পাকিস্তানি যুদ্ধাপরাধী ১৯১ জন

ডা. এম এ হাসান

ডা. এম এ হাসানের জন্ম ১৯৫০ সনের ১৪ মার্চ। তিনি মূলত: একজন বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক ও বিজ্ঞানী। তাঁর কর্মপরিধি চিকিৎসা বিজ্ঞানের নানা বিষয় থেকে সামাজিক বিজ্ঞান, মনোবিজ্ঞান ও দর্শনের নানা বিষয় পর্যন্ত বিস্তৃত। একদিকে যেমন তিনি জীবন ও পৃথিবীর বিকাশ নিয়ে কাজ করেছেন অপরদিকে মানবাধিকার ও বিচারের অধিকার নিয়ে কাজ করেছেন। '৭১-এ বাংলাদেশের মাটিতে সংগঠিত গণহত্যা, নারী নির্যাতন সংক্রান্ত তাঁর গবেষণা ব্যাপক। ১৯৯৯ থেকে তিনি গণকবর, ফরেনসিক এক্সিবিটস (Forensic Exhibits) এবং হাড়গোড়ের ডিএনএ প্রোফাইলিং নিয়েও কাজ করেছেন। ডা. এম এ হাসান এমন একজন অগ্রগামী মুক্তিযোদ্ধা যিনি তাঁর শহীদ ভ্রাতা লে. সেলিমকে নিয়ে ২৫ মার্চ ৭১-এর রাতে ঢাকার বুকে প্রতিরোধ যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন। '৭১-এর ৩১ মার্চ তিনি দ্বিতীয় ইষ্টবেঙ্গল রেজিমেন্টের সাথে যোগ দিয়ে মুক্তিযুদ্ধে শরিক হন এবং অসংখ্য যুদ্ধে নেতৃত্ব দেন।

পাকিস্তানি যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের বিষয় নিয়ে তিনি একাধিকবার কথা বলেছেন জাতিসংঘের মানবাধিকার হাইকমিশনে এবং আন্তর্জাতিক অঙ্গনে। তিনি কথা বলেছেন ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের সাথে। বিচারহীনতার নেতিবাচক দিকগুলো নিয়ে আলোচনা করেছেন এ্যামেনেস্টি ও আইসিসি আয়োজিত শীর্ষ সম্মেলনে। এ সব কাজের জন্য ২০০৩ সনে বেলজিয়াম সরকার পৃথিবীর শীর্ষ দু'শ মানবাধিকার কর্মীর সাথে তাঁকেও সম্মানিত করেন।

'৭১ এর গণহত্যা, নারী নির্যাতন ও বর্বরতার অনবদ্য ডকুমেন্টেশন 'যুদ্ধাপরাধ গণহত্যা ও বিচারের অন্বেষণ' ও 'যুদ্ধ ও নারী' তাঁর দুটি শ্রেষ্ঠ রচনা। তাঁর অন্যান্য রচনার মধ্যে রয়েছে 'নীরবতার ওপারে কৃষ্ণ মেঘের দিনগুলি', 'প্রসঙ্গ '৭১ মানবতার বিরুদ্ধে অপরাধ'। 'নৈঃশব্দের পদাবলী' তাঁর একক কাব্যগ্রন্থ।

www.pathagar.com

'পাকিস্তানি যুদ্ধাপরাধী ১৯১ জন' শীর্ষক গ্রন্থটি মানুষের সীমাহীন নিষ্ঠুরতা ও মানবতার বিরুদ্ধে অপরাধকর্মের এমন একটি দলিল যার প্রতিটি ছত্র আমাদের রক্ত ও অশ্রু দিয়ে লেখা। এই দলিলটিকে শুধু সাত কোটি মানুষের রক্তাক্ত ইতিহাসের অংশ বললে কম বলা হবে। কেননা, এই গ্রন্থে শুধু যুদ্ধের নিষ্ঠুর যাতাকলে পিষ্ট মানুষগুলোর সীমাহীন কষ্টের কথা, আঘাতে আঘাতে চূর্ণবিচূর্ণ হবার কথা, আগ্রাসী পাকিস্তানি বাহিনীর ভয়ঙ্কর নিষ্ঠুরতা ও তাণ্ডবের কথাই বিধৃত হয় নাই, সেই সাথে বর্ণিত হয়েছে সভ্যতার এমন এক ব্যর্থতার কথা, যা সকল মানুষের অনুভবের বিষয়। বিচারহীনতার এই ব্যর্থতাকে অতিক্রম করবার জন্যই পাকিস্তানি যুদ্ধাপরাধীদের কিছু অপরাধের অনুপুঙ্খ বিবরণ তুলে ধরা হয়েছে এই গ্রন্থে। সেই সাথে চিহ্নিত করা হয়েছে অপরাধীদেরকে। ৭১-এ এদেশের মাটিতে ঘটে যাওয়া অপরাধকর্মের বিচার কোনদিন সম্পাদিত হলে এই দলিলটি কাজে আসবে বলে মনে করা হচ্ছে। আত্মপরিচয়ের সংকটে নিমজ্জিত জাতির হৃদয়ের গভীর মূল্যবোধ ও সুস্থ অহংকার তৈরি করে বিচারের প্রতি আস্থা এবং মানব মর্যাদা প্রতিষ্ঠার জন্য এ গুরুত্বপূর্ণ দলিলটি কাজে আসবে বলে মনে করা যাচ্ছে।

www.pathagar.com

পাকিস্তানি যুদ্ধাপরাধী ১৯১ জন

ডা. এম এ হাসান

সময় প্রকাশন

www.pathagar.com

পাকিস্তানি যুদ্ধাপরাধী ১৯১ জন
ডা. এম এ হাসান
© লেখক

দ্বিতীয় মুদ্রণ : মে ২০১২
প্রথম প্রকাশ : ফেব্রুয়ারি বইমেলা ২০০৭

সময়

সময় ৫৮১

প্রকাশক
ফরিদ আহমেদ
সময় প্রকাশন
৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা

প্রচ্ছদ
ধ্রুব এষ

কম্পোজ
সময় কম্পিউটার্স
৩৮/২-ক বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০

মুদ্রণ
একুশে প্রিন্টার্স
শিংটোলা, ঢাকা

মূল্য : ৩২৫.০০ টাকা মাত্র

PAKISTANI JUDDHAPARADHI 191 JON (War Criminals of 1971 : 191 Pakistanis) by Dr. M A Hasan. First Published: February Book Fair 2007. 2nd Print in May 2012 by Farid Ahmed. Somoy Prakashan, 38/2Ka Banglabazar, Dhaka 1100.

Web : www.somoy.com E-mail: f.ahmed@somoy.com

Price : Tk. 325.00 only

ISBN 984-458-581-3 Code : 581

নিজস্ব বিক্রয়কেন্দ্র 'সময় . . .', প-াজা এ. আর, (৪র্থ তলা), সড়ক ১৪ (নতুন) ধানমন্ডি (মিরপুর রোড, সোবহানবাগ মসজিদের পাশে), ঢাকা। ফোন : ৯১১৬৮৮৫

www.pathagar.com

উৎসর্গ

যাদেরকে নানাভাবে বঞ্চিত করে বহুমুখী গবেষণার পেছনে আপন সম্পদ ও সময় ব্যয় করেছি, সেই পরিবারকে –

যাকিয়া মাহফুজা হাসান

ইফতেখার হাসান

আদিব হাসান

শামাভী হাসান

www.pathagar.com

প্র স ঙ্গ ক থা

১৯৭১ সনের ২৫ মার্চ ঘুমন্ত বাঙালি জাতির উপর অকস্মাৎ ঝাঁপিয়ে পড়ে পাকিস্তানি বর্বর বাহিনী যে যুদ্ধ শুরু করে তা কোন অভ্যন্তরীণ সংঘাত, নাগরিক শৃঙ্খলা নিয়ন্ত্রণে সাধারণ দমন বা দাঙ্গা ছিল না। এটা কোন বিচ্ছিন্ন বিদ্রোহ দমনও ছিল না। এটা ছিল একটি সুপরিকল্পিত গণহত্যা এবং একটি জাতিকে নিশ্চিহ্ন করবার নিষ্ঠুরতম প্রক্রিয়া। বেপরোয়া হত্যা, গণধর্ষণ, লুট, অগ্নিসংযোগ, অপহরণ এবং অন্যায়ভাবে নিরপরাধ মানুষগুলোকে বন্দী করে পাকিস্তানি শাসকেরা অন্যতম বৃহৎ একটি যুদ্ধাপরাধ ও মানবতার বিরুদ্ধে অপরাধকর্ম সম্পন্ন করে। এরপর তারা প্রতারণামূলকভাবে একটি জাতির স্বাধীনতা যুদ্ধকে বিদ্রোহ বলে অভিহিত করে তাদের সীমাহীন অপরাধগুলোকে লঘু করার, চেষ্টা করে।

শুধু তাই নয়, তারা ১৯৭১-এর পর এমনভাবে কূটনৈতিক তৎপরতা চালায় যাতে এ দেশের মাটিতে সংঘটিত এই নৃশংস গণহত্যা আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত না হয়। গণহত্যাকে অস্বীকার করার প্রবণতাটি নতুন কিছু নয়। এ কারণেই উন্নত বিশ্ব অধুনা গণহত্যা অস্বীকার করার বিষয়টিকে রাষ্ট্রীয় অপরাধ হিসাবে বিবেচনা করছে।

প্রকৃত সত্য হল এই, পরিকল্পিত ধ্বংসযজ্ঞের মাধ্যমে ত্রাস সৃষ্টি করে বর্বর পাকিস্তানি বাহিনী '৭১-এর ন'মাসে এক কোটিরও বেশি বাঙালিকে ঘর ছাড়া করে Forced migration -এ বাধ্য করে। প্রথম ছয় মাসে হত্যা ও ধর্ষণের পর সম্মান ও সম্পদ লুট করে ভিটেমাটিতে আগুন দিয়ে ৬৯.৭১ লক্ষ (মার্চ–আগস্ট, সূত্রঃ বাংলাদেশ ডকুমেন্টস পৃষ্ঠা-৪৪৬, ভারত সরকারের বৈদেশিক মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রকাশিত) হিন্দুকে দেশ ছাড়া করে তারা ethnic cleansing- এর কাজটি সমাধা করেছিল।

এসময়ে তারা নির্বিচার হত্যা ও পরিকল্পিত গণহত্যার মাধ্যমে বাঙালি জাতি ও হিন্দু সম্প্রদায়কে নির্মূল করবার নিষ্ঠুর প্রক্রিয়া চালায়। বিশেষ করে এ দেশের তরুণ ও বুদ্ধিজীবী শ্রেণীকে নিশ্চিহ্ন করবার জন্য তারা তাদের তাঁবেদার বাহিনীকে ব্যবহার করে এ সময়। তারা দেশের তরুণ ও হিন্দু সম্প্রদায়ের জন্য এমন জীবননাশী অবস্থা সৃষ্টি করে, যাতে তারা সম্পূর্ণ বা আংশিক নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। এটা করতে গিয়ে তারা হত্যা, ধর্ষণ, লুট, অগ্নিসংযোগ, বন্দীদের উপর অত্যাচার, নিষ্ঠুর নির্যাতনসহ শিশু হত্যার মতো বীভৎস ও পৈশাচিক কর্মকাণ্ডে লিপ্ত হয়। এভাবে দেশের প্রতি পাঁচ জনের মধ্যে একজন কোন না কোনভাবে নিষ্পেষিত হয়েছে নিষ্ঠুর পাকিস্তানি সেনা ও

www.pathagar.com

তাদের দোসর দ্বারা। ওয়ার ক্রাইম্স ফ্যাক্টস ফাইন্ডিং কমিটির চলতি গবেষণা অনুযায়ী পাকি হানাদার ও তাদের দোসররা ১৯৭১ সালে দেশে যে ব্যাপক গণহত্যা ও নারী নির্যাতন চালায়, তাতে প্রায় সাড়ে বারো লাখ লোক নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। এসব হত্যাকাণ্ডের বিজ্ঞানভিত্তিক সুনির্দিষ্ট প্রমাণ রয়েছে, এর বাইরে আরও হিসাব রয়েছে। পরিসংখ্যান রয়েছে চার লাখ ষাট হাজার নারী নির্যাতনের বিষয়ে। এ যাবত ৯২০টি গণহত্যা ও গণকবর স্পট আবিস্কৃত হলেও মূল গণকবরের সংখ্যা পাঁচ হাজারের বেশি বলে মনে করা হচ্ছে। ৮৮টি নদীর তট ও ৬৫টি ব্রিজের উপর পাকিস্তানি বাহিনী ও তাদের দোসরদের দ্বারা সংঘটিত নিয়মিত হত্যাযজ্ঞের প্রমাণ পাওয়া গিয়েছে। এইসব হত্যা, ধর্ষণ, ও বীভৎস নির্যাতনে পাকি দোসররা নিয়মিতভাবে সহায়তা করলেও পাকিস্তানি বাহিনী নিজেরাই অধিকাংশ ক্ষেত্রে এ সমস্ত হত্যা, ধর্ষণ, লুন্ঠন অগ্নিসংযোগ, নিষ্ঠুর নির্যাতনসহ গণহত্যায় অংশ নেয়। ভুক্তভোগী মানুষ, ধর্ষিতা নারী ও প্রত্যক্ষদর্শীরা পাকিস্তানি সেনাদের নামও উল্লেখ করেছে। এ প্রেক্ষাপটে ওয়ার ক্রাইম্স ফ্যাক্টস ফাইন্ডিং কমিটি ২৮৭ জন যুদ্ধাপরাধীকে শনাক্ত করেছে। এরমধ্যে ১৯১ জন বড় মাপের যুদ্ধাপরাধী। এই গ্রন্থটি ১৯১ জন যুদ্ধাপরাধীর অপরাধ কর্মেরই দলিল। তারপরও কথা আছে।

এই দলিলে যে তাদের সবটুকু অপরাধের কথা বর্ণিত হয়েছে তা নয়। তাদের সবার কথা উঠে এসেছে এটাও নয়। বড় মাপের অনেক অপরাধীর অনেক কথা এখনও না বলা রয়ে গেছে। সে হিসাবে এই গ্রন্থটি ৭১-এ এদেশের মাটিতে ঘটে যাওয়া সীমাহীন অপরাধসমূহের এক খণ্ডিত অংশের নখদর্পণ।

এ গ্রন্থ রচনায় আমার যে সকল সহকারী তাদের শ্রম দিয়েছে, নানা সময়ে অনুলিখনে সাহায্য করছে, কম্পিউটারের পেছনে কাজ করেছে তাদের নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। মূলত: অনুলিখনের কাজটি করছে আবু বকর সিদ্দিক। প্রবল উৎসাহে শেষ প্রুফ দেখার কাজটি করেছেন কবি হাসান হাফিজ। কম্পিউটারের পেছনে নিরলসভাবে কাজ করেছে অহিদুল ইসলাম। বইটি নির্ভুল ও সুন্দর করার জন্য শ্রম দিয়েছে পাপিয়া ও তরুন। আমি এদের সবার কাছে কৃতজ্ঞ। এই গ্রন্থটি প্রকাশের জন্য আমি বিশেষভাবে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি সময় প্রকাশের স্বত্বাধিকারী জনাব ফরিদ আহমেদ এবং তাঁর কুশলী কর্মীবৃন্দকে।

ডা. এম এ হাসান
উত্তরা, ঢাকা

www.pathagar.com

সূচি পত্র

ঢাকা বিভাগ	৯
চট্টগ্রাম বিভাগ	৭৩
সিলেট বিভাগ	৯১
খুলনা বিভাগ	১০৯
বরিশাল বিভাগ	১২৯
রাজশাহী বিভাগ	১৬৯
শেষ কথা	২৩১

www.pathagar.com

ঢাকা বিভাগ

আসামীঃ লে. জেনারেল টিক্কা খান, মেজর জেনারেল রাও ফরমান আলী, ব্রিগেডিয়ার জাহানজেব আরবাব, ব্রিগেডিয়ার বশির, ব্রিগেডিয়ার রাজা, ব্রিগেডিয়ার আসলাম, ব্রিগেডিয়ার শরীফ, ব্রিগেডিয়ার শফি, কর্নেল তাজ, মেজর আসলাম, ক্যাপ্টেন সাঈদ, ক্যাপ্টেন তারেক, সুবেদার শের শাহ্ খান, আকবর (র‍্যাঙ্ক অজানা)

অপরাধের ধরনঃ গণহত্যা, জাতিগত নিধন, ধর্ষণ, লুটপাট, অগ্নিসংযোগ।

সাক্ষী ঃ অরুণ কুমার দে, রেনুবালা দে, ফরিদা খানম, আবদুল খালেক, হাসিনা বেগম, রাম রাজীয়া পার্শ্বী, মনোরঞ্জন দাস, গাঙ্গুলী বাবু, পাগলনাথ সুর, শহীদ জননী সালেমা বেগম, জিল্লুর রহমান, নুরুদ্দীন মিয়া, আওয়াল খান, ফকির সফির উদ্দীন আহমেদ, এ্যাল্লাইয়া, কমলা, মারি, মুহম্মদ মোস্তফা, অধ্যক্ষ ব্রাদার জন।

ঘটনাকালঃ একাত্তরের পঁচিশে মার্চের রাত থেকে ডিসেম্বর।

ঘটনাস্থল ঃ ঢাকা

সূত্রঃ যুদ্ধাপরাধ গণহত্যা ও বিচারের অন্বেষণ এবং WCFFC গবেষণা।

পাকি বাহিনী ঢাকা, চট্টগ্রামসহ এদেশের প্রধান প্রধান শহর ও বন্দরে ঘুমন্ত বাঙালির ওপর অত্যাধুনিক সমরাস্ত্র নিয়ে উন্মত্ত পশুর মতো ঝাঁপিয়ে পড়ে ১৯৭১ এর ২৫ মার্চ রাতে। ভয়ঙ্কর নিষ্ঠুরভাবে নির্বিচারে তারা হত্যা করে নিরীহ জনগণসহ ছাত্র, শিক্ষক, শ্রমিক, বুদ্ধিজীবী ও বাঙালি সেনাসদস্যদেরকে।

ঢাকাবাসীদের মতো পঁচিশে মার্চ রাতে সাধারণ ছাত্ররা অনেকেই হলে অবস্থান করছিলেন। পাকিস্তানি সেনাবাহিনী হঠাৎ করে মধ্যরাতে আক্রমণ করবে, তা কেউ কল্পনাও করতে পারেননি। ঢাকা আক্রমণের শুরুতেই পাকি বাহিনী ট্যাঙ্ক নিয়ে জগন্নাথ হলের ভেতরে প্রবেশ করে। ব্রিগেডিয়ার জাহানজেব আরবাব খানের নেতৃত্বে এই গণহত্যা পরিচালিত হয়। গ্রেনেড ছুঁড়ে, ব্রাশফায়ার করে পাকিসেনারা ছাত্রাবাসে তাণ্ডব শুরু করে। এসময় সত্য দাস, রবীন ও সুরেশ দাসসহ জনাপঁচিশেক ছাত্র হলের ছাদে আশ্রয় নেন। সেখানেও রক্ষা পাননি তাঁরা। লাইন করে মেশিন গানের গুলিতে ঝাঁঝরা করে দেওয়া হয় তাঁদের শরীর। সেদিনের গণহত্যা থেকে বেঁচে গিয়েছিলেন পরিমল গুহ ও সুরেশ। এক পর্যায়ে পাকিস্তানি সৈন্যরা পলায়নরত ও আতঙ্কগ্রস্ত মানুষদের ধরে এনে লাশ সরানোর কাজে নিয়োজিত করে। মিলিটারি

www.pathagar.com

পাহারায় রাইফেল আর বেয়নেটের ভয়ে ছাত্র কর্মচারীদের অনেকে সেই কাজ করতে বাধ্য হন। পরে তাঁদেরকেসহ বিভিন্ন স্থান থেকে ধরে আনা মানুষকে সারিবদ্ধভাবে দাঁড় করিয়ে গুলি করে হত্যা করা হয়। এর মধ্যে শিববাড়ির কয়েকজন সাধুও ছিলেন। প্রথমে তারা মর্টার গাড়ে, তারপর শুরু করে গুলিবর্ষণ। তারা জগন্নাথ হলের প্রাক্তন প্রাধ্যক্ষ ড. গোবিন্দ চন্দ্র দেবের বাড়ি আক্রমণ করে তাঁকে ও তাঁর পালিতা কন্যা রোকেয়ার স্বামীকে হত্যা করে। জগন্নাথ হল সংলগ্ন বিশ্ববিদ্যালয় স্টাফ কোয়ার্টারে পরিসংখ্যান বিভাগের অধ্যাপক মুনিরুজ্জামান, তাঁর পুত্র ও আত্মীয়সহ অনেকে শহীদ হন। আহত হয়ে পরে হাসপাতালে মৃত্যুবরণ করেন ড. জ্যোতির্ময় গুহঠাকুরতা। পাকিস্তানি সৈন্যরা মধুসূদন দে'র (মধুদা) বাড়ি আক্রমণ করে হত্যা করে তাঁর স্ত্রী যোগমায়া, পুত্র ও পুত্রবধূসহ তাঁকে। জগন্নাথ হলে সংঘটিত এ গণহত্যায় শহীদদের সঠিক সংখ্যা খুঁজে পাওয়া যায় না। তবে রতনলাল চক্রবর্তী সম্পাদিত 'ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে গণহত্যা ১৯৭১, জগন্নাথ হল' গ্রন্থে বলা হয়েছেঃ জগন্নাথ হলের সাথে সংশ্লিষ্ট ৩ জন শিক্ষক, ৩৪ জন ছাত্র এবং ৪ জন কর্মচারী ২৬ মার্চ শহীদ হন। কয়েকজন প্রত্যক্ষদর্শীর জবানবন্দী এখানে তুলে ধরা হল। এ ছাড়াও পাকি আর্মি রোকেয়া হল, ইকবাল হলসহ বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন স্থানে হামলা করে।

শহীদ মধুসূদন দে'র ছেলে অরুণ কুমার দে সেদিনের হত্যাকাণ্ডের বর্ণনা দিতে গিয়ে বলেন, একাত্তরের ছাব্বিশে মার্চ সকাল সাড়ে সাতটার দিকে দশ বারোজনের একটি দল আমাদের বাড়িতে আসে। এরা সবাই ছিল পাকিস্তানি আর্মির লোক। আমার বয়স তখন দশ-বারো বছর। আমাদের বাড়িটা তাদেরকে চিনিয়ে নিয়ে এসেছিল আমাদের কোয়ার্টারের চতুর্থ তলায় বসবাসকারী তোতা মিয়া। সকালে প্রতিদিনের মতো আমার বাবা নামজপ করছিলেন। দরজায় ধাক্কা দিতে থাকে পাকি সেনারা। বাবা দরজা খোলার সাথে সাথে 'হ্যান্ডস আপ' করিয়ে পাকি সেনারা তাঁকে পাশের ফ্লাটে নিয়ে যায়। এরপর তারা বাড়ির ভেতরে ঢুকে পড়ে প্রথমেই আমার বৌদি রীনা রাণীর ওপর আক্রমণ করে। মাত্র পাঁচ মাস আগে তিনি এ বাড়ির বউ হয়ে এসেছিলেন। আমার বোন রানু, দাদা রঞ্জিত কুমার দে'কে ডেকে বলে, "দাদা, বৌদিকে মেরে ফেলছে।" দাদা তখন বৌদিকে 'হাত তোলো' বলতেই তাঁকে গুলি করে পাকিস্তানি সেনারা। সাথে সাথে তিনি মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েন। এরপর হত্যা করে বৌদিকে। আমার মা দৌড়ে গিয়ে বাবাকে জড়িয়ে ধরে প্রাণভিক্ষা চান। আমার মাও তখন অন্তঃসত্ত্বা ছিলেন। মা এমনভাবে বাবাকে ধরেছিলেন যে, তারা গুলি করতে পারছিল না। অবশেষে তারা মাকে গুলির আঘাতে ঝাঁঝরা করে দেয়। মার হাত দু'টো তখন কিমার মতো ছড়িয়ে পড়েছিল। গলায় গুলি লেগেছিল তাঁর। বাবার হাতে পায়ে গুলি লেগেছিল, কিন্তু তখন তিনি বেঁচে ছিলেন। ঘরের মধ্যে তখন দাদা বৌদির লাশ। ছোট বোন রানু পিঠে ও চোয়ালে গুলি লাগা অবস্থায় পড়েছিল। ঘরের সবকিছু লণ্ডভণ্ড করে চলে যায় পাকি সেনারা। বাড়িতে কান্নাকাটির রোল পড়ে তখন। এই অবস্থায় ঘন্টা খানেকের মধ্যে আবার ফিরে আসে পাকি সেনারা। সাথে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র কালাচাঁদ শীল ও মালী দুখীরাম, যাদেরকে দিয়ে সারারাত

www.pathagar.com

জগন্নাথ হলের লাশ সরানোর কাজ করায় তারা। এরপর তারা মধুসূদন দে'কে ধরে নিয়ে যায়। আহত বাবাকে ধরে আমরা হাউমাউ করে কাঁদছি তখন। প্রাণভিক্ষা চাচ্ছি পাকিস্তানি সৈন্যদের কাছে। তখন তারা বলে যে, "ভয় নেই তোমার বাবাকে হাসপাতালে নিয়ে যাচ্ছি, সুস্থ হলে ছেড়ে দেব।" আমরা আহত রানুকেও হাসপাতালে নেওয়ার কথা বললে, তারা জানায়, মেয়েদেরকে নিতে পারবে না। এরপর তারা বাবাকে জগন্নাথ হলের দিকে নিয়ে যায়। সেখানে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মচারী, শিক্ষকসহ অনেকের সঙ্গে তাঁকে গুলি করে হত্যা করে।

রেনুবালা দে বলেন, আমি ছিলাম পাকি বাহিনীর হামলার প্রথম শিকার। পাকিরা আমার স্বামী খগেন দে ও বড় ছেলে মতিলালকে হত্যা করে। হঠাৎ রাতে গুলির আওয়াজ শুনতে পেয়ে আমরা ভেবেছিলাম, বিয়ের বাজি ফোটানো হচ্ছে। আমরা তখন জগন্নাথ হলের পূর্ব বাড়িতে থাকতাম। আমার স্বামী ছিলেন বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মচারী। হলের মধ্যে প্রচণ্ড গোলাগুলির শব্দ হচ্ছে তখন। তখনও আমরা ভাবছি আন্দোলন হচ্ছে, হয়তো দু'একজন ছেলেকে ধরবে। আমি দরজায় গিয়ে দাঁড়ালাম। এমন সময় দারোয়ানের দু'ছেলে শিবু ও শংকর এসে বলল, "কাকিমা দরজা বন্ধ করে চৌকির নিচে শুয়ে থাকেন।" এরপর ঘরে গিয়ে সবে বাচ্চাদের খাটের নিচে শুইয়ে দিয়েছি, এর মধ্যেই মিলিটারি এসে পড়ল। মুহূর্তের মধ্যে শংকরের ওপর গুলি করল মিলিটারিরা। "মাগো" বলে চিৎকার শুনলাম। এর মধ্যেই পেছনের টিনশেড বাড়িতে আগুন লাগিয়ে দিয়েছে তারা। আগুনের ঝলকানিতে উত্তপ্ত হয়ে উঠল ঘর। আমি স্বামীকে বললাম, ছোট তিন ছেলেমেয়েকে নিয়ে আমি এখানেই থাকব। স্বামী ও বড় ছেলে মতিলালকে বললাম, পালিয়ে গিয়ে জীবন বাঁচাতে। তখনও আমি জানি না যে, আমার ঘরের সামনে দু'জন আর্মি দাঁড়িয়ে আছে। ছোট বাচ্চাটাকে কোলে নিয়ে দরজা খুলতেই তাদের সামনে পড়ে গেলাম। আর্মি প্রশ্ন করল, "ছাত্রলোগ হ্যায় ঘরমে?" বললাম, এখানে কোন ছাত্র নেই। এরপর আর্মি বলল যে ঘরে আগুন দেওয়া হবে, তোমরা জিনিসপত্র নিয়ে মাঠে চলে যাও। এই কথা শুনে আমার স্বামী বললেন, "বলেছি না! আমাদেরকে কিছু করবে না।"

আজানের পরপরই ঘরে আগুন লাগিয়ে দেয় পাকি সেনারা। বাইরে ট্রাঙ্কের ওপর বসে আমি আমার আট মাসের ছেলেকে দুধ খাওয়াচ্ছি। বড় ছেলে মতিলাল তখন পাশে বসা। এ সময় পাকি সেনা আমার অষ্টম শ্রেণীতে পড়ুয়া ছেলে, মতিলালকে ধরে নিয়ে যায়। কোয়ার্টারের সমস্ত ছেলেকে তারা ধরে নিয়ে গিয়েছিল। বারো তেরো বছর বয়স থেকে পূর্ণবয়স্ক পর্যন্ত সব পুরুষকেই তারা গোয়ালঘরে নিয়ে আটকিয়ে রাখে। একজন পাকি সেনা এসে মহিলাদেরকে ধমকে বলতে থাকে, "আভি তুমকো কৌন বাচায়েগা, মুজিব কো বুলাও।" এ পরিস্থিতিতে মহিলারা আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে পড়েন এবং স্বামী সন্তানদের প্রাণ ভিক্ষা চাইতে থাকেন।

www.pathagar.com

সূর্য তখনও ওঠেনি। সব পুরুষকে লাইন করে বাইরে নেওয়া হচ্ছিল। মহিলারা পুরুষের পেছনে পেছনে যাচ্ছিলেন। এরপর পুরুষদের লাগানো হল সারারাত ধরে চালানো হত্যাকাণ্ডের নিদর্শন সরানোর কাজে। লাশ এনে মাঠে জড়ো করছিলেন তাঁরা। হলের ছাত্র ও কর্মচারী ছাড়াও শিববাড়ির পাঁচ জন সাধু এদের মধ্যে ছিলেন; আরও ছিলেন মুকুন্দনন্দ, মাধব ও অন্যরা। লাশ টানা শেষ হওয়ার পর সবাইকে সোজা হয়ে দাঁড়াতে বলে গুলি চালানো শুরু করে তারা। আকস্মিক এই আক্রমণে হতবিহ্বল হয়ে পড়েন সবাই। মহিলাদের সামনে গুলির আঘাতে মৃত্যু ঘটল স্বামী সন্তানের। আমি এগিয়ে গেলাম স্বামীর সন্ধানে। তখনও মৃত্যু হয়নি তাঁর। আমি তাঁকে ধরে নিয়ে যেতে চাইলাম। স্বামী বললেন, "নাড়াতে তো পারবা না, জল দাও।" আমি স্বামী সন্তানকে জল খাওয়ালাম। এরই মধ্যে আবার টহল দিতে এল পাকি সেনারা। সব মিলে অসহায় আতঙ্কগ্রস্ত আমি অজ্ঞান হয়ে পড়ে গেলাম। তখন মেয়ে বাসনা গিয়ে অনেক লাশের ভিড়ে বাবা ও ভাইকে খুঁজে পানি খাওয়াল।

এরপর একটি ছেলে (নাম মনে করতে পারেননি, তবে বটতলার লাইব্রেরিতে থাকতেন বলে জানিয়েছেন) এসে আমাদেরকে হোসনী দালানে নিয়ে গেল এবং পরে এসে স্বামী ও ছেলেকে মেডিক্যালে নিয়ে যাবে বলে জানাল। কিন্তু পরে ফিরে এসে সে কিছু করতে পারেনি। কারণ ইতোমধ্যে মাঠ ঘিরে ফেলেছিল পাকি সেনাবাহিনীর লোকেরা।

পরদিন আমি নিজেই আবার জগন্নাথ হলে ফিরে আসি। ততক্ষণে সবাইকে মাটিচাপা দেওয়া হয়ে গেছে। কারও লুঙ্গি কারও আঙুল বেরিয়ে আছে। আমি অন্যদের কাছ থেকে খবর পেলাম, আমার ছেলে শেষ অব্দি বেঁচে ছিল। শেষ মুহূর্তে তাকে ব্রাশফায়ার করে বুলডোজারের চাপে গণকবরে মিশিয়ে দেওয়া হয়।

এরপর আমি অনেক কষ্টে সেখান থেকে পালিয়ে ছোট দুই ছেলে ও এক মেয়েকে নিয়ে জিঞ্জিরায় চলে যাই। সেখানে ২রা এপ্রিল আবার পাকি সেনাদের হামলার শিকার হই। সেখান থেকে আবার ফিরে আসি শিববাড়ি মন্দিরে। সেখানেও এসে হাজির হয় পাকি সেনারা। আমার সঙ্গে তখন ছিল সতেরো-আঠারো বছরের একটি ছেলে। সে এসে বলল, "দিদি পালাতে হবে।" সে ছেলেটি দেয়াল টপকে মন্দিরের পেছন দিক থেকে তিনটে শিশুকে বাইরে নামিয়ে দেয়। আমি দেয়াল টপকাতে গিয়ে মারাত্মকভাবে আহত হলাম। এই অবস্থায় পুকুরের মধ্যে লুকিয়ে থাকলাম আমরা। এর মধ্যেই মন্দিরের মধ্যে ঢুকে পড়ে পাকি সেনা। সব কিছু ভাঙচুর শুরু করে। কিছুক্ষণ পর আমি সন্তানদের নিয়ে বাংলা একাডেমিতে গিয়ে কয়েকজনের কাছে আশ্রয় চাইলাম। কিন্তু কেউই আশ্রয় দিতে রাজি হল না। অবশেষে এক বৃদ্ধ দারোয়ান নিজের মেয়ের পরিচয় দিয়ে আমাকে আশ্রয় দিলেন।

মাসখানেক পর এক রাতে আবারও শিববাড়ি আক্রান্ত হয়। ছেলেমেয়েসহ আমাকে বাইরে এনে দাঁড় করায় পাকি আর্মি। নাম জিজ্ঞেস করায় আমি বিহারি সুইপারদের নাম বলি। নাম শুনে পাকি সেনারা আমাদেরকে ঘরে চলে যেতে বলে। পরে কে যেন

www.pathagar.com

তাদেরকে বলে দেয় যে, আমরা হিন্দু। তখন আবার ফিরে আসে তারা। ইউনিভার্সিটি কোয়ার্টার থেকে দাড়ি নেই এমন লোকদের ধরে নিয়ে শিববাড়ির সামনে শুইয়ে রাখে। আমাকেও নিয়ে যায় সেখানে। ছেলেমেয়েদের কাছ থেকে আলাদা করে দাঁড় করায় গুলি করার জন্য। কিছুক্ষণ পর কী যেন মনে করে ছেড়ে দেয় আমাদেরকে। মন্দিরে গিয়ে শুয়ে থাকতে বলে। কিন্তু ছেলেমেয়ে নিয়ে স্টাফ কোয়ার্টারের দিকে চলে যাই আমি। সারারাত কাঁচা পায়খানার মধ্যে বসে থাকি। এক পর্যায়ে লক্ষ্য করি আবার আমাকে খুঁজতে এসেছে পাকি সেনারা। সকালে আমাদেরকে সেখান থেকে উদ্ধার করেন সলিমুল্লাহ মুসলিম হলের দারোয়ান ফরিদ। অবশেষে তিনি লুকিয়ে ঢাকার বাইরে পার করে দিয়েছিলেন আমাদেরকে। এরপর তিন দিন পর বহু কষ্টে নোয়াখালী গিয়ে পৌঁছেছিলাম আমরা।

রোকেয়া হলে অবস্থানরত তৎকালীন ছাত্রী, ফরিদা খানম সাকী বলেন, ১৯৭১ সনের পঁচিশে মার্চ রাতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রোকেয়া হলে পাকি বাহিনী যে নারকীয় হত্যাকাণ্ড চালায়, আমি তার প্রত্যক্ষদর্শী। আমার সাথে আরও ছয়জন ছাত্রী সে রাতে হলে ছিল। পঁচিশে মার্চ সকাল থেকেই চারদিকে থমথমে ভাব ছিল। আমি ও মমতাজ বেগম তখন ছাত্র লীগের সক্রিয় কর্মী। কোন সমস্যা হলে আমাদেরকে হল থেকে সরিয়ে নেওয়া হবে বলে নেতৃবৃন্দ পূর্বাহ্নেই জানিয়েছিলেন। হলে অবস্থানরত বাকি পাঁচ জনের কোন রাজনৈতিক সংশ্লিষ্টতা ছিল না। আসন্ন পরীক্ষা ও অন্যান্য কারণে তাঁরা হলেই অবস্থান করছিলেন। হলে অবস্থানরত সাত জনের পরিচয় ১. এ.এ. খুরশিদা বেগম-২য় পর্ব এমএ, ২. লুৎফুন নাহার খান-এমএ, পরীক্ষার্থী, ৩. নাজমা বেগম-এমএ, পরীক্ষার্থী, ৪. রাধা সেরেন্ডা (নেপালী) এমএ, পরীক্ষার্থী, ৫. আখতার ইমাম শোকাতুন্নেছা-এমএ পরীক্ষার্থী, ৬. ফরিদা খানম-দ্বিতীয় বর্ষ-এম.এ ৭. মমতাজ বেগম-তৃতীয় বর্ষ, অনার্স পরীক্ষার্থী)।

"এ সময় ছাত্র ইউনিয়নের মেয়েরা ডামি রাইফেল হাতে প্যারেড করতেন। এঁদের সংখ্যা ছিল প্রায় পঞ্চাশ জন। এঁরা রেসকোর্সে প্যারেড শেষ করে রোকেয়া হলে এসে পানি, জলখাবার খেয়ে খানিকক্ষণ বিশ্রাম নিয়ে চলে যেতেন। পাকি বাহিনীর লোক যারা সে সময় হলের নজরদারি করত, তারা প্যারেড করা ওই মেয়েদের দেখে মনে করে, হলে প্রচুর মেয়ে আছে।"

"সে রাতে আটটার মধ্যেই আমরা রাতের খাবার খেয়ে নিই। এরপর আমি ও আমার বান্ধবী মমতাজ বেগম রুমে গিয়ে শুয়ে শুয়ে গল্প করছিলাম। হঠাৎ রাত সাড়ে এগারোটার দিকে গুলির শব্দ কানে এল। আমরা মনে করেছিলাম, দূরে কোথাও গোলাগুলি হচ্ছে। এসময় দরজা খুলে বাইরে এসে দেখি পাকি হানাদার হলের মূল ফটক ভাঙার চেষ্টা করছে। এরপর পুরো বিশ্ববিদ্যালয় এলাকা আলোয় আলোকিত হয়ে ওঠে। পাকি বাহিনী আলো দেখে দেখে গুলি করতে থাকে। জগন্নাথ হল, ইকবাল হল থেকে গুলির শব্দ ভেসে আসছিল। গুলির মুহুর্মুহূ শব্দে মনে হচ্ছিল, তারা রাতের মধ্যেই বিশ্ববিদ্যালয় এলাকা ধ্বংস করে দেবে। আমরা যারা অনার্স ভবন ও মূল ভবনে ছিলাম, তারা ভয়ে পেছনের দরজা দিয়ে হলের প্রাধ্যক্ষ আখতার

www.pathagar.com

ইমামের বাসায় চলে যাই। তিনি তখন বারান্দায় দাঁড়িয়েছিলেন। তাঁর বাসায় আমাদের জায়গা দেওয়ার অনুরোধ করি। কিন্তু আখতার ইমাম আমাদেরকে বাসায় ঢুকতে দিতে অস্বীকার করেন। আমার সাথের পাঁচটি মেয়ে তখন কাঁদছিল। প্রাধাক্ষ্যের বাসায় থাকার অনুমতি না পেয়ে ফিরে আসার সময় হলের আবাসিক শিক্ষক সাহেরা বেগম, তাঁর বাসায় আমাদের থাকতে অনুমতি দেন।

"আমরা সাহেরা আপার বাসায় সারা রাত থাকলাম। তখন আশেপাশে বুটের শব্দ শুনতে পাচ্ছিলাম। এ সময় পাকি সেনারা প্রাধক্ষ্যের কাছে মেয়েদের সন্ধান জানতে চান। তিনি মেয়েদের সন্ধান দিতে না পারায় তাঁকে সৈন্যরা রাইফেলের বাঁট দিয়ে আঘাত করে। ছাব্বিশ তারিখ দুপুরে আবাসিক শিক্ষক মেহেরুননেসা আপা, আমাকে ও মমতাজকে সাহেরা আপার বাসা থেকে বের করে নিয়ে যান। এরপর মেহেরুননেসা আপার সাথে গিয়ে আমরা তাঁর ডাক্তার বোনের বাসায় আশ্রয় নেই। সাতাশ তারিখ কারফিউ উঠে যাওয়ার পর বাইরে এসে দেখি সতীর্থ একরাম, খালেদ, মোঃ আলী, বেলায়েত আমাদের খোঁজ নিতে এসেছে। তারা মনে করেছিল, জগন্নাথ হল ও জহুরুল হক হলের ছেলেদের মতো আমরাও বেঁচে নেই। হল থেকে বেরনোর পর আমরা হলের মূল গেটের ফুটপাতে তিন জনের লাশ দেখতে পাই। ওই তিন জনের মধ্যে আঠারো উনিশ বছরের একটি মেয়েও ছিল। বাকি দু'জন ছিল ছেলে। যাওয়ার সময় আমরা একজনকে বলতে শুনি, সে ছাড়া তাঁর পরিবারের আর কেউ বেঁচে নেই। সে লাশের নিচে পড়ে ভাগ্যক্রমে বেঁচে যায়। রেসকোর্সের ফুটপাতে আমরা রাস্তায় ছোপ ছোপ রক্ত দেখতে পাই। রেসকোর্সের মাঠ ও ফুটপাতের ওপর কিছু দূর পর পর লাশ পড়ে থাকতে দেখি। এরপর আমরা সার্কিট হাউজে আমার খালার বাসায় গিয়ে উঠি। সেখানে গেলে কিবরিয়ার (তখন গান করত) মা বললেন, 'এদেরকে জায়গা দেবেন? চেনেন না, কিছু না।' তখন খালা বললেন, 'এরা আমার পরিচিত।' পরের দিন আঠাশ তারিখ বিকেলে সেখান থেকে ফুফার বাড়ি ওয়ারিতে চলে যাই। আমি আমার ফুফাতো ভাইসহ ওয়ারির দিকে হেঁটে যাওয়ার সময় দেখি, সেদিক থেকে সুভাষ দত্ত হেঁটে আসছেন। তখন কেউ কারও দিকে তাকাচ্ছে না। একটা রিকশার মধ্যে দু'জন লোক মরে পড়ে থাকতে দেখলাম। তার মধ্যে একজন রিকশওয়ালা, আরেকজন রিক্সা আরোহী। ফুফার বাড়িতে দু'চারদিন থাকার পর আমি গ্রামের বাড়ি চলে যাই। জিঞ্জিরার দিক দিয়ে ঘুরে বাড়ি চলে যাই। পথে দেখি, সবাই আতঙ্কে দৌড়াচ্ছে। ঢাকা থেকে নোয়াখালী যেতে আমার দু'দিন লেগেছিল। ওই সময় আমার বাবা রাজশাহীর সার্কেল অফিসার ছিলেন, তিনি চিকিৎসার জন্য তখন ঢাকায় অবস্থান করছিলেন। সে রাতে তিনি ঢাকা মেডিক্যালে ছিলেন। আমি ভাবছিলাম বাবা বেঁচে নেই, আর বাবাও ভাবছিলেন, আমি বোধহয় বেঁচে নেই।"

অন্য একজন প্রত্যক্ষদর্শী ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রোকেয়া হলের কর্মচারী আবদুল খালেক বলেন, আমি একাত্তরের পঁচিশে মার্চের রাতে শিববাড়ি স্টাফ কোয়ার্টার ও

www.pathagar.com

রোকেয়া হলে পাকি বাহিনীর হামলা নিজের চোখে দেখেছি। "তখন আমার বয়স ছাব্বিশ-সাতাশ বছর। আমি থাকতাম শিববাড়ি স্টাফ কোয়ার্টারে। পঁচিশে মার্চ রাত এগারোটার দিকে আমাদের এলাকার বিদ্যুৎ চলে যায়। আমরা পাকিস্তান ও ইন্ডিয়া বেতার ধরানোর চেষ্টা করলাম। কিন্তু ধরাতে পারলাম না। এ সময় রাত বারোটা বেজে গেল। হঠাৎ দেখলাম, আকাশ আলোকিত হয়ে উঠেছে। সেই সাথে হালকা শব্দ। কিছুক্ষণ পর বিকট শব্দ হতে লাগল। উপায় না দেখে দরজা বন্ধ করে শুয়ে পড়লাম। এর কিছুক্ষণ পরেই জুতার আওয়াজ ও পাশের ঘরে চিৎকার শুনতে পেলাম। সম্ভবত মালী খালেকের স্ত্রী ফুলবানু চিৎকার করছিলেন। তিনি বলছিলেন, 'বাবাগো আমাদের মাইরেন না, আমরা কিছু জানি না।' আমি দরজা একটু ফাঁক করে দেখি আমার ঘরের সামনে কয়েকটা গুলির বাক্স ও একটা মেশিনগান দাঁড় করিয়ে রাখা। সেখানকার চৌদ্দটা ঘরের সামনে দিয়ে মিলিটারিরা আসা-যাওয়া করছে। সব ঘরের ভেতর থেকেই চিৎকার আর গুলির শব্দ আসছে। তিন-চারটা শব্দের পর দেখলাম, আমার ঘরের সামনে দিয়ে রক্ত গড়িয়ে যাচ্ছে। পেছনের জানালা ভেঙে পালিয়ে গেলাম আমি। তখন রোকেয়া হলের বাউন্ডারির মধ্যে পুকুর ছিল। ওই পুকুরের পাড় দিয়ে আমি রোকেয়া হলে গেলাম। সেখানে গিয়ে দেখি মমতাজ আপা (ছাত্রী), সাকিয়া আপা (ছাত্রী), জাহানারা বেগমসহ (হল সুপার) কয়েকজন ছাত্রী দাঁড়িয়ে আছেন। সুপার আপাকে বললাম, 'আমাকে এক গ্লাস পানি খাওয়ান। স্টাফ কোয়ার্টারে হামলা হয়েছে, সবাইকে মেরে ফেলেছে।' তখন আমরা সবাই মেইন বিল্ডিংয়ের নিচ দিয়ে, চামেলী হাউজের পেছন দিক থেকে প্রভোস্ট আখতার ইমাম আপার বাসায় গেলাম।

"প্রভোস্ট আপাকে সব কিছু জানানোর আগেই দরজায় লাথির বিকট শব্দ শোনা গেল। তখন রাত সোয়া একটা বাজে। ইতোমধ্যে সেখানে যে সাত জন মেয়ে ছিলেন, তাঁদের দু'জনকে রাতে এক শিক্ষকের বাসায় পার করে দেওয়া হল। কেউ ছিলেন, হাউজ টিউটর মেহেরুন্নেসা আপার বাসায়, আর দুই-তিন জন ছিলেন সুপার আপার বাসায়। সে মুহূর্তে প্রভোস্ট আপার বাসায় কোন মেয়ে ছিল না। মিলিটারিরা দরজা ভেঙে আপার বাসায় ঢুকে পড়ে। তখন সেখানে দু'জন 'দাদী' (হলে আয়া হিসেবে কর্মরত মহিলা), রুমি ও হামিদুন এবং স্টাফ আশরাফ, হাবুল ও মান্নান উপস্থিত ছিল। ঘরে ঢুকেই আর্মি আমাদের ওপর নির্যাতন চালায়। প্রভোস্ট আপাকে রাইফেলের বাঁট দিয়ে বাড়ি দেয়। আমি ভাল উর্দু বলতে পারতাম। তারা জিজ্ঞাসা করল, 'ইকবাল কাঁহা হ্যায়?' আমি বোঝলাম, ওরা ইকবাল হল খুঁজছে। ওরা আরও জিজ্ঞাসা করল, 'স্টুডেন্ট কিধার হ্যায়, ইধার লাড়কি হ্যায়?' আমি বললাম, 'হল বন্ধ হয়ে গেছে। সবাই বাড়ি চলে গেছে।' এরপর আমাদেরকে বাইরে জাম গাছের নিচে নিয়ে গুলি করার জন্য দাঁড় করাল। তখন সেখানে একজন ক্যাপ্টেন এল। প্রভোস্ট আপার সাথে ইংরেজিতে কিছু কথাবার্তা হল। পরে ওরা চলে গেল। আমরা ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে নিজেদের মধ্যে কথা বলতে যাব, এমন সময় মিলিটারিদের

www.pathagar.com

আরেকটা গ্রুপ সেখানে এল। তারা ফায়ার করছিল। গুলির শব্দে কিছুই শোনা যাচ্ছিল না। তখন ওরা আমাদের বলল, 'তুম মোহাম্মদপুরমে হামারা ভাইকো মার দিয়া, হাম তুমলোগকো টুকরা টুকরা করকে করাচি ভেজ দেগা।' তারপর বলল, 'ছাত্র কোথায়?' একজনকে দেখিয়ে বলল, 'ইয়ে ছাত্র হ্যায়?' আমি বললাম, 'না, ইয়ে ছাত্র নেহি, নওকর হায়।' এরপর ওরা আমাদের মারধর করে চলে গেল। দু'টো সোয়া দু'টোর দিকে আরেক দল মিলিটারি এল। কিন্তু তারা দেখল দরজা, জানালার কাচ ভাঙা, তাই তারা আর ভেতরে ঢুকল না।

"ছাব্বিশ তারিখ সকালে 'পতাকা নামিয়ে ফেলো', এ ধরনের একটা শ্লোগান শুনলাম। আমরা হলের পতাকা নামিয়ে ফেললাম। হলের একটি ঘরে আমি ও হাবুল এক রাত ছিলাম। এরপর বাসায় খোঁজ নিতে গিয়ে দেখলাম, সেখানে শুধু রক্ত আর রক্ত। একজনের লাশ বের করে এনে সামনে রাখলাম। দেখলাম নিয়াজ ভাইয়ের বুকের পাশ দিয়ে গুলি ঢুকে বের হয়ে গেছে। সেখানে একটা গর্ত হয়ে আছে, আর এপাশ থেকে ওপাশে আলো দেখা যাচ্ছে। হাসিনা বেগম ও তাঁর বোন আহত অবস্থায় পড়ে আছেন। কোয়ার্টারের সাত জন স্টাফসহ মোট পঁয়তাল্লিশ জনকে পাকি সেনারা ওই দিন হত্যা করে। শিশু থেকে বৃদ্ধ, মহিলা কেউই বাদ যাননি। প্রভোস্ট আপা আমাদের বললেন, 'তোমরা যে যেখানে পারো নিরাপদ আশ্রয়ে চলে যাও। আমার পক্ষে তোমাদের জন্য কিছু করা সম্ভব হবে না। আমি নিজেও নির্যাতনের শিকার।'

এরপর আমি দেশে চলে যাই। স্বাধীনতার পর উনিশে ডিসেম্বর ফিরে এসে ঘরের জিনিসপত্র কিছুই পাইনি। সব লুট হয়ে গিয়েছিল। বর্তমানে যেখানে শামসুন্নাহার হলের গেট, সেখানে একটা গর্তে লাশ চাপা দেওয়া ছিল। সেখানে মানুষের হাড়গোড়, কাপড়-চোপড় পড়েছিল। পরে আমরা ৮টা কাঠের বাক্সে করে ওই জায়গা থেকে হাড়গুলো তুলে বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় মসজিদের উত্তর পাশে কবর দিই।"

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মচারী হাসিনা বেগম বলেন, "তখন আমার বয়স চৌদ্দ-পনেরো বছর হবে। ভাই বোনদের মধ্যে আমি সবার বড় ছিলাম। আমার ছোট ভাইয়ের বয়স তখন দেড় বছর। রাত বারোটার দিকে মিলিটারিরা আমাদের কোয়ার্টার আক্রমণ করে। তখন আমি ভয়ে কোরআন শরীফ পড়তে বসি। আমরা পেছনের জানালা দিয়ে পালাতে পারিনি। ওরা জোরে জোরে দরজা ধাক্কাতে লাগল। তখন আমার বাবা দরজা খুলে দিলেন। কয়েকজন পাকি আর্মি ঘরে ঢুকে পড়ল। বাবার কোলে আমার বড় ভাই ছিল। মার কোলে ছিল ছোট ভাই। ওরা গুলি করতে লাগল। আমার বাবার গায়ে তিনটা গুলি লেগে ছিল। ভাইয়ের এবং মায়ের গায়েও গুলি লাগে। মা উপুড় হয়ে পড়ে যান এবং তাঁর কোলের আড়ালে আমার ছোট ভাইটাও পড়ে যায়। তাই তার গায়ে কোন গুলি লাগেনি। আমার ছোট বোন ভয়ে টেবিলের নিচে শুয়ে পড়ে। ওকে সেখানেই গুলি করে। ওর গায়ে মোট তেরোটা গুলি

www.pathagar.com

লেগেছিল। পাকি হায়েনারা এসে আমার হাত থেকে কোরআন শরীফ নিয়ে ফেলে দিয়ে বলে, তোমরা হিন্দু, তোমাদেরকে হত্যা করব। তখন আরেকজন মিলিটারি বলে যে, ওরা মুসলমান ওদের মারার দরকার নেই। আমার পেটে একটা গুলি লাগলে আমি অজ্ঞান হয়ে যাই। কিছুক্ষণ পর জ্ঞান ফিরে এলে বাবা, ভাই ও বোনকে পানি খাওয়াই। তাঁরা তখনও বেঁচে ছিলেন। মিলিটারিরা কিছুক্ষণ পরপরই আমাদের ঘরে আসতে থাকে। এক সময় এসে আমার বড় ভাইকে নিয়ে মেরে ফেলে। আমি দেখি যে, আমার মা মারা গেছেন এবং ছোট ভাইটা মায়ের কোলের নিচে শুয়ে আছে। আমি তখন ভাইকে নিয়ে বিছানায় শোয়াই এবং কাঁথা দিয়ে ঢেকে রাখি। আর্মি আমার ছোট ভাইটাকে ভোর রাতে নিয়ে গিয়ে গুলি করে হত্যা করে।

"আমি সে সময় কিছুক্ষণ পর পর জ্ঞান হারাচ্ছিলাম। ভোর রাতে জ্ঞান ফিরলে দেখি বাবা কুঁজো হয়ে বসে আছেন। তাঁর শরীর থেকে তখনও রক্ত ঝরছে। আমি আমার ওড়না ও মায়ের শাড়ি ছিঁড়ে বাবার ক্ষতস্থান বেঁধে দিলাম। কয়েকজন মিলিটারি আবারও ঘরে ঢুকলে আমার বাবা জিজ্ঞাসা করেন, 'আমার ছেলে কোথায়?' ওরা বলে 'সবকো খতম কর দিয়া।' ওরা আমার ও আমার বোনের চুলের বেণী ধরে টেনে দেখে। চোখের উপর টর্চ ফেলে দেখে। আমার বোনের সারা শরীর গুলির আঘাতে গর্ত হয়ে মাংস থেঁতলে গিয়েছিল। কিন্তু সে মারা যায়নি।

সকালের দিকে আমি আমার বাবাকে নিয়ে পাশের গেট দিয়ে বের হয়ে আসি। আমার বোনকে আনতে পারিনি। সে এতই আহত ছিল যে, উঠতে পারছিল না। আমি ওর কাছে একটা বাটিতে পানি ও একটা চামচ রেখে এসেছিলাম। বাবাকে নিয়ে বের হয়ে আসার পথে এক নাইট গার্ডের সাথে দেখা হয়। তিনি আমাদেরকে তাঁর বাসায় নিয়ে ট্যাবলেট খাওয়ান। দুপুরে খিচুড়ি খাওয়ান। এরপর আমরা সুপার আপার বাসায় যাই। সেখানে আরও মেয়েরা ছিল। রাতে আমরা সেখানে থাকলাম। পরের দিন হুদা সাহেব গাড়ি করে আমাদের মেডিক্যালে নিয়ে ভর্তি করে দেন। আমি সেখানে এক মাস ছিলাম। আমার বোনকেও মেডিক্যালে ভর্তি করা হয়। সে তিন মাস হাসপাতালে ছিল। সেখান থেকে ছাড়া পেয়ে, নারায়ণগঞ্জে আমার চাচাতো বোনের বাসায় চলে যাই। যুদ্ধের ন'মাস ওখানেই ছিলাম। আমার চোখের সামনে পাকি বাহিনী আমার ভাই ও মাকে একসাথে হত্যা করে।"

বাংলাদেশে পাকি বাহিনীর গণহত্যার আর একটি বর্বর ও ঘৃণ্য অধ্যায়টি ঘটে যুদ্ধের শেষ দিকে, ঢাকায়। বুদ্ধিজীবী হত্যার মূল পরিকল্পনাকারী ছিল। মেজর জেনারেল রাও ফরমান আলী। ঢাকা শহর জামায়াতে ইসলামীর দফতর সম্পাদক, মওলানা এবিএম খালেক মজুমদারকে দেওয়া হয়েছিল বুদ্ধিজীবী হত্যার দায়িত্ব। মুক্তির জন্য বাঙালির প্রাণপণ লড়াইকে যখন কোনভাবেই আর ঠেকিয়ে রাখা যাচ্ছিল না, তখনই পাকি আর্মি শেষ চাল হিসেবে বাংলাদেশকে বুদ্ধিবৃত্তিক ও প্রশাসনিক দিক থেকে বিকল করে দেওয়ার পরিকল্পনা করে। একই সঙ্গে বিভিন্ন পেশায় নিয়োজিত ব্যক্তি ও বুদ্ধিজীবীদের হত্যার নীলনকশা প্রণয়ন করে। অত্যন্ত সুপরিকল্পিতভাবে পাকিস্তানিরা

www.pathagar.com

এদেশের প্রশাসনিক কর্মকর্তা, অধ্যাপক, শিক্ষক, সাহিত্যিক, সাংবাদিক, ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ারসহ বহু বুদ্ধিজীবীকে হত্যার পরিকল্পনা করে। অক্টোবর মাস থেকেই পাকি আর্মি, আলবদর বাহিনীর মাধ্যমে বুদ্ধিজীবী হত্যার প্রস্তুতি নিতে শুরু করে। নভেম্বর মাস থেকে, অনেক বুদ্ধিজীবীর কাছে তারা হুঁশিয়ারি পত্রও পাঠাতে শুরু করে।

ঢাকার মিরপুর, মোহাম্মদপুর থানা এলাকার **ব্রিগেডিয়ার রাজা**, রমনা থানা এলাকার **ব্রিগেডিয়ার আসলাম**, তেজগাঁ এলাকার **ব্রিগেডিয়ার শরীফ** এবং ধানমণ্ডি এলাকার **ব্রিগেডিয়ার শফি** ঢাকার বুদ্ধিজীবী হত্যায় বিশেষ ভূমিকা রাখে। আলবদর হাইকমান্ড সদস্য আশরাফুজ্জামান এই বাহিনীর প্রধান ঘাতক ছিল বলে জানা যায়। ঢাকায় বুদ্ধিজীবী হত্যার জন্য বদর বাহিনীর পাঁচ শ' সদস্যকে নিয়োজিত করা হয়েছিল। বাহাত্তরের চৌদ্দই ডিসেম্বর 'দৈনিক বাংলা'য় প্রকাশিত এক রিপোর্টে বলা হয়, একাত্তরের মে মাসে কিছুসংখ্যক বুদ্ধিজীবীর কাছে ইয়াহিয়া সরকারের পক্ষ থেকে একটি বিশেষ ফর্ম পাঠানো হয়। মনে করা হয়, এদের সম্পর্কে তল্লাশি চালানোর উদ্দেশ্যেই এই ফর্ম পাঠানো হয়েছিল। 'লন্ডন টাইমস' বাংলাদেশের শিক্ষক, অধ্যাপক, চিকিৎসক, সাংবাদিক, আইনজীবী ও সাহিত্যিকদের সম্পূর্ণ নিশ্চিহ্ন করার পরিকল্পনা ফাঁস করে দেয়। ফলে পরিকল্পনাটি সাময়িকভাবে স্থগিত থাকে।

ছাব্বিশে মার্চের সকালে জগন্নাথ হলের একজন হাউজ টিউটর, অধ্যাপক অনুদ্বৈপায়ন ভট্টাচার্যকে আরও দু'জনের সাথে নির্যাতনের পর গুলি করে হত্যা করা হয়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিসংখ্যান বিভাগের রিডার এএনএম মুনিরুজ্জামানকে তাঁর পরিবারের তিন সদস্যসহ শহীদ মিনার সংলগ্ন ৩৪ নং বাড়িতে হত্যা করা হয়। গোবিন্দচন্দ্র দেব, জ্যোতির্ময় গুহঠাকুরতাকেও গুলি করা হয় সেদিন। জোতির্ময় গুহঠাকুরতাকে সাতাশে মার্চ ঢাকা মেডিক্যালে নেওয়া হয়। কিন্তু তিনি আর বাঁচেননি। জিসি দেবকেও হত্যা করে ফেলে রাখা হয়েছিল মাটিচাপা দেওয়ার জন্য।

শিক্ষকদেরই পাকি বাহিনী জাতির অস্তিত্বের মূল অংশ ভেবেছিল। তারা পরিকল্পনা করেছিল, যেভাবেই হোক ধ্বংস করতে হবে এই শক্তিকে। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে ঘাঁটি তৈরির পর পাকি বাহিনী পরিসংখ্যান বিভাগের কাজী সালেহ, গণিত শাস্ত্রের প্রভাষক মুজিবর রহমান, ফলিত পদার্থ বিজ্ঞানের ড. রফিক এবং বাংলা বিভাগের ড. আবু হেনা মোস্তফা কামালকে ধরে নিয়ে অমানুষিক নির্যাতন চালিয়েছিল। তৎকালীন উপাচার্য সৈয়দ সাজ্জাদ হোসাইন এ ব্যাপারে তালিকা প্রণয়নে পাকি বাহিনীকে সাহায্য করে। সংস্কৃত ভাষার সহকারী অধ্যাপক সুখরঞ্জন সমাদ্দারকে হত্যা করে বিশ্ববিদ্যালয়ের সামনের কাজলার পুকুর পাড়ের একটি গর্তে ফেলে রেখেছিল। পঁচিশে নভেম্বর মনোবিজ্ঞানের প্রভাষক মীর আব্দুল কাইয়ুমকে বাসা থেকে ডেকে নিয়ে যায় পাকি আর্মির অনুচর, উপাচার্যের অবাঙালি স্টেনো তৈয়ব আলী। ত্রিশ ডিসেম্বর পদ্মার চরের বাবলা বনে পাওয়া যায় তাঁর লাশ। গণিত বিভাগের অধ্যক্ষ হাবিবুর রহমানকে পনেরোই এপ্রিল ধরে নিয়ে যাওয়া হয় **ব্রিগেডিয়ার আসলাম** ও **কর্নেল তাজের** অতিথি ভবনের ছাদে। পরে আর ফিরে আসেননি তিনি।

www.pathagar.com

নয় জানুয়ারি, ১৯৭২ 'পূর্বদেশ'-এ প্রকাশিত রিপোর্টে একটি ডায়েরির কথা লেখা হয়। সে ডায়েরিটি বুদ্ধিজীবী হত্যাকারী আলবদর কমান্ডার আশরাফুজ্জামান খানের বলে উল্লেখ করা হয়। এই আশরাফুজ্জামান পাকি আর্মির নির্দেশে মিরপুর গোরস্থানে সাত জন বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষককে নিজ হাতে গুলি করে হত্যা করে বলে সাক্ষ্য প্রমাণ পাওয়া যায়। যে গাড়িতে করে শিক্ষকদের নিয়ে যাওয়া হয়, তার চালক মফীজুদ্দীন পুলিশের কাছে স্বীকারোক্তিতে এ তথ্য জানান।

এ ডায়েরির দুটো পৃষ্ঠায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উনিশ জন বিশিষ্ট শিক্ষক-শিক্ষিকা এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের চিকিৎসক গোলাম মুর্তজার নাম ও ঠিকানার উল্লেখ ছিল। এই বিশ জনের মধ্যে চৌদ্দই ডিসেম্বর যে আট জন নিখোঁজ হন, তাঁরা হলেন অধ্যাপক মুনীর চৌধুরী (বাংলা), অধ্যাপক মোফাজ্জল হায়দার চৌধুরী (বাংলা), অধ্যাপক আনোয়ার পাশা (বাংলা), ড. আবুল খায়ের (ইতিহাস), অধ্যাপক রাশীদুল হাসান (ইংরেজি), অধ্যাপক গিয়াসউদ্দিন আহমদ (ইতিহাস), ড. ফয়জুল মহী (ইসলামী শিক্ষা), ও ডা. মুর্তজা।

এ ছাড়াও ডায়েরিতে যাঁদের নাম ছিল, তাঁরা হলেন অধ্যাপক আহমদ শরীফ (বাংলা), ড. নীলিমা ইব্রাহীম (বাংলা), ড. লতিফ (শিক্ষা), ড. মনিরুজ্জামান (ভূগোল), ড. সাদউদ্দীন (সমাজ বিজ্ঞান), ড. এএসএস শহীদুল্লাহ (গণিত), ড. সিরাজুল ইসলাম (ইসলামের ইতিহাস), ড. আখতার আহমদ (শিক্ষা), ড. সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী (ইংরেজি) এবং বাংলা একাডেমির পরিচালক অধ্যাপক কবীর চৌধুরী। এই ডায়েরিতে **ব্রিগেডিয়ার বশির, ক্যাপ্টেন তারেক**সহ অনেকের নাম ছিল এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আরও ষোলো জন শিক্ষকের নাম ছিল, যাদের কেউ নিখোঁজ হননি। তা ছাড়া এই শিক্ষকদের মধ্যে একজন ছিলেন পাকি বাহিনীর দালাল ড. মোহর আলী। আশরাফুজ্জামান ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের তৃতীয় বর্ষের ছাত্র ছিল বলে পরবর্তীতে জানা যায়। বুদ্ধিজীবী হত্যার দ্বিতীয় অধ্যায়টি শুরু হয় স্বাধীনতার মাত্র ক'দিন আগে দশ ডিসেম্বর থেকে, যার প্রথম শিকার হয়েছিলেন 'দৈনিক ইত্তেফাক'-এর বার্তা সম্পাদক জনাব সিরাজুদ্দীন হোসেন। এর পরপরই নিখোঁজ হতে থাকেন অনেকেই। স্বাধীনতার আনন্দ ম্লান হয়ে যায় আঠারো ডিসেম্বর, রায়ের বাজার বধ্যভূমি আবিষ্কারের পর। এখানে ইটখোলার মধ্যে পাওয়া যায় দেশের কৃতী সন্তানদের লাশ। লাশগুলোর চোখ-হাত বাঁধা, কারও চোখ তুলে নেওয়া, কারও বুক চিরে উপড়ে নেওয়া হয়েছে হৃৎপিণ্ড।

পাঁচ জানুয়ারি মিরপুর গোরস্থানে মাটির নিচে পাওয়া যায় শ্রী সন্তোষ ভট্টাচার্য, ড. সিরাজুল হক, ড. ফয়জুল মহী, ডা. মুর্তজার লাশ। অন্য তিনটে লাশ ছিল ভয়ানকভাবে গলিত ও বিকৃত, যা শনাক্ত করাই অসম্ভব হয়ে পড়ে। অন্যদিকে আলবদর বাহিনী কর্তৃক অপহৃত ইত্তেফাকের কার্যনির্বাহী সম্পাদক সিরাজুদ্দীন হোসেন, সংবাদের যুগ্ম সম্পাদক শহীদুল্লাহ কায়সার, সাবেক পি আই-এর ব্যুরো চীফ ও বিবিসি সংবাদদাতা নিজামুদ্দিন আহমেদ ও চীফ রিপোর্টার সৈয়দ নাজমুল হকের লাশের সন্ধান পাওয়া যায়নি।

www.pathagar.com

সাতাশে মার্চ দিবাগত রাত বারোটার পর সশস্ত্র পাকি বাহিনী কালীবাড়ির নিরীহ জনগণের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। প্রাণভয়ে এলাকার অধিবাসীরা মন্দিরে গিয়ে আশ্রয় নেন। মন্দিরের স্বামীজী এঁদের বাঁচাতে চেয়েছিলেন, কিন্তু প্রথমে তাঁকেই গুলি করে প্যাকিরা। কপালে ও পেটে গুলি লাগে তাঁর। আরও পঞ্চাশ-ষাট জনকে গুলি করে হানাদাররা। রমনা কালীবাড়ি হত্যাকাণ্ডের প্রত্যক্ষদর্শী রাম রাজীয়া পার্শী বলেন, "সেদিন আমি রমনা কালীবাড়িতে ছিলাম। পঁচিশে মার্চের ঢাকা আক্রমণের পর অনেক হিন্দু পরিবার এখানে আশ্রয় নিয়েছিলেন। সাতাশে মার্চ আগুনের মতো গোলা উড়ে এসে আঘাত হানে মন্দিরের গায়ে। ধসে পড়ে মন্দির। ওপরে নিচে আশ্রিত মানুষের পালাবার সুযোগটুকুও ছিল না। চারদিক থেকে ঘিরে রাখে পাকি বাহিনী। সকলকে একত্র করে লাইনে দাঁড় করায় তারা। খাকি পোশাক পরা একজন ক্যাপ্টেন পাহারা দিচ্ছিল। অধিকাংশ পুরুষকেই তখন আলাদা করা হয়। মহিলা আর শিশুদের সঙ্গে ছিল আমার সতেরো-আঠারো বছরের ছেলে হীরালাল। একটু পরে মেশিনগানের আওয়াজ শুনতে পাই। আমি জানতাম, মেশিনগান দিয়ে অনেক মানুষ একসঙ্গে মারা যায়। দেয়ালের ওপাশে কে মরল, কে বাঁচল, জানতে পারেননি কেউ। ভেতরে যাওয়ার চেষ্টা করলে আমাদের তাড়িয়ে দেওয়া হয়। এরপর একজন অফিসার এসে কর্তব্যরত পাকি সেনাকে এখনও আমাদেরকে কেন মারা হয়নি সে প্রশ্ন করে। ওই পাকি সেনাটি কোনমতে অফিসারকে বুঝিয়ে ছেড়ে দেয় মহিলাদের। পরদিন স্বামীসহ আবার ফিরে আসি ভাঙা মন্দিরের কাছে। অনেকগুলো লাশের মধ্যে থেকে ছেলের লাশ টেনে হিঁচড়ে কোনমতে নিয়ে মাটির নিচে পুঁতে রাখি। এখানে কিছু পুড়িয়ে দেওয়া লাশও আমার চোখে পড়ে। হিন্দুদের মৃতদেহ পোড়ানো হয়, একথা জানতে পেরে পাকি বাহিনী অর্ধমৃতদের গায়ে আগুন লাগিয়ে পুড়িয়ে দেয়।"

মনোরঞ্জন দাস বলেন, "আমি ছিলাম শ্রী শ্রী বুড়া শিবধাম রমনার একজন ভক্ত। প্রতিদিনের মতো গুরুদেবের দর্শনে গিয়েছিলাম সেদিনও। পঁচিশে মার্চ রাত দশটা পর্যন্ত মন্দিরেই ছিলাম। বাড়ি ফিরে যাওয়ার পর রাতে হত্যাযজ্ঞ শুরু হলে তখনও ঠিক বুঝতে পারছিলাম না, কী হচ্ছে। প্রথমে ভেবেছিলাম, কোথাও বাজি পোড়ানো হচ্ছে। এরপর সকালে দেখলাম, মানুষজন ক্রমাগত ছুটছে। তখন কারফিউ চলছে। পরে মন্দিরে আর ফিরে যেতে পারিনি আমি। কোনমতে শহর ছেড়ে জিঞ্জিরায় চলে যাই। সেখান থেকে ছেলেকে শিব ধামে পাঠাই। ছেলে সেখানে গিয়ে গুরুদেব স্বামী ব্রজানন্দ সরস্বতীর সঙ্গে দেখা করে। পরদিন আমি ছেলের মারফৎ গুরুদেবের জন্য কিছু টাকা পাঠাই। তখন স্বামীজী আমার ছেলের সঙ্গে জিঞ্জিরায় চলে যাওয়ার ইচ্ছা ব্যক্ত করলেন। কিন্তু সেটা সম্ভব হয়নি। এদিকে যুদ্ধের মধ্যে প্রায় ছ'মাস দেশের বিভিন্ন স্থানে ঘুরে আমি ভারতে চলে যাই। সেখানে গুরুদেবের সঙ্গে দেখা হয় আমার। সেখানে তাঁর কাছ থেকে শুনেছিলাম, পঁচিশে মার্চ রাতে শিবধাম আক্রান্ত হয়। পাকি বাহিনী প্রথমে সিন্দুক ভেঙে সব কিছু লুটপাট করে নেয়। বিভিন্ন ঘর তল্লাশি করে তরুণদের ধরে নিয়ে যায়। এদের মধ্যে গুরুদেবের চার জন সাধু,

www.pathagar.com

কয়েকজন ভক্ত ও আশ্রিতরা ছিলেন। প্রথমে তারা স্বামী ব্রজানন্দ সরস্বতীকে গুলি করতে উদ্যত হয়, কিন্তু পরে ছেড়ে দেয়।"

শাঁখারীপট্টির গণহত্যার কয়েকজন প্রত্যক্ষদর্শীর জবানবন্দী: শাঁখারী পট্টির হামলায় ক্ষতিগ্রস্ত গাঙ্গুলী বাবু বলেন, পঁচিশে মার্চ শাঁখারী বাজারের বাহান্ন নম্বর বাড়িতে ঘুমিয়ে ছিলাম আমি। চারদিকের গুলির আওয়াজে আমার ঘুম ভেঙে যায়। অবস্থা কী তা দেখার জন্য ছাদে উঠি। মারাত্মক গোলাগুলি শুরু হয়ে গেছে তখন। ছাদে দাঁড়ানো সম্ভব হল না। সারা রাত দাঁড়িয়ে রইলাম বারান্দায়। এর মধ্যে ইসলামপুর ফাঁড়ির সামনে বিকট আওয়াজ হল। পাকিস্তানি আর্মি একটি গাড়িতে করে এসে গ্রেনেড ছুঁড়ে মারল পুলিশ ফাঁড়ির দিকে। এতে ফাঁড়ির সামনের অংশ ধসে পড়ে। গ্রেনেডের আঘাতে ক্ষতিগ্রস্ত হয় উল্টোদিকের লক্ষ্মীনারায়ণ মন্দির। সকালে ফাঁড়ির কাছে গিয়ে দেখি, রক্তাক্ত অবস্থায় অনেক লাশ পড়ে আছে। এরপর এলাকার কয়েকজন মিলে ময়লা টানার গরুর গাড়িতে করে আটটি লাশ মিটফোর্ডে পাঠিয়ে দেই। তারপর শাঁখারীবাজারের পূর্বদিকে এগোই আমরা। সেখানে গিয়ে দেখি, রাস্তার পাশে যেসব ভিক্ষুক, রিকশাওয়ালারা থাকত, তাদের সবাই ব্রাশ ফায়ারে নিহত হয়েছে। প্রায় বিশ-পঁচিশটা লাশ পড়েছিল সেখানে। এই লাশগুলোকেও এলাকার লোকজনই গাড়িতে তুলে নিয়ে যায়। বেলা তখন প্রায় সাড়ে বারোটা। তখনও শহরে পাকি বাহিনীর তাণ্ডব চলছে। নবাবপুর খালের পাড়ে কাঠের আড়তসহ ছোট ছোট কারখানায় আগুন লাগিয়ে দেয় পাকি সেনারা। কোন এলাকা নিরাপদ ছিল না। এরপর আমার শাঁখারী বাজারের পূর্বদিকে ভাঙা গাড়ি দিয়ে ব্যারিকেড তৈরি করি, যাতে পাকি সেনাদের গাড়ি ২০/৬ নম্বরে ঢুকতে না পারে।

ছাব্বিশে মার্চ বেলা চারটার দিকে শাঁখারী বাজার আক্রমণ করে পাকি সেনারা। এলাকাবাসীর দেওয়া ব্যারিকেড মুহূর্তের মধ্যে সরিয়ে ফেলে তারা। ফাঁড়ির কাছে পজিশন নিয়ে গোলাগুলি শুরু করে। এ সময় বিভিন্ন বাড়ির বারান্দায় বা পথে পনেরো-বিশ জন মারা যায়। এলাকায় আওয়ামী লীগের শক্ত ঘাঁটি আছে, এরকম রিপোর্ট করা হয়েছিল পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর কাছে। কালীবাড়ির তত্ত্বাবধানে ছিল ৫২ নম্বর বাড়িটি। সে বাড়িতেই ভাড়া থাকতাম আমি। পাকি সেনারা গুলি করতে করতে পাড়ার মধ্যে ঢুকে পড়ে। প্রথমেই আক্রান্ত হয় ৫২ নম্বরের বাড়িটি। কলাপসিবল গেট ভেঙে নিচতলার ভাড়াটিয়াদের ধরে নিয়ে এক জায়গায় জড়ো করে তারা। এরপর দোতলা ও তিনতলার ভাড়াটিয়াদেরকেও ধরে নিচে নামিয়ে বলে, বাড়ি সার্চ করা হবে। পাকি সেনারা ভাড়াটিয়াদের মাধ্যমে সবাইকে নিচে আসার জন্য বলে। আমাকে ডাকছিলেন তিন তলার চিত্ত বাবু। কিন্তু আমি বেরোইনি। আমি দোতলা বাড়ির পেছন দিকের গেট ভেঙে লাফ দিই। এরপর বাড়িতে ঢুকে পড়ে পাকি সেনারা। আমার মতো করে আরও তিন চার জন আত্মগোপন করেন। পুরো বাড়ির পুরুষ, মহিলা ও শিশুদের ৫২ নম্বরের নিচতলার ঘরে তালাবদ্ধ করে রেখে চলে লুটপাট। বেশ কিছুক্ষণ পর তারা তালা খুলে বলে, "মহিলারা মাথায় কাপড়

www.pathagar.com

দিয়ে বেরিয়ে এসো।" তখন সেখানে থাকলেন শুধু একুশ জন পুরুষ। এরপর আকবর নামে একজনকে তারা গুলি করতে নির্দেশ দিল। আকবর দরজায় দাঁড়িয়ে ভেতরে ব্রাশ ফায়ার করলে চৌদ্দ জনের তাৎক্ষণিক মৃত্যু ঘটে। বাকিরা রক্তের মধ্যে পড়ে থাকেন। বিকেল তখন সাড়ে পাঁচটা। আমি এ সময় পাশের বাড়িতে ছিলাম। সে বাড়িও আক্রান্ত হল। এরপর আমি ওই বাড়ি থেকে বেরিয়ে দেয়াল বেয়ে ছাদে উঠে বেশ ক'টি বাড়ি টপকে দূরে চলে যাই। তখন গুলি চলছে। ঘড়িতে তখন সন্ধ্যা সাড়ে ছ'টা। এক বাড়িতে পঞ্চাশ-ষাট জন লোকের সাথে কোন রকমে রাতটা কাটালাম। সকালে মেশিনগান বসানো একটি আর্মির গাড়ি এসে বিভিন্ন বাড়ির ছাদে টাঙানো পতাকা নামিয়ে ফেলার হুকুম দিয়ে চলে গেল। তেইশে মার্চের পর বিভিন্ন বাড়ির ছাদে বাংলাদেশের পতাকা উঠানো হয়েছিল। সকালে কারফিউ ভাঙার পর পাড়ার সবাই বেরোতে লাগল। বিভিন্ন বাড়িতে তখন লাশ পড়ে ছিল। আমি এ সময় এক কাপড়ে আমাদের পাড়া ছেড়ে নারিন্দার বসুর বাজারে গিয়ে মদন চক্রবর্তীর বাড়িতে আশ্রয় নিলাম। উনত্রিশ মার্চ সে বাড়ি থেকে বেরিয়ে শাঁখারীবাজারে এসে দেখি, বিহারিরা পাড়ায় লুটপাট চালাচ্ছে। সূত্রাপুর লোহার পুলের কাছে এগারো জনকে গুলি করে হত্যা করা হয়েছে বলে শুনলাম। ত্রিশ মার্চ শুনতে পেলাম, নারিন্দা মঠে ৪/৫ জন সাধুকে হত্যা করা হয়েছে।

ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি পাগলনাথ সুর বলেন, পঁচিশ মার্চ রাতটা কেটে যায় আতঙ্কের মধ্যে, জেগে জেগে। ছাব্বিশে মার্চ পাকি বাহিনী আমাদের পাড়ায় টহল দিয়ে যায় এবং সবাইকে 'পাকিস্তান জিন্দাবাদ' বলতে বলে। এর কিছুক্ষণের মধ্যে লোকজন এসে দোকানপাট ভাঙচুর শুরু করে। আমি তখন শাঁখারীবাজার এলাকার ১৩৭ নং বাড়িতে লুকিয়ে আছি। সাড়ে তিনটা নাগাদ পাকি মিলিটারি আক্রমণ শুরু করে। সে বাড়ি থেকে দেখতে পেলাম, আমার বৃদ্ধ বাবা শিশু ঘোষ সুরকে পাকি সেনারা (৭০) ধরে নিয়ে যাচ্ছে। এ সময় আমার জ্যাঠাতো দাদা বিশ্বনাথ সুর বললেন, "বাড়িতে এখন কাউকে কিছু বলিস না।" এরই মধ্যে বেশ ক'বার গুলির আওয়াজ শুনতে পেলাম আমরা। কিছুক্ষণ পর মিলিটারি চলে গেলে আমার ছেলে এসে বলল, "বাবা, দাদুকে নিয়ে গেছে"। আমি ছেলেকে ৩২ নম্বরে শ্বশুর বাড়িতে রেখে রাতে বাড়িতে এলাম। এ সময় আমাদের বাড়ির সদর দরজায় মর্টার চার্জ করে পাকি বাহিনী। সারা বাড়ি আগুনের উত্তাপে ঝলসে যেতে থাকে। পেছনের দিকে একটি গোপন ঘরে লুকিয়ে ছিলেন পুরুষরা। সকালে বাড়ির বাইরে এসে দেখি, কয়েকটা লাশ পড়ে আছে। এর মধ্যে আমার বাবার লাশও ছিল। বড় দাদা বিশ্বনাথকে পাওয়া গেল কাঁচা পায়খানার মধ্যে। সৌরেন সেন, মদনহরি সেনসহ আরও অনেকেরই লাশ পাওয়া গেল সেখানে। বেয়নেট দিয়ে খুঁচিয়ে, গুলি করে, হত্যা করার পর গান পাউডার ছিটিয়ে আগুনে পুড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল এই লাশগুলোকে। এই ঘটনার পর পাড়ার সকলে মিলে সিদ্ধান্ত নিলাম যে, এখান থেকে পালাতে হবে। আটাশে মার্চ, আমি স্ত্রী, চার ছেলে, মা ও দুই বোনসহ ভাঙনা চলে যাই। ভাঙনা গিয়ে শুনতে পেলাম সেখানেও

www.pathagar.com

আক্রমণ হতে পারে। প্রায় দুই হাজারের মতো শাঁখারী বাজারের লোক সেখানে আশ্রয় নিয়েছিলেন।

একাত্তরের দোসরা এপ্রিল, খুব ভোরে পাকি বাহিনী হামলা করে জিঞ্জিরায়। চতুর্দিক থেকে আক্রমণ হওয়ায় দিগ্বিদিক জ্ঞান হারিয়ে দৌড়াচ্ছিলেন সবাই। আমার সঙ্গে স্ত্রী ও দু'ছেলে ছিল। আমার স্ত্রী ভাগ্যবতী সুর সাঁতার জানতেন না। তিনি ডাঙায় মাথা নিচু করে ছিলেন। আমি তখন বিলের পানির মধ্যে। মিলিটারি সরে যাওয়ার পর পানি থেকে উঠে দেখি, আমার স্ত্রী গুলিবিদ্ধ অবস্থায় পড়ে আছেন। দু'ছেলেও বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে। মুমূর্ষু স্ত্রী তখন বললেন, "আমার দিকে তাকিও না, ছেলেরা কোনদিকে গেল দ্যাখো। তুমিও পালিয়ে যাও।" জল খেতে চান আমার স্ত্রী। বিল থেকে আঁজলা ভরে জল এনে খাওয়ালাম তাঁকে। অনেককে ডাকলাম সাহায্যের জন্য, কিন্তু কাউকে পেলাম না। পরে এক বোনকে খুঁজে পেলাম। খবর পেলাম, এক ছেলেসহ আর এক বোন রয়েছে ষোলো ঘর হাসারায়। সারাপথ হেঁটে পৌঁছালাম সেখানে। শুনলাম আমার মা'র সঙ্গে রাজানগরে রয়েছে আর এক ছেলে। তেসরা এপ্রিল মার সঙ্গে দেখা করে স্ত্রীর মৃত্যুর খবর জানতে পারলাম। আবার ফিরে গেলাম ভাঙনার সেই জায়গায়, যেখানে ফেলে গিয়েছিলাম স্ত্রীকে। মানুষের মুখে শুনলাম, স্থানীয় লোকজন সেখানে একজন পুরুষ ও একজন মহিলার লাশ দাফন করেছেন। আমি নিশ্চিত হওয়ার জন্য মাটি খুঁড়লাম। পুরুষটির মুখ দেখে চিনলাম, সে আমাদের এলাকার মঙ্গল দত্ত। এর পরপরই স্ত্রীর লাশটি দেখতে পেলাম। গ্রামবাসীদের ধন্যবাদ জানালাম। ফিরে যাচ্ছিলাম এক বুক বেদনা নিয়ে। হঠাৎ রাস্তার পাশের এক বাড়ি থেকে শুনতে পেলাম, বড় ছেলে প্রকাশের 'বাবা' বলে ডাকছে। সেখানে এক বাড়িতে পায়ে গুলি খেয়ে আশ্রয় পেয়েছিল প্রকাশ। সঙ্গে দু'বছর বয়সী ছোট ভাই হরেন। মার করুণ পরিণতির কথা জেনে ছেলে দুটো হাউমাউ করে কাঁদতে শুরু করল।

শহীদ জননী সালেমা বেগম মুক্তিযুদ্ধের ন'মাস ঢাকাতেই ছিলেন। তিনি ঢাকায় পাকিস্তানি বাহিনীর অনেক ধ্বংসযজ্ঞ ও নির্যাতনের প্রত্যক্ষদর্শী। তিনি জানান, "১৯৭১ সনের মার্চ মাস থেকে ডিসেম্বর পর্যন্ত আমি ঢাকাতেই ছিলাম। আমার স্বামী ডা. এম এ শিকদার তখন তেজগাঁস্থ সেন্ট্রাল মেডিক্যাল স্টোরের উপ-পরিচালক। ঢাকায় আমাদের বাসা ছিল, ওই অফিসের দোতালায়। পঁচিশে মার্চ পাকি হানাদার বাহিনীর বর্বর আক্রমণের পর আমার দু'ছেলে ঢাকা শহরের বিধ্বস্ত অবস্থা দেখে একত্রিশে মার্চ মুক্তিযুদ্ধে যোগ দিতে চলে যায়। দু'মেয়েকে প্রত্যন্ত গ্রামে পাঠিয়ে দিয়ে আমি ঢাকার বাসায় থাকছিলাম। এ সময় আমি খুবই আতঙ্কের মধ্যে থাকতাম। এপ্রিলের শেষ দিকে একদিন বাসার কাছে প্রচণ্ড গোলাগুলির আওয়াজ শুনতে পেলাম। ঘটনা জানার জন্য আমাদের অফিসের পিয়ন রমজানকে পাঠালাম। রমজান ফিরে এসে জানাল, পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটের পাশের এক বাসায় গোলাগুলি হয়েছে। ওখানে পাকি সেনারা এক পরিবারের বৃদ্ধ বাবা ও তাঁর বয়স্ক

www.pathagar.com

ছেলেকে গুলি করে হত্যা করেছিল। ওই বাসার একটি বাচ্চা বারান্দায় দাঁড়িয়ে বাংলাদেশের পতাকা নাড়িয়ে 'জয় বাংলা' স্লোগান দিচ্ছিল। স্লোগানের শব্দ পাকিস্তানি আর্মির কানে যাওয়ার সাথে সাথে তারা ওই বাসার দোতলায় উঠে যায়। বাচ্চার হাতে তখনও পতাকাটি ধরা ছিল। হানাদাররা প্রথমে পতাকা ছিনিয়ে নিয়ে ছেলেটার মাথার তালুর মধ্যে পতাকার লাঠিটা ঢুকিয়ে দেয়। বাচ্চাটি তখন যন্ত্রণায় মাটিতে লুটিয়ে পড়ে। এ সময় বাচ্চাটির মা-বাবা ও দাদা-দাদী সেখানে ছুটে আসেন। পাকিস্তানি আর্মি বাচ্চাটির বাবা ও দাদাকে বেঁধে রেখে তাঁদের সামনেই তাঁর মা ও দাদীকে উপর্যুপরি ধর্ষণ করে। ধর্ষণ শেষে বাবা ও দাদাকে গুলি করে হত্যা করে। ঘটনাটি ঘটেছিল সকাল এগারোটা থেকে সাড়ে এগারোটার মধ্যে। তখন কারফিউ ছিল, চলছিল ব্ল্যাক আউট।

"জুন জুলাই মাস থেকে হানাদার বাহিনীর অত্যাচার আরও বেড়ে যায়। এ সময় তারা যাকে যেখানে পাচ্ছিল, ধরে নিয়ে যাচ্ছিল। রাস্তার পাশে বাসা থাকায় আমরা সব সময় গাড়ি চলাচলের শব্দ শুনতে পেতাম। অনেক সময় বন্ধ জানালার ছিদ্র দিয়ে দেখতে পেতাম, পাকি আর্মি গাড়িতে করে চোখ বাঁধা অবস্থায় ছেলেদের ধরে নিয়ে যাচ্ছে। এদের কারও কারও মাথা ও শরীর থেকে রক্ত ঝরছে। ছেলেদের সবাই আহত ও পিঠমোড়া করে বাঁধা থাকত। তাদের চোখের দিকে তাকানো যেত না। অনেকের মুখের ভয়ার্ত ছবি এখনও আমাকে স্বপ্নে তাড়িত করে। এই মানুষ ভর্তি ট্রাকগুলো শহর থেকে ক্যান্টনমেন্টের দিকে যেত। দুটো থেকে শুরু করে বিশটি পর্যন্ত ট্রাক প্রতিদিন আমি যেতে দেখেছি। ডিসেম্বরের তিন তারিখে আর্মি আমাদের অফিসটা পুরো দখল করে নেয়। আমরা তখন ভয়ে আতঙ্কে দিশেহারা হয়ে পড়ি। সাতই ডিসেম্বর একজন বাঙালি ডাক্তার আমাকে বলেন, 'আপনারা তাড়াতাড়ি এখান থেকে চলে যান। আর্মির কথাবার্তা শুনে মনে হচ্ছে তারা যে কোন সময় আপনাদেরকে হত্যা করবে।' এ সময় আমরা গ্রাম থেকে নিয়ে আসা মেয়ে দু'টোকে নিয়ে পায়ে হেঁটে গোপীবাগের একটা বাসায় গিয়ে উঠি। আমাদের সব জিনিসপত্র তখন তেজগাঁর বাসাতেই ছিল।

"আটই ডিসেম্বর রাতে ভয়ঙ্কর শব্দে ঘুম ভেঙে গেল। শুনতে পেলাম তেজগাঁতে বোম্বিং করা হচ্ছে। তেজগাঁতে আমাদের মালামাল ও গরু বাছুর থাকায় সকালে পায়ে হেঁটে আবার সেখানে গেলাম। রাস্তায় দেখলাম, মানুষজন ঢাকা ছেড়ে চলে যাচ্ছে। কোন যানবাহন রাস্তায় নেই। সেখানে গিয়ে শুনলাম, তেজগাঁ এতিমখানায় বোম্বিং করা হয়েছে। কী ঘটেছে তা দেখার জন্য আমি এতিমখানায় গেলাম। সেখানে গিয়ে যে হৃদয়বিদারক দৃশ্য দেখলাম, তাতে আমার-মাথা ঘুরে গেল। ধ্বংসস্তূপের মাঝে কতগুলো এতিম শিশুর ছিন্ন বিচ্ছিন্ন দেহ পড়ে আছে। কয়েকজন লোক সেই ধ্বংসস্তূপ থেকে ছিন্ন বিচ্ছিন্ন লাশগুলোকে সরানোর চেষ্টা করছে। ভয়ে আমরা সেখান থেকে চলে এলাম। সেখান থেকে কিছু দূর যাওয়ার পর, একটা জলাভূমিতে

www.pathagar.com

বিরাটাকার একটা বোমা পড়ে থাকতে দেখলাম। বোমাটির গায়ে চীনা ভাষায় কিছু লেখা ছিল।

"স্বাধীনতার পর আমাদের বরিশালের বাড়ির সামনে, অপ্রকৃতিস্থ এক বৃদ্ধকে বসে থাকতে দেখতাম। পাশের বাসার এক ভদ্রলোক এ বৃদ্ধ সম্পর্কে বলেন, তাঁর বাড়ি গৌরনদীতে। যুদ্ধের সময় তাঁর ছেলে ও নাতি খুলনার খালিশপুর জুট মিলে চাকরি করতেন। সেখানে বিহারিরা বাঙালিদের জবাই করা শুরু করলে তাঁরা সপরিবারে নিজ গ্রাম গৌরনদীতে বাবার কাছে চলে আসেন। জুন মাসের মাঝামাঝি সময়ে খবর আসে, পাকিস্তানি আর্মি গৌরনদীতে আসবে। এ সময় আর্মি আসার কোন সংবাদ পেলেই নারী পুরুষ নির্বিশেষে গ্রামবাসীরা পার্শ্ববর্তী জঙ্গলে গিয়ে লুকিয়ে পড়ত। শেষ পর্যন্ত একদিন সত্যিই আর্মি গ্রামে এসে ঢুকল। সেদিন শুধু মেয়েরাই পালিয়ে যেতে পেরেছিল; পুরুষরা পারেনি। পাকি আর্মি এদিন ত্রিশ-চল্লিশ জন গ্রামবাসীকে গুলি করে হত্যা করে। এই বৃদ্ধ, তাঁর ছেলে ও নাতিকে পাকি সেনারা বলল, "তোমাদের মারবো না, তোমরা পুকুর পাড়ে চলে এস"। তাঁরা পুকুর পাড়ে এলে তাঁদেরকে বিশালকৃতির সেই পুকুরের এপার থেকে সাঁতরে ওপারে গিয়ে ফিরে আসতে পারলে হত্যা করা হবে না, বলে তারা জানাল। কথা অনুযায়ী তাঁরা তিনজন প্রথমবার সাঁতরে ফিরে এলে তাঁদেরকে দ্বিতীয়বার ওই কাজটি করতে বলা হল। দ্বিতীয় বার সাঁতরে এলে তাঁদেরকে তৃতীয়বার সাঁতরে আসার জন্য বলা হল। এভাবে তৃতীয়বারও সাঁতরে এলে তাদেরকে চতুর্থবার সাঁতরে আসার জন্য বলা হল। তাঁরা তখন খুবই ক্লান্ত হয়ে পড়লেন। কিন্তু জীবন বাঁচানোর তাগিদে তখন তাঁরা মরিয়া হয়ে সাঁতরাচ্ছিলেন। আসলে পাকিস্তানি আর্মি তাঁদের জীবন নিয়ে স্রেফ কৌতুক করছিল। চতুর্থবার যখন তাঁরা সাঁতরিয়ে কোন রকমে মাঝ পুকুরে যান, তখন তাঁদের উপর আর্মি ব্রাশ ফায়ার শুরু করে। ব্রাশ ফায়ারে বৃদ্ধের ছেলে ও নাতি নিহত হন। কিন্তু বৃদ্ধ ব্যক্তিটি আহত অবস্থায় বেঁচে যান। পরে নাতি ও ছেলের শোকে তিনি পাগল হয়ে যান।"

অবসরপ্রাপ্ত সরকারি কর্মকর্তা জিল্লুর রহমান একাত্তর সনে তাঁর ন'বছরের শিশু সন্তানের শহীদ হওয়ার ঘটনা বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন, "আমার বড় ছেলে ইকবাল ওই বয়সেই মুক্তিপাগল ছিল। যুদ্ধের সময় তার বয়স ছিল নয় বছর। সে টিভি দেখে তার মাকে বলত, 'মা, আমি যুদ্ধে যাব'। তার মা উত্তরে বলতেন, 'তোমার চেয়ে বন্দুকের ওজন বেশি। যুদ্ধে গিয়ে তুমি ঠিক মতো বন্দুক চালাতে পারবে না। তখন শত্রুরা তোমাকে মেরে ফেলবে।'

"পঁচিশে মার্চ রাতে যখন গণহত্যা ও ধ্বংসযজ্ঞ শুরু হয় তখন আমরা ২৫, ইস্কাটন রোডে ছিলাম। সে রাতে সেনাবাহিনী ট্যাংক নিয়ে রাস্তায় বেরিয়ে এলে আমরা বাসার মধ্য থেকে সেটা দেখতে পাচ্ছিলাম। 'সাকুরা'র পাশে অবস্থিত 'পপুলার প্রেসে' পাকি বাহিনীর আক্রমণের বর্বরতা তখন আমি নিজ চোখে দেখেছি। পরের

www.pathagar.com

দিন সকাল পর্যন্ত পুরো প্রেসটা আগুনে জ্বলেছে এবং কর্মচারীদের গুলিবিদ্ধ লাশগুলো তখনও সেখানে পড়ে ছিল।

"ষোলোই ডিসেম্বর দীর্ঘ ন'মাসের যুদ্ধ শেষে বিজয় অর্জিত হলে, ঢাকা শহর উল্লাসে ফেটে পড়ে। আমি বিকাল আনুমানিক পাঁচটায় সময় তৎকালীন ইন্টারকন (বর্তমানে শেরাটন) হোটেলের সামনে উপস্থিত সাংবাদিক ও উৎসুক লোকদের মধ্যে ছিলাম। সেই সময় আমার ২৫ নং ইস্কাটনের বাসার সামনে, ইকবাল বাংলাদেশের ম্যাপ ওয়ালা পতাকা নিয়ে, 'জয় বাংলা' শ্লোগান দিতে দিতে রাস্তায় নেমে পড়ে। আমার মনে হয়, এই সময় পাকিস্তানি সৈন্যরা রেসকোর্সে আত্মসমর্পণ করতে যাচ্ছিল। জয় বাংলা শ্লোগান শুনে তারা গাড়ি থামায় এবং গলির মধ্যে ঢুকে এলোপাতাড়ি গুলি ছুঁড়তে শুরু করে। তাদের গুলিতে আমার ছেলে ইকবাল ঘটনাস্থলেই মারা যায়। আমার বড় মেয়ে তাঁকে আনতে গেলে তাঁর হাতেও গুলি লাগে। সেই সময় আমার শ্যালক মিজানুর রহমান মোটর সাইকেল নিয়ে গলির ভেতরে ঢুকছিলেন, পাকি বাহিনীর একটি গুলি তাঁর পায়েও লাগে। ১৬ ডিসেম্বর ঢাকা শহর যখন উল্লাসে ফেটে পড়ে, তখন পাকি সেনাবাহিনী আমার ছেলের মতো আরও পঁচিশ-ত্রিশ জন লোককে হত্যা করে। আমি আমার ছেলের হত্যাকাণ্ডসহ পাকি বাহিনীর সকল বর্বরতার বিচার চাই।"

রায়ের বাজারের নুরুদ্দীন মিয়া বলেন, এই এলাকায় পাকি আর্মি ও তাদের দোসরদের প্রধান বধ্যভূমি ছিল রায়ের বাজার। এই বধ্যভূমিতে পাকি হানাদাররা অসংখ্য বাঙালিকে হত্যা করে। তারা গাড়ি ভর্তি করে লাশ এনে বটতলায় (পুলপার) ফেলেছে। সেখানে তখন একটি পরিত্যক্ত ইটের ভাটা ছিল। ভাটার ভেতরে একটি বিশাল গর্ত ছিল। লাশগুলো এনে ওই গর্তের মধ্যে ফেলা হত। আমি নিজের চোখে সেখানে লাশের স্তূপ দেখেছি। লাশগুলো স্থানীয় লোকদের ছিল না। গেণ্ডারিয়া, ধূপখোলা প্রভৃতি জায়গা থেকে এসব লাশ গাড়িতে করে এনে এই ইটখোলায় ফেলা হত।

"তবে রায়ের বাজার থেকে যাদের ধরা হত, তাঁদেরকে মিরপুরে নিয়ে হত্যা করা হত বলে শুনেছি। রায়ের বাজার থেকে সে সময় আর্মি অনেক লোককে ধরে নিয়ে যায়। এর মধ্যে নীহার মেম্বার (নীহাররঞ্জন পাল), শওকত প্রমুখের নাম এখনও মনে পড়ে। স্থানীয় লোকদের ধরার সময় রাজাকাররা পাকি আর্মিকে সহযোগিতা করত। এই ভয়াবহ দিনগুলোতে আমি কোন ক্ষতির সম্মুখীন হইনি। কারণ আমি তখন পৌরসভায় চাকরি করতাম এবং বাইরে বেরনোর সময় অফিসিয়াল ড্রেস পরে নিতাম। এ জন্যই হয়তো পাকি আর্মি আমাকে কিছু বলত না। রায়ের বাজার বধ্যভূমিতে যে সমস্ত বাঙালির মাথা কাটা অবস্থায় পাওয়া যায়, তাঁরা সবাই বড় বড় অফিসে চাকরি করতেন।"

www.pathagar.com

একাত্তরে পাকি বাহিনীর বহু হত্যাকাণ্ডের প্রত্যক্ষদর্শী ফিজিক্যাল কলেজের লাইব্রেরিয়ান আওয়াল খান বলেন, বঙ্গবন্ধুর ঐতিহাসিক সাত মার্চের ভাষণের পর আমাদের কলেজ বন্ধ হয়ে যায়। মার্চ মাস শেষে আমি বেতন নেওয়ার জন্য কলেজে গিয়ে স্তম্ভিত হয়ে যাই। দেখি পাঞ্জাবিরা সেখানে ঘেরাও দিয়ে রেখেছে। আমি জানতে পারলাম, আমাদের হেড ক্লার্ক তোফাজ্জেল হোসেন সাহেব ভেতরে আটক রয়েছেন। বরকত সাহেব (শিক্ষক), ইন্সট্রাকটর ফজল খান প্রমুখও আটকা পড়ে আছেন। পাকি আর্মি ও বিহারি ছেলেদের দেখে আমি আর ভেতরে ঢুকতে সাহস পেলাম না। জানতে পারলাম, পাকি আর্মি সেখানে ক্যাম্প স্থাপন করেছে। যে-ই ভেতরে যাচ্ছে, তাকেই কাস্টোডিতে আটকে রাখছে। এরপর আমাদের কলেজটিকে কিছুদিন ইডেন কলেজে ও টিটি কলেজে স্থানান্তর করা হয়। তারপর উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের অনুমতি নিয়ে আমরা পুনরায় ক্যাম্পাসে ফিরে আসি। তখনও ক্যাম্প ছিল। তবে আমাদের অফিস করতে হত হোস্টেলে। আমাদেরকে ওরা অফিস স্টাফ বলে পরিচয় করিয়ে দেয়। তখন পরিচালক ছিলেন খান মজলিস সাহেব।

"একদিন মিলিশিয়া বাহিনীর দু'হাজার সদস্য আমাদের কলেজে এসে ঢোকে। কর্নেল, মেজর পর্যায়ের অফিসারসহ বহু সংখ্যক সেনা দেখে আমরা ভয় পেয়ে যাই। মেশিনগানসহ ভারী ভারী অস্ত্রশস্ত্র ওরা মাঠের মধ্যে স্থাপন করে। আমি দেখলাম, মেয়েদের হোস্টেলের মধ্যে কিছু বাঙালিকে ওরা আটকে রেখেছে। এঁরা সম্ভবত ইপিআর ছিলেন। তাঁরা জানান, তাদের অফিসার র‍্যাঙ্কের সকলকেই আর্মি মেরে ফেলেছে। আমরা যখন বাইরে ঘুরতাম, তখন তাঁরা বেরনোর জন্য পাগল হয়ে যেতেন, হাউমাউ করে কাঁদতেন (আউয়াল হোসেন খান এক পর্যায়ে আবেগপ্রবণ হয়ে উঠেছিলেন), কিন্তু আমাদের কিছুই করার ছিল না।

"টিটি কলেজ থেকে আমরা যখন নিজেদের ক্যাম্পাসে ফিরে এলাম, তখন ছেলেদের হোস্টেলের সিঁড়ির চতুর্দিকে ছোপ ছোপ রক্ত দেখতে পেলাম। তিন তলা থেকে নিচ তলা পর্যন্ত বয়ে যাওয়া রক্তের শুকনো ধারাও দেখতে পেলাম। এসব দেখে আমাদের মনে হয়, বেয়নেট চার্জ করে বহু লোককে পাকিরা এখানে হত্যা করেছিল। শুকনো রক্তের ছাপগুলো সম্ভবত নিহতদের বাঁচার শেষ আকুতির চিহ্ন ছিল। ওপরে মেয়েদের লম্বা চুলও পড়ে থাকতে দেখেছি। এখানের আর্মি ক্যাম্পে বিভিন্ন এলাকা থেকে মেয়েদের ধরে আনা হত। আমাদের প্রিন্সিপালের কোয়ার্টারে তখন এক পাকি মেজর থাকত। একদিন আমাদের এক পিয়ন সেখানে ঝাড়ু দিতে গিয়ে শুধু ব্লাউজ ও পেটিকোট পরা একটি সুন্দরী মেয়েকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে। কোথা থেকে এই সুন্দরী বাঙালি মেয়েটাকে ধরে আনা হয়েছিল, তা আমরা জানতে পারিনি। যুদ্ধ শেষে আর্মি চলে যাওয়ার পর আমরা কলেজের মাঠে ঘাসের মধ্যে অনেক হাড়গোড় ও মাথার খুলি পেয়েছিলাম।"

ঢাকা শহরের বস্তি বা বাড়িঘরগুলো ধুলোয় মিশিয়ে দেওয়ার দায়িত্বে ছিল পাকি ক্যাপ্টেন সাঈদ। 'দৈনিক বাংলা', ১০ ফেব্রুয়ারি, ১৯৭২ এ প্রকাশিত সাবেক পাকি

www.pathagar.com

বিমান বাহিনীর প্রকৌশল বিভাগের ফোরম্যান আফতাবের সাক্ষাৎকারে এ তথ্য পাওয়া যায়। কুর্মিটোলা সেনানিবাস ও ঢাকার পুরানো বিমানবন্দর এলাকায় তিনি বুলডোজার চালাতেন। বুলডোজার চালিয়ে গর্ত করতেন আর সেই গর্তে লাশ ভর্তি করে মাটিচাপা দিতেন। আফতাব জানান, অসংখ্য বাড়িঘর মাটিতে মিশিয়ে দিয়েছিল ওরা। ঢাকা বিমানবন্দর সংলগ্ন এলাকায় অসংখ্য নিরীহ বাঙালিকে তারা হত্যা করে। প্রায় শ'খানেক মেয়েকে পাকিরা সেনানিবাসে ধরে নিয়ে যায়। পাশবিক অত্যাচারের পর এদের সবাইকে হত্যা করা হয়। আফতাব নিজ চোখে সুবেদার শের শাহ্ খানকে নিরপরাধ মানুষ খুন করতে দেখেছেন। এক দম্পতি ঢাকা থেকে পায়ে হেঁটে সাভারের দিকে যাচ্ছিলেন। এ সময় একটি জিপ থেকে নেমে শের শাহ্ খান গুলি করে স্বামীকে হত্যা করে। আফতাব জানান, এরা এতই ভয়ংকর ছিল যে, নিজেদের নিহত সঙ্গীর লাশও মাটিচাপা দিত, যাতে পশ্চিম পাকিস্তানের কেউ প্রকৃত ঘটনা জানতে না পারে।

পাকিস্তানি সেনাবাহিনী ও তাদের সহযোগীদের হিংস্রতা যে কত ভয়াবহ ছিল, তার প্রমাণ পাওয়া যায় ১৯৯৯ সনের জুলাই মাসে। সাতাশে জুলাই মিরপুরে নূরী মসজিদের সংস্কার কাজের সময় কূপ খনন করলে বেরিয়ে আসে একাত্তরের সেই হত্যাযজ্ঞের স্মৃতিচিহ্ন। মাথার খুলি ও হাড়গোড়ের সাথে বেরিয়ে আসতে থাকে চুলের বেণী, ওড়না, কাপড়ের অংশসহ বিভিন্ন ব্যবহার্য সামগ্রী। ধারণা করা হয়, ন'মাসের স্বাধীনতা সংগ্রামে নিহত বাঙালি, ত্রিশে জানুয়ারি '৭২-এ মিরপুর মুক্তি অভিযানে শহীদ লে. সেলিম ও তাঁর ৪১জন সহযোদ্ধা, জিয়াউল হক খান লোদী এবং পুলিশ বাহিনীর সদস্যসহ অন্যান্যের লাশ এই কুয়োতে ফেলে মাটিচাপা দেওয়া হয়।

জল্লাদখানা বধ্যভূমিঃ মিরপুরের ১০ নং সেকশনের 'জল্লাদখানা' বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের অন্যতম বৃহৎ বধ্যভূমি। ১৯৭১ সনে পুরো মিরপুর এলাকাই ছিল গ্রামীণ জনপদ। জল্লাদখানার আশেপাশের এলাকাসহ সমগ্র মিরপুরই ছিল বিহারি অধ্যুষিত। যুদ্ধের সময় পাকি আর্মি নির্বিচারে বাঙালি হত্যার জন্য বিহারিদের হাতে অস্ত্র তুলে দেয়। ফলে পাকি আর্মি ও বিহারিরা হাজার হাজার বাঙালিকে এখানে ধরে এনে হত্যা করে লাশ ফেলে দেয়। এই কারণে মিরপুরে অনেকগুলো বধ্যভূমি আবিষ্কৃত হয়েছে। তবে এখনো অনাবিষ্কৃত রয়েছে অনেক বধ্যভূমি।

মুসলিম বাজার বধ্যভূমিঃ মিরপুরের মুসলিম বাজার নূরী মসজিদের বধ্যভূমিতে প্রাপ্ত হাড়গোড়ই প্রমাণ করেছে, একাত্তরে পাকি বাহিনী ও তাদের দোসর অবাঙালি বিহারিরা কত নৃশংস ও নারকীয় হত্যাযজ্ঞ চালিয়েছে ওই এলাকায়। সাতাশে জুলাই, ১৯৯৯ মিরপুর ২ নং সেকশনের ডি ব্লকে, মুসলিম বাজার সংলগ্ন নূরী মসজিদের বর্ধিতাংশ নির্মাণকল্পে মাটি খননের সময় এই বধ্যভূমির সন্ধান পাওয়া যায়। ফকির সফির উদ্দীন আহমেদ স্বাধীনতার পরপরই মিরপুর ইউনিয়নের চেয়ারম্যান নিযুক্ত হন। মুক্তিযুদ্ধকালীন মিরপুরের অবস্থা বর্ণনা করতে গিয়ে ২৫ ফেব্রুয়ারি, ২০০১ ইং তারিখে WCFFC প্রতিনিধিকে তিনি বলেন-

www.pathagar.com

"মুক্তিযুদ্ধকালীন মিরপুরের কথা বলতে গেলে একটু পেছনের দিকে ফিরে যেতে হবে। পশ্চিম পাকিস্তানিরা বাংলাদেশকে কব্জা করার উদ্দেশ্যে তাদের দোসর উগ্র বিহারিদেরকে মিরপুর, মোহাম্মদপুরসহ ঢাকার বিভিন্ন এলাকায় বসতি স্থাপন করায়। ফলে এলাকাগুলো এক পর্যায়ে তাদের কলোনিতে পরিণত হয়। ১৯৭১ সনের অনেক আগে থেকেই মিরপুরে বসতি গেড়ে বসা এই বিহারিরা স্থানীয় বাঙালিদের ওপর নানাভাবে অত্যাচার চালাত। কখনও কখনও লুটপাট চালাত এবং বাঙালিদের সঙ্গে অনর্থক ঝগড়া বাঁধানোর পাঁয়তারা করত।

"'৭১-এর পঁচিশে মার্চের কয়েকদিন আগ থেকেই মিরপুরে বাঙালিদের সাথে বিহারিরা দাঙ্গা বাঁধানোর চেষ্টা করে। এ সময় তাদের নির্বিচার বাঙালি হত্যা ও লুটতরাজ দেখে আমরা বুঝতে পারি যে, বাড়িতে থাকা আমাদের জন্য নিরাপদ হবে না। তাই চব্বিশে মার্চ সকালে আমার পরিবার পরিজনকে নদীর ওপারে গ্রামে পাঠিয়ে দিই।

"পঁচিশে মার্চ দুপুর বারোটার দিকে বিহারিরা আমার মিরপুরের বাড়ি আক্রমণ করে। ব্যাপক লুটপাটের পর, তারা আমার বিল্ডিং বাড়িতে অগ্নিসংযোগ করে। তখন ছিল আমাদের একান্নবর্তী পরিবার। তাই ভেতর বাড়িতে দুটো বিশাল ধানের গোলা ও অনেক চাল মজুদ ছিল। ধান ভর্তি গোলা দু'টিতে তারা আগুন দিয়ে চাল, অন্যান্য মূল্যবান আসবাবপত্র ও টাকা পয়সা লুট করে নিয়ে যায়। বিহারিদের এই লুটপাট ও ধ্বংসাত্মক কর্মকাণ্ডের কাছে আমরা খুবই অসহায় ছিলাম। তবে সৌভাগ্যক্রমে আমি এবং বাড়িতে অবস্থানরত আমার অন্য দু'ভাই কৌশলে বিহারিদের হাত থেকে পালিয়ে যেতে সক্ষম হই।

সাতাশে মার্চ পাকি আর্মির মদদে বিহারিরা 'ইত্তেফাক'-এর সাংবাদিক আবু তালেবকে মিরপুরে হত্যা করে। তাঁকে নিজ ঘরের মধ্যে জবাই করা হয়। বি ব্লকের দুই নং রোডে অবস্থিত তাঁর বাড়িটি ইতিহাসের সাক্ষী হয়ে এখনও দাঁড়িয়ে আছে। এ ব্লকের এভিনিউ ১-এর বাড়িটি ছিল অবসরপ্রাপ্ত সরকারি কর্মকর্তা সাজ্জাদুর রহমানের। বিহারিরা তাঁর বাড়িটিতেও লুটপাট চালায়। সাজ্জাদ সাহেব তাদের হাতে মারাত্মকভাবে জখম হন। ছাব্বিশে মার্চে হত্যা করা হয় ডা. জয়নুদ্দিন, আব্দুল হাকিম, আসিরুদ্দিনের ছেলে বরকত প্রমুখকে। বরকত আলীকে তাঁর স্ত্রী, সন্তানসহ নিজ বাড়িতে নির্মমভাবে জবাই করা হয়। বিহারিরা যখন এসব হত্যাকাণ্ড চালায় তখন আমি ঢাকাতে ছিলাম না। সাভারের যাদুর চর গ্রামে গিয়ে আশ্রয় নিয়েছিলাম।"

"ষোলোই ডিসেম্বর বাংলাদেশ স্বাধীন হলেও মিরপুর এলাকা তখন মুক্ত হয়নি। মিরপুর শত্রুমুক্ত হয় আরও অনেক পরে, ত্রিশ জানুয়ারি ১৯৭২ সনে। সে দিন বিহারিরা এখানে এক 'প্রলয়ংকরী' হত্যাকাণ্ড চালায়। মিরপুর মুক্ত করতে গিয়ে এদিন লে. সেলিম, আবদুল আলিম, জহির রায়হানসহ বহু সামরিক বেসামরিক লোক নিহত হন। দেশ স্বাধীন হলে আমরা ঢাকার বিভিন্ন এলাকায় ঘুরেছি। এ সময় বিভিন্ন

www.pathagar.com

স্থানে লাশ পাওয়া গেছে, হত্যা করে বীভৎস অবস্থায় ফেলে রাখা হয়েছে, এ রকম খবর সারাক্ষণই পেতাম এবং সেখানে ছুটে যেতাম। এর মধ্যে একদিন ১৪ নং সেকশনে গিয়ে একটা হত্যাকাণ্ড দেখে শিউরে উঠলাম। এখানকার যে বিল্ডিংগুলো এখন পুলিশ ব্যারাক ও অন্যান্য বাহিনীকে দেওয়া হয়েছে, সেগুলোর মাঝখানে একটা বিল্ডিং-এর মধ্যে এটা দেখলাম।

পাকি সেনাদের গণহত্যার অন্যতম প্রত্যক্ষদর্শী সুইপার এ্যাল্লাইয়া বলেন, সময়টা ছিল মে/জুনের কাছাকাছি। হঠাৎ তেজগাঁও এতিমখানার উপর বোমা বর্ষণ হতে দেখলাম। চারদিকে যুদ্ধের দম বন্ধ করা পরিবেশ। এরই মধ্যে একদিন পাকি বাহিনী আমাদের বস্তিতে আসে। আমাদের সবাইকে ডেকে বলল, "তোমাদের ভয় নেই, তোমরা এস"। কিন্তু আতঙ্কিত ছিলাম আমরা। আমাদের ভয় ভাঙাতে খান সেনারা বলল, "তোমরা ঝাড়ুদার, তোমাদের কিছু কাজ আছে, কাজ শেষ হলে ছেড়ে দেব এবং কিছু জিনিসপত্র দেব। এরপর আমাদের পাঁচ সাত জনকে গাড়িতে করে ঘটনাস্থলে নিয়ে গেল। সেখানে এতিম শিশুদের প্রায় বিশ-পঁচিশটি লাশ পড়েছিল। লাশগুলো গাড়িতে তুলে ক্যান্টনমেন্টে নিয়ে যাওয়া হল। সেখানে আগেই গর্ত করা ছিল। তার মধ্যে সেই বাচ্চাগুলোকে মাটিচাপা দেয়া হল, আমাদেরকে দিয়ে। এরপর হাতমুখ ধোয়ার পর আমাদেরকে তন্দুর রুটি, মাংস, ডাল খেতে দেওয়া হল। ফিরে যাওয়ার সময় চিনি, ময়দা বেঁধে দিয়ে গাড়িতে করে সুইপার কলোনিতে পাঠিয়ে দিল। দশ পনেরো দিন পর মিলিটারিরা আবার এসে পাঁচ সাত জনকে ক্যান্টনমেন্টের বাথরুম রাস্তাঘাট সাফ করার জন্য নিয়ে গেল।

রামু সুইপারের মেয়ে কমলা বলেন, দয়াগঞ্জ পুলের কাছে আর্মি ক্যাম্প ছিল। বিভিন্ন সময় নানা দরকারে আমার বাবাকে ডেকে নিয়ে যেত তারা। অন্য কাজের কথা বলে নিয়ে বাবাকে দিয়ে লাশ সরানোর কাজ করাত পাকি সেনারা। কাজ শেষ হলে আবার তাকে দয়াগঞ্জ পুলের কাছে এনে ছেড়ে দিত। সেই সঙ্গে এই বলে হুঁশিয়ার করে দিত যে, "তোমাকে দিয়ে যে কাজ করাই, তা কাউকে বলবে না এবং কখনও কাজে 'না' বলবে না। যা করতে বলব তাই করবে, তা না হলে গুলি করে মেরে ফেলব"। কিন্তু বাবা প্রতিদিন এসে মার কাছে সেসব ঘটনা বলে দিতেন। একদিন বাবার সাথে আমিও যাচ্ছিলাম, এমন সময় খানসেনারা ডাক দিল। বাবা তখন আমাকে বাড়িতে ফিরে যেতে বলল, স্কুলের কর্মচারী ছিলেন আমার বাবা। কাজে যাওয়ার পথে তাকে প্রায়ই ধরে নিয়ে যেত পাকিস্তানি মিলিটারিরা। ব্রাদাররা প্রায় জিজ্ঞেস করত, "রামু তুমি কোথায় যাও?" কিন্তু প্রাণের ভয়ে চুপ করে থাকতেন তিনি। রাতে জেগে বসে থাকতেন, আতঙ্কে ঠিকমত ঘুমোতেও পারতেন না। পাকি সেনারা টাকা-পয়সা তেমন দিত না, তবে চাল ও আটা দিত।

পাকি আর্মির হাতে নির্যাতিত মুহাম্মদ মোস্তফা বলেন, "আমি সে সময় পাকিস্তান থেকে প্রকাশিত পত্রিকা 'ডেইলি জং', 'ডেইলি নিউজ' ও 'সাপ্তাহিক আকবরি'র ঢাকা অফিসের গাড়ি চালক ছিলাম। আমাদের পূর্ব পাকিস্তান অফিসের জেনারেল

www.pathagar.com

ম্যানেজার ছিলেন মহিউদ্দীন সাহেব। আমার মাইক্রোবাসটির নম্বর ছিল ঢাকা ব-৩৪২। গাড়ির পেছনে 'ডেইলি জং' লেখা থাকার কারণে যুদ্ধের বিভীষিকার মধ্যেও আমরা গাড়ি নিয়ে নির্বিঘ্নে যাতায়াত করতে পারতাম। যে কোন রাজনৈতিক দলের মিটিং ও সচিবালয়ে আমাদের যাতায়াত ছিল অবাধ।

"ঢাকা থেকে তখন 'ডেইলি জং'-এর জন্য সংবাদ সংগ্রহ করে করাচির হেড অফিসে পাঠানো হত। সম্ভবত উর্দু পত্রিকার লোক বলেই আর্মি আমাদের কিছু বলত না। সংবাদ পাঠানো ও পত্রিকা সংগ্রহের জন্য প্রতিদিন কয়েকবার আমাকে বিমান বন্দরে যেতে হত। কারণ করাচি থেকে বিমানের কার্গোতে করে পত্রিকা আসত। যুদ্ধ শুরুর মাস তিনেক পর থেকে আমার মাইক্রোবাসটি নিয়মিতভাবে মুক্তিযোদ্ধাদের বিভিন্ন অপারেশনের কাজে ব্যবহার করা হত।

আমার ২৯, নয়াপল্টনস্থ বাসায় একদিন দুপুরে খোলা জিপে করে তেরো-চৌদ্দ জন পাকি আর্মি এল। তারা এসেই মাইকে ঘোষণা দেয়, 'তুমি পালালে তোমার ছেলেমেয়েকে শেষ করে দেওয়া হবে।' কথাগুলো উর্দুতে বলছিল। আমি তাদের কথা কিছু কিছু বুঝতে পারছিলাম। আমাকে তারা বাসা থেকে গাড়িতে নিয়ে যায়। দিন তারিখ সঠিক মনে নেই। সেটা রোজার প্রথম দিককার ঘটনা। তারা আমাকে প্রথমে ৪নং দিলকুশায় আমার অফিসে নেয়। অফিসে তখন অনেকেই ছিলেন। তারা আমার অফিস সার্চ করার পর, আমাকে নিয়ে বিভিন্ন জায়গা ঘুরে নিউমার্কেটে যায়। সেখানকার একটা হোটেলে তারা তন্দুর রুটি ও মুরগির মাংস খায় এবং আমাকেও খেতে দেয়। দোকানী দাম চাইলে তাকে রাইফেলের বাঁট দিয়ে আঘাত করে। সেখান থেকে তারা আমাকে তেজগাঁওয়ের এমএলএ হোস্টেলের মার্শাল ল' কোর্টে নিয়ে যায়। সেখানে ছোট একটা কক্ষে আমাকে রাখা হয়। এরপর ছাই রং এর পোশাক পরা এক অফিসার এল। সে ছিল মিলিশিয়া বাহিনীর লোক। আমার অফিসের পাশে 'হোটেল পূর্বরাগে' সে থাকত। আমি তাকে পত্রিকা দিতাম। এক সুবেদার আমাকে তার কক্ষে নিয়ে যায়। সেখানে তাদের একজন আমাকে এমন জোরে এক থাপ্পড় মারে, যার যন্ত্রণা ত্রিশ বছর ধরে আমাকে পোহাতে হচ্ছে। তবে আমাকে থাপ্পড় মারার কারণে ওই অফিসারটিও লোকটাকে কষে এক থাপ্পড় দেয়। এরপর সে অফিসার আমাকে শিখিয়ে দেয় যে, আমি যেন কোন কিছুই স্বীকার না করি। বলে, স্বীকার করলে তারা তোমাকে হত্যা করবে।

"আমাকে যে কক্ষে রাখা হয়, তার পাশে আরও কয়েকটি কক্ষ ছিল। সে সব কক্ষে চার জন, পাঁচ জন, দু'জন করে বন্দী রাখা ছিল। পালাক্রমে তাঁদেরকে সেখান থেকে 'টর্চার' কক্ষে নিয়ে যাওয়া হত। পরদিন সকালে আমাকে সুফি সাহেবের ('ডেইলি জং'র ঢাকাস্থ উর্দু সাংবাদিক) কাছে নিয়ে যাওয়া হয়। সুফি সাহেবের কাছে ওই অফিসার আমার জন্য সুপারিশ করেছিল। সুফি সাহেব আমার কার্ড দেখতে চাইলেন। আমি তাকে কার্ড দেখালাম। সুফি সাহেব আমাকে বললেন, আমি যেন

www.pathagar.com

কিছুই স্বীকার না করি। আমার নামে তখন তিনটি অভিযোগ লেখা হয়েছিল। তিনি বললেন, "আমার তো ছেড়ে দেওয়ার ক্ষমতা নেই, তবে যেহেতু আমার রিপোর্টের ভিত্তিতে শাস্তি হবে, সেহেতু ব্যাপারটি আমি দেখব"। ওই কক্ষে আমাকে ছয় দিন রাখা হয়েছিল। এই ছয় দিনে আমার পাশের কক্ষের বন্দীদের ওপর যে অমানুষিক নির্যাতন করা হয়েছিল, তার দৃশ্য আমি কখনও ভুলতে পারব না। জানালা দিয়ে লুকিয়ে লুকিয়ে আমি সেগুলো দেখতাম। তাঁদেরকে শুইয়ে পেটানো হত। আঙুলের ভেতর সুঁচ ঢুকিয়ে, মলদ্বার দিয়ে গরু বাঁধার খুটো ঢুকিয়ে, শুইয়ে দু'জনে বাঁশ ধরে, বুকের দিক থেকে ডলা দিয়ে, পায়ের দিকে নিয়ে যাওয়া, প্রভৃতি নির্যাতন পদ্ধতি সেখানে আমি দেখেছি। আটক বন্দীদের আর্ত চিৎকার শুনে আমি নির্যাতনের ভয়াবহতা অনুধাবন করতে পারতাম।

"আটক হওয়ার ষষ্ঠ দিনে আমাকে মার্শাল ল' কোর্টে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে যাওয়ার সাথে সাথে এক সেন্ট্রি আমাকে বেত দিয়ে পেটানো শুরু করে। পেটাতে পেটাতে বেত ভেঙে যায়। কোর্টে এক আর্মি অফিসার বলে, 'শালাকে তো সুফি সাহেব পিটিয়ে কাহিল করে ফেলেছে, তবুও কিছুই হয়নি!' কোর্টের 'টর্চার' কক্ষে অনেককে মুমূর্ষু অবস্থায় মলমূত্রের মধ্যে পড়ে থাকতে দেখেছি। কাউকে ফ্যানের সাথে ঝোলাতে দেখেছি। ফ্যানে ঝোলানোর জন্য কপিকল সেট করা ছিল। বড় ফ্যানের সাথে ঝুলিয়ে যখন সুইচ অন করত, তখন ঝোলানো লোকটি ফ্যানের মতোই ঘুরত। সেই অবস্থায় তাঁকে পেটানো হত। এ সময় তার নাকমুখ দিয়ে গল গল করে রক্ত পড়ত। গরম পানির ভাপ দেওয়া, চামড়ার বড় পাঞ্জা দিয়ে পেটানো, সিগারেটের ছ্যাঁকা দেওয়া, বরফ ভর্তি বিশাল ডিসে চেপে ধরা প্রভৃতি বিভিন্ন ধরনের নির্যাতনের পন্থা আমি সেখানে দেখেছি। বোতলে পানি ভরে তাতে কিছু মিশিয়েও তারা [illegible] তো। পেটাতে পেটাতে বলত 'থোড়া দিনকে বাদ মর যায়েঙ্গে।"

[illegible]মভাবে তারা আমাকে তিন ঘন্টা পিটিয়েছিল। সেখানে মেজর আসলামের সাথে একজন বাঙালি দোভাষীর কাজ করছিল। আমি সব কিছু অস্বীকার করলে তারা আমাকে পেটাতে শুরু করে। তারা আমাকে চামড়ার পাঞ্জা বরফে ভিজিয়ে তা দিয়ে পেটায়। টেবিলে শুইয়ে 'বাঁশ ডলা' দেয়, সিগারেটের আগুন দিয়ে শরীরের দশ বারো জায়গায় ছ্যাঁকা দেয়। পরে এই জায়গাগুলোতে দগদগে ঘা হয়ে যায়। আঙুলের নখের ভেতরে তিন চারবার সুচ দিয়ে বিদ্ধ করে। আঙুলগুলো ফুলে হাতের কব্জির মতো মোটা হয়ে যায়। আমি তখন জ্ঞান হারিয়ে ফেলি। এরপর সেখানে সুফি সাহেব এলেন। মেজর আসলামের সাথে আলাপ করে আমাকে রমনা থানায় নেওয়ার সিদ্ধান্ত হয়। তারপর 'টর্চার' কক্ষ থেকে আমাকে আগের জায়গায় নিয়ে যাওয়া হয়। নির্যাতনের ষষ্ঠ দিনে আমাকে রমনা থানায় নেওয়া হয়। সেখানে বাড়ির মানুষের

www.pathagar.com

সাথে আমার যোগাযোগ হয়। আমি তখন কিছুটা সুস্থ হয়ে উঠেছিলাম। যদিও গাদাগাদি অবস্থা ও মলমূত্রের মধ্যে রমনা থানার ওই সেলের পরিবেশ জঘন্য হয়ে উঠেছিল। সেই ঘরে আমাদের ষাট জনকে রাখা হয়। থানায় ঊনত্রিশ দিন রাখার পর আমাকে জেলে পাঠানো হয়। দেশ স্বাধীন হলে জেল থেকে ছাড়া পাই। মার্শাল ল' কোর্টে আমি এ্যাডভোকেট মুজিবর রহমান সাহেবকে নির্যাতিত হতে দেখেছি। রমনা থানায় মুক্তিযোদ্ধা সেলিম, রামপুরা চৌধুরীপাড়ার 'হোটেল আবুল' এর মালিক আবুল সাহেব, জিঞ্জিরার জনৈক চেয়ারম্যান ও প্রাক্তন এক মন্ত্রীর ভাই সিরাজ সাহেব আমার সাথে ছিলেন। এঁদের সাথে জেলখানায় আমার সাথে তৎকালীন হাউজ বিল্ডিং, এর চীফ এ্যাকাউন্ট্যান্ট রহমান সাহেবও ছিলেন।"

বর্তমানে সেন্ট যোসেফ স্কুলের অধ্যক্ষ, ব্রাদার জন তখন বান্দুরা স্কুলের প্রধান শিক্ষক ছিলেন। তিনি মাঝির বয়ান থেকে স্মৃতিচারণ করে পাকি বাহিনীর হাতে ফাদার ইভান্সের করুণ মৃত্যু প্রসঙ্গে তিনি বলেন, ফাদার উইলিয়াম ইভান্স তখন ঢাকার অদূরে গোল্লাবাঁধের যাজক ছিলেন। সে সময় গোল্লা, হাসনাবাদ, তুতালি, বকসনগর এবং সোনাবাজুতে পাঁচটি গীর্জা ছিল। কিন্তু শেষের দু'টিতে যাজক না থাকায় প্রার্থনার দিন বাইরে থেকে কাউকে সেখানে যেতে হত। সেই সম্পর্কে তেরোই নভেম্বর ১৯৭১, ঢাকা থেকে আরও কয়েকজনের সঙ্গে নৌকায় নবাবগঞ্জ হয়ে বক্সনগর যাচ্ছিলেন ফাদার ইভান্স। নবাবগঞ্জ পাইলট স্কুলে তখন পাকিস্তানি সৈন্যদের ক্যাম্প। স্বভাবতই সাধারণ মানুষ এ পথ এড়িয়ে ঘুর পথে যেত। কিন্তু ফাদার বেছে নিয়েছিলেন সোজা পথ। তিনি ফাদার, তাঁর কাছে কিইবা আছে। এ সময় ক্যাম্পের প্রহরীরা নৌকা থামিয়ে ফাদার ইভান্সকে ভেতরে নিয়ে যায়।

নৌকার মাঝি তখনও ঘাটে বসে ছিলেন। বেলা তখন দুটো কি আড়াইটা হবে। ফাদার ইভান্সকে নদীর ধারে এনে ট্রেঞ্চে নামতে বলা হলে তিনি নামতে অস্বীকার করেন। মুহূর্তের মধ্যেই গুলি করে তাঁকে নদীতে ফেলে দেওয়া হয়। মাঝি প্রাণভয়ে নদীতে ঝাঁপিয়ে পড়ে পালাতে সক্ষম হয়। বিকেল সাড়ে পাঁচটায় ফাদারের মৃত্যু সংবাদ পেয়ে আমি গোল্লায় ছুটে যাই। ইতোমধ্যে স্রোতে লাশ ভেসে গিয়ে ওঠে কুমোরগঞ্জের কাছে। বিল দিয়ে নৌকায় করে সেই লাশ নিয়ে আসা হয় গোল্লায়। পরদিন গোল্লার পাশেই সমাহিত করা হয় তাঁকে। ফাদারকে হত্যার দু'দিন পর, সেনাবাহিনী প্রত্যাহার করে নেয় পাকিরা।

নবাবগঞ্জ থেকে বালুবার তিন মাইল দূরত্বের মাঝখানে হিন্দু বসতিগুলো সব ফাঁকা দেখেছিলাম তখন। কারণ এর আগের দিন বক্সনগরে হিন্দু এলাকায় চৌদ্দজনকে গুলি করে তারা। দু'একজন বাদে এই চৌদ্দ জনের সকলেই মারা যান। ওখানকার স্কুলে পাঞ্জাব রেজিমেন্টের ক্যাম্প ছিল।

www.pathagar.com

আসামী: মেজর আইয়ুব, সুবেদার মুশতাক।

অপরাধের ধরন: গণহত্যা, জাতিগত নিধন, ধর্ষণ, লুটপাট, অগ্নিসংযোগ।

সাক্ষী: বিল্লাল হোসেন, মোহাম্মদ আসগর আলী, যতীন্দ্র চন্দ্র দাস, নিলু বালা শীল, শ্রীনিবাস ভৌমিক, সিস্টার সিসিলিয়া, সুশান্ত টমাস রিবেরু, রবি রিবেরু, যোসেফ বিভাষ গোমেজ,

ঘটনাকাল: একাত্তরের পঁচিশে মার্চ থেকে ডিসেম্বর পর্যন্ত।

ঘটনাস্থল: গাজীপুর

সূত্র: যুদ্ধাপরাধ গণহত্যা ও বিচারের অন্বেষণ এবং WCFFC গবেষণা।

অন্যান্য জেলার মতো পাকি বাহিনী গাজীপুরেও ব্যাপক গণহত্যা, ধ্বংসযজ্ঞ ও নির্যাতন চালায়। জয়দেবপুরের রাজবাড়িতে দ্বিতীয় ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের অবস্থান থাকায়, পাকি বাহিনী সহজেই গাজীপুর সদর থেকে জেলার অন্য থানাগুলোতে গিয়ে অপারেশন চালাতে সক্ষম হত। এ সময় গাজীপুর সদর, কালিগঞ্জ, টঙ্গীসহ অন্য থানাগুলোতে তারা ব্যাপক নির্যাতন, ধর্ষণ ও হত্যাযজ্ঞ চালায়। এর মধ্যে বাড়িয়া ও কামারিয়া গ্রামে পাকি বাহিনী সবচেয়ে বড়ও নৃসংশতম গণহত্যাটি সংঘটিত করে। এখানে এক শ' একান্ন জন শহীদের তালিকা করা হলেও নিহতদের প্রকৃত সংখ্যা আরও অনেক বেশি ছিল। কালিগঞ্জ থানার খ্রীস্টান অধ্যুষিত রাঙামাটিয়া ও এর আশপাশের গ্রামগুলোতেও ব্যাপক গণহত্যা চালায় তারা। কয়েকজন প্রত্যক্ষদর্শীর সাক্ষাৎকারে এসব স্থানে পাকি বাহিনী কর্তৃক সংঘটিত গণহত্যা, নারী নির্যাতন ও মানবতা বিরোধী কর্মকাণ্ডের বাস্তব চিত্র ফুটে উঠেছে।

১৯৭১ সনের ঊনত্রিশ মার্চে বিমান থেকে পাকি বাহিনী রাজবাড়ি ও তার আশেপাশের জনবসতি এলাকায় ব্যাপক বোমাবর্ষণ শুরু করে। সেদিনই তারা জয়দেবপুর দখল করে নেয়। যুদ্ধের নয় মাসে এখানে ব্যাপক লুটতরাজ, অগ্নিসংযোগ, ঘরবাড়ি ধ্বংস, গ্রামের পর গ্রাম আক্রমণ ও বাঙালি নিধনযজ্ঞ চালানো হয়। এপ্রিলের মাঝামাঝি সময়ে তৎকালীন ন্যাশনাল সার্ভিসে নিয়োজিত, বেশ কিছু বাঙালি যুবককে ঢাকা থেকে এনে রাজবাড়ির একটি ঘরে আটকে রেখে, গ্রেনেড চার্জ করা হয়। এর মধ্যে বাতেন ও রওশনের নাম জানা যায়। চৌদ্দই মে পাকি মেজর আইয়ুবের নেতৃত্বে হিন্দুপ্রধান বাড়িয়া ও কামারিয়া গ্রামে পাকিবাহিনী আক্রমণ চালিয়ে বহু লোককে হত্যা করে। একই সঙ্গে চলে লুটতরাজ ও অগ্নিসংযোগ। রাজবাড়িতেও অনেককে ধরে এনে নির্যাতনের পর হত্যা করে রাজবাড়ি সংলগ্ন আবাসিক এলাকার গণকবরে ফেলে দেওয়া হয়। এখানে মানুষের মাথার খুলি, মেয়েদের ব্যবহৃত কাপড় চোপড় পাওয়া যায়। কয়েকজন সাক্ষীর বিবরণ নিচে উল্লেখ করা হল।

www.pathagar.com

১৯৭১ সনের ৫ মার্চ এক বিশাল শ্রমিক প্রতিবাদ মিছিল মেঘনা টেক্সটাইল মিলের সামনে দিয়ে যাওয়ার সময় পাকি হানাদার মিছিলে বেপরোয়া গুলিবর্ষণ করে। ইস্রাফিল, মোতালেব ও হারিছ উদ্দিনসহ চারজন শ্রমিক সেদিন পাকিদের গুলিতে নিহত হন।

টঙ্গী থানার মুদাফা গ্রামের মুক্তিযোদ্ধা বিল্লাল হোসেন ১৯৭১ সনের সেপ্টেম্বর মাসে মুক্তিযুদ্ধে যোগ দেন। তিনি বলেন, টঙ্গী টেলিফোন অফিসে পাঞ্জাবিদের ক্যাম্প ছিল। বিভিন্ন সময় ক্যাম্প থেকে টঙ্গী শিল্প এলাকায় আক্রমণ করে, তারা বহু লোককে হত্যা করেছে এবং বিচ্ছিন্নভাবে কলকারখানার মধ্যে হত্যা করে লাশ গুম করে ফেলেছে। আমি বিশ-বাইশ জনকে চিনি, যাঁরা এভাবে নিহত অথবা গুম হয়েছিলেন। দুলা মিয়া (৪০), দুলা মিয়ার স্ত্রী ও ন'বছরের ছেলে বদরুদ্দীনকে মুদাফা গ্রামের রাস্তার উপর গ্রেনেড চার্জ করে হত্যা করা হয়। তৈয়ব আলী ও আব্দুল মান্নান আমীন হানাদারের গুলিতে শহীদ হন। অন্য সবার নাম এখন মনে করতে পারছি না। তবে টঙ্গী এলাকায় হত্যা করা ছাড়াও মুদাফা, আচিরপুর ও আগুলিয়ায় ঘরবাড়ি পুড়িয়ে, লুটপাট করেছে পাকি আর্মি। গরু, ছাগল, ধান, চালও নিয়ে গেছে তারা।

জয়দেবপুরের অধিবাসী মোহাম্মদ আসগর আলী বলেন, সে সময় আমি ঢাকার ডেমরায় কাজ করতাম। আমাকে প্রতিদিন জয়দেবপুর থেকে যাওয়া-আসা করতে হত। পঁচিশে মার্চ পাকিস্তানি আর্মি সারুলিয়ার পুলের কাছে একটা বাঙ্কার তৈরি করে। এখানকার আর্মি ছিল পাঞ্জাবি ও পাঠান বংশোদ্ভূত। আমি ভাল উর্দু জানতাম। ফলে যাওয়া-আসার পথে আমার সাথে তাদের কথা হত। কিছুদিন পর তারা এখান থেকে চলে গেলে ঘাঁটি গেড়ে বসে মিলিশিয়া বাহিনী। এদের আচার আচরণে আমরা ভয় পেয়ে যাই। সারাদিন বাড়িতে থাকতাম না। তাই মেয়ে ও স্ত্রীর জন্য সব সময় দুশ্চিন্তায় থাকতাম। কারণ এরা যখন তখন বাড়িতে ঢুকে পড়ত। শেষে আমার চাচা গনি মেম্বারের পরামর্শে, আমি থানায় গিয়ে এদের অত্যাচারের কথা জানাই। বাঙালি ওসি ওদের লোককে ডেকে এনে, এগুলো করতে নিষেধ করলে তারা ক্ষেপে যায়। সেদিন অফিস থেকে ফিরে বাজারের কাছাকাছি আসতেই ছোট মেয়েটা দৌড়ে এসে আমাকে ধরে কাঁদতে শুরু করে। এর মধ্যে পাকিস্তানিরা আমার মেয়েকে তুলে নিয়ে যাওয়ারও হুমকি দেয়। মেয়ে বলল, 'বাবা তোমাকে ওরা মেরে ফেলবে।' মেয়ের সেদিনের আর্তনাদের কথা মনে করে এখনও কেঁদে ফেলেন আসগর আলী। পরে বলেন, আমি ভেবেছিলাম পালিয়ে যাব। কিন্তু সেটা সম্ভব হয়নি। কারণ আমি বুঝতে পারি যে, নিজে পালিয়ে গেলে বাড়ির কাউকে ছাড়বে না ওরা। বাড়িতে এসেই হানাদারদের সামনে পড়ে গেলাম। 'শালা শুয়ার কা বাচ্চা' বলেই আমাকে চড় থাপ্পড় মারতে শুরু করল তারা। ধাক্কা দিয়ে ফেলে দেয়, আবার তুলে মারে। ওদের একটাই প্রশ্ন, 'তোর থানায় যাওয়ার সাহস হল কী করে?'

আমার দু'হাত বেঁধে দাঁড় করিয়ে রাখল তারা। অনেকে এসে কাকুতি মিনতি করলেন ছেড়ে দেওয়ার জন্য। অদূরেই স্ত্রী, মেয়ে, পরিবারের সবাই মাটিতে মাথা আছড়িয়ে কাঁদছে। কিন্তু সেদিকে ভ্রূক্ষেপ করল না মিলিশিয়ারা। আমি ভেবেছিলাম মেরেই,

www.pathagar.com

ফেলবে আমাকে। ঠায় দাঁড়িয়ে আছি; দুঃখ কান্নার কোন অনুভূতিই আর কাজ করছে না তখন। এর মধ্যে এক সেপাই এসে আমার কাছে পঞ্চাশ টাকা চাইল। আমি বললাম, পকেটে ত্রিশ টাকা আছে। এরপর অন্য একজন সেপাই এসে আবার মারধর শুরু করল। রাত আটটার দিকে গাড়িতে তুলে নিল। তখন দোয়া ইউনুস পড়ছি। বুঝতে পারছি এই যাওয়াই শেষ যাওয়া"।

বাঙ্কারে নিয়ে যাওয়ার পর আবার মারধর করা শুরু করল। কে থানায় যাওয়ার বুদ্ধি দিয়েছে, সেটা জিজ্ঞেস করতে থাকে। শত অত্যাচারেও মুখ খুলিনি আমি। ভাবলাম, মরলে একাই মরব। কিন্তু অন্য কারও নাম বলব না। অবশেষে হানাদার বাহিনীর হাত থেকে কোন রকমে জীবন নিয়ে ফিরে আসতে পেরেছিলাম। নারী নির্যাতনের ঘটনা নিজের চোখে না দেখলেও বালুচাকলিতে ভাইয়ের শ্বশুরবাড়ির একটি ঘটনা এখনও আমার মনে আছে। যেখানে পাকি আর্মি বিভিন্ন বাড়িতে ঢুকে মেয়েদের ধর্ষণ করেছিল। বাড়ির বাইরে দাঁড়িয়ে আমি ধর্ষিতা নারীদের আর্তচিৎকার শুনতে পেয়েছিলাম।

বাড়িয়া হত্যাকাণ্ড প্রসঙ্গে বাড়িয়া স্কুলের শিক্ষক যতীন্দ্র চন্দ্র দাস বলেন, ১৯৭১ সনের ১৩ মে মেজর আইয়ুব জয়দেবপুর ক্যান্টনমেন্ট থেকে মিটিং করতে ঢাকায় যায়। সে সময় বাঙালিরা তার ক্যান্টনমেন্টের বাড়িতে হামলা চালায় ও অস্ত্রাগার লুণ্ঠন করে। লুট করা এসব অস্ত্র গরুর গাড়িতে ভরে বেসামরিক বাঙালিরা বাড়িয়ার ওপর দিয়ে নিয়ে যায়। বাড়িয়া তখন শতভাগ হিন্দু অধ্যুষিত গ্রাম ছিল। আমি তখন ভাওয়াল বাড়িয়া উচ্চ বিদ্যালয়ের অষ্টম শ্রেণীর ছাত্র।

চৌদ্দই মে বেলা একটার দিকে আমরা শুনতে পেলাম, আর্মি চিলাই নদী পার হচ্ছে। খবর পাওয়ার পর সবাই যে যার মতো পালিয়ে যাচ্ছিলেন। আমাদের নৌকাটা খালের জলার মধ্যে ডোবানো ছিল। আমি সেটা তুলে সেচছিলাম, এর মধ্যে গুলির আওয়াজ কানে এল। প্রথম গুলির প্রায় সাথে সাথেই গ্রামের পাশ দিয়ে আর্মিকে দৌড়ে যেতে দেখলাম। নৌকা তখনও পুরো সেচা হয়নি। মা, বাবা, ভাই-বোন সবাই নৌকার ধারে এলেন। বাবা এ সময় ছোট ভাইয়ের খোঁজে অন্যদিকে গেলেন। এ সময় শরুতী দাস, তার স্ত্রী, মেয়ে শৈলবালা, পুত্র প্রিয়রঞ্জন, চিত্তরঞ্জন ও কেশরিতা আমার নৌকায় এসে ওঠলেন। আমি তাঁদেরকে বললাম, 'নৌকায় যেতে পারবেন না, নেমে যান।' কিন্তু তারা নামলেন না। অবশ্য আমার পরিবারের লোকেরা কেউ তখনও নৌকার ওপরে উঠেননি। আমার দাদী, মা, ভাই দুই বোন, সবাই নৌকার নিচে ছিলেন। তখন মিলিটারিদের একটি নৌকা আমাদের কাছ দিয়ে যাচ্ছিল। ওই নৌকায় পাঁচ জন আর্মি ছিল। তাদের মধ্যে একজন ছিল বেশ ফর্সা, যার বুকে তিনটা স্টার ছিল। তারা আমাদের নৌকা লক্ষ্য করে গুলি শুরু করল। প্রথম গুলিটা শরুতী বাবুর পিঠে এসে লাগল। আমি তাঁদেরকে আবার বললাম, 'আপনারা নৌকা থেকে নামেন'। কেশরিতার যমজ দুই বাচ্চা ছিল। তার মধ্যে মেয়েটা নেমে গেল। এরপর ছেলেটা যখন মায়ের সাথে নামতে গেল তখন গুলি এসে ছেলেটার মাথা ছিঁড়ে নিয়ে গেল। বাচ্চাটির বয়স বছর খানেক হবে। শরুতী

www.pathagar.com

বাবুর স্ত্রী নৌকা থেকে নামতে গিয়ে, শরুতীবাবুর গায়ে গুলি লাগতে দেখে আবার নৌকায় উঠতে গেলেন। তখন তাঁরও বুকে গুলি লাগল।

"বুকে গুলি লাগার সাথে সাথেই তিনি মারা যান। কয়েকজন মানুষ মারা যাওয়ায় নৌকা নিয়ে আমরা আর যেতে পারলাম না। তখন আমরা সেখানেই দাঁড়িয়ে গেলাম। পাকি সেনারা একেবারে কাছাকাছি এসে পড়েছে তখন। কালো এক আর্মি, এ সময় অস্ত্র উঁচিয়ে গুলি করতে যাচ্ছিল। তখন ফর্সা আর্মিটা কিছু বলায় সে গুলি না করে বসে পড়ল। এরপর শরুতী বাবুর মেয়ে শৈলবালাকে আর্মি ধরে নৌকায় উঠিয়ে নিয়ে গেল। আমরা তখন মৃত লোকগুলোর কাছে বসে আছি। এ সময় শৈলবালা আর্মির হাত থেকে মুক্ত হয়ে সেখানে ফিরে এল। আর্মি শৈলবালাকে ছেড়ে দিলে মাঝি নাজিম উদ্দিন তাকে নিয়ে এল। নাজিম উদ্দিন এখনও বেঁচে আছে। সে রেওলা গ্রামের অধিবাসী। সেই মিলিটারিদের নৌকার মাঝি ছিল। শৈলবালাকে দেড় ঘণ্টা পর আর্মি ফিরিয়ে দিয়েছিল।

মৃত লাশগুলো যেখানে যেভাবে ছিল, সেভাবেই পড়ে থাকে। কোন রকম সৎকার করা সম্ভব হয়নি। লাশ পড়ে থাকার স্থানগুলো এখন ঠিক মতো মনে করতে পারছি না। সে সময় লাশ শিয়াল কুকুরে খেয়েছে। আবাদী জমির ওপর হাড়গোড় থাকায়, পরে সেগুলো সরিয়ে ফেলা হয়। এরপর আমাদের বাড়িতে যে সমস্ত সহায়সম্পদ ছিল, তা আর্মির সহযোগীরা লুটপাট করে নিয়ে যায়। হত্যাকাণ্ডের পর শৈলবালার মৃত মাকে রেখে, আহত বাবাকে নিয়ে আমরা কোনমতে বড়কৈর যেতে পেরেছিলাম। সেখানে শরুতীবাবু রাত একটায় মারা যান। নরেন্দ্র নামে এক লোককে সাথে নিয়ে শরুতী বাবুকে নাগরীতেই মাটি দেওয়া হয়। জায়গাটা এখন আর মনে করতে পারব না।

নিলুবালা শীল বলেন, বাড়িয়া গ্রামের হরিন্দ্রচন্দ্র শীলের পরিবারের একমাত্র তিনি ছাড়া সবাইকে গুলি করে হত্যা করে পাকি আর্মি। ওই পরিবারের একমাত্র বেঁচে যাওয়া সদস্য তিনি। তিনিও একই নৌকায় ছিলেন। কিন্তু হানাদারদের এলোপাতাড়ি গুলির মধ্যে পড়েও তিনি ভাগ্যক্রমে বেঁচে যান। পাকিদের গুলিতে তাঁর পরিবারের পাঁচজন নিহত হন। নিলুবালার দুই মাস বয়সী ভাতিজি, বেনু মৃত মায়ের কোলে থেকে পানির মধ্যেই মারা যায়।

বাড়িয়ায় পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর গণহত্যার অন্যতম সাক্ষী শ্রী নিবাস ভৌমিক। ডিগ্রী পাশ করার পর, তিনি সে সময় বাড়িয়া স্কুলে শিক্ষকতা করতেন। বাড়িয়া হত্যাকাণ্ড প্রসঙ্গে তিনি বলেন, তখন বৈশাখ মাস। দুপুর দু'টার দিকে শুনতে পেলাম জয়দেবপুর থেকে পাকি আর্মি গ্রামে হানা দিতে আসছে। এ কথা শোনার পর নারকেল গাছে উঠে গেলাম আমি। দূর থেকে দেখতে পেলাম, খাকি পোশাক পরা পাকি সেনা আসছে। গ্রামের অনেকেই তখন বিলের দিকে ছুটছেন। আমিও গাছ থেকে নেমে দৌড়ে বাড়ি গেলাম। আমার বাবা তখন তুলসীতলায় জল দিচ্ছেন, মা রান্নার কাজে ব্যস্ত। আমার কাছে সংবাদ শুনে, একটা ট্রাংকে করে টাকা-পয়সা নিয়ে মা ছুটলেন। তাঁরা নয়াবাড়ির পূর্ব পাশে অন্ধকার পুকুরের ধারে গিয়ে আশ্রয় নেন।

www.pathagar.com

পুকুরপাড়ে আরও অনেকেই গেলেন। ছোট ভাই অবিনাশ ভৌমিকসহ সবাইকে নিরাপদ দূরত্বে বসিয়ে দিলাম। বাড়ির কুকুরটা কিছুতেই পিছু ছাড়ছিল না আমার। এ সময় মা ছোট ভাই সুখরঞ্জন ভৌমিকের খোঁজ করছিলেন। কৌশলে বাবার কাছে সত্য ঘটনা বলে মাকে সান্ত্বনা দিলেও আমি জানতাম, পালানোর সময় সুখরঞ্জনকে খুঁজে পাওয়া যায়নি।

পুকুর পাড়ে বসেই অবিরাম গুলির আওয়াজ শুনতে পেরেছি। মাঝে মাঝে বিলের মধ্যে আত্মগোপনকারী সাধারণ মানুষের গুলি খাওয়া দেহ শূন্যে লাফিয়ে উঠতে দেখেছি। মুষলধারে বৃষ্টি নেমেছিল সেদিন। রাত সাড়ে আটটার দিকে গোলাগুলি থেমে গেলে, বিজলির আলোর মধ্যে জীবিত ভাই নেপালসহ বিশ-পঁচিশ জন মানুষ দেখতে পাই। সবাই মিলে কামারিয়া যাওয়ায় সিদ্ধান্ত নিই। বৃদ্ধ, মহিলা ও শিশুদের নৌকায় বসিয়ে বয়স্ক পুরুষরা জোঁকের কামড় খেতে খেতে নৌকা ঠেলতে থাকি। পথিমধ্যে আমাদেরকে ডাকাতে আক্রমণ করে। পরে আমাদের দুরবস্থার কথা জেনে ডাকাতরাই তাদের বাড়িতে নিয়ে যায় এবং জামা কাপড় দিয়ে রাতে তাদের বাড়িতেই থাকার ব্যবস্থা করে দেয়।"

যুদ্ধের সেই দিনগুলোতে আতঙ্কগ্রস্ত অসহায় মানুষেরা ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানে গিয়ে আশ্রয় নিয়েছিল। এসব ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানে ঢুকেও হত্যাকাণ্ড ঘটায় বর্বর পাকি বাহিনী। কালিগঞ্জের কয়েকটি এলাকায় খ্রিস্টান ধর্মাবলম্বীদের বসবাস ছিল তুলনামূলকভাবে বেশি। মুক্তিযুদ্ধের সময় রাঙামাটিয়া গ্রামটিতে ব্যাপক নৃশংসতার শিকার হন খ্রিস্টান সম্প্রদায়ের লোকজন। তথ্যানুসন্ধানের প্রথম পর্যায়ে তুমুলিয়া মিশনে যোগাযোগ করা হয়। এই মিশনের বর্তমান ইনচার্জ সিস্টার মিনতি। যুদ্ধের সময় তিনি ছিলেন তৃতীয় শ্রেণীর ছাত্রী। পাকিস্তানি বাহিনীর আক্রমণে তাঁরা বাড়িঘর ছেড়ে নাগরি চার্চে গিয়ে উঠেছিলেন। এর চেয়ে বেশি কিছু তিনি বলতে পারেননি।

তুমুলিয়া মিশনে নার্সের দায়িত্বে রয়েছেন সিস্টার সিসিলিয়া। ময়মনসিংহ জেলার হালুয়াঘাটের মারাখের মেয়ে সিসিলিয়া ১৯৪৩ সাল থেকে সেবার দায়িত্বে নিয়োজিত আছেন। মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে জুলাই মাস পর্যন্ত তিনি একটা মিশনে ছিলেন। সে সময় মিশনের ইনচার্জ ছিলেন ফাদার ন্যাপ (বর্তমানে মৃত)। এ ছাড়া তিনি সিস্টার মেরিলিন (তেজগাঁয় আছেন), ফাদার গ্যাটার্ড (মৃত), ফাদার হোমরিক (বর্তমানে পীরগাছায় আছেন) এর নাম উল্লেখ করেন। এ সময় মিশনে চল্লিশ জনের বেশি সিস্টার ছিলেন বলে তিনি উল্লেখ করেন। তিনি জানান, মিশনের কাছাকাছি খান সেনারা ঘাঁটি গাড়লেও এখানে কোন ক্ষতি সাধনের চেষ্টা করেনি। একদিন আমি মিশনের দরজা দিয়ে উঁকি দিলে পাকিস্তানি বাহিনী আমাকে দেখে ফেলে এবং ধরতে আসে। পরে তৎকালীন চেয়ারম্যান আলাউদ্দিন তাদেরকে নিবৃত্ত করেন।

এই এলাকায় পাকি সেনাদের গুলিতে মারা যান মার্টিনার মা। বান্দাখোলা গ্রামের প্রত্যক্ষদর্শী সুভাষ কস্টা জানিয়েছেন সেই তথ্য। আলফ্রেড কস্টার ছেলে সুভাষ কস্টা বলেন, তখন আমি দশ বারো বছরের কিশোর। সঠিক তারিখ মনে নেই, তবে সেই সময় শালি ধান প্রায় পেকে এসেছিল। তুমুলিয়া মিশন এবং দড়িপাড়া

www.pathagar.com

রেলব্রীজের দু'পাশে দুটো করে আর্মি ক্যাম্প ছিল। সেখানে পাঞ্জাবি ও বেলুচ সৈন্যরা থাকত। একেক ক্যাম্পে ত্রিশ জন সৈন্য, আর এক জন করে মেজর ছিল।

এর মধ্যে হঠাৎ একদিন বিকেলে গ্রামে মিলিটারিদের হামলা শুরু হলে, গ্রামের লোক পালাতে শুরু করেন। অধিকাংশই আশ্রয় নেন ধানের জমিতে। মার্টিনা তাঁর সত্তর বছরের বৃদ্ধা মাকে নিয়ে তখনও সরে পড়তে পারেননি। বাড়ির তালগাছের কাছ থেকে আর্মি ধরে নিয়ে যায় মা ও মেয়েকে। সন্ধ্যায় ক্যাম্পে তাঁদেরকে গুলি করা হয়। ঘটনাস্থলেই মার্টিনার মা মারা যান। মার্টিনা হাতে শাড়ি পেঁচিয়ে গুলির ক্ষত স্থান ঢেকে পালিয়ে আসেন। তাঁকে তখন নাগরির পাঞ্জুরা হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। মিলিটারিদের ভয়ে ক্যাম্পে গিয়ে মার্টিনার মায়ের মরদেহ সংগ্রহ করতে পারেনি তারা। পরে সেখানে থেকে মাথার খুলি, হাড়গোড় সংগ্রহ করে সমাহিত করা হয়। মার্টিনা এখনও জীবিত আছেন, তবে গ্রামে থাকেন না।

রাঙামাটিয়া: কালিগঞ্জের যে এলাকাটিতে খ্রিস্টান সম্প্রদায়ের মধ্যে সবচেয়ে মর্মান্তিক হত্যাকাণ্ডের ঘটনা ঘটেছিল, সেটার নাম রাঙামাটিয়া। ২ সেপ্টেম্বর ২০০০ইং তারিখে রাঙামাটিয়া গিয়ে স্থানীয় খ্রিস্টান সমবায় সমিতি লিমিটেডের অফিসে মুক্তিযোদ্ধাসহ কয়েকজন প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণ সংগ্রহ করা হয়। এখানে আমাদের প্রতিনিধির সাথে যাঁদের কথা হয়, তারা হলেন: সুশান্ত টমাস রিবেরু, রবি রিবেরু, যোসেফ বিভাস গোমেজ, জন যোসেফ কস্টা, অজয় অগাস্টিন ডি কস্টা।

তাঁরা বলেন, নভেম্বরের আগ পর্যন্ত পাকি সেনাদের আনাগোনা তেমন ছিল না। রবি রিবেরু জানান, নভেম্বরের চব্বিশ তারিখে ঢাকা থেকে ট্রেনে করে পাকি আর্মি এখানে আসতে শুরু করে। এই সংবাদ পেয়ে এন্ড্রু ডি কস্টার আহ্বানে এখানে আসেন শান্ত রোজারিও, সুনীল, আই ডি কস্টাসহ আরও অনেকে। এসে তাঁরা আশকোনা বাড়ি রেল ব্রিজ ভেঙে ফেলেন। পরদিন পঁচিশ তারিখ একটা মালগাড়ি বোঝাই করে, পাকি সেনারা ব্রিজ ঠিক করার জন্য এখানে আসে। ফিরে যাওয়ার সময় মুক্তিযোদ্ধারা হামলা করলে তারা গ্রামের দিকে ফিরে যায়। তখন আড়িখোলা স্টেশন, তুমুলিয়া মিশন, কালিগঞ্জ মিলে প্রভৃতি এলাকায় আর্মির ঘাঁটি ছিল। এ সময় আর্মিকে গ্রামে ঢুকতে না দেওয়ার জন্য হাজার হাজার মানুষ রেললাইন উপড়ে ফেলতে শুরু করে। তখন মালগাড়ি ও তিনটে হেলিকপ্টার থেকে গুলি বর্ষণ শুরু হলে জনতা ছত্রভঙ্গ হয়ে যায়। এই অবস্থায় দুপুরের পর প্রায় শ' তিনেক পাকি সৈন্য ঢুকে পড়ে। গ্রামের লোকজন তখন আতঙ্কিত অবস্থায় পালাতে শুরু করেন। পাকিস্তানিরা ঘরবাড়িতে আগুন দিতে দিতে এগুতে থাকে। মাঝপথে গুলি করে হত্যা করে গেদু কস্টা ও পিটার ডি কস্টাকে। ছোট সাতানীপাড়ার খাকুর ভিটার কাছে আশ্রয় নিয়েছিলেন দশ এগারো জন নারী পুরুষ। এঁদেরকে এক সারিতে দাঁড় করিয়ে গুলি করে হত্যা করা হয়। গুলিতে আহত অবস্থায় পানিতে পড়ে যান অনেকে। ঊষা মারিয়া কস্টা ছিলেন এঁদের একজন।

www.pathagar.com

রাঙামাটিয়া প্রাইমারি স্কুলের শিক্ষিকা উষা মারিয়া কস্টা জানান, তখন বিকেল পাঁচটা। সবাই প্রাণভয়ে ক্ষেতের আলের পাশে লুকিয়ে আছি। এ সময় সারু নামের এক ধান কুড়ানি মহিলা আমাদেরকে দেখে ফেলে। সবাই সারুকে আমাদের সাথে লুকাতে বললে, সে সবাইকে অবজ্ঞা করে গ্রামে ফিরে যায়। কিছুক্ষণ পর মিলিটারিসহ ঐ মহিলা ফিরে আসে। এরপর পাকি আর্মি প্রথমেই সারুকে গুলি করে এবং অন্যদেরকে লাইন করে দাঁড়াতে বলে। এরপর আমাদের গুলি করলে সবাই পানিতে পড়ে যাই। আমি উরুতে এবং আমার বোন রেণু বাম বাহুতে গুলি লেগে আহত হন। ঘটনাস্থলে অনিল ডি কস্টা শহীদ হন।

প্রত্যক্ষদর্শী এবং গ্রামবাসীদের বক্তব্য অনুযায়ী পাকি সেনাদের হামলায় নিহতদের মধ্যে প্রাথমিকভাবে যাঁদের নাম সংগ্রহ করা হয়, তাঁরা হলেন- পল রড্রিক্স, কেতু রড্রিক্স, মার্থা কস্টা (স্বামী-লুকাস কস্টা), ফেলু কস্টা (পিতা-বিলু কস্টা), মুক্তিযোদ্ধা অনিল ডি কস্টা (পিতা-মনাই কস্টা), মোরি জোসিনতা রড্রিক্স ও ডা. পিটার। এই এলাকায় হত্যাকাণ্ডের শিকার হয়েছিলেন নিরপরাধ সাধারণ মানুষ, যাঁরা অধিকাংশই বয়স্ক ছিলেন। পাকিস্তানিরা প্রার্থনারত অবস্থায় গুলি করে হত্যা করে গেদু কস্টাকে, ঘর থেকে উঁকি দেবার অপরাধে হত্যা করে অসুস্থ পিটার ডি কস্টাকে। ঘরে আগুন লাগিয়ে পুড়িয়ে মারে এক বৃদ্ধকে। এ যেন কেবল অস্ত্র ব্যবহার করার মাধ্যমে আনন্দ লাভের পাশবিক প্রয়াস। স্থানীয় খ্রিস্টান কবরস্থানে এই এলাকার মুক্তিযুদ্ধে নিহতদের সমাহিত করা হয়।

আসামী ঃ ক্যাপ্টেন আমানুল্লাহ, ক্যাপ্টেন ইয়াসিন, সুবেদার মোশতাক।

অপরাধের ধরন ঃ গণহত্যা, জাতিগত নিধন, ধর্ষণ, লুটপাট, অগ্নিসংযোগ।

সাক্ষী ঃ আবু মোহাম্মদ এনায়েত করিম (যুদ্ধকালীন কাদেরিয়া বাহিনীর প্রশাসক), মুক্তিযোদ্ধা আজিজুল হক, প্রভাষক বজলুর রশিদ খান চুন্নু, সাধনচন্দ্র ভট্টাচার্য,গোপালচন্দ্র বণিক, হরিপদ সাহা, গোপাল চন্দ্র বৈষ্ণব, ভানু বেগম, নুরজাহান বেগম, শবজান এবং আরও অনেকে।

ঘটনাকালঃ একাত্তরের এপ্রিল থেকে মুক্তিযুদ্ধের শেষ সময় পর্যন্ত।

ঘটনাস্থল ঃ টাঙ্গাইল, মির্জাপুর, মধুপুর, ভূয়াপুর, ছাব্বিশা, কালামাঝি ও জেলার অন্যান্য স্থান

সূত্রঃ যুদ্ধাপরাধ গণহত্যা ও বিচারের অন্বেষণ এবং WCFFC গবেষণা।

টাঙ্গাইলে পাকিস্তানি বাহিনী ব্যাপক হত্যা, ধ্বংসযজ্ঞ ও নারী নির্যাতন চালায়। এ সমস্ত ঘটনার জন্য দায়ী যে সমস্ত পাকিস্তানি আর্মি অফিসারের নাম পাওয়া গেছে, তার মধ্যে ক্যাপ্টেন আমানুল্লাহ, ক্যাপ্টেন ইয়াসিন ও সুবেদার মোশতাকের নাম উল্লেখযোগ্য। তাদের অপকর্মের দলিল হিসাবে টাঙ্গাইল শহর ও জেলার বিভিন্ন থানায় অসংখ্য গণকবর, বধ্যভূমি ও নির্যাতন কেন্দ্র এখনও বিদম্যান। টাঙ্গাইল

www.pathagar.com

শহরের পানির ট্যাঙ্কির কাছে ডি-কোয়ার্টারের পেছনে, চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারীদের কোয়ার্টারের সামনের গর্ত খুঁড়ে অনেক হাড়গোড় ও কঙ্কাল পাওয়া যায়। জেলার বিভিন্ন এলাকা থেকে মানুষজন ধরে এনে এখানে হত্যা করে মাটিচাপা দেওয়া হয়। এ ছাড়া মির্জাপুর, মধুপুরের বংশাই নদীর তীর, ভুয়াপুরের ছাব্বিশা, কালামাঝি ও অন্যান্য স্থানে পাকি বাহিনী ব্যাপক গণহত্যা, নির্যাতন ও ধর্ষণযজ্ঞ চালায়।

সাতই মে ১৯৭১, এদিন ছিল মির্জাপুর থানা সদরের হাটবার। হিন্দু সম্প্রদায়ভুক্ত মির্জাপুরের বাসিন্দারা অধিকাংশই ছিলেন ব্যবসায়ী। কেনাবেচার জন্য সেদিন অনেকেই হাটে এসেছিলেন। লৌহজং নদীর উপর নির্মিত বাঁশের সাঁকো পার হয়ে, পাকি বাহিনী তিন ভাগে বিভক্ত হয়ে মির্জাপুর ঘিরে ফেলে। প্রথমেই তারা কমলকৃষ্ণ সাহাকে গুলি করে হত্যা করে। এরপর মধুসূদন সাহা ও তাঁর ছেলে সুভাষচন্দ্র সাহাকে হত্যা করে। দুই ঘন্টা ধরে তারা এই হত্যাযজ্ঞ চালায়। এই হামলায় সাতাশ জন নিরপরাধ গ্রামবাসী প্রাণ হারান। নিহতরা হলেন- গদাধর সাহা, নিতাই পদ শীল, যুগল চন্দ্র বণিক, গোপাল চন্দ্র বণিক, ধীরেন্দ্র কুমার সাহা, নারায়ণচন্দ্র সাহা, উমাচরণ সাহা, রঞ্জিত কুমার সাহা, মঙ্গল চন্দ্র সাহা, সাধু মালী উমেশ চন্দ্র পাল, নগিনা ভাস্কর, গণেশ চন্দ্র মণ্ডল, স্বপন কুমার সাহা, আনন্দ সাহা, ভেকল চন্দ্র মণ্ডল, ভোলানাথ বণিক, সুরতী মোহন বণিক, ভাদুরী সূত্রধর, গণেশচন্দ্র নমদাস প্রমুখ। তাছাড়া ওই দিন রাতেই কুমুদিনী হাসপাতাল, দেবেন্দ্র কলেজ ও কুমুদিনী কলেজের প্রতিষ্ঠাতা রণদা প্রসাদ সাহা ও তাঁর পুত্র ভবানী প্রসাদ সাহাকে নারায়ণগঞ্জের বাসা থেকে ধরে এনে, ফতুল্লার বাসার কাছে বুড়িগঙ্গার তীরে হত্যা করে বর্বর পাকি সেনারা।

রানী ভবানী পাইলট উচ্চ বিদ্যালয়ের শিক্ষক, গোপাল চন্দ্র বৈষ্ণব নিজের চোখে দেখেছেন বংশাই নদীর তীরে পাকি বাহিনীর গণহত্যার দৃশ্য। একাত্তরে তাঁর বয়স ছিল তেইশ চব্বিশ বছর। তিনি বলেন, তেরোই এপ্রিল মঙ্গলবার ছিল মধুপুরের হাটবার। সেদিনই প্রথম মধুপুরে আসে আর্মি। বাজার সংলগ্ন একটি ঘরে ছিলেন তিনি। সেখান থেকেই পাকি সেনাদের গাড়ির বহর দেখতে পান। বর্তমান ইউএনও অফিস ছিল তাদের মূল ঘাঁটি। থানায়ও ক্যাম্প করেছিল তারা। তবে সেটা মূলত টর্চার সেল ছিল। গোপাল চন্দ্র বৈষ্ণব জানান, জামালপুর, শেরপুর, নালিতাবাড়ি, কালিহাতি থেকে মানুষদের এখানে ধরে আনত পাকিস্তানি আর্মি। সেদিন এক শ' চুয়ান্নটি গুলির শব্দ শুনেছিলেন তিনি। পরে বংশাই নদীর পাড়ে গিয়ে দেখেন, রক্তে লাল হয়ে গেছে নদী। নদীর স্রোতে ভেসে গেছে অনেক লাশ। মধুপুরে দশ বারো জন নারীর ওপর পাকিস্তানি আর্মি পাশবিক নির্যাতন চালায় বলে তিনি জানান। এর মধ্যে আট নয় জন মহিলার যুদ্ধের পর আর কোন হদিস পাওয়া যায়নি। তিনি আরও জানান, মধুপুরে পাকিবাহিনীর **সুবেদার মুশতাকের** অত্যাচার আজও ভোলেনি কেউ। ঘোড়ায় চড়ে সে ঘুরে বেড়াত বিভিন্ন এলাকায়। কাকে মারতে হবে, কার মেয়েকে তুলে আনতে হবে এ সব নির্দেশ আসত তার কাছ থেকে।

www.pathagar.com

পাকিস্তানি বাহিনী একাত্তরের সতেরোই নভেম্বর ভুয়াপুরের ছাব্বিশা গ্রামের নিরীহ জনসাধারণের ওপর ব্যাপক গণহত্যা ও ধর্ষণযজ্ঞ চালায়। কয়েকজন প্রত্যক্ষদর্শী ও ধর্ষিতার জবানবন্দী এখানে উল্লেখ করা হল। স্থানীয় মুক্তিযোদ্ধা আজিজুল হক জানান, সেদিন পাঞ্জাব ও বেলুচ রেজিমেন্টের সদ্যসরা আক্রমণ করে। এর মধ্যে তিনি শু্ **ক্যাপ্টেন ইয়াসিন** নামে একজনের কথা স্মরণ করতে পেরেছেন। এদিন পাকিবাহিনী তাদের গ্রাম জ্বালিয়ে ছারখার করে দেয় এবং বহু নারীর ওপর তারা নির্মম পাশবিক নির্যাতন চালায়।

ছাব্বিশা গ্রামের বৃদ্ধা মরিয়ম বেগম (৭০), এদিনের হত্যাযজ্ঞে হারিয়েছেন তাঁর স্বামী ইসমাইল হোসেন, দশ বারো বছর বয়সী মেয়ে ও নয় বছরের নাতিকে। তিনি জানান, ঘরের দরজায় দাঁড়িয়ে গুলি করে পাকি সেনারা। এরপর ঘরে আগুন লাগিয়ে দিলে, ঘরের মধ্যেই পুড়ে মরে তাঁর মেয়ে আর নাতি। তিনি বলেন, শোকে যে কাঁদব তারও উপায় ছিল না। কাঁদতেও দেয়নি পাকি সেনারা।

মসিরন বেগম (৫০), স্বামীর প্রাণ বাঁচাবার জন্য হাতে পায়ে ধরে অনেক অনুনয় করেছিলেন পাকি সেনাদের। কিন্তু তাঁর অনুরোধ বর্বর পাকিস্তানি সেনাদের মন গলাতে পারেনি। তাঁর স্বামী মোমতাজ আলী তখন ঘরেই ছিলেন। তাঁকে টেনে বের করে গুলি করে হত্যা করে তারা। এরপর পাকি আর্মি মৃতদেহের ওপর পাউডার ছিটিয়ে আগুন ধরিয়ে দেয়।

এসএম আনিসুর রহমান ঘটনার সময় ধানক্ষেতে লুকিয়েছিলেন। সেখান থেকেই দেখতে পান মুহূর্তের মধ্যে তছনছ হয়ে যাচ্ছে তাঁর চির চেনা গ্রামটি। গুলি যেমন চলছে নির্বিচারে, তেমনি তার সাথে চলছে বাড়িঘর পোড়ানো।

মোঃ সেকেন্দার আলী (৭০), নিজেকে আড়াল করে রেখেছিলেন কচুরিপানার মধ্যে। সেখান থেকে প্রত্যক্ষ করেন পাকি বাহিনীর তাণ্ডবলীলা। তিনি গৃহবধূদের ধরে নিয়ে যেতে দেখেছেন। এর মধ্যে হায়দারের বউ বলে একজনের কথা মনে করতে পারেন তিনি।

মোঃ আবদুল কুদ্দুস মিয়া তখন ষষ্ঠ শ্রেণীর ছাত্র। তাঁর বাবা তাঁকে তার মা ও বিশ দিন বয়সী ছোট্ট বোনকে নিয়ে দক্ষিণে খড়গ গ্রামের দিকে চলে যেতে বলেন। মা বোন নিয়ে গ্রাম ছেড়ে পালানোর ঘন্টা দুয়েক পর খবর পান, তার বাবাসহ গ্রামের অনেককে হত্যা করা হয়েছে। পাকি বাহিনী গ্রাম ছেড়ে যাওয়ার পর ফিরে আসেন কুদ্দুস। এসে দেখেন বাড়ির উঠানে রক্তাক্ত অবস্থায় পড়ে আছেন তাঁর বাবা। বাবার শরীরে দুটো গুলির আঘাতের চিহ্ন দেখতে পান।

গৃহবধূ ভানু বেগম (৫০), পাকি বাহিনীর পাশবিক অত্যাচারের শিকার হয়েছিলেন । তিনি বলেন, ঘন সবুজ পোশাক পরা আট নয়জন পাকি সেনা তাঁকে ঘিরে ধরে। বাড়ির ভেতরেই গুলি করে হত্যা করে তাঁর ভাসুরকে। তাঁর স্বামী ইয়াকুব আলী তখন সেখানে ছিলেন না। পাকি আর্মি তাঁর গায়ে হাত দিলে তিনি 'বাবা সোনা, গতরে হাত দিয়েন না' বলে অনেক অনুনয় করেছিলেন। কিন্তু তাঁর সেই অনুনয় মন গলাতে

www.pathagar.com

পারেনি পাকি সেনাদের। তারা তখন বাড়িতে আগুন লাগিয়ে দেয়। ভয় দেখায় ছেলেকে আগুনে ফেলে দেওয়ার। অবশেষে নিজেকে পাকি বাহিনীর বিকৃত লালসার কাছে সমর্পণ করতে বাধ্য হন ভানু বেগম। যাওয়ার সময় তারা কানের দুল, গলার মালাটা পর্যন্ত ছিনিয়ে নিয়ে যায় এবং তাঁকে ছুঁড়ে ফেলে দেয় আগুনে। আজও সে পোড়া দাগ রয়েছে তার হাত, পা ও পিঠে। ভানু বেগম জানান, রাজাকার আনিস তাদের সবকিছু দেখিয়ে নিয়ে এসেছিল।

আবদুল মান্নান জানান তাঁর মা সজিরন বেগমের অত্যাচারিত হওয়ার সেই দুঃখজনক ঘটনা। সে সময় পনেরো বছরের কিশোর তিনি। এদিন বাড়িতে তাঁর বাবা ওমর আলী কোরআন শরীফ পড়ছিলেন। রাজাকারদের সঙ্গে একদল পাকি সেনা তাদের বাড়িতে এসে ঢুকে বারান্দায় কোরআন শরীফ পাঠরত অবস্থায় তাঁর বাবাকে গুলি করে হত্যা করে। এ সময় পাকি বাহিনীর গুলির আঘাতে তাঁর চাচা দরজার কাছে মাটিতে পড়ে যান। ঘরে মেয়েরা ছিল, পাকি বাহিনী তাদেরকে বের করে দিয়ে ঘরে আগুন লাগিয়ে দেয়। সেই আগুনে পুড়ে যায় তাঁর বাবার মৃতদেহ। চার ভাই তিন বোন ছিল মান্নানের। মার গর্ভে তখন সন্তান ছিল। সেই অবস্থায় তাঁকে পাশবিক নির্যাতন করে পাকি সেনারা। শুধু তাই নয়, ধর্ষণের পর আগুনের মধ্যে ধাক্কা মেরে ফেলে দিয়ে, পুড়িয়ে মারে তাঁর মাকে। কাঁদবার সময়ও পাননি তাঁরা। দাদীর হাত ধরে ধানক্ষেতের ভেতর গিয়ে লুকিয়েছিলেন তিনি, ভাইবোনদের সাথে।

শবজান (৭৫), সেদিনের হামলায় হারান স্বামী সেকান্দার আলী এবং পুত্র রমজান আলীকে। বেলা বারোটার দিকে ষাট সত্তর জন পাকি সেনা তাঁদের বাড়িতে এসে ঢোকে। প্রথমে তাঁদের ধরে কিল, ঘুষি, লাথি মেরে ফেলে দিয়ে পরে গুলি চালায়। পরে আবার বিশ পঁচিশ জনের অন্য একটি দল এসে বাড়িতে আগুন লাগিয়ে দেয়। চোখের সামনে স্বামী আর পুত্রকে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়তে দেখে মানসিকভাবে অসুস্থ হয়ে পড়েন শবজান।

নূরজাহান বেগম হারিয়েছেন তাঁর স্বামী দানেশ আলী, এক ছেলে ও দেবরকে। পাকিরা চোখের সামনে গুলি করে হত্যা করে তাদেরকে। ছেলের বিয়ে দিয়েছিলেন বছর খানেক আগে। ওই পুত্রবধূ রওশন আরাকে নিয়ে কাড়াকাড়ি পড়ে যায় পাকি সেনাদের মধ্যে। কিছুতেই তাদের হাত থেকে রেহাই পায়নি মেয়েটি। নূরজাহান জানান, তখন আমি মরা স্বামী-সন্তান সামলাব, না বউকে বাঁচাব, তার কূল কিনারা পাচ্ছিলাম না। ওদিকে গুলিবিদ্ধ হয়ে মারা যাচ্ছিল ছোট ছেলে নিজামুদ্দিন।

নদীর ভাঙনে সব হারিয়ে ছাব্বিশা গ্রামে ভাই সেকান্দার আলীর বাড়িতে এসে উঠেছিলেন সজিরন। স্বামী কোরবান আলীসহ ছোট ছোট বাচ্চাদের নিয়ে ছাব্বিশা গ্রামে আশ্রয় নিয়েছিলেন বাঁচার আশায়। কিন্তু এখানে এসেও বাঁচতে পারেননি তাঁরা। পাকি সেনাদের গুলিতে নিহত হলেন সজিরনের দুই ভাতিজা। স্বামীর হাত ধরে দাঁড়িয়েছিলেন সজিরন। স্বামীর প্রাণ ভিক্ষা চেয়েছেন। কত হাতে পায়ে পড়েছেন খান সেনাদের, কিন্তু ওরা কানেও নেয়নি তাঁর কথা। স্বামী কোরবান আলীকে গুলি করে, পাকি হানাদাররা সজিরনের বেঁচে থাকার শেষ অবলম্বনটুকুও ধ্বংস করে দেয়।

www.pathagar.com

সাহেবানু তাঁর মা আলোকজানের সঙ্গে লুকিয়েছিলেন দক্ষিণ পাড়ায়। বিশ পঁচিশ জন মহিলা একটি ঘরে লুকিয়েছিল। পাকিস্তানিরা সেখানে গিয়ে কয়েকজনকে গুলি করে হত্যা করে। মেয়েদেরকে তারা ঘর থেকে বেরিয়ে আসতে বলে। এরপর পাকি আর্মির ভয়ে অনেকেই শামসু মাতব্বরের বাড়িতে গিয়ে আশ্রয় নেন। সেখানেই সাহেবানু দেখেন, হায়দারের বউকে ঘরে নিয়ে খিল আটকে দিল পাকিস্তানি সৈন্যরা। নির্মম ধর্ষণে জর্জরিত করেছিল তাকে। আলোকজান মেয়েকে নিয়ে মানসম্মানের ভয়ে ছুটে বেড়াচ্ছিলেন। গ্রামের এক বাড়ির ছেলে পাকিস্তানে চাকরি করত। তার কথা শুনে সে বাড়িতে অত্যাচার হবে না, ভেবে ওই বাড়িতে আশ্রয় নিয়েছিলেন। কিন্তু সে বাড়িতেও সাহেবানু দেখেছেন, হাজেরা নামের একটি মেয়েকে নিয়ে পাকি বাহিনীর পৈশাচিক ধর্ষণ উল্লাস। এরপর তারা মারফতের বউয়ের ওপর পাশবিক নির্যাতন অত্যাচার চালায়। আট নয় বছরের সাহেবানুর স্মৃতিতে এখনও জ্বলজ্বল করছে নিরপরাধ মেয়েদের সেই সব আর্তচিৎকার।

ছাব্বিশার তোফাজ্জল হোসেন, সে সময় ছিলেন কিশোর। পাকি বাহিনীর পেছন পেছন ঘুরছিলেন কৌতূহলে। কিন্তু এই কৌতূহল তাঁকে মারাত্মক সব অভিজ্ঞতার মুখোমুখি দাঁড় করিয়েছিল। পাকি বাহিনী একের পর এক অত্যাচার করে চলেছে। তাঁর চোখের সামনেই মুক্তিযোদ্ধাদের বাবা মায়ের ওপর নির্মম অত্যাচার, বাড়িঘরে আগুন দেওয়া, হত্যাযজ্ঞ চলতে লাগল। জব্বার মুনশীর চারটি ছেলেকে, মরতে দেখলেন পাকি সেনাদের গুলিতে। এক ছেলে ‘পাকিস্তান জিন্দাবাদ’ বলে নিশান উড়িয়ে ঘর থেকে বের হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে, তাঁকে লাথি মেরে পানিতে ফেলে দিয়ে মাথায় গুলি করে। এভাবে মারা যান চার ভাই ইউসুফ, মোতালেব, শফিকুল ও আয়নাল। কোরবান আর সেকান্দারকেও হত্যা করতে দেখেছেন তোফাজ্জল। এরপর পাকি বাহিনী একে একে হত্যা করে আবুল, হায়দার, কাশেম, সিরাজ আলী মুন্সী, তাঁর মা, মন্তাজসহ আরও একজনকে। গ্রামের সবচেয়ে তাগড়া পুরুষ মনির উদ্দীনকেও হত্যা করে পাকি সেনারা। হত্যার পর অনেককে বাড়িঘরের জ্বলন্ত আগুনের মধ্যে ফেলে দিতে দেখেছেন। বাড়ি ফিরে এসে তোফাজ্জল দেখেন, তাঁর বাবা মাহমুদ আলী শেখ ও মা শহীদ হয়েছেন পাকি বাহিনীর হাতে।

ছাব্বিশায় সেদিনের হামলায় হবিরন বেগম (৫০), হারান তাঁর স্বামী ইয়াকুব আলীকে। ঘর থেকেই তিনি দেখতে পান বন্দুক দিয়ে তাঁকে বাড়ি দিচ্ছে এক খানসেনা, এরপর তার কপালে গুলি করে। পরে বাড়িতে আগুন লাগিয়ে দিলে, হবিরন বেগম অনেক কষ্টে টেনে টেনে স্বামীর লাশটি সরিয়ে এনেছিলেন। অবশেষে রাতে বাড়ির সামনেই কবর দেন তাঁকে।

এভাবেই ক্যাপ্টেন আমানুল্লাহ, ক্যাপ্টেন ইয়াসিন, সুবেদার মোশতাক ও নাম না জানা অন্যান্য পাকি সেনা বৃহত্তর টাঙ্গাইল জেলায় গণহত্যা, ধর্ষণ, অগ্নিসংযোগ এবং লুটপাটের তাণ্ডব চালিয়েছে একাত্তরে। উপর্যুক্ত ঘটনাগুলোর সাথে তারা সরাসরি জড়িত।

www.pathagar.com

আসামী ঃ ব্রিগেডিয়ার আব্দুল কাদের, মেজর আইয়ুব, মেজর সিদ্দিক, মেজর সুলতান, মেজর রিয়াজ, ক্যাপ্টেন খালেক, ক্যাপ্টেন আব্দুর রহিম, ক্যাপ্টেন আঞ্জু, হাবিলদার আলাউদ্দিন, হাবিলদার সুফি, রমজান ও সাদেক (র‍্যাঙ্ক অজ্ঞাত)।

অপরাধের ধরন ঃ গণহত্যা, জাতিগত নিধন, ধর্ষণ, লুটপাট, অগ্নিসংযোগ।

সাক্ষী ঃ মোঃ হায়দার রহমান তালুকদার, আব্দুল হাই তালুকদার, রিয়াজ উদ্দিন তালুকদার, মোঃ আব্দুল করিম, মানিক চন্দ্র দাস, আতিকুল ইসলাম, শেখ আহমেদ, আব্দুল রশিদ, মোসাম্মৎ রমিসা, বিমল পাল, অধ্যক্ষ আমীর আহমেদ চৌধুরী।

ঘটনাকালঃ একাত্তরের এপ্রিল মাস থেকে ডিসেম্বর পর্যন্ত।

ঘটনাস্থল ঃ ময়মনসিংহ জেলা।

সূত্রঃ যুদ্ধাপরাধ গণহত্যা ও বিচারের অন্বেষণ এবং WCFFC গবেষণা।

এসব পাকি আর্মি ও তাদের সহযোগীরা ময়মনসিংহ শহর ও শহরতলীসহ জেলার সাতটি থানায় ব্যাপক গণহত্যা ও ধ্বংসযজ্ঞ চালায়। এই জেলায় অসংখ্য বধ্যভূমি ও গণকবর রয়েছে। শহরের পাঁচটি বধ্যভূমির একটি রয়েছে ময়মনসিংহ শহরের বড় বাজারের কালীবাড়িতে। কালীবাড়ির একটি কক্ষে পাওয়া যায় চওড়া দু'টি কাঠের টুকরা, যাতে ছিল চাপ চাপ রক্তের ছোপ। ধারণা করা হয়, এই কাঠের টুকরার ওপর রেখেই হতভাগ্য বাঙালিদের জবাই করে হত্যা করা হত। কালীবাড়ির পাশের পুকুরে পাওয়া যায় অসংখ্য নরকঙ্কাল। কালীবাড়ির পাশের দু'টি কুয়ো ছিল মানুষের লাশে ভরা। এই দু'টি কুয়োতে নরকঙ্কাল, গলিত লাশ, ছিন্ন মস্তক, ছিন্ন দেহ, জমাট বাঁধা রক্ত দুর্গন্ধে একাকার হয়ে থাকায় কত মানুষকে যে, এখানে হত্যা করা হয়েছে, তা সঠিকভাবে নিরূপণ করা সম্ভব হয়নি। তবে পাঁচ শ'র বেশি লোককে এখানে হত্যা করা হয় বলে প্রত্যক্ষদর্শীরা অনুমান করেন।

ময়মনসিংহ ডাকবাংলো, নিউমার্কেট, কেওয়াটখালী, রেলওয়ে কলোনির কাছে ও নদীর ধারে ছিল বধ্যভূমি। এসব বধ্যভূমি থেকে সহস্রাধিক মানুষের কঙ্কাল উদ্ধার করা হয়। শহরের সাহেব কোয়ার্টারের একটি পুকুর থেকে বাক্সভর্তি নরকঙ্কাল পাওয়া যায়। শহরের অদূরে কাচারি ঘাটেও ছিল বধ্যভূমি। এখানে যেসব বাঙালিকে হত্যা করা হয়, তাঁদের অধিকাংশকেই নদীতে ফেলে দেওয়া হয়। ডাকবাংলোর পাশে নদীর ধারেও পাওয়া যায় অনেক নরকঙ্কাল ও মাথার খুলি। এই ডাকবাংলোয় ছিল আলবদর বাহিনীর ক্যাম্প।

বাহাত্তর সালে 'দৈনিক বাংলার' প্রতিনিধি এক রিপোর্টে বলেন, ব্রহ্মপুত্র নদের দু'পারে অসংখ্য গর্ত ও নরকঙ্কাল পড়ে ছিল। নরকঙ্কালগুলোর উপরে ও পাশে পড়েছিল চট ও কাপড়ের টুকরো টুকরো অংশ। জানা যায়, বিভিন্ন এলাকা থেকে লোকজনকে ধরে নিয়ে নদীর তীরে গুলি করে হত্যা করা হত। পরে ওই লাশের কিছু অংশ মাটিচাপা দেওয়া হত, আর কিছু ফেলে দেওয়া হত নদীতে। রাম অমৃতগঞ্জের ফজর ও চর আলমগীরের মফির নামক দু'জন বাসিন্দা জানান, আট মাসব্যাপী তাঁরা

www.pathagar.com

ব্রহ্মপুত্র নদে গলাকাটা ও হাত পা বাঁধা অবস্থায় অসংখ্য লাশ ভেসে যেতে দেখেছেন। এ ছাড়া পাকি সেনারা ময়মনসিংহের সরচা, ক্ষীরা ও সতুয়া নদীতে কত বাঙালিকে যে হত্যা করে ভাসিয়ে দিয়েছে, তার হদিস হয়তো কোনকালেই পাওয়া যাবে না।

একাত্তর সনের আগস্ট মাসের এক রাতে তারাইকান্দি গ্রামে হানাদার বাহিনীর সাথে মুক্তিযোদ্ধাদের এক সম্মুখযুদ্ধ সংঘটিত হয়। গোলাবারুদের অভাবে মুক্তিযোদ্ধারা পেছনে ফিরতে বাধ্য হলে পাকি আর্মি গ্রামের অধিবাসীদের ওপর চালায় হত্যা ও ধ্বংসযজ্ঞ। পাকি বাহিনী অগ্নিসংযোগ করে পুরো গ্রামটি পুড়িয়ে দেয়। এরপর তারা ওই গ্রামের চৌদ্দ জন নারী পুরুষসহ নাম ঠিকানাবিহীন পঞ্চাশ জন মানুষকে ঘাঘট নদীর তীরে নিয়ে হত্যা করে। প্রত্যক্ষদর্শী ওই আলাউদ্দিন কান্নাজড়িত কণ্ঠে বলেন, "গোলাগুলির ভয়ে দৌড়ে গ্রাম থেকে পালিয়ে যাই। দু'দিন পরে ফিরে এসে ঘাঘট নদীর পাড়ে দেখি লাশ আর লাশ। আমার স্ত্রী রহিমাও হাতে রশি বাঁধা অবস্থায় গুলিবিদ্ধ হয়ে মরে পড়েছিল।" শহীদ হওয়া কয়েক জনের নাম-নূর হোসেন আকন্দ, তাঁর দুই স্ত্রী, মমরুজ আলী, শমশের আলী, ইছহাক আলী প্রমুখ। গৌরীপুরের প্রাথমিক বিদ্যালয়ের বৃদ্ধ শিক্ষক ব্রজেন্দ্র বিশ্বাসকেও পাকিরা হত্যা করে। তেইশে মে হানাদার বাহিনী যখন গৌরীপুরে প্রবেশ করে, তখন ব্রজেন্দ্র বিশ্বাস তাদের সামনে পড়ে যান। এরপর সেখান থেকে কালীপুর মোড়ে নিয়ে হানাদার বাহিনী তাঁকে গুলি করে হত্যা করে।

নান্দাইল থানা ছিল পাকি বাহিনীর শক্ত ঘাঁটি। সতেরোই নভেম্বর মুক্তিযোদ্ধাদের সহযোগিতা করায় নান্দাইল থানার বিভিন্ন ইউনিয়নের বহু ব্যক্তিকে বাড়ি থেকে ধরে নিয়ে নির্মমভাবে হত্যা করা হয়। নান্দাইলে যাদেরকে হত্যা করা হয়, তারা হলেন, শামসুল হক, গ্রাম-রসুলপুর; রইসউদ্দিন ভূঁইয়া, গ্রাম- চারিআনিপাড়া; মিয়া চান মিয়া;, গ্রাম-চারিআনিপাড়া; ছোবেদ আলী, গ্রাম-চারিআনিপাড়া; হাবিবুর রহমান, গ্রাম-ভাটিসাভার; আবুল হোসেন, গ্রাম-চরভেলামারী; নজরুল ইসলাম, গ্রাম-চরউত্তরবন্দ; মহিউদ্দিন, গ্রাম-শেসগিয়ানপুর; খগেনচন্দ্র মজুমদার, গ্রাম-খামারগাঁও; হীরেন্দ্র চন্দ্র মজুমদার, গ্রাম-খামারগাঁও; উপেন্দ্র চন্দ্র মজুমদার, গ্রাম-খামারগাঁও; সতীশচন্দ্র দেব, গ্রাম-মুসল্লি; দিগেন্দ্র চন্দ্র বিশ্বাস, গ্রাম-মুসল্লি; জিল্লুর বারী, গ্রাম-সোরাগোলা; অনিলচন্দ্র আচার্য, গ্রাম-আচারগাঁও; মুজিবুর রহমান, গ্রাম-হাওলাপাড়া; আতাউর রহমান, গ্রাম-গারুয়া; সাধু ভূঁইয়া, গ্রাম-কাশীনগর; খগেন চন্দ্র ভৌমিক, গ্রাম-মহব্বতনগর; রিয়াজউদ্দিন খান, গ্রাম-সিংরইল;.সরাফউদ্দিন হোসেন, গ্রাম-জাহাঙ্গীরপুর; ফজলুর রহমান, গ্রাম-গয়েশপুর; বাবুল, গ্রাম-কান্দাপাড়া; মনিরউদ্দিন মুন্সী, গ্রাম-রাজগাতি; রেজাউল করিম ফরাজী, গ্রাম-নান্দাইল। কয়েকজন প্রত্যক্ষদর্শীর জবানবন্দী এখানে উল্লেখ করা হল।

ফুলপুরের হায়দার রহমান তালুকদার বলেন, "আমি সে সময় স্কুলে পড়তাম। তখন আমাকে নিজেদের গরু বাছুরগুলোকে মাঠে চরাতে নিয়ে যেতে হত। যেখানে গরু

www.pathagar.com

চরাতাম, সেখান থেকে পাকি আর্মির অনেক কার্যকলাপ আমরা দেখতে পেতাম। দেখতাম পাকিস্তানিরা বিভিন্ন জায়গা থেকে, প্রতিদিন অনেক মানুষ ধরে নিয়ে আসত। বরইগাছের সাথে তাঁদেরকে বেঁধে নির্যাতন করত। তাঁদেরকে সেখানে বেয়নেট দিয়ে খোঁচাত ও রাইফেলের বাঁট দিয়ে আঘাত করত। সারাদিন নির্যাতন করে মাগরিবের আজানের পর তাঁদেরকে গুলি করে হত্যা করা হত। এই রকম ঘটনা তখন নিত্য নৈমিত্তিক ছিল। যুদ্ধের ন'মাসে হানাদাররা অসংখ্য লোককে এভাবে হত্যা করে। আমরা দুই-তিন জন থেকে শুরু করে, ত্রিশ জনকে পর্যন্ত প্রতিদিন এখানে নির্যাতন করতে দেখেছি। যুদ্ধের শেষের দিকে তারা বেশি বেশি লোক ধরে এনে হত্যা করেছে। যাঁদেরকে তারা ধরে আনত, তাঁদেরকে দিয়ে নানা ধরনের কাজ করিয়ে নিত। কাজ করতে না পারলে অমানুষিক নির্যাতন চালাত। এসব ঘটনা আমার নিজের চোখে দেখা।"

একাত্তর সনে পাঞ্জাবিরা কংস নদীর ব্রিজের কাছে বহু লোককে হত্যা করে। আমি দূর থেকে এসব হত্যাকাণ্ড দেখেছি। তারা ময়মনসিংহ, হালুয়াঘাট, ময়মনসিংহগামী বাসগুলো দাঁড় করিয়ে যাত্রীদের নামিয়ে তল্লাশি করত। যাঁদেরকে তারা সন্দেহ করত, তাদেরকে বেঁধে রাখত। ওই স্থানে একটা বরই গাছ ছিল। বরই গাছের সাথে ধৃত যাত্রীদের বেঁধে চড়, থাপ্পড়, লাথি, কিল, ঘুষি মারত ও বেয়নেট দিয়ে খোঁচাত। এরপর রাতে নদীর ধারে নিয়ে গুলি করে হত্যা করত। প্রতিদিন পনেরো বিশ জন থেকে এক শ' জন পর্যন্ত লোককে তারা এখানে হত্যা করেছে। যুদ্ধের শেষ দিকে হত্যাকাণ্ড আরও বেড়ে গিয়েছিল। তখন বাঙালাদিরকে তারা গুলি করে হত্যা করত। বিজলী নামে এক পাকিস্তানি বাবুর্চী পার্কি আর্মি অফিসারের হুকুমে ধৃত সবাইকে জবাই করে হত্যা করত। আমাদের পাশের গ্রাম থেকে ধরে আনা পনেরো-বিশ জনের মধ্যে দু'জন সৌভাগ্যক্রমে বেঁচে যান।"

মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন সাচ্চাপুর ঘাটে পাকিস্তানি বাহিনীর ক্যাম্প ছিল। ক্যাম্পের মেজর, লেফটেন্যান্ট, হাবিলদার ও সুবেদাররা বাখাইয়ের হিন্দু বস্তি থেকে মেয়েদের ধরে এনে এই ক্যাম্পে ধর্ষণ করত। বিশ থেকে পঁচিশ জন মেয়েকে তারা এখানে ধরে আনে। এসব মেয়েদের হত্যা করা হয়নি। সম্ভবত তারা এই মেয়েগুলোকে ছেড়ে দিয়েছিল। তারা শুধু ধর্ষণ করেই ক্ষান্ত হয়নি, সমাজের প্রধান প্রধান হিন্দু ব্যক্তিদেরকেও গুলি করে হত্যা করে। এ রকম প্রায় ত্রিশ-পঁয়ত্রিশ জনকে এখানে হত্যা করা হয়।

"হালুয়াঘাট, নালিতাবাড়ি, নেত্রকোনা প্রভৃতি এলাকা থেকে প্রতিদিন বহু লোককে ধরে এনে নদীর তীরে হত্যা করা হয়। আমরা গুলির আওয়াজ শুনতে পেতাম। বাড়ির বাইরে বেরলে বিভিন্ন স্থানে লাশ পড়ে থাকতে দেখতাম। লাশগুলোর গায়ে কালো চাক চাক আঘাতের চিহ্ন দেখা যেত। এসব লোকদের হত্যা করার আগে বেয়নেট দিয়ে খুঁচিয়ে ও বিভিন্নভাবে নির্যাতন করা হত। এখানে আনুমানিক

www.pathagar.com

সহস্রাধিক ব্যক্তিকে হত্যা করা হয়। আমার পরিচিত যে সমস্ত লোককে এখানে হত্যা করা হয়, তাঁদের মধ্যে মুশির্নী পোদ্দার, তাঁর বাবা নারায়ণ ডাক্তার, জুবাইর দাস, ইমাতপুরের কালসু, ভূপেন্দ্র তালুকদার, বীরেন্দ্র তালুকদার প্রমুখের নাম উল্লেখযোগ্য। তবে বিক্রম মাস্টার, বিমল চন্দ্র দাস ও সুনীলসহ কয়েকজন পাকি হানাদারদের হাত থেকে বেঁচে আসতে পেরেছিলেন।"

প্রতক্ষদর্শী মৌলভী মোঃ আব্দুল করিম বলেন, এখানে ভুবননাথ চৌধুরীর বাড়িতে পাকি বাহিনী বড় ধরনের হত্যাকাণ্ড ঘটায়। এই বাড়ির আট-নয় জন নারী পুরুষকে তারা হত্যা করে। ভুবননাথের একজন অন্ধ ভাইকেও হানাদাররা হত্যা করে। মে ও জুন মাসে ডা. আবু তাহের ও পোস্ট মাস্টারকে পাকি বাহিনী হত্যা করে। ডোবারপাড় নামক স্থান থেকে এক পরিবারের কয়েকজনকে আলোকদি নিয়ে হত্যা করে ফেলে রেখে যায়। পরে তাঁদের আত্মীয়রা এসে লাশগুলো নিয়ে যান। এক পর্যায়ে পাকি বাহিনী গ্রামের মধ্যে প্রবেশ করে, আমাকে ধরে নিয়ে যায়। চাকরি সূত্রে এক কৃষি অফিসারের সাথে পরিচয় থাকায়, তিনি অনেক সুপারিশ করে আমাকে ছাড়িয়ে আনেন। এরপর থেকে আমি গা ঢাকা দিয়ে থাকতাম।

মানিক চন্দ্র দাস বলেন, আমার বাবা পল্লী চিকিৎসক ছিলেন। একাত্তরের আঠারোই শ্রাবণ পাকি আর্মি আমাদের বাড়িতে আসে। তখন আমার বয়স দশ বছর। আমি তখন চতুর্থ শ্রেণীতে পড়তাম। বাবা ও আমি সে রাতে একই বিছানায় ঘুমাচ্ছিলাম। হঠাৎ করে রাত দশটার দিকে পাকি বাহিনী ও আলবদর বাহিনীর লোকেরা এসে আমার বাবাকে ধরে নিয়ে যায়। তারা আমার বাবাকে বলে যে, 'তোমার বাড়িতে মুক্তিবাহিনী আছে।' এই বলে তারা আমার বাবাকে বাড়ির সামনের একটা আম গাছের সাথে বেঁধে নির্যাতন শুরু করে। তখন আমার বাবা গাছটাকে জড়িয়ে ধরে কেঁদে কেঁদে বলতে থাকেন, 'পৃথিবীতে আমার কেউ নেই, আমি কোন অন্যায় করিনি। গাছ! তুমি সাক্ষী থাকলে।' আমার বাবাকে গাছটার সাথে তারা ঘন্টা খানেক বেঁধে রাখে। এ সময় আমি, আমার মা, বোন ও ঠাকুরমা বাবাকে ছেড়ে দেওয়ার জন্য অনেক কাকুতি মিনতি করি। কিন্তু তারা আমার বাবাকে ছেড়ে দেয়নি। আমাদের বাড়িতে তখন একটা টিউবওয়েল ছিল। বাবা সেখান থেকে পানি খেতে চাইলে তারা বাবাকে পানিও খেতে দেয়নি। এরপর পাকি আর্মি আমার বাবাসহ বাইশ জনকে ক্যাম্পে ধরে নিয়ে যায়। পরে নদীর পাড়ে নিয়ে তাঁদেরকে গুলি করা হয়। এই বাইশ জনের মধ্যে নয় জন মারা যান। বাকিরা পানির মধ্যে থেকে দড়ি ছিঁড়ে পালিয়ে বাঁচেন। আমার জানা মতে, এ গ্রামে দশ-পনেরো জন নারী পাকি বাহিনীর পাশবিক নির্যাতনের শিকার হয়েছিলেন। এদিন যে নয় জন নিহত হন, তাঁদের মধ্যে আমার বাবা ছাড়াও উপেন্দ্র তালুকদার, ধীরেন্দ্র তালুকদার, নগেন্দ্র বিশ্বাস, যোগেন্দ্র দাস, রমণী ভদ্র ও অবিনাশ দাসের কথা আমার মনে আছে।"

মানিক চন্দ্র দাসসহ স্থানীয় গ্রামবাসীরা জানান, নরেন্দ্র চন্দ্র দাস যে গাছটিকে সাক্ষী রেখেছিলেন, আঠারোই শ্রাবণের পর থেকে সেই গাছটির পাতা ঝরে যায় এবং গাছটি মরে যায়। ওই স্থানে আরও দু'বার গাছ লাগানোর চেষ্টা করা হয়, কিন্তু সেখানে

www.pathagar.com

কোন গাছই আর হয়নি। এ ছাড়াও তিনি যে টিউবওয়েল থেকে পানি খেতে চেয়েছিলেন, সেই টিউবওয়েলটি থেকেও কোন দিন আর পানি ওঠেনি। এরপর দু'জায়গায় টিউবওয়েলটি সরানো হয়েছে, কিন্তু কোন কাজ হয়নি। টিউবওয়েলটি আজও নষ্ট হয়ে আছে। মানিক চন্দ্র বলেন, "দেশ স্বাধীন হয়েছে, অনেকে অনেক কিছু পেয়েছে, কিন্তু আমি তো আমার বাবাকে ফিরে পেলাম না। আমি আমার বাবার হত্যাকারীদের বিচার চাই।"

অবসরপ্রাপ্ত পুলিশ শেখ আহমেদ বলেন, ষোলোই ডিসেম্বর সকাল দশটায় আমি ব্রহ্মপুত্র নদের ধারে গিয়ে দেখি সেখানকার ব্রিজটা ভাঙা। সে সময় সেখানে ছেষট্টিটি লাশ দেখতে পেয়েছিলাম। লাশগুলো শিয়াল, কুকুর ও শকুনে খাওয়া ছিল। কিছু কিছু লাশের শরীরে তখনও তাজা রক্ত দেখা যাচ্ছিল। স্থানীয় লোকজন নদীর তীরের সেই লাশগুলোকে বালিচাপা দিয়েছিল। অনেকের কাছে শুনেছি, ডাকবাংলোর ভেতরে একটি কুয়ো ছিল, সেখানে মানুষ খুন করে ফেলে দেওয়া হত।

অন্য প্রত্যক্ষদর্শী আব্দুর রশিদ বলেন, আমি তখন এখানকার ক্যাম্পে অবস্থানরত পাকিস্তানি আর্মির নদী পারাপারের কাজ করতাম। আমাকে তারা জোর করে আটকে রেখে এ কাজ করাত। একদিন দেখলাম, এক মৌলভীকে ধরে এনে, তাঁর ওপর ভীষণ নির্যাতন শুরু করেছে। তাঁর বাড়ি ছিল নেত্রকোনার নান্দাইলে। তাঁর অপরাধ ছিল, তিনি মুক্তি বাহিনীর চিঠি আদান প্রদান করতেন। এই মৌলভী সাহেবকে শারীরিক নিযার্তন করার পর সুবেদাররা তাঁর প্রতি একটু সদয় হয়। তারা কর্নেলকে ফোন করে বলে যে, 'একজন সুফী লোক আছেন, তাঁকে ছেড়ে দেওয়া যাবে কিনা।' কিন্তু সেখান থেকে তাঁকে হত্যার নির্দেশ আসে। মৌলভী সাহেবও বুঝতে পারেন যে, তাঁকে মেরে ফেলা হবে। জোহরের ওয়াক্তে তিনি মেজরকে বলেন যে, আমি একটু গোসল করে নামাজ পড়ব। এরপর কোমরে দড়ি বেঁধে তাঁকে নদীতে নিয়ে যাওয়া হয়। তিনি হাত পা বাঁধা অবস্থায় সেখানে কোন রকমভাবে গোসল সারেন। তারপর নামাজের আগে দীর্ঘ আধা ঘন্টা ধরে তিনি করুণ সুরে আজান দেন। তাঁর আজানের করুণ সুরে সড়কের চলমান বাসগুলো থেমে যায়, ভেতর বসে থাকা পনেরো-বিশ জন যাত্রী দাঁড়িয়ে যান। কয়েকজন কৃষক তাঁদের হাতের কাস্তে ফেলে হু হু করে কেঁদে ওঠেন। এরপর তিনি হাত পা বাঁধা অবস্থাতেই বসে বসে নামাজ পড়েন। মাগরিবের নামাজের সময় নদীর পাড়ে নিয়ে পাকিস্তানি আর্মি তাঁকে গুলি করে হত্যা করে। এ ছাড়া হালুয়াঘাট থেকে ট্রাক ভর্তি করে মানুষ ধরে এনে, তারা একজনের পেছনে আরেক জনকে দাঁড় করিয়ে এক গুলিতেই পাঁচ-ছয় জনকে হত্যা করত। এখানে তারা প্রায় দু'হাজার মানুষকে হত্যা করে। পূর্ব বাখাই গ্রামের নারীদের ওপরেও প্যাকি আর্মি ব্যাপক নির্যাতন চালায়।

মোসাম্মৎ রমিসা পাকি বাহিনী কর্তৃক তাঁর স্বামীকে ধরে নিয়ে যাওয়ার ঘটনা উল্লেখ করে বলেন, আমি খবর পেলাম যে, আমার স্বামীকে ডাকবাংলোয় আটকে রাখা হয়েছে। তাই স্বামীর খোঁজ নেওয়ার জন্য তখন আমি ডাকবাংলোয় গেলাম। সেখানে বন্দুক নিয়ে অনেক লোক ঘোরাঘুরি করছিল। তাদেরকে আমার স্বামীর আটকের

www.pathagar.com

কথা জিজ্ঞেস করলে তারা অস্বীকার করে। আমি সকাল, বিকাল, সন্ধ্যা সব সময়ই ডাকবাংলোর গেটে গিয়ে দাঁড়িয়ে থাকতাম, কান্নাকাটি করতাম। বলতাম, 'যে লোক আমাকে খাওয়া পরা দেয়, তাঁকে যখন তোমরা আটকে রেখেছ, তখন আমাকে ও আমার ছেলে মেয়েকে তোমরা মেরে ফেল।'

পরে আমার এক দুলাভাইয়ের মাধ্যমে আলবদরদের সাথে যোগাযোগ করি। এর ক'দিন পর দুলাভাই আমার ছেলে মেয়েকেসহ আমার স্বামীকে ছাড়িয়ে আনতে সেখানে যান। তখন তারা বলে যে, পরদিন সকালে আমার স্বামীকে তারা ছেড়ে দেবে। পরদিন সকালে সত্যিই তারা আমার স্বামীকে ছেড়ে দেয়। আমার স্বামী সেখানে আট দিন বন্দী অবস্থায় ছিলেন। তিনি তখন অনেক শুকিয়ে গিয়েছিলেন। এ সময় পাকিস্তানিরা রক্ত লাগবে বলে তাঁর শরীর থেকে জোরপূর্বক আধা লিটার রক্ত বের করে নিয়েছিল। অন্যান্য বন্দীদের থেকেও তারা এভাবে রক্ত নিয়েছে।

বিমল পাল বলেন, ময়মনসিংহের ডাকবাংলোতে পাকি বাহিনী প্রথম গণহত্যা শুরু করে। এখানের ডাকবাংলো এলাকাকে কালীবাড়ি বলা হয়। আলবদরের লোকেরা মুক্তিযোদ্ধা সন্দেহে এলাকার যুবকদের ধরে, সেখানে নিয়ে যেত। তারপর তাঁদেরকে হত্যা করে ব্রহ্মপুত্র নদে ফেলে দিত। লাশ নদীতে ফেলার জন্য ডাকবাংলোর ভেতরের একটি দেয়াল তারা ভেঙে ফেলে। তারা যে সমস্ত লাশ ফেলে দিত, তার কিছু অংশ নদীর স্রোতে ভেসে যেত, কিছু অংশ চরে আটকা পড়ে থাকত।

কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের রেস্ট হাউজ ও ব্যাংকে পাকি বাহিনী ব্যাপক গণহত্যা চালায়। এখানকার হত্যাকাণ্ডের নেতৃত্ব দিত ৩৩ পাঞ্জাব রেজিমেন্টের ব্রিগেডিয়ার আব্দুল কাদির। এখানে সাহসী মুক্তিযোদ্ধদেরকে ধরে এনে হত্যা করা হত। এই দু'জায়গায় প্রায় পাঁচ শ' লোককে হত্যা করা হয়। এর মধ্যে এক শ' জনের লাশ পাওয়া যায়। বাকি লাশ ভাসিয়ে দেওয়া হয়। ষোলো, সতেরো, আঠারো ও উনিশে এপ্রিল পাকি বাহিনী ময়মনসিংহ আক্রমণ করে।

সোহাগপুরের হালুয়াঘাটা গ্রামে মুক্তিযোদ্ধাদের আশ্রয় দেওয়ার অভিযোগে এক সাথে ব্রাশ ফায়ার করে পাকি বাহিনী ত্রিশ পঁয়ত্রিশ জন নিরীহ বাঙালিকে হত্যা করে। হালুয়াঘাটের ১১২১ ও ১১২২ সীমান্তের মাঝামাঝি তেলীখোলাতে পাকি বাহিনী ব্যাপক নারী নির্যাতন চালায়। সীমান্তের যে সব বাঙ্কারে আর্মির ঘাঁটি ছিল, সেখানে নারী নির্যাতন বেশি হয়। স্বাধীনতার পর এই সব জায়গায় মেয়েদের ব্যবহৃত অনেক জিনিস পাওয়া যায়। রোজার মাসে সেহরি ও ইফতার তৈরি করতে হবে এটা বলে এসব জায়গায় মেয়েদেরকে আটকে রাখা হত। পাকি বাহিনী এ সমস্ত স্থানে গণহত্যা, ধর্ষণ ও লুটপাটের কাজেই সর্বদা মগ্ন থাকত। সেই সময় এখানে কর্মরত যেসব আর্মি অফিসারের নাম জানা যায়, তারা হল (১) ব্রিগেডিয়ার আব্দুল কাদের, (২) মেজর আইয়ুব (৩) মেজর রিয়াজ (৪) ক্যাপ্টেন খালেক (৫) ক্যাপ্টেন আব্দুর রহিম ও (৬) মেজর সুলতান।

www.pathagar.com

মুকুল নিকেতনের অধ্যক্ষ আমির আহমেদ চৌধুরী বলেন, একাত্তরের পনেরোই নভেম্বর 'জয়বাংলা পত্রিকা', একটি ম্যাপ ও খবরাখবর নিয়ে ঢাকা থেকে ময়মনসিংহে যাই। ইচ্ছা ছিল রাতেই ঢাকা ফিরে যাব। কিন্তু অনেক পথ ঘুরে আসার ফলে ক্লান্ত হয়ে বাড়িতে ঘুমিয়ে পড়ি। এরপর গভীর রাতে আমাকে ঘুম থেকে পাকি আর্মি তুলে নিয়ে যায়। প্রথমে আমাকে ময়মনসিংহের কোতোয়ালী থানায় নিয়ে যাওয়া হয়। ব্রিগেডিয়ার কাদির খান ও ক্যাপ্টেন আঞ্জু সেখানে উপস্থিত ছিল। শেষ রাতে ফজরের আজানের আগে আনুমানিক চারটার দিকে, আমাকে তারা ক্যান্টনমেন্টে নিয়ে যায় (বর্তমানে সেখানে কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের রেস্ট হাউজ)। সেখানে দু'জন পাকি আর্মি অফিসার আমাকে হাত পা বেঁধে পেটানোর জন্য লাঠি নিয়ে প্রস্তুত হয়। কিন্তু সেই মুহূর্তে খবর আসে যে, বরোর চরে ভয়ানক যুদ্ধ বেঁধে গেছে। সুবেদারের কাছ থেকে এই সংবাদ পাওয়ার পর ওই দুই সেনা অফিসার আমাকে হাত পা বাঁধা অবস্থায় একটি সরু গর্তে ফেলে রেখে চলে যায়। হাত পা বাঁধা অবস্থায় আট ফুটের মতো গভীর গর্তে ফেলে হানাদাররা ওপর থেকে ঢিল/ইট ছুঁড়ে মারতে থাকে। সন্ধ্যা পর্যন্ত আমি সেই গর্তের মধ্যেই মৃত্যুর ক্ষণ গুনেছি। কিন্তু শেষ পর্যন্ত আমাকে অফিসার কাদির খানের সামনে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য আনা হয়। তখনও আমার নামে কোন ইনকোয়ারি হয়নি বলে সেখান থেকে আমাকে ময়মনসিংহ জেলখানায় পাঠিয়ে দেওয়া হয়। দু'দিন পর আবার আমাকে ক্যান্টনমেন্টে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য নিয়ে যাওয়া হয়। কিন্তু আমার কাছ থেকে কোন তথ্য উদ্ধার করতে না পেরে ক্রোধে উন্মত্ত হয়ে, তারা আমার পায়ে দড়ি বেঁধে, মাথা নিচের দিকে দিয়ে গাছে ঝুলিয়ে রাখে। হাত বুকের সাথে বেঁধে লাঠি দিয়ে বুকে ও পিঠে আঘাত করতে থাকে। এভাবে ছ'ঘন্টা অত্যাচারের পর আমাকে গাছ থেকে নামানো হয়। তখন আমি সোজা হয়ে দাঁড়াতে পারছিলাম না। মাথা রক্তে ভিজে ভারী হয়ে গিয়েছিল। কথা বলার মতো কোন শক্তি ছিল না। এরপর আমাকে কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় সংলগ্ন ব্রহ্মপুত্র নদের পাড়ে, সারা রাত খালি গায়ে দাঁড় করিয়ে রাখা হয়। সকালে একটি কক্ষে এনে সিলিং ফ্যানের সাথে ঝুলিয়ে, তারা আমাকে আবার জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করে।

এ সময় আমার ছোট ভাই বর্তমানে মেজর জেনারেল আমিন আহমেদ চৌধুরী বীরবিক্রম ভারতে মুক্তিযুদ্ধের জন্য প্রশিক্ষণ নিচ্ছিলেন। গ্রামের বাড়ি ফেণীতে আমার দাদাসহ আরও ছ'জন নিকট আত্মীয়কে হানাদাররা হত্যা করেছিল, সেটাও তারা জেনে যায়। এ কারণে আমার ওপর সন্দেহ আরও ঘনীভূত হয় এবং নির্যাতনের মাত্রাও বাড়িয়ে দেয়।

পরের দিন আমাকে আবার সিলিং ফ্যানের সাথে ঝুলিয়ে বাঁশকল (দু'টি বাঁশ দিয়ে দু'জনে ধরে বুকে চাপ দেওয়া) দেওয়া হয় এবং আগে আমি যা বলেছি, তা ঠিক কি না তা নিশ্চিত হওয়ার জন্য আবার জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করে। আমি তখন কষ্টে কথা বলতে পারছিলাম না, কিন্তু মাথা ঠাণ্ডা রেখে আগের মতোই একই কথা বলে

www.pathagar.com

যাচ্ছিলাম। ক্যাপ্টেন আঞ্জু ও মেজর সিদ্দিক নামে কালো মতো এক জন অফিসার আমার ওপর বেশি অত্যাচার করে। আমার ছোট ভাই কেন যুদ্ধে গেছে, সে বিষয়ে আমাকে প্রশ্ন করা হলে বলি যে, "ছোট ভাই আমার অবাধ্য।" আমার মতো বহু লোককে একইভাবে অত্যাচার নির্যাতন করতে দেখেছি আমি। আবদুল হেকিম নামে আমার পরিচিত এক ব্যক্তিকে ভালুকা থেকে ধরে আমার চোখের সামনেই হাবিলদার আলাউদ্দীন, (জল্লাদ নামে পরিচিত ছিল) জবাই করে হত্যা করে। প্রথমে এই লোকটিকে প্রচণ্ড মারধর করা হয়। এরপর তাঁর দুর্বল দেহটিকে নদীর ধারে বালির ঢিবির ওপর শুইয়ে জবাই করে হত্যা করে। বালি দ্রুত রক্ত চুষে নিতে পারে বলে হানাদাররা সাধারণত বালির ওপরেই জবাই করত। এভাবে লোকটিকে হত্যার পর তারা জেলা বোর্ডের স্পিড বোটে করে তার লাশ ব্রহ্মপুত্র নদে ফেলে দেয়। এভাবে ব্রহ্মপুত্রে ফেলা সব লাশই শীতলক্ষ্যা হয়ে কাপাসিয়া চলে যেত। অমানবিক এই জবাই দৃশ্য দেখার পর একজন আমাকে বলে, "তোমার অবস্থাও এমন হবে।"

এর পর আমাকে চোখ বেঁধে মাটির নিচের একটি গোপন কক্ষে (যেখানে অত্যাচার করে লোক হত্যা করা হত সেখানে) বেঁধে রাখা হয়। ওই কক্ষের মধ্যে ক্লাস সিক্স ও আই, কম প্রথম বর্ষের দুই ছাত্রকে বন্দুকসহ ধরা পড়ার অপরাধে হত্যা করা হয়। ক্লাস সিক্সে পড়া ছেলেটি অনেক অনুনয় বিনয় করে বলেছিল, "আমার বিধবা মা আছে, আমাকে ছেড়ে দেন।" কিন্তু কিশোর ছেলেটির কথায় কর্ণপাত না করে, তারা তাঁকে হত্যা করে। হানাদাররা হত্যা করার আগে পিটিয়ে অর্ধমৃত করে ফেলত। প্রায় সময়ই তারা চোখ বেঁধে রাখত। আমি এই মর্মান্তিক ও পাশবিক ঘটনার এত কাছাকাছি ছিলাম যে, এখনও সেই ঘটনার পুরোটাই অনুভব করতে পারি, কিন্তু ভাষায় প্রকাশ করতে পারি না। বেয়নেট দিয়ে খুঁচিয়ে ও নির্যাতন করে অগণিত বাঙালিকে এই এলাকায় হত্যা করা হয়েছে। হাজারেরও বেশি লাশ এখানে ভাসিয়ে দেওয়া হয়েছে বলে প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান। এখানে গণকবরও রয়েছে।

বন্দী থাকার সময় আমি দূর থেকে নারী কণ্ঠের আর্তচিৎকার শুনেছি, কিন্তু কিছুই করার ছিল না। হাত পা বাঁধা অবস্থায় শত আঘাতে দুর্বল শরীরটিকে নিয়ে হতভাগা নারীগুলোর কথা স্মরণ করে শুধু নীরবে কেঁদেছি। আমি আট দিনের মতো বন্দী ছিলাম। সেখানে বন্দী থাকা অবস্থায় আমি হাবিলদার সুফির কাছ থেকে পাশবিক অনেক ঘটনার বিবরণ জানতে পারি। সুফির ডিউটি ছিল আমার বুকে বন্দুক ঠেকিয়ে পাহারা দেওয়া। সুফি মাঝে মাঝে আফসোস করে বলত, "সাব হাম দেখা হ্যায় খামাখা কিতনা আদমিরকো মারা হ্যায়, তওবা তওবা এ রমজান কা মাহিনা হ্যায়। কিতনা আওরাত লোগকো বেইজ্জত করতা হ্যায়, এ কেয়া হোতা হ্যায়, হাম লোগকো বোলা এধারসে সব হিন্দু হ্যায়, আভি কেয়া দেখতা হ্যায়, এধারমে রোজা নামাজ আজান ভি হোতা হ্যায়।" এসব কথা শুনে আমি উত্তর দিতে ভয় পেতাম যে, কোনটা বলে আবার কী হয়ে যায়। তারপরও দুরুদুরু বুকে আমি বলতাম, আমাদের দেশের লোকেরা নামাজ পড়ে, রোজা রাখে, মহিলারাও বোরখা পরে।

www.pathagar.com

সুফির কাছ থেকে আমি শুনেছি, তারা প্রচুর লোককে ঝুলিয়ে পিটিয়ে হত্যা করেছে। বহু মেয়েকে ধর্ষণ ও নির্যাতনের পর হত্যা করেছে। আমাকে মানসিকভাবে দুর্বল করার জন্য, তারা আমার চোখের সামনে কিছু লোকের শরীর ব্লেড দিয়ে চিরে, মরিচের গুঁড়া ও লবণ ভরে সেলাই করে ঝুলিয়ে হত্যা করেছে। তারপর বলেছে, "আপকা হালাত এ্যায়সা হো যায়েগা, আপ জলদি সব বাতা দো।" এ অবস্থায় কাবলিওয়ালারা হানাদারদের কাছে দেনদরবার করে অর্ধমৃত অবস্থায় আমাকে মুক্ত করে। এই কাবলিওয়ালাদের আমি আগে অনেক সাহায্য করেছিলাম। তিনি বলেন, প্রায় দশটি হত্যাকাণ্ডের প্রত্যক্ষদর্শী আমি। ময়মনসিংহে কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, ডাকবাংলো, জেলাবোর্ডের আলবদর বাহিনীর হেড কোয়ার্টার, দূত মহল ও বাজার এলাকার একটি কুয়োর মধ্যে বহু নরনারীকে হত্যা করা হয়, যার প্রকৃত সংখ্যা আজও জানা যায়নি।

ব্রিগেডিয়ার আব্দুল কাদের, মেজর আইয়ুব, মেজর সিদ্দিক, মেজর সুলতান, মেজর রিয়াজ, ক্যাপ্টেন খালেক, ক্যাপ্টেন আব্দুর রহিম, ক্যাপ্টেন আঞ্জু, হাবিলদার আলাউদ্দিন, হাবিলদার সুফি, রমজান ও সাদেক প্রমুখ আর্মি অফিসার ও তাদের সহযোগীরা ময়মনসিংহ জেলায় সংঘটিত সকল যুদ্ধাপরাধের জন্য দায়ী।

আসামীঃ মেজর ইফতেখার

অপরাধের ধরনঃ গণহত্যা, জাতিগত নিধন, ধর্ষণ, লুটপাট, অগ্নিসংযোগ।

সাক্ষী ঃ আব্দুর রাজ্জাক, শরীফা খাতুন, আব্দুর রহিম, জামাল উদ্দীন।

ঘটনাকালঃ একাত্তরের পঁচিশে মার্চ থেকে ডিসেম্বর পর্যন্ত।

ঘটনাস্থল ঃ কিশোরগঞ্জ জেলা

সূত্রঃ যুদ্ধাপরাধ গণহত্যা ও বিচারের অন্বেষণ এবং WCFFC গবেষণা।

কিশোরগঞ্জ থেকে আট কিলোমিটার দক্ষিণ পূর্বে অবস্থিত বরইতলা গ্রামের রেল লাইনের পাশে পাকি সেনারা ব্যাপক গণহত্যা চালায়। একাত্তরের তেরোই অক্টোবর একদল পাকি সেনা ট্রেনযোগে ঠিকনীচর, কালিকাবাড়ি, তিলকনাথপুর ও গোবিন্দপুর গ্রাম থেকে আসা প্রায় পাঁচ শ' (মতান্তরে পনোরো শ') নিরীহ লোককে মুক্তিযুদ্ধের বিরুদ্ধে প্রচার চালানোর জন্য সংগ্রহ করে। কিন্তু এ সময় একজন পাকি সেনা নিখোঁজ হওয়ার সংবাদ ছড়িয়ে পড়ে। রাজাকাররা বলে, গ্রামের মুক্তিযোদ্ধারা তাকে মেরে ফেলেছে। এ খবর শোনার পর সংগ্রহ করে আনা মানুষগুলোকে একত্রিত করে হত্যা করা হয়। শাবল, বেয়নেটের আঘাতের পাশাপাশি চালানো হয় গুলি। কয়েকজন প্রত্যক্ষদর্শীর জবানবন্দী এখানে উল্লেখ করা হল।

www.pathagar.com

আব্দুর রাজ্জাক বলেন, আমি সে সময় অষ্টম শ্রেণীর ছাত্র ছিলাম। আমার বড় ভাই তখন গরুর গাড়ি চালাতেন। সেদিন তিনি আমাকে গরুগুলো কড়ই গাছে বেঁধে রেখে আসতে বলেন। গরুগুলো রেখে আসতে গিয়ে দেখি পাকি বাহিনীর গাড়ি দাঁড়ানো। গাড়ি থেকে নেমে প্রায় পাঁচ শ' জন সৈন্য 'পাকিস্তান জিন্দাবাদ' স্লোগান দিতে দিতে খালপাড় দিয়ে যাচ্ছিল। হঠাৎ দেখলাম, আট জন পাকি আর্মি আমাদের বাড়ির দিকে আসছে। তখন বাড়িতে আমি, আমার বাবা, ভাই ও চাচা অবস্থান করছিলাম। আমাদের বাড়িতে ঢুকে তারা আমার বাবার ঘাড়ে বন্দুক দিয়ে আঘাত করে। আমার বাবা এ সময় তাদেরকে বলেন, 'আমাকে মারেন কেন?' তখন তারা বলে, 'আমাদের সাথে চলো, শান্তি মিছিল হবে।' এরপর আমাদের পাশের বাড়ির হাকিম মিয়া ও হোসেনসহ প্রায় পনেরো জনকে তারা ধরে নিয়ে যায়। আমাদের সাথে মসজিদের এক ইমাম সাহেবও ছিলেন। একজন পাকি সৈন্য ওই ইমাম সাহেবের গণ্ডদেশে প্রচণ্ড জোরে এক থাপ্পড় মারে।

"প্রায় দেড় হাজারের মতো লোককে তারা সেখানে জড়ো করে। সেখান থেকে কয়েক জনকে ধরে জিওল গাছের নিচে নিয়ে গিয়ে বেয়নেট দিয়ে খোঁচাতে থাকে। যাঁদেরকে আঘাত করা হচ্ছিল, তাঁদের আঘাতের স্থানগুলো সাথে সাথে ফুলে ওঠে। পাকি আর্মি এ সময় শরীরের ফুলে ওঠা অংশগুলো চাকু দিয়ে ফেঁড়ে দেয়। আমি এগুলো দেখতে গেলে আমাকে থাপ্পড় মারে এবং লাঠি দিয়ে আঘাত করে। এরপর সেখানে অবস্থানরত পাকি মেজর উপস্থিত সবার হাত পা বেঁধে ফেলার নির্দেশ দেয়। তখন অনেকে ভয়ে দৌড়ে মসজিদে গিয়ে ঢোকেন। যাঁদের গ্রামে রাজাকার ছিল, তাঁদের অনেককে সে সময় ছেড়ে দেওয়া হয়। প্রায় পাঁচ শ' জনকে এভাবে হত্যার জন্য দাঁড় করানো হয়। তখন আমরা সবাই "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু, মোহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ" জোরে জোরে পড়তে লাগি। তখন মেজর বলে, 'এভাবে কলেমা পড়তে থাকলে তো মারা যাবে না।' তারপর তারা ত্রিশ কেজি ওজনের রেল লাইন ঠিক করার শাবল দিয়ে জনতার প্রথম সারি থেকে মাথায় আঘাত করতে শুরু করে। এতে অধিকাংশ লোকের মাথা চৌচির হয়ে যায় এবং তাঁদের রক্তমিশ্রিত ঘিলু বিভিন্ন দিকে ছিটকে পড়ে। অনেকের কাঁধ ও ঘাড় ভেঙে যাওয়ায় অজ্ঞান হয়ে পড়েন। এ সময় লাইন থেকে যাঁরা ভয়ে দৌড়ে পালাচ্ছিলেন তাঁদের কাউকে কাউকে জোর করে ধরে এনে বেত দিয়ে পিটিয়ে পুনরায় লাইনে দাঁড় করানো হয়, এর মধ্যে কাউকে কাউকে আবার গুলি করে হত্যাও করা হয়। যাঁদেরকে শাবল দিয়ে আঘাত করে হত্যা করতে সক্ষম হয়নি, তাঁদেরকে পরে ব্রাশ ফায়ার করে হত্যা করা হয়।

পাকি বাহিনী লাঠি দিয়ে আমার শরীরের বিভিন্ন জায়গায় আঘাত করে। একজন বেয়নেট দিয়ে মারতে এলে আরেকজন বাধা দিয়ে বলে, 'ইয়ে বাচ্চা লোগ হ্যায়।' তখন আমাকে তারা আর মারেনি। পাকি আর্মি চলে গেলে হোসেন নামে এখানকার এক রাজাকার বলে, 'তোমরা যারা বেঁচে আছো তারা চলে যাও, পাকিস্তানিরা চলে গেছে।' আমি তখন আহত অবস্থায় সেখান থেকে বাড়ি আসার সময়, পথে আমার

www.pathagar.com

ভাইকে গুলিবিদ্ধ অবস্থায় পড়ে থাকতে দেখি। তিনি এ সময় আমাকে জড়িয়ে ধরে বলেন, 'ভাই, আমি আর বাঁচব না' এ কথা বলার সাথে সাথে তিনি অজ্ঞান হয়ে পড়ে যান। এ অবস্থায় আমি তাঁকে কাঁধে করে বাড়ি নিয়ে আসি। তাঁর পেটে গুলি লেগেছিল। বাড়িতে এসে তিনি বমি করা শুরু করেন। এ সময় তিনি তাঁর শরীর থেকে গুলি বের করার জন্য আমাকে বলেন। কিন্তু ভয়ে আমি তাঁর শরীর থেকে গুলি বের করতে পারিনি। ফজরের আজানের সময় আমার ভাই মারা যান। সেদিন যে পাঁচ শ' জনের ওপর নির্যাতন চালানো হয়েছিল তার মধ্যে তিন শ' ছেষট্টি জন মারা যান। বাকিরা আহত অবস্থায় বেঁচে ছিলেন। এর মধ্যে কেউ কেউ পরে মারা যান। আমাদের বাড়ির যে পাঁচ জনকে পাকি বাহিনী হত্যা করে, তাঁরা হলেন ১. আমার ভাই আব্দুল করিম ২. চাচাতো ভাই মোঃ মরতুজ আলী ৩. চাচা মোঃ আব্দুল হাশিম ৪. চাচা আব্দুল হালিম এবং ৫. চাচা আব্দুল মন্নেফ।"

প্রত্যক্ষদর্শী শরীফা খাতুন বলেন, পাকি বাহিনী যেদিন আমাদের বাড়িতে আসে, তখন আমি বাড়ির পেছনের কেওড়া গাছের নিচে দাঁড়িয়ে ছিলাম। আমার কোলে তখন আমার দশ মাসের শিশু সন্তান আব্দুর রউফ খোকন। তারা বাড়িতে ঢুকে আমার শাশুড়িকে মারধর করে টাকা পয়সা চায়। আমার শাশুড়ির তখন সত্তর বছর বয়স। শাশুড়ি বলেন, 'আমার কাছে কোন টাকা পয়সা নেই।' তখন তারা আমার শাশুড়িকে মেরে কেওড়া গাছের নিচে ফেলে রাখে। উঁচু লম্বা ধরনের তিন পাকিস্তানি আর্মি আমার কোল থেকে আমার দশ মাস বয়সী শিশু সন্তানকে ছিনিয়ে নিয়ে, বাড়ির পেছনের নদীর দিকে যেতে থেকে। তখন আমি দিশেহারা হয়ে তাদের পেছন পেছন যেতে থাকি। কান্নাকাটি করে তাদেরকে আমার ছেলে ফিরিয়ে দেওয়ার জন্য অনুরোধ করতে থাকি। তখন আর্মি বলে, আমি যদি তাদের পেছনে এরকম করতে থাকি তাহলে তারা আমাকেও গুলি করে হত্যা করবে। আমি এ সময় বলি, 'আমাকে গুলি করে মেরে ফেলেন, তবু আমার ছেলেকে মারবেন না।' এ কথা বলার পরপরই এক আর্মি আমার বুকে রাইফেল ধরে। তখন আরেকজন বলে, 'মারার দরকার নেই, ছেলেটাকে পানিতে ফেলে দাও । মাকে মেরে ফেললে তো সে দেখতে পাবে না যে, তার সন্তানকে পানিতে ফেলে মারা হয়েছে।' আমার সন্তানের জন্য আমি তখন পাগলের মতো কাঁদছি। আমি যখন ওদের কাছে আমার সন্তানের প্রাণ ভিক্ষার জন্য কাকুতি মিনতি করছি, তখন দেখি, তারা আমার অসহায় অবস্থাটাকে উপভোগ করেছে। এক পর্যায়ে তারা আমার সন্তানকে নদীতে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে, সেখান থেকে চলে যায়। ছুঁড়ে ফেলার মিনিট পাঁচেক পর আমি জ্ঞান ফিরে পাই এবং পানিতে ঝাঁপ দিয়ে আমার বাচ্চাটাকে পাগলের মতো খুঁজতে থাকি। এ সময় আমার পরনের শাড়ি খুলে কোথায় পড়ে গিয়েছিল তা বুঝতে পারিনি। আমি যখন নদীতে আমার হারিয়ে যাওয়া সন্তাননের খোঁজ করছি, তখন আমার মাথার ওপর দিয়ে অন্য মানুষের লাশ ভেসে যাচ্ছিল। খুঁজতে খুঁজতে এক সময় আমার হাতের চুড়িতে কী যেন হঠাৎ বেঁধে গেল। আমি সেদিকে ভয়ে ভয়ে তাকিয়ে দেখি, আমার ছেলের আঙুল চুড়িতে লেগে

www.pathagar.com

আছে। পানির নিচেই আমি আমার ছেলের নাক ও চোখ দেখতে পাই। তখন পানির নিচ দিয়ে ছেলেকে নিয়ে নদীর অপর পারে গিয়ে উঠি।

"নদীতে পড়ে পানি খেয়ে আমার ছেলের পেট ও মাথা ফুলে গিয়েছিল। তখন আর্মির ভয়ে একটি লোক নদীর পাড় দিয়ে পালিয়ে যাচ্ছিল। আমি তাকে ধর্মের বাবা ডেকে, আমার ছেলের পেট থেকে পানি বের করে দেওয়ার জন্য অনুরোধ করলাম। লোকটি ভয়ে ভয়ে আমার ছেলেকে মাথায় নিয়ে এক পাক ঘোরাতেই তার নাক মুখ থেকে পানি বের হয়ে যায়। এরপর তাকে আমি শুইয়ে রাখি। পরে শুনতে পাই, পাকিস্তানি আর্মি গ্রামের লোকদের হত্যা করে গাড়ি নিয়ে চলে গেছে। বেলা প্রায় চারটার দিকে আমি নদীর ওপারে বাড়িতে যাওয়ার জন্য, একজনের কাছে কাপড় চাই। তার কাছ থেকে কাপড় নিয়ে ছেলেকে কাঁধে করে বাঁশের সাঁকো দিয়ে কোন রকমে নদী পার হই।

"গ্রামে ফিরে দেখি, সেখানে কোন লোকজন নেই। আমার স্বামী, শাশুড়ি কারও কোন খোঁজ নেই। এরপর রেল ক্রসিং-এ গিয়ে দেখি সেখানে অনেক লাশ। কারও বুকে, কারও মাথায় আঘাত করে হত্যা করা হয়েছে। কিন্তু আমার বাড়ির লোকজনদের কোন খোঁজ পেলাম না। পরে আমার বাবার বাড়ির লোকজন আমাদের বাড়ির লোকদের উদ্ধার করে আনে। আমার ছেলের শরীরে কিছু একটা বিঁধে ছিল। সন্ধ্যার পর ডাক্তার আনিয়ে কেটে সে জিনিসটা বের করে ফেললে, আমার ছেলে জোরে চিৎকার করে কেঁদে ওঠে। এরপর আমার ছেলেকে এক বোতল দুধ খাওয়াই। আমার সেই ছেলে এখনও বেঁচে আছে। সে এখন অনেক বড় হয়ে গেছে।"

প্রত্যক্ষদর্শী আব্দুর রহিম বলেন, পাকিস্তানি হানাদাররা যেদিন আমাদের বাড়িতে আসে, সেদিন ছিল বুধবার। আমাকেসহ আমাদের বাড়ির আট জনকে তারা ধরে নিয়ে যায়। বরইতলা রেল লাইনের কাছে নিয়ে আমাদের প্রায় তিন শতাধিক লোককে তিনটা লাইনে বসিয়ে রাখে। তারা আমাদেরকে বলে যে, আইডি কার্ড দিয়ে তোমাদের ছেড়ে দেওয়া হবে। এর মধ্যে পূর্ব দিক থেকে আনা কিছু লোক "পাকিস্তান জিন্দাবাদ" স্লোগান দেওয়ায় তাঁদের ছেড়ে দেওয়া হয়। কিছু মানুষ জোহরের নামাজ পড়ার জন্য মসজিদে যান। এরপর ওই তিন লাইন থেকে প্রথমে তিন জনকে নিয়ে গুলি করে হত্যাযজ্ঞের সূচনা করে। আমরা তখন বাঁচার জন্য ছুটোছুটি শুরু করলে, তারা এলএমজি দিয়ে এলোপাতাড়ি ব্রাশ ফায়ার শুরু করে। রেল লাইনের ওপর লোহার রড ও বেয়নেট দিয়ে যাঁকে সামনে পায়, তাঁকেই মারতে থাকে। তারা আমার শরীরে লোহার রড ও মাথায় বেয়নেট দিয়ে আঘাত করে। তাদের নির্মম আঘাতে আমি জ্ঞান হারিয়ে ফেলি। তারপর আর কিছুই মনে ছিল না। পরে বাড়ির লোকজন সেখান থেকে আমাকে বাড়িতে নিয়ে আসে। এর দু'দিন পর আমার জ্ঞান ফেরে। আমার মাথায় আটটা সেলাই দিতে হয়েছিল। আমাদের বাড়ি থেকে আট

www.pathagar.com

জনকে পাকিস্তানিরা ধরে নিয়ে যায়, এর মধ্যে আমরা চার জন বেঁচে আছি, বাকি চার জন শহীদ হন।"

কিশোরগঞ্জ সুগার মিলের পেছনে সংঘটিত গণহত্যার অন্যতম সাক্ষী মোঃ জামাল উদ্দীন বলেন, সেদিন সন্ধ্যা সাতটার দিকে পাকি বাহিনী এই এলাকায় প্রবেশ করে। তখন আমাদের বাড়িটা ছিল সুগার মিলের পাশে। প্রথম দিনই আর্মি বিভিন্ন এলাকা থেকে সতেরো-আঠারো জনকে ধরে এনে, সুগার মিলের একটি কক্ষে আটকে রাখে। ওই দিন রাত ন'টার দিকে হঠাৎ করে আমরা গুলির শব্দ শুনতে পাই। এ সময় আমি লক্ষ্য করে দেখি, হানাদাররা এক একজন লোককে ধরে নদীর পাড়ে নিয়ে গুলি করে হত্যা করছে। এখানে ধরে আনা লোকদের নদীর হাঁটু পানিতে দাঁড় করিয়ে, গুলি করে হত্যা করা হত। তখন এখানকার একটা ডাকবাংলোয় পাকিস্তানিদের ক্যাম্প ছিল। তারা বিভিন্ন এলাকা থেকে লোকজন ধরে এনে এই ক্যাম্পে একত্রিত করে হত্যা করত। সে সময় নিরীহ বাঙালিদের রক্তে নদীর পানি সব সময় লাল হয়ে থাকত। গ্রামের লোকেরা ভয়ে রাতে কোন বাতি জ্বালাত না। এই মিলের দু'জন দারোয়ান সোবহান ও রহিম লাশগুলো টেনে নদীতে ফেলত। অনেক দিন যাবত এখানে এ রকম হত্যাকাণ্ড চলেছে। যাঁদেরকে তারা ধরে আনত, তাঁদের কাউকে কাউকে কালীগঞ্জে ও ধুইন্ধাতে নেওয়া হত। আমরাও অনেক লাশ পানিতে ভাসিয়ে দিয়েছি।

"একদিন আমাকেও হত্যা করার জন্য পাকিস্তানি বাহিনী অন্যদের সাথে পানিতে দাঁড় করায়। হত্যা করার আগেই আমি পানিতে উপুড় হয়ে পড়ে যাই। তারা প্রতি রাতেই বাড়িঘরের ওপর লাইট ফেলে মানুষ খুঁজত। মানুষ দেখলেই ধরে এনে হত্যা করত। একদিন একই পরিবারের পাঁচ জনসহ আট জন লোককে তারা এখানে ধরে আনে। তাঁদের মধ্যে থেকে একজন কবরস্থানের দেয়াল টপকে নদী পার হয়ে পালাচ্ছিলেন। নদী পার হয়ে জমিতে উঠে তিনি যখন দৌড়াচ্ছিলেন, তখন তাঁর লুঙ্গি খুলে যায়। তাঁর হাত বাঁধা ছিল বলে তিনি লুঙ্গি ধরতে পারেন নি। পরে লুঙ্গি ফেলে উলঙ্গ অবস্থাতেই দৌড়ে পালিয়ে যান।

তিন জন পাকি হানাদার আমাদের বাড়িতে আসে। আমি তখন নৌকা করে বাড়ি ফিরছিলাম। নৌকা থেকেই তাদেরকে দেখতে পেয়ে, আবার নৌকার মধ্যে উপুড় হয়ে শুয়ে পড়ি। হানাদাররা আমাকে দেখতে পায়নি। তারা আমার ছোট ভাইকে গরু, ছাগল, হাঁস, মুরগি যা বাড়িতে আছে, সেগুলো ধরে দিতে বলে। তারা সে সময় এখানকার বিভিন্ন বাড়িতে ঢুকে হাঁস, মুরগি, গরু, ছাগল যা পেত, জোর করে ধরে নিয়ে যেত। বিভিন্ন গ্রাম থেকে যুবতী মেয়েদের ধরে নিয়ে সুগার মিলে আটকে রেখে পাশবিক নির্যাতন চালাত। মেজর ইফতেখার ও তার সহযোগী পাকি আর্মি কিশোরগঞ্জে নিষ্ঠুরতম গণহত্যা, ধর্ষণ, লুটপাট ও অগ্নিসংযোগ চালায়।

www.pathagar.com

আসামীঃ মেজর আনসারী, মেজর আকরাম কোরেশী, সেপাই রাশিদ খান (বেলুচ)।

অপরাধের ধরনঃ গণহত্যা, জাতিগত নিধন, ধর্ষণ, লুটপাট, অগ্নিসংযোগ।

সাক্ষী ঃ মোঃ মোসলেম শরীফ, মো মনু মিয়া, মঙ্গল চন্দ্র শীল, খন্দকার জাকির হোসেন নিলু, সুফিয়া বেগম, সোহরাব ফকির, সুফিয়া বেগম, হাফিজুর রহমান চানুমিয়া, মোঃ আবুল ফয়েজ, এ কে এম আবু ইউসুফ সিদ্দিক।

ঘটনাকালঃ সতেরোই এপ্রিল থেকে আট ডিসেম্বর পর্যন্ত।

ঘটনাস্থল ঃ ফরিদপুর।

সূত্রঃ যুদ্ধাপরাধ গণহত্যা ও বিচারের অন্বেষণ এবং WCFFC গবেষণা।

উপর্যুক্ত আর্মি অফিসাররা ফরিদপুরে ব্যাপক গণহত্যা, ধর্ষণ, জাতিগত নিধন, অগ্নিসংযোগ ও লুটপাট চালায়। পাকি আর্মির নিজস্ব তত্ত্বাবধানে ফরিদপুর স্টেডিয়ামের অন্ধ কুঠুরিতে অত্যাচার করা হত বিভিন্ন এলাকা থেকে ধরে আনা নিরীহ বাঙালির। রাতে কোমরে রশি বেঁধে তাদের নিয়ে যাওয়া হত হাসরা সেতুর ওপর, তারপর ব্রাশফায়ারে হত্যা করে লাশ ফেলে দেওয়া হত নদীতে। চাঁদেরহাট ফরিদপুর জেলার ছোট্ট একটি গ্রাম। গাছপালায় ঢাকা শুকনো ডোবায় গ্রামের অসংখ্য মহিলা ও শিশু আশ্রয় নিয়েছিল সেদিন। তখন সেপ্টেম্বর মাস। পাকি বাহিনীর মেশিনগানের গুলিতে এক শ' একষট্টি জনের তাজা রক্তে ভরে উঠেছিল ওই গ্রামের শুকনো ডোবানালাগুলো।

বাইশে মে শরিয়তপুর পালং থানার মধ্যপাড়া গ্রামে আক্রমণ চালিয়ে পাকিবাহিনী শিক্ষক সুখদেব সাহা, গৌরাঙ্গ চন্দ্র পোদ্দার, কানাই মালো, পার্থ নাথ, নারায়ণ চন্দ্র, চিত্তরঞ্জন সাহা, হরি সাহা, উপেন্দ্রমোহন নাগ, নিপা পোদ্দার, শম্ভুনাথ দাসসহ ত্রিশ জন পুরুষ ও পাঞ্চাশ জনের মতো মহিলাকে ধরে নিয়ে মধ্যপাড়া গ্রামের পরিত্যক্ত বাড়ির এক মন্দিরে পাশবিক অত্যাচার চালায়। অত্যাচারের পর মাত্র তিন জনকে ছেড়ে দেওয়া হয়। বাকিদেরকে নৃশংসভাবে হত্যা করা হয়। মধ্যপাড়া রুদ্রকর গ্রাম, চিকন্দি গ্রাম, ভেদরগঞ্জ থানার গৈড্যাসৈড্যা এবং জান্দিতে আট মাস ধরে তারা নির্যাতন চলে। মধ্যপাড়া মন্দির ছিল তাদের নারী নির্যাতনের প্রধান কেন্দ্র। জান্দি হত্যাকাণ্ডের বিবরণ সংবলিত সম্পর্কে কয়েকজন প্রত্যক্ষদর্শীর জবানবন্দী এখানে তুলে ধরা হল।

মো: মোসলেম শরীফ জান্দি এলাকার পাকিস্তানি বাহিনীর নির্মম হত্যাযজ্ঞের সাক্ষী। তিনি জানান, "জান্দি ছিল মূলত হিন্দুপ্রধান এলাকা। পাকিস্তানি সেনাবাহিনী ফরিদপুরে প্রবেশের পর অনেক হিন্দু পরিবারের লোকজন জান্দি গ্রামকে নিরাপদ ভেবে এখানে এসে আশ্রয় নেন। এলাকায় জনপ্রিয় নেতা টনিক সেনও জমিদার প্রফুল্ল সেনের বাড়িতে আশ্রয় নিয়েছিলেন। আঠারোই বৈশাখ ভোরে আনুমানিক চারটার সময় জান্দি এলাকায় গোলাগুলির আওয়াজ শুনতে পাই। এর পরপরই সেখানে পাকি আর্মির হামলার কথা জানতে পারি। সকালের দিকে বহু লোক হতাহত

www.pathagar.com

হওয়ার খবর পাই। সকাল সাতটার সময় আমি মামাতো ভাই রফিককে নিয়ে জান্দিতে গেলাম। সেখানকার পোদ্দার বাজারের কাছে আমরা টনিক সেনের লাশ দেখতে পাই। বিভিন্ন জায়গায় ছড়িয়ে ছিটিয়ে ছিল লাশগুলো। গোবিন্দ বলে এক ব্যক্তি যাত্রায় অভিনয় করতেন। গোবিন্দের বাড়িতে গিয়ে দেখি, তার সাথে আরও একজন মরে পড়ে আছে। এলাকার অভিজাত পরিবার ঠাকুরবাড়ির, অটা ঠাকুরের লাশও দেখেছিলাম সেদিন। জান্দি থেকে ফিরে যাওয়ার সময় তিন পাকি সেনার সামনে পড়ে যাই আমরা। কলেমা পড়ার পর আমাদের কাছে হিন্দু এলাকা কোনটা জিজ্ঞাসা করলে আন্দাজের ওপর এক দিকে হাত তুলে দেখাই। পরদিন আবার জান্দিতে গিয়ে দেখি বড় একটি গর্ত খুঁড়ে গতদিনের লাশগুলো দাফন করা হয়েছে।

জান্দিতে গিয়ে আমি মহারাজ পোদ্দারের হত্যাকাণ্ডটি নিজের চোখে দেখেছিলাম। তিনি বাজারের কাছে আশ্রমেই থাকতেন। পা খোঁড়া মহারাজ পোদ্দারকে গুলি করলে তাঁর দেহ কয়েক হাত শূন্যে লাফিয়ে উঠে আবার মাটিতে পড়ে। আঠারোই বৈশাখ সকাল ন'টায় তাঁকে হত্যা করে। জান্দির হত্যাযজ্ঞের বিশ দিন পর পাকি বাহিনী নগরকান্দা আক্রমণ করে। পাকি বাহিনী গানবোট নিয়ে কোদালিয়া গ্রামে এসে অগ্নিসংযোগ করে। পুরুষদের না পেয়ে গ্রামের সব মহিলাকে স্কুলের মাঠে বসিয়ে সেজদা করায়। সেজদা দিয়ে বসামাত্র প্রায় দেড় শ' মহিলাকে তারা ব্রাশ ফায়ারে হত্যা করে। জানা যায়, স্বাধীনতার পর এই গ্রামে জীবিত কোন গৃহবধূকে পাওয়া যায়নি। শুধু হত্যা করেই তারা ক্ষান্ত হয়নি, হত্যার আগে তারা মেয়েদের ওপর পাশবিক নির্যাতনও চালিয়েছিল। আমার ভাইঝির ভাসুরের ছেলে হাবিবুরের স্ত্রীকে পাকি বাহিনী ধর্ষণ করে। গ্রাম আক্রান্ত হওয়ার সময় হাবিবুরের স্ত্রী ঘর লেপছিলেন। সুন্দরী, সুশ্রী সেই বউটির ওপর পাকি আর্মি ভয়ঙ্কর পাশবিক নির্যাতন চালায়। জান্দির মনু মিয়া জানান, আমি আঠাশ জনের লাশ দেখেছি সেদিন। পোদ্দার বাজারের ডান পাশে কালীঘরে বেশি লাশ ছিল। অধিকাংশ লাশের চোখ বাঁধা ছিল। সেই ভয়ঙ্কর বীভৎস দৃশ্যের বর্ণনা দেওয়া আমার পক্ষে সম্ভব নয়।

মঙ্গল চন্দ্র শীল বলেন, পাকিস্তানি সেনাদের হাতে নির্মমভাবে নিহত আঠাশ জনের লাশ দেখার পর, আমি পাকি বাহিনীর ভয়ে স্ত্রী ও বোনকে নিয়ে মোল্লাকান্দায় চলে যাই। সারা গ্রাম জুড়ে এমনভাবে লাশ পড়ে ছিল, যেটা বেশিক্ষণ দেখা আমার পক্ষে সম্ভব হয়নি। প্রত্যক্ষদর্শী গ্রামবাসীদের কাছ থেকে জানা যায়, আঠারোই বৈশাখ অর্থাৎ ১৯৭১ সনের মে মাসের প্রথম সপ্তাহের কোন এক রাতের শেষ প্রহরে পাকি বাহিনী জান্দি আক্রমণ করে। তারা নির্বিচারে আক্রমণ করে আঠাশ জন গ্রামবাসীকে হত্যা করে। এর মধ্যে পঁচিশ জনের নাম জানা যায়। এঁরা হলেন-১. টনিক সেন ২. উপেন কম্পাউন্ডার (টনিক সেনের বাবা) ৩. অটা ঠাকুর, ৪. সুধীর সেন ৫. আশ্রমের মহারাজ ৬. শংকর কুমার সেন ৭. গোবিন্দ ৮. বিনয় কুমার সেন ৯. সুধীর কুমার সেন ১০. সিস্টা সেন ১১. মধুসূদন সেন ১২. সোমেশ্বর সেন ১৩. কালাচাঁদ সেন ১৪. গুরু দাস ১৫. নিত্য সেন ১৬. মদিল সেন ১৭. জীবন কৃষ্ণ সেন ১৮. ননী গোপাল সেন ১৯. পচা সেন ২০. পান্না সাধু ২১. ধীরেন বণিক ২২. পঞ্চানন্দ ধুপি ২৩. শ্রীমন্ত দত্ত ২৪. মাধব দত্ত ২৫. নইদা বৈরাগী।

www.pathagar.com

কোদালিয়া হত্যাকাণ্ড প্রসঙ্গে শহীদ রহিমুন্নেসার সন্তান মিলু জানান, পাকিস্তানি আর্মি প্রথমবার নগরকান্দা কলেজের পার্শ্ববর্তী বালিয়া গ্রামে হামলা চালিয়ে ব্যাপক ধ্বংসযজ্ঞ চালায়। সেখান থেকে এগিয়ে গিয়ে ঈশ্বরদী গ্রামে বাড়িঘর জ্বালিয়ে ওরা চলে যায়। এরপর পয়লা জুন, বাংলা ষোলোই জ্যৈষ্ঠ মিলিটারিরা ঈশ্বরদী গ্রাম হয়ে কোদালিয়া আসে। নারী পুরুষসহ ত্রিশ জনকে সেদিন তারা হত্যা করে। ত্রিশ মে হত্যা করে সাদেক, পিপির উদ্দীন ও আফাজউদ্দীনসহ আরও কয়েকজনকে। নিলু জানান, পাড়ার সম্ভ্রান্ত পরিবার হিসেবে হয়তো আমাদের বাড়িতে কিছু করবে না, এ রকম মিথ্যে ধারণা থাকলেও ফিরে যাওয়ার মুহূর্তে মিলিটারিরা আমাদের বাড়িঘর জ্বালিয়ে দেয় এবং অনেককেই হত্যা করে। আমার মা, খালা, নানীসহ, অনেকেই সেদিন পাকি আর্মির হাতে শহীদ হন।

কোদালিয়া গ্রামের সুফিয়া বেগম বলেন, চারদিকে পাকি বাহিনীর অত্যাচারের খবর শুনে বাড়িতে মন টিকছিল না। বারবার স্বামীকে অনুরোধ করছিলাম, অন্য কোথাও নিয়ে যাওয়ার জন্য। কিন্তু স্বামীর একই কথা, সামনে বিল রয়েছে, এই দুর্গম স্থানে পাকিস্তানি মিলিটারি আসবে না। অগত্যা আমি দু'বাচ্চা নিয়ে একাই বাবার বাড়ি ছাগলদি চলে যাই। এর পরদিনই কোদালিয়া গ্রামে আর্মি আসে। আগুনের লেলিহান শিখা জ্বলতে দেখে উত্তভ্রান্ত হয়ে ওঠে আমার মন। তাণ্ডব কমলে বাবার বাড়ি থেকে দৌড়াতে দৌড়াতে গ্রামে ফিরে আসি। এসে দেখি আঠারো জন মহিলার লাশ পড়ে আছে। কারও মাথার অর্ধেক নেই, কারও চোখ নেই, কারও মুখ নেই। যাঁরা গুলি খেয়ে বেঁচে ছিলেন তাঁদের গোঙানির শব্দে বাতাস ভারী হয়ে উঠেছে। আহতরা সবাই পানি চাচ্ছিলেন। আমার চাচা শ্বশুরের মেয়েও আমাকে দেখে, "ভাবী, পানি দাও" বলে কাতরাচ্ছিলেন। বাড়িঘর সব পুড়ে শেষ হয়ে গেছে তখন। কোথাও পাত্র পাচ্ছিলাম না। শেষে হাঁসের পানি খাওয়ানোর বাটিতে করে কোনমতে পানি খাওয়াই তাঁদের। চারদিক তখন রক্তে ভেসে যাচ্ছিল। সেদিন বাড়ির পুরুষ যারা ছিল, সবাইকে ধরে নিয়ে যায় পাকিস্তানি নরপশুরা।

কোদালিয়া হত্যাকাণ্ডের আর এক প্রত্যক্ষদর্শী সোহরাব ফকির তখন গ্রামেই ছিলেন। তিনি বলেন, তিনি জানান মিলিটারি গ্রামে ঢুকে আগুন দেওয়া শুরু করলে লুকিয়ে পড়ি আমি। মহিলারা প্রাণের ভয়ে সবাই এক জায়গায় গিয়ে লুকান। সেখান থেকে তাঁদেরকে ধরে নিয়ে যায়। এদের সাথে বিশ তিরিশটা বাচ্চা ছিল। তাদেরকে খেলার নাম করে সরিয়ে দেয় পাকি সেনারা। এরপর মহিলাদের সারি বেঁধে দাঁড় করিয়ে মেশিনগান দিয়ে গুলি করে। প্রথম বার হয়ত আহত হয়েছিলেন অনেকে। দ্বিতীয় বার গুলি করলে বেশি মারা পড়ে এবং লাশগুলোও বিকৃত হয়ে যায়। মিলিটারি চলে যাওয়ার পর আমি বেরিয়ে আসি। কয়েকজনে মিলে কোনমতে গর্ত করে লাশগুলো মাটিচাপা দেই। আঠারো জন মহিলা ছাড়া সেদিন পাঁচ জন পুরুষও মারা গিয়েছিলেন।

পাকি সেনাবাহিনীর হত্যাযজ্ঞের সাক্ষী সুফিয়া বেগম। তিনি জানান, সকাল বেলা খাওয়া দাওয়ার সময় আমার এক দেবর এসে বলল যে, কালো কালো কতগুলো লোক এসেছে। দেড় শ'র মতো পাকিস্তানি সৈন্য তখন গ্রামের দু'পাশ দিয়ে ভেতরে ঢুকছে। একের পর এক বাড়িতে আগুন দিয়ে যাচ্ছিল তারা। এরই মধ্যে আমাদের

www.pathagar.com

বাড়িতে ঢুকে মান্দার গাছ তলায় বসে গাছ থেকে নারকেল, ডাব পেড়ে দিতে বলে। এদিকে তখন আমাদের পাশের ভিটেয় আগুনে পুড়ে মরছেন অসুস্থ দু'ভাই আফাজউদ্দীন ও আলফাজ উদ্দীন। ভয়ে সবাই একসঙ্গে লুকিয়ে ছিলাম। পাকি সেনারা সেখান থেকে ধরে নিয়ে আসে আমাদেরকে। ঈদের নামাজের জামাতের মতো লাইন করে বসিয়ে রাখে বিকেল পর্যন্ত। 'মৃত্যুর জন্য অপেক্ষা আর কি!' পাকিস্তানি সৈন্যদের একজন এক বালতি পানি এনে সবাইকে ওজু করতে বলে। তখন ভয়ে অনেকেই দরূদ পড়ছিলেন। কিন্তু 'মোনাফেক' খুনীদের দেওয়া পানিতে ওজু করতে রাজি হলেন না কেউ। এর পরপরই গুলি করা হয় আমাদের। কোমর এবং উরুতে তিনটি গুলি লেগেছিল আমার। তখন কিছুই দেখতে পাচ্ছিলাম না। শুধু দেখেছি গুলি করার পর বড় একটা শতরঞ্চি দিয়ে আমাদেরকে ঢেকে দিল ওরা। অনেকগুলো লাশের সঙ্গে ঢাকা পড়লাম আমিও। কীভাবে বাঁচলাম, কে বাঁচাল আজও জানি না।

কোদালিয়ার হাফিজুর রহমান চানুমিয়া বলেন, সকাল ন'টা দশটার সময় মিলিটারি গ্রামে ঢোকে। এর ক'দিন আগে মজিদ নামে একজনকে ধরে নিয়ে গিয়েছিল তারা। সে ছাড়া পেয়ে ছুটতে ছুটতে এসে খবর দেয় মিলিটারি আসছে। এ সময় চাচা-চাচি, চাচাতো ভাইবোন সবাই মিলে আমরা জঙ্গলে গিয়ে লুকিয়ে পড়ি। আমার চাচা হান্নান মিয়া "তোমরা বসো, আমি দেখে আসি" বলে জঙ্গল থেকে বেরিয়েই পাকি বাহিনীর হাতে ধরা পড়ে যান। এরপর আমরা জঙ্গলের আরও গভীরে চলে যাই। সেখানেও মহিলাদের দেখতে পাই আমরা। কিন্তু চারপাশ ঘিরে মহিলাদের ধরে ফেলে পাকি সেনারা। শিশুদেরকে মহিলাদের কাছ থেকে সরিয়ে দেয় তারা। বেশি বয়স্কদেরকেও আলাদা করে দেয়। দশ-বারো জন পুরুষকে ধরে লুটপাটের মাল বয়ে নেওয়ার কাজে নগরকান্দা পাঠায়। এদের মধ্যে আমার বাবা এবং চাচাও ছিলেন। এরপর আমাকেসহ দশ-এগারো বছরের বাচ্চাদের আলাদা করে বিলের পাশে বসায়। আমাদের দেখা শোনা ও বোঝানোর জন্য পাকিরা হান্নান চাচাকে পাঠিয়ে দেয়। তিন চার জন মিলিটারি শিশুদেরকে বিলের ওপারে নিয়ে যায়। বিশ মিনিট পর আমি দেখি যে, সব বাড়িঘর জ্বলছে। শিশুরা তখন মায়েদের জন্য কাঁদছে। আমিও সঙ্গের ছোট তিন ভাইবোনকে জড়িয়ে ধরে কাঁদতে থাকি। এর মধ্যে মেশিনগানের ব্রাশ ফায়ারের শব্দ হয়। অজানা আতঙ্কে বুক কেঁপে উঠে আমার। এরপর ছেড়ে দেওয়া হয় বাচ্চাদের। অনেক কষ্টে বিল সাঁতরে এপারে চলে আসতে সক্ষম হই আমরা।

এসে দেখি যে, শতরঞ্চি দিয়ে ঢেকে দেওয়া হয়েছে মা-বোনদের লাশগুলো। হাত পা নেই, বীভৎস সে দৃশ্য। মাকে পেয়ে জড়িয়ে ধরি আমি। দেখি যে, ছয়টা গুলি লেগেছে মার শরীরে, আমার চৌদ্দ পনেরো বছরের বোন রেক্সোনা তখন গুলিতে নিহত হয়েছে। চার পাঁচ বছরের চাচাতো বোন কলি, চাচি ফিরোজা বেগমও মারা গেছেন। কোনমতে মাকে নিয়ে সরে আসি আমি। আগুনের উত্তাপে তখন ঘরে টেকা যাচ্ছিল না। আমার মা রহিমা বেগম, বোন শিউলি এবং চাচাতো ভাই কচি মিয়া আহত অবস্থায় আজও বেঁচে আছেন।

পাকিদের হাতে বন্দী হওয়া এ কে এম আবু ইউসুফ সিদ্দিক বলেন, পাকিস্তানি আর্মি ও তাদের দোসরদের তাণ্ডবলীলা থেকে বাঁচার জন্য আমরা টুপি পরে বাইরে বের

www.pathagar.com

হতাম। এ রকম অবস্থার মধ্যে আমার বড় ভাই বেলায়েত হোসেন একদিন বললেন, 'ফরিদপুর শহরে যেভাবে লুটপাট চলছে, না জানি আমাদের গ্রামের বাড়ির কী হাল হয়েছে। চল বাড়িটা একবার দেখে আসি।' পরের দিন সকালে রাস্তায় বের হয়ে দেখি, পরিস্থিতি আমাদের ধারণার চেয়েও ভয়াবহ। ভাঙ্গা রোডের মোড় পেরিয়ে কিছুদূর এগুনোর পর দেখি, রাস্তার ওপর হারকান্দির যাত্রাভিনেতা মতি পাগলার লাশ পড়ে আছে। ডানদিকে তাকিয়ে দেখি, পাকি আর্মি তাদের সহযোগীদের নিয়ে মজিবর রহমান সিদ্দিকীর বাড়ি লুট করছে।

সেখান থেকে কিছুদূর যাওয়ার পর হঠাৎ তিনটি আর্মি ভ্যান এসে আমাদের পাশে দাঁড়িয়ে গেল। ভ্যানগুলোর ভেতরে অনেক আর্মি। প্রথমটার ভেতর থেকে একজন জিজ্ঞেস করল, 'ঘর কিধার হ্যায়?' আমি একটু চালাকি করে বললাম, 'এই বিহারি কলোনির পেছনে।' এ কথায় কাজ হল। গাড়ি সামনে চলতে শুরু করল। কিন্তু পেছনের গাড়িটা আমাদের পাশে এসে আবার ব্রেক করল। তারপর কোন কথা না বলে আমাদের দু'জনকেই উঠিয়ে নিল ভ্যানের ভেতর। গাড়ি বহর আবার চলতে শুরু করল। ভ্যানের পেছনের দিক খোলা থাকার কারণে আমরা বাইরের সব কিছুই দেখতে পাচ্ছিলাম। কিছুদূর যাওয়ার পর দেখি রাখাল ডাক্তারের বাড়ির সামনে দীনবন্ধু ও অন্ধ সাধুর লাশ পড়ে আছে। ব্রিজ পেরিয়ে দেখি, ডান পাশের পুরো মার্কেট আগুনে জ্বলছে। আর্মিই আগুন লাগিয়েছিল। তাদের বেশ ক'জনকে দেখলাম সেখানে দাঁড়িয়ে আছে। তাদের দেখে আমাদের গাড়ির গতি কমিয়ে দেওয়া হল। তারপর ভেতর থেকে এক আর্মি তাদের উদ্দেশ্যে বলল, 'দুটো পেয়েছি, নিয়ে যাচ্ছি।'

আমাদের গাড়ি গিয়ে থামল ফরিদপুর সার্কিট হাউজের ভেতরে। দেখলাম চেনা-অচেনা অনেককে সেখানে আটকে রাখা হয়েছে। আমাদেরকে একটা রুমের ভেতরে নিয়ে গেল। সেখানে পাকিস্তানি **মেজর আকরাম কোরেশী**র সঙ্গে আমাদের **মুসা বিন শমসের** ও নাজমা ক্লথ স্টোরের মালিককে দেখলাম খোশ গল্প করছে। এই মেজরকে তখন চিনতাম না, পরে নাম জানতে পেরেছি। সিএন্ডবি ও পাবলিক হেলথের দু'জন ড্রাইভার এবং অন্য ছ'জন আর্মিও সেখানে দাঁড়ানো ছিল।

"যাহোক কিছুক্ষণ পর সার্কিট হাউজে মেজর কোরেশীর রুমে আরও বারো-তেরো জন যুবককে ধরে আনল পাকি সেনেরা। তারপর তাদের সবাইকে বাইরে এনে রাস্তার পাশে লাইন করে দাঁড় করাল। আমরা রুমের ভেতর থেকেই সব দেখতে পাচ্ছিলাম। মুহূর্তের মধ্যে তাদের ওপর মেশিনগান চালিয়ে দেওয়া হল। আমরা চিন্তাই করিনি, এ রকম ভয়াবহ ঘটনা ঘটতে পারে। দেখলাম ধীরে ধীরে নিথর হয়ে আসছে দেহগুলো। আমাদেরও একই পরিণতি হবে ভেবে দু'ভাই ততক্ষণে কাঁপতে শুরু করেছি। এর পর তিন জন আর্মি আমাদের রুমে এসে ঢুকল। তাদের একজন বলল, আমাদেকে মারা হবে না। আরেকজন বলল, 'মারা হবে না মানে? আমি নয় আদমি মেরেছি, এই শালাদেরকেও মারব।' আমার তখন জ্ঞান হারানোর দশা। মুসা বিন শমসের আমাদেরকে ভালভাবেই চিনত। মেজর যখন আমাদের পরিচয় জিজ্ঞেস করল, তখন সে কোন কথাই বলল না। আর্মির সঙ্গে মুসার তখন অনেক খাতির।

www.pathagar.com

আমরা আশা করেছিলাম, সে কিছু একটা বলবে। কিন্তু তার মধ্যে কোন রকম প্রতিক্রিয়া দেখতে পেলাম না।

পাকিস্তানি আর্মি আমাদেরকে আলফাডাঙ্গা থেকে ধরে এনে ফরিদপুর স্টেডিয়ামের একটা অন্ধকার ঘরের ভেতর ঢোকাল। তারপর শুরু হল জীবন ও মৃত্যুর রশি টানাটানি। পাকিস্তানি আর্মির নির্যাতনের কথা এর আগ পর্যন্ত কেবল শুনেই এসেছিলাম। বন্দী হওয়ার পর তার রূপ দেখলাম। এই স্টেডিয়াম ছিল ফরিদপুরে আর্মির প্রধান নির্যাতন ও হত্যা কেন্দ্র। স্টেডিয়ামের কক্ষগুলো বন্দী নারী-পুরুষে সবসময় ভর্তি থাকত। আমি আটক হওয়ার ক'দিন পরেই মাদারীপুর থেকে বিশ জন যুবককে ধরে আনতে দেখলাম। এ ছাড়া আমার পরিচিত-অপরিচিত অনেক মানুষ আগে থেকেই স্টেডিয়ামে বন্দী ছিল। গুড়বাজারের দুলাল, কিসলু, বাদল, সৈয়দ মাসুদ, বোয়ালমারীর মোস্তফা, ভাঙ্গার ইপিআর সদস্য হানিফ, ঝালকাঠির মান্নান, কেরানীগঞ্জের মনসুর, গোপালগঞ্জের লুৎফর, সৈর্চা স্কুলের হেডমাস্টার, শাহজাহানের ছেলে কবির, কতজনের নাম বলব। এই বন্দীদের মধ্য থেকে প্রতিদিনই কয়েকজন করে গণহত্যার শিকার হত। খাবাশপুরের তানুকুল, কবির, লুৎফরকে হত্যা করা হয় হারুকান্দি ব্রিজের ওপর। একদিন বন্দীদের মধ্য থেকে ভাঙ্গার হানিফসহ বিশ জনকে জামতলা ব্রিজের ওপর নিয়ে যায়। ব্রিজের ওপর নিয়ে গুলি করবে বলে সবাইকে দাঁড় করায়। এমন সময় হানিফ হঠাৎ ব্রিজের নিচে লাফিয়ে পড়ে। তারপর সাঁতরে দূরে চলে যায়। আর্মি চেষ্টা করেও ওকে মারতে পারেনি। বাকি উনিশ জনের মৃতদেহ ভেসে যায় ব্রিজের নিচ দিয়ে বয়ে যাওয়া নদীর স্রোতে।

"বন্দী থাকা অবস্থায় আমাদেরকে খুব সামান্যই খাবার দেওয়া হত। কোন কোন দিন তো একটা রুটি খেয়েই পার করতে হয়েছে সারা দিন। অত্যাচারে অত্যাচারে শরীর বলে তো কিছু অবশিষ্ট ছিল না। ব্যথা আর যন্ত্রণায় উঠতে পারতাম না। তার উপর ক্রমাগত ক্ষুধার কষ্টে শরীর আরও কাহিল হয়ে পড়েছিল। সেই দিনগুলোতে বন্দীদের ওপর যে অত্যাচার করা হয়েছে, তার পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ দেওয়া সম্ভব নয়। মাঝে মাঝে পাকি সেনা এসে জিজ্ঞেস করত, 'কিয়া হাল হ্যায়?' আমরা মেঝের ওপর পড়ে কাতরাতাম। হয়তো এই আর্মিই কাল আমাদের পিটিয়েছে। কিন্তু 'খারাপ আছি' একথা বলার উপায় ছিল না। কেউ যদি যন্ত্রণা সহ্য করতে না পেরে বলে ফেলত যে সে খারাপ আছে, তাহলে আর রক্ষা ছিল না। ওরা বলত, 'শালা, ম্যায় চব্বিশ ঘন্টা ডিউটি করতা, মেরা হাল আচ্ছা হ্যায়, আর তুম শালা বোলতা হ্যায় আচ্ছা নেহি?' তারপর সবাইকে বুট দিয়ে মাড়াত। কারও ওপর বেয়নেট চার্জ করত, কারও কান কেটে দিত। কারও গলায় পোঁচ দিত। এমনকি অনেকের জিহ্বা কেটে নিতেও দেখেছি আমি। শরীরের বিভিন্ন জায়গায় বেয়নেট দিয়ে খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে লবণ আর মরিচের গুঁড়ো ঢুকিয়ে দিত। এ রকম অত্যাচারের অনেক চিহ্ন এখনও আমার পিঠে আছে।

"স্টেডিয়ামের যে কক্ষগুলোকে পাকি আর্মি নির্যাতন কেন্দ্র হিসাবে ব্যবহার করত, তার সামনেই ছিল চারু মজুমদারের বাড়ি। তাঁর বাড়ির অংশবিশেষ দখল করে মেজরের জন্য অফিস বানানো হয়েছিল। মজুমদার বাবুও বলতে পারতেন না, আর্মি কখন কাকে মারছে। প্রতি সন্ধ্যায় মেজর বন্দীশালার ভেতরে এসে বলত, 'ছে

www.pathagar.com

আদমিকো আপনা আপনা ঘরমে ভেজ দো। আর দো আদমিকো সাবাসাবাকে নাস্তা বানাও।' অর্থাৎ ছ'জনকে মেরে ফেল, আর দু'জনকে ছেড়ে দাও। নানারকম সাংকেতিক ভাষায় ওরা কথা বলত। কিন্তু এইসব কথাবার্তা আমরা এত বেশি শুনেছি যে, সব মুখস্ত হয়ে গিয়েছিল। যদি ছয় জনের অর্ডার হত, তবে ওরা বের করে নিত বিশ জনকে। স্টেডিয়ামের ভেতরে বেশিরভাগ বন্দীকে জবাই করে হত্যা করা হত। বর্ষার সময় ওই জায়গাটা পানিতে ভরে যেত। তখন ভাঙ্গা ব্রিজ, কামারখালীর ডক প্রভৃতি জায়গাতে নিয়ে তাদেরকে হত্যা করা হত।

"ফরিদপুরে স্টেডিয়ামে অন্তত এক শ' পঁচিশ জন মহিলা বন্দী ছিলেন। আমাদের পাশের রুমেই তাদেরকে গাদাগাদি করে রাখা হয়েছিল। আমরা রুমের ভেতর থেকেই তাঁদেরকে দেখতে পেতাম। তাদের ওপরেও সীমাহীন অত্যাচার চালানো হয়েছিল। আর্মির তো বিবেক বলে কিছু ছিল না। ধর্ষণের পর বেয়নেট দিয়ে অনেকের স্তন কেটে ফেলত, যৌনাঙ্গে রাইফেলের নল ঢুকিয়ে গুলি করত। অত্যাচারে অত্যাচারে ছিন্নভিন্ন করে ফেলত তাঁদের দেহ। এসব আমরা চোখের সামনেই ঘটতে দেখেছি। সব ঘটনা তো ভাষায় বর্ণনা করা যায় না। প্রকৃত ঘটনার অতি সামান্যই বলতে পারলাম। নির্যাতিতদের মধ্যে যাদের কথা বলার শক্তি অবশিষ্ট থাকত, তাঁদের কেউ কেউ আমাদের উদ্দেশ্যে চিৎকার করে বলতেন, 'ভাই, আমরা তো মরে যাব, আপনাদের কেউ যদি এই মৃত্যুপুরী থেকে বেঁচে যান, তাহলে আমার মৃত্যুর সংবাদটা আমার বাড়িতে পৌঁছে দেবেন।'

"এই মহিলাদের অনেককেই আমি চিনতাম। ফরিদপুরসহ আশেপাশের বিভিন্ন এলাকা থেকে তাদেরকে ধরে আনা হয়েছিল। নগরকান্দা, বোয়ালমারী প্রভৃতি এলাকার মেয়েদেরকেও আমি সেখানে দেখেছি। তবে শহরের মেয়ে ছিল খুব কম। বেশিরভাকেই বাইরে থেকে ধরে আনা হয়েছিল। এ কারণে সবাইকে চিনতাম না। কারও নাম পরিচয় জিজ্ঞেস করারও কোন উপায় ছিল না। সবাইকে উলঙ্গ করে রাখা হত। কী যে বীভৎস দৃশ্য! সেইসব দৃশ্য যারা দেখেনি, যেভাবেই বর্ণনা করা হোক না কেন, প্রকৃত অবস্থা তাদেরকে কিছুতেই বোঝানো যাবে না। বন্দী অসহায় সেইসব মেয়ের শরীরের ওপর জানোয়ার পাকিস্তানি আর্মির সেই বীভৎস অত্যাচারের দৃশ্যগুলো আমি কখনও ভুলতে পারব না। এসব বর্ণনা করতে গেলে আমার হাত-পা কাঁপতে থাকে, শরীরের পশম শক্ত হয়ে দাঁড়িয়ে যায়। আমার কণ্ঠ রোধ হয়ে আসে। মনে হয় কেউ যেন আমার গলা চেপে ধরেছে। সে সময় আর্মির অত্যাচারের দৃশ্য দেখে দেখে আমি ভেবেছি 'মানুষ কি সত্যিই সৃষ্টির সেরা জীব'?

"পাকি সেনারা বাঙালি মেয়েদেরকে মুরগি বলে ঠাট্টা করত। শহর থেকে ধরে আনা মেয়েদেরকে রুমের ভেতরে ঢোকাতে ঢোকাতে বলত, 'বাঙালি আওরাত, তুম আগে যাও। তুমহারা বাঙালি ভাইকো হাম রুপিয়া দিতা হ্যায়। ওহ মেরা পাস মুরগি দিয়া যাতা হ্যায়।' আর্মি সাধারণত সন্ধ্যা সাতটা থেকে রাত দশটা পর্যন্ত মেয়েদের ওপর নির্যাতন চালাত। যে রুমটাতে নির্যাতন করা হত, সেখানে নীল বাতি জ্বলত। বড়

www.pathagar.com

অফিসার, ছোট অফিসার, সেপাই কেউই বাদ যেত না। সবাই ছিঁড়ে খুঁড়ে খেয়ে ফেলতে চেষ্টা করত মেয়েগুলোকে। তবে সুবেদার, মেজর শ্রেণীর আর্মিই অত্যাচার করত বেশি। খুব বড় অফিসাররা আবার প্রতি রাতে দু'চার জনকে বাংলোয় নিয়ে নির্যাতন করত।

"দীর্ঘদিন আর্মির ক্যাম্পে বীভৎস অত্যাচার সয়ে সয়ে আমি নিজেও ভীষণ অসুস্থ হয়ে পড়েছিলাম। টর্চার করতে করতে তো আমাকে প্রায় মেরেই ফেলেছিল তারা। এক ক্যাম্প থেকে অন্য ক্যাম্পে নিয়ে গেছে, আর টর্চারের নতুন মাত্রা যোগ করেছে। তারপর আগস্টের শেষ দিকে একান্তই ভাগ্যক্রমে আমি যশোর ক্যান্টনমেন্ট থেকে ছাড়া পাই। আমাকে বাঁচিয়ে দিয়েছিল এক বেলুচ **সেপাই রশিদ খান**। সেলের ভেতরে এসে সে আমাদেরকে বলত, 'মেরা ছোটা একটা ভাই আছে, বোন আছে, আমি কোন বাঙালি মারব না। আমরা সাত ভাইয়ের মধ্যে দু'জন মাত্র বেঁচে আছি। আমি কোন বাঙালি মারব না।' সে আমাদের ওপর নির্যাতন চালিয়েছিল ঠিকই, কিন্তু এ কারণে তাকে অনুশোচনা করতেও দেখেছি। ঠিকমত টর্চার না করলে অফিসাররা তাকে বকাঝকা করত, ডিউটি থেকে সরিয়ে দিত। একদিন রশিদ আমাদের ক'জনকে বেশ মারধর করল। তারপর আমাকেসহ সাতজন বন্দীকে সাতটা চটের বস্তায় ভরে রাগে গজরাতে গজরাতে অন্য সেনাদের শুনিয়ে বলতে লাগল, 'এদেরকে কুত্তা দিয়ে খাওয়াব ...।' টানতে টানতে এই সাতটা বস্তা সে কিভাবে যশোর ক্যান্টনমেন্ট এরিয়ার বাইরে নিয়ে এসেছিল, ভাবতে এখনও আমার বিস্ময় লাগে। ক্যান্টনমেন্টের বাইরে এনে বস্তার মুখগুলো খুলে দিয়ে সে বলল, 'আমি ছিলাম সুবেদার মেজর, কিন্তু এরা এখানে আমাকে সেপাই বানিয়ে রেখেছে। আমি কাউকে হত্যা করব না। আমি তোমাদের সবাইকে বাঁচিয়ে দিলাম। যাও, ভাগো।' ফরিদপুর স্টেডিয়ামেই আমি বেশিদিন আটক ছিলাম। সেখানে পাঁচ থেকে ছ' শ' পুরুষ এবং অন্তত এক শ' মহিলাকে হত্যা করা হয়েছে বলে আমি জানি।

মোঃ আবুল ফয়েজ বলেন, একুশে এপ্রিল সন্ধ্যার দিকে পাকি আর্মি ফরিদপুরে প্রবেশ করে। এখানে তারা ব্যাপক গণহত্যা ও ধর্ষণ চালায়। তখন ফরিদপুরের এমন কোন মহল্লা ছিল না, যেখানে নির্যাতন বা হত্যাকাণ্ড ঘটানো হয়নি। শুধু তাই নয়, ফরিদপুরে এমন কোন মহল্লা নেই যেখানে সাধারণ সিপাইরা ঢুকে দু' চার জন নারী নির্যাতন করেনি। স্বাধীনের পরে ওই সব সম্ভ্রান্ত পরিবারের লোকজন তাদের মেয়েদের ধর্ষণের কথা এড়িয়ে গেছেন। লজ্জা ও সামাজিক সমস্যার কারণে এই বিষয়গুলো চেপে যাওয়া হয়েছে। আজও অনেকে মুখ খুলতে চান না। সত্যি কথা বলতে কি, এই দেশে অনেক প্রভাব প্রতিপত্তিশালী লোক আছেন, যাদের মাকে ও কন্যাকে পাকি সেনা এক সাথে ধর্ষণ করেছে। লোকলজ্জার কারণে এগুলো কেউ বলে না। আনুমানিক চল্লিশ হাজার থেকে পঞ্চাশ হাজার নারী এখানে নির্যাতিত হয়েছেন। কেউ শারীরিক ভাবে নির্যাতিত হয়েছেন, কেউ রেপড হয়েছেন, কেউ আহত হয়েছেন। নির্যাতনের ধরন অনেক রকম ছিল।

www.pathagar.com

আসামীঃ মেজর চীমা খান

অপরাধের ধরনঃ গণহত্যা, জাতিগত নিধন, ধর্ষণ, লুটপাট, অগ্নিসংযোগ।

ঘটনাকালঃ একাত্তরের সতেরোই এপ্রিল থেকে ডিসেম্বর পর্যন্ত।

ঘটনাস্থল ঃ রাজবাড়ি।

সূত্রঃ যুদ্ধাপরাধ গণহত্যা ও বিচারের অন্বেষণ এবং WCFFC গবেষণা।

সতেরোই এপ্রিল পাকি বাহিনী গোয়ালন্দ ঘাটে এসে পৌছায়। ওইদিন তাদের গুলিতে শহীদ হন আনসার কমান্ডার মহিউদ্দীন। মেজর চিমার নেতৃত্বে পাকি বাহিনী গোয়ালন্দ আসে। বাইশে এপ্রিল পাকি বাহিনী চীমা খানের নেতৃত্বে ব্যাপক গুলিবর্ষণ, অত্যাচার ও লুটতরাজ করতে করতে রাজবাড়ি শহরে প্রবেশ করে। পাকি বাহিনী রাজবাড়ি জেলায় হাজার হাজার লোককে হত্যা ও নির্যাতন করে। ধর্ষণ করে শত শত মা বোনকে। রাজবাড়ি রেলগেটে পাকি বাহিনীর সামনে একজন পাগল 'জয় বাংলা' বলে চিৎকার করে উঠলে সাথে সাথেই তাঁকে গুলি করে হত্যা করা হয়। হাকিম মিয়া, সালাম মিয়াসহ রেলওয়ে কলোনির অসংখ্য বাঙালি সেদিন পাকি বাহিনীর হাতে নিহত হন।

আসামীঃ মেজর সেলিম, মেজর খটক, মেজর মঞ্জু।

অপরাধের ধরনঃ গণহত্যা, জাতিগত নিধন, ধর্ষণ, লুটপাট, অগ্নিসংযোগ।

সাক্ষী ঃ আবদুর রব হাওলাদার, চৌধুরী বাবু নুরুল আলম, আলহাজ্ব আনোয়ার ফরাজী।

ঘটনাকালঃ একাত্তরের এপ্রিল থেকে ডিসেম্বর পর্যন্ত।

ঘটনাস্থল ঃ মাদারীপুর।

সূত্রঃ যুদ্ধাপরাধ গণহত্যা ও বিচারের অন্বেষণ এবং WCFFC গবেষণা।

চব্বিশে এপ্রিল পাকি বাহিনী মাদারীপুর শহরে প্রবেশ করে এমপি আসমত আলী খান, ফণীভূষণ মজুমদারের বাড়িসহ বহু বাড়ি ও দোকানপাটে অগ্নিসংযোগ করে এবং লুটপাট চালায়। অক্টোবরের মাঝামাঝি কোন একদিন ভোরে পাকি বাহিনী ঘটকবর গ্রামে আক্রমণ চালায়। তারা নিরীহ গ্রামবাসীদের যাঁকে যে অবস্থায় পায়, গুলি করে হত্যা করে। প্রতিটি বাড়িতে আগুন লাগায়। ক্যাম্প এলাকার দু'শ'র বেশি নারী, পুরুষ ও শিশুকে তারা হত্যা করে। কয়েকজন প্রত্যক্ষদর্শীর জবানবন্দী এখানে তুলে ধরা হল।

স্থানীয় বাসিন্দা ও রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব আলহাজ্ব আনোয়ার ফরাজী বলেন, একাত্তরে আমি মাদারীপুর জেলা আওয়ামী লীগের দপ্তর সম্পাদক ছিলাম। এ কারণে

www.pathagar.com

মুক্তিযুদ্ধের সাংগঠনিক কর্মকাণ্ডের ব্যাপারে আমার দায়িত্বও ছিল অনেক বেশি। পাকিস্তানি হানাদাররা মাদারীপুর আক্রমণ করলে বড় ছেলে সিরাজুল ইসলাম ফরাজীকে সাথে নিয়ে আমি মুক্তিযুদ্ধে যোগ দিই। সে সময় আমাকে এখানকার কন্ট্রোল রুম নিয়ন্ত্রণের দায়িত্ব পালন করতে হত বলে মাদারীপুরের আনাচে কানাচে লুকিয়ে থাকতে হত। যুদ্ধের ন'মাসে তারা তিন বার আমার বাড়িঘর ভাঙচুর করে। বাড়ির বহু গাছ-গাছালি কেটে ফেলে এবং শেষে আগুন লাগিয়ে সব ছারখার করে দেয়। এর মধ্যে জুন মাসে কয়েকজন রাজাকার আমাকে ধরে ফেলে। আর্মি আমাকে মাদারীপুর এ আর হাওলাদার জুট মিলে বন্দী করে। ওই মিলের ডি-টাইপ কোয়ার্টারের ছোট একটি রুমে আরও অনেক বন্দীর মধ্যে আমার জায়গা হয়।

"এ আর হাওলাদার জুট মিল ছিল একাধারে পাকি আর্মির ক্যাম্প, বন্দিশালা, নির্যাতন ও হত্যা কেন্দ্র। বিভিন্ন এলাকা থেকে নিরীহ মানুষদেরকে ধরে এনে এখানে নির্যাতন শেষে হত্যা করা হত। আমি চার থেকে পাঁচ শ' লোককে এখানে বন্দী অবস্থায় দেখেছি। প্রতিদিন রাত আটটার পর থেকে বন্দীদের ওপর নির্যাতন শুরু হত। ভারী বুটের লাথি, রাইফেলের বাঁট, বাঁশ প্রভৃতি দিয়ে পেটানো শুরু হত এবং অজ্ঞান না হওয়া পর্যন্ত সেটা চলত। হাওলাদার জুট মিলে আমি দুই মাস বন্দী ছিলাম। এই দু'মাস পাকিস্তানি আর্মি আমার ওপর যে বীভৎস নির্যাতন চালায়, তার বর্ণনা দেওয়ার মতো ভাষা আমার জানা নেই। শুধু নির্যাতন করেই তারা ক্ষান্ত হয়নি, আমাকে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করেছিল। শুধুমাত্র খোদা তা'লার অশেষ রহমতেই আমি ওই মৃত্যুপুরী থেকে বেরিয়ে আসতে পেরেছিলাম।

"যাহোক, বন্দী হওয়ার পরদিন আমাকে জুট মিলের ভেতরে এক মেজরের রুমে নিয়ে যাওয়া হল। পরে জেনেছি তার নাম মেজর সেলিম। সে প্রথমেই আমাকে জিজ্ঞেস করল, 'ইসকো ক্যায়া খবর?' তখন পাশে উপস্থিত দু'জন লোক আমাকে দেখিয়ে বলল যে, আমি আওয়ামী লীগের দপ্তর সম্পাদক। মুক্তিবাহিনীর লোক, কন্ট্রোল রুম পরিচালনা করি ইত্যাদি।

"মেজর সেলিম আমার মুখ থেকে তথ্য বের করার জন্য অনেক চেষ্টা করল। আমি জানতাম একবার স্বীকারোক্তি নিতে পারলে ওরা আমাকে নিশ্চিত মেরে ফেলবে। পরদিন রাত আটটায় আমাকে নিয়ে যাওয়া হল টর্চার সেলে। শুরু হল বীভৎস নির্যাতন। এক পর্যায়ে আমার মাথার তালুতে রাইফেলের বাঁট দিয়ে প্রচণ্ড জোরে আঘাত করলে আমি জ্ঞান হারিয়ে ফেলি। এরপর ওরা আমাকে নিয়ে কী করেছিল, তা বলতে পারব না। জ্ঞান ফিরলে দেখি, আমি সেলের ভেতরে অন্য বন্দীদের মধ্যে পড়ে আছি। বিকেলের আলোর রেশ এসে পড়ছে কোয়ার্টারের ভেতরে। এর মধ্যে রাত দিন পেরিয়ে গেছে বেহুঁশ অবস্থায়। তৃষ্ণায় বুক ফেটে যাচ্ছিল। এক আর্মির কাছে পানি খেতে চাইলাম। কিছুক্ষণ পর সে একটা কাচের গ্লাসে করে পানি নিয়ে এল। স্বচ্ছ কাচের গ্লাসে পানি দেখে তৃষ্ণা যেন আরও বেড়ে গেল। আমাকে এত বেশি মারপিট করেছিল যে, মেঝে থেকে উঠে বসার মতো ক্ষমতাও আমার ছিল না। তবু ওই অবস্থাতেই গ্লাস নেওয়ার জন্য হাত বাড়ালাম। কিন্তু বর্বর পাকিস্তানি আর্মি গ্লাসটা আমার হাতে না দিয়ে পুরো পানিটা নোংরা মেঝের ওপর গড়িয়ে দিল। তারপর হো হো করে হাসতে লাগল। সে-যে-কী কষ্ট আর অপমান, তা ভাষায়

www.pathagar.com

প্রকাশ সম্ভব নয়। কিন্তু আমি এত বেশি তৃষ্ণার্ত ছিলাম যে, ওই নোংরা পানিই মেঝে থেকে চেটে চেটে খেতে লাগলাম।

"হাওলাদার জুট মিলের ধার ঘেঁষে গেছে বড় একটা নদী। এই নদীর পাড়ে মিলের জেটিটি ছিল আর্মিদের গণহত্যার মূল কেন্দ্র। বন্দী লোকদের ধরে নিয়ে প্রতিদিনই সেখানে হত্যা করা হত। আমি আটক হওয়ার কয়েকদিন পরের একটি ঘটনা আপনাদেরকে বলছি। সেদিন পাকিস্তানি সেনারা কোয়ার্টারের ভেতরের বন্দীদের পেটাতে পেটাতে বাইরে নিয়ে গেল। আমিসহ তেরো জন কোয়ার্টারের ভেতরেই রয়ে গেলাম। আমাদেরকে বাছাই করে আলাদা করে রাখা হল। সম্ভবত ওরা ধারণা করেছিল, যে কোন উপায়েই হোক আমাদের কাছ থেকে তারা তথ্য আদায় করবে। ওইদিন আমি ডি-টাইপ কোয়ার্টারের খোলা জানালায় দাঁড়িয়ে দেখতে লাগলাম রক্তপিপাসু পাকিস্তানি আর্মির গণহত্যার বীভৎস দৃশ্য। বন্দীদের সবার চোখ ও হাত বাঁধা, লাইন করে নিয়ে গেল নদীর পাড়ের জেটির ওপর। সবাইকে লাইনে দাঁড় করাল সেখানে। সামনে মেশিনগান হাতে প্রস্তুত পাকিস্তানি আর্মি। কী যে বীভৎস দৃশ্য! আমি প্রার্থনা করেছি, 'হে আল্লাহ, এই দৃশ্যটা তুমি মিথ্যে করে দাও। এই দৃশ্য যেন কিছুতেই সত্যি না হয়।' কিন্তু আল্লাহ আমার আকুতি গ্রহণ করলেন না। চোখ বাঁধা, হাত বাঁধা সারি সারি বন্দীর ওপর ব্রাশ ফায়ার শুরু হল। উহ্ খোদা, কত যে রক্ত আর মরণ চিৎকার! পানির খুব কিনারে নিয়ে গুলি করায় গুলিবিদ্ধ দেহগুলো কাটা কলাগাছের মতো নদীতে গিয়ে পড়ছিল। যারা জেটির ওপরে পড়ছিল, তাদেরকে লাথি দিয়ে পানিতে গড়িয়ে দেওয়া হচ্ছিল। কোয়ার্টারের জানালায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে আমি এই অসহ্য দৃশ্য প্রত্যক্ষ করতে লাগলাম। এভাবে মাত্র কয়েক মিনিটের মধ্যে নিভিয়ে দেওয়া হল কয়েক শ' মানুষের জীবন প্রদীপ!

"এর মধ্যে অবশ্য আরেকটি ঘটনা ঘটল। চোখ বাঁধা কিছু লোককে জেটির ওপর গুলি না করে ডি-টাইপ বিল্ডিংয়ের আঙিনায় নিয়ে আসা হল। আর্মি তাদের কয়েকজনের বাঁধন খুলে দিল। তারপর তাদেরকে দিয়ে ফাঁকা একটা জায়গায় বুক পর্যন্ত গভীর করে গর্ত খোঁড়াল। এরপর পুনরায় তাদের হাত পা বেঁধে একযোগে ব্রাশফায়ার করল। খুব অল্প সময়ের মধ্যেই এই নৃশংস ঘটনাগুলো ঘটে গেল। গুলি করার পর এক এক করে মৃত কিংবা অর্ধমৃত দেহগুলোর পা ওপরের দিকে এবং মাথা নিচের দিকে দিয়ে ওই গর্তে নামাতে লাগল। সবাইকে গর্তে নামানো হলে আর্মি বড় কোদাল দিয়ে গর্তটি ভরাট করে ফেলল। কিন্তু তখনও মাটির ওপর অনেকের পা বেরিয়ে। এতগুলো পা অল্প একটু জায়গার মধ্যে, অদ্ভুত আর বীভৎস সেই দৃশ্য! হঠাৎ খেয়াল করলাম, নীল রঙের প্যান্ট পরা এক জোড়া পা খুব কাঁপছে। সেটা ছিল সম্ভবত রাজুরী গ্রামের রিয়াজের পা। ওর নীল রঙের প্যান্ট পরা ছিল। তারপর আস্তে আস্তে সব নিস্তেজ হয়ে এল। গভীর অন্ধকার নেমে এল পুরো মিলের কোয়ার্টারের ভেতরে। আমরা অবশিষ্ট তেরোটা প্রাণী সেই অন্ধকারের ভেতরে বসে বসে ভয়াবহ মৃত্যুর ক্ষণ গণনা করতে লাগলাম।

"সেপ্টেম্বরের দিকে পাকিস্তান সরকার কিছু বাঙালি রাজনৈতিক বন্দীর জন্য সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা করে। বহির্বিশ্বে যুদ্ধ বিধ্বস্ত বাংলাদেশের পরিস্থিতি স্বাভাবিক দেখানোর জন্যই এটা করা হয়েছিল এবং সত্যি সত্যিই কিছু সংখ্যক বন্দীকে তারা মুক্তি

www.pathagar.com

দিয়েছিল। মুক্তি দিতে বাধ্য হয়েছিল তারা। আমি ভাগ্যবান ছিলাম, তাই ওই সাধারণ ক্ষমার মধ্যে আমাকেও তারা ছেড়ে দিয়েছিল। আমার পরিবারের সদস্যরা ধরেই নিয়েছিল যে, আমি বেঁচে নেই। কারণ জুট মিলের ভেতর থেকে জীবিত ফিরে আসার ঘটনা তার আগে কখনও ঘটেনি।

"হাওলাদার জুট মিলে আমি দু'মাস আটক ছিলাম। যখন ধরা পড়ি তখন ওই ঘাঁটির দায়িত্বে ছিল **মেজর সেলিম**, আর যখন ছাড়া পাই তখন ছিল **মেজর খটক**। খটকের রাজকীয় গোঁফের কথা এখনও আমার মনে পড়ে। তার ভয়ঙ্কর চেহারাটা সবসময় চোখের সামনে ভাসে। তাকে দেখলে এখনও আমি নিশ্চিত চিনতে পারব। মিলচত্বরে চার থেকে পাঁচ শ' বাঙালিকে হত্যা করে মাটিচাপা দেয়া হয় বলে আমার ধারণা। যাদেরকে হত্যা করা হয়েছে, সাধারণত তাদেরকে দিয়েই গর্ত খোঁড়ানো হয়। তবে হত্যাকাণ্ডের প্রকৃত সংখ্যা আরও অনেক বেশি হবে। বহু মৃতদেহ ভেসে গেছে নদীর স্রোতে। এখানে মোট হত্যাকাণ্ডের মাত্র এক-চতুর্থাংশ মৃতদেহ সমাহিত হয়ে থাকতে পারে। নড়িয়া গ্রামের বাদশা, রাজুরী গ্রামের আসলাম, রাজ্জাকসহ আমার পরিচিত অনেককে এই জুট মিলে বন্দী দেখেছি। পরে তাদের আর কারও খোঁজ পাইনি।

"মুক্তিযুদ্ধের ন'মাসে মাদারীপুরে ব্যাপক নারী নির্যাতনের ঘটনা ঘটে। হাওলাদার জুট মিলে আমি নিজে শতাধিক মহিলাকে বন্দী অবস্থায় দেখেছি। মাদারীপুরের বিভিন্ন গ্রাম, পার্শ্ববর্তী আঙ্গারিয়াসহ বিভিন্ন এলাকা থেকে মহিলাদের সেখানে ধরে আনা হত। ডি-টাইপ কোয়ার্টারের জানালা দিয়ে আমরা তাদের দেখতে পেতাম। আমার চেনা জানা তেমন কাউকে সেখানে দেখিনি। তবে জেলারের মেয়ে দুটোর কথা খুব ভাল মনে আছে। পাকি সেনারা কী যে দুর্বিষহ অবস্থা করেছিল তাদের, তা বলে বোঝানো যায় না। আরেকজন মহিলার কথা মনে আছে, মিলের ভেতরে আর্মিদের একটা রুম থেকে তাঁকে বিধ্বস্ত অবস্থায় বেরিয়ে আসতে দেখেছিলাম। তাঁর ছেলের সঙ্গে আমার ভাল পরিচয় ছিল। এই মহিলা পরবর্তীতে আমাকে জানান, আর্মি রাতের বেলা বন্দী মেয়েদের ওপর ভয়ঙ্কর পাশবিক নির্যাতন চালিয়ে তারপর দিনের বেলা তাদের অনেককেই গুলি করে হত্যা করত। জেলারের মেয়ে দুটোকে এভাবেই হত্যা করা হয়। তিনি দৃঢ় কণ্ঠে বলেন, বর্বর পাকিস্তানি আর্মি ও তাদের দোসরদের এই সীমাহীন নৃশংসতা, হত্যা, গণহত্যা, নারী নির্যাতন, ধ্বংসযজ্ঞসহ সকল অপরাধের বিচার চাই আমি। আমি অবশ্যই বিচার চাই। প্রত্যেকটা হত্যার বিচার চাই ও প্রত্যেকেটা নির্যাতনের বিচার চাই।

মাদারীপুরের আবদুর রব হাওলাদার বলেন, বাইশে এপ্রিল দুপুরে পাকি আর্মি মাদারীপুরে ঢোকে। মাদারীপুরে ঢুকেই তারা বাড়িঘর সব জ্বালিয়ে দেয়। ঢাকা ও যশোর থেকে তারা এখানে আসে। তখন আমি এ আর হাওলাদার জুট মিলে চাকরি করতাম। আর্মি যখন আসে, তখন আমরা বাড়িঘর ছেড়ে দূরে চলে যাই। তারা এখানে আসার পরপরই এ আর হাওলাদার জুট মিলের ডি টাইপ কোয়ার্টারে আশ্রয় নেয়। ওই কোয়ার্টারের অধিবাসীদের তাড়িয়ে দিয়ে সেখানে ক্যাম্প করে। কোয়ার্টারের পেছনে একটা টিনশেড কোয়ার্টারকে জল্লাদখানা বানায়। সেখানেই বাঙালিদের হত্যা করা হত। তবে শুধু জল্লাদখানায় নয়, তারা অন্যান্য জায়গায় হত্যাকাণ্ড চালাত। মিলের জেটির ওপর দাঁড় করিয়ে অনেক লোককে তারা হত্যা

www.pathagar.com

করে। জেটির ওপর থেকে গুলি করে নদীতে ফেলে দিত। এ ছাড়া বর্তমানে নতুন মিলের যে বাংলো হয়েছে, তার পাশে লাশ মাটিচাপা দিয়ে রাখত। আমি অনেক ঘটনা নিজের চোখে দেখেছি। একদিন সন্ধ্যার আগে চার জন হানাদার তেরো জন বাঙালিকে গুলি করে হত্যা করে। সঠিক তারিখ মনে নেই। তবে বাইশে এপ্রিলের পরের ঘটনা সেটি।

ঘটনাটা ছিল এরকম যে যাকে দিয়ে গর্ত করিয়েছে, তাকে হত্যা করেই সেই গর্তে ফেলেছে। আবার আরেকজনকে দিয়ে সেই লাশ মাটিচাপা দিয়ে আবার তাকেই হত্যা করে সেখানে ফেলেছে। তবে আমি সেই তেরোজন লোকের নাম জানতাম না। তাঁদেরকে গ্রামগঞ্জ থেকে ধরে এনে এখানে হত্যা করা হয়। আমাদের এখানকার হোসেন মাতব্বরকেও তারা ধরে এনেছিল। তাঁর সুন্দর দাড়ি ছিল। সেলুনে নিয়ে তাঁরা সেই দাড়ি কেটে ফেলে, কিন্তু গোঁফ রেখে দেয়। এরপর নমশূদ্রের মালা পরিয়ে তাঁর ওপর ভয়ঙ্কর নির্যাতন চালায়। তিনি খুব বীর পুরুষ ছিলেন। তাদের নির্দয় প্রহারে তিনি একটুও কাঁদেননি, এমনকি উহ্ আহ্ পর্যন্ত করেননি। তিনি জানতেন তাঁকে তারা হত্যা করবে, তবু তিনি কিছু বলেননি। তাঁকে দিনভর পিটিয়ে রাতে গুলি করে হত্যা করা হয়। সাত্তার মাতব্বরকেও তারা এভাবে পিটিয়ে হত্যা করে। অসংখ্য লোককে তারা এভাবে হাওলাদার জুটমিল ও পার্শ্ববর্তী এলাকাতে হত্যা করেছে, যার সঠিক সংখ্যা কোনভাবেই বের করা সম্ভব হবে না। তবে আনুমানিক দশ সহস্রাধিক লোককে পাকি আর্মি এখানে হত্যা করে।

মাদারীপুরে জেলারের পরিবারটিকে নির্যাতন, ধর্ষণের পর হত্যা করা হয়। তাঁর এক মেয়ে আওয়ামী লীগ করতেন। তিনি নাজিমুদ্দিন কলেজের একটি হলের দায়িত্বে ছিলেন। তাঁর নাম ছিল সুফিয়া। তাঁর নেতৃত্বে পুরো মাদারীপুরবাসী পাকিস্তানি সামরিক জান্তার বিরুদ্ধে বিক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে। যুদ্ধ শুরু হয়ে গেলে তাঁরা সবাই গ্রামে পালিয়ে যান। কিন্তু আর্মির সহযোগী একটি কুচক্রী মহল, তাঁদেরকে কিছু বলা হবে না, আপনি নির্ভয়ে জেলারের দায়িত্ব পালন করবেন ইত্যাদি প্ররোচনা দিয়ে পরিবারসহ তাঁকে গ্রাম থেকে মাদারীপুর নিয়ে আসে। এই প্ররোচনায় পড়ে জেলারের ফ্যামিলি মাদারীপুর এলে তাঁদের ওপর ভয়াবহ নির্যাতন চালিয়ে হত্যা করা হয় তাঁদের। জেলার, তাঁর দুই ছেলে ও স্ত্রীকে সাথে সাথে হত্যা করা হলেও সুফিয়া ও তাঁর অন্য একটি বোনকে অনেক দিন আটক রেখে ধর্ষণ ও নির্যাতনের পর হত্যা করে। জেলারের পরিবারকে যারা গ্রাম থেকে ফুসলিয়ে নিয়ে আসে, তাদের মধ্যে **আবদুল হামিদ খন্দকার** নামে একজন ছিল। সে তখন পিডিবিতে চাকরি করত।

শুধু যে তারা গ্রামগঞ্জ থেকে লোকজন ধরে এনে হত্যা করত, তা নয়। মিলের যে জেটি দিয়ে মাল সরবরাহ করা হত, সেখানে আর্মি দাঁড়িয়ে থাকত। যদি কোন নৌকা বা লোককে সন্দেহ হত, তখন চেক করত এবং হিন্দু লোক পেলে হত্যা করত। এ ছাড়া তারা স্পিডবোটে বিভিন্ন জায়গায় গিয়ে মানুষ হত্যা করত। এভাবে মিঠাপুর গ্রামে গিয়ে তারা অনেক লোককে হত্যা করে। আমাকে একটা লোক ঘি দিত। সে আর্মির হাত থেকে বেঁচে আসতে পেরেছিল। যেখানে তার গুলি লেগেছিল, সেখান থেকে অনেকখানি মাংস ছিঁড়ে গিয়েছিল। তখন বর্ষাকাল ছিল। তারা যত লাশ মাটিচাপা দিয়েছিল, তার চেয়ে বেশিসংখ্যক লাশ নদীতে ফেলে দিয়েছিল। এ ছাড়া

www.pathagar.com

মিলের পশ্চিমাংশে **অক্টোবর নভেম্বর** মাসে **অনেক** লোককে তারা হত্যা **করে**। সেখানে খুঁড়লে এখনও অনেক হাড়গোড় পাওয়া যাবে। সেখানে মিলের শ্রমিক, দারোয়ানরা বর্তমানে বাড়িঘর তুলেছে। কমপক্ষে চার পাঁচ হাজার মহিলাকে তারা এখানে নির্যাতন শেষে হত্যা করে। বাইশে এপ্রিল থেকে ডিসেম্বর পর্যন্ত তারা এইসব নির্যাতন চালায়। ষোলোই ডিসেম্বরের আগেই পাকি সেনারা মাদারীপুর ছেড়ে চলে যায়। তখন এখানে **মেজর খটক ও মেজর মঞ্জু** ছিল। আমাদের এখানে শেষদিন পর্যন্ত **মেজর খটক** ছিল।

আসামীঃ ক্যাপ্টেন ফয়েজ, ক্যাপ্টেন সেলিম।

অপরাধের ধরনঃ গণহত্যা, জাতিগত নিধন, ধর্ষণ, লুটপাট, অগ্নিসংযোগ।

সাক্ষি ঃ মোঃ বদরুদ্দোজা বদর।

ঘটনাকালঃ একাত্তরের এপ্রিল থেকে ডিসেম্বর পর্যন্ত।

ঘটনাস্থল ঃ গোপালগঞ্জ

সূত্রঃ যুদ্ধাপরাধ গণহত্যা ও বিচারের অন্বেষণ এবং WCFFC গবেষণা।

পাকি বাহিনী পঁচিশ এপ্রিল গোপালগঞ্জের মানিকদাহ ও হরিদাশপুরে প্রবেশ করে। এদের প্রথম লক্ষ্য ছিল হিন্দুপ্রধান এলাকা রঘুনাথপুর (শহর থেকে ছয় মাইল দূরে অবস্থিত)। ঊনত্রিশে এপ্রিল তারা দু'দলে ভাগ হয়ে এই এলাকায় আক্রমণ চালায়। পাঁচ দিন দিন ধরে তাদের তাণ্ডবলীলা চলে সেখানে। রঘুনাথপুরে প্রায় এক শ' জনকে তারা হত্যা করে। এরপর তারা সাতপাড়, জলিরপাড়, বিদ্যাধর, কৃষ্ণপুর, শাহাপুরে আক্রমণ চালায়। তাদের 'কাফের' নিধন প্রক্রিয়ার নামে চলতে থাকে নির্বিচার হত্যা, অগ্নিসংযোগ ও লুটতরাজ।

অক্টোবরের শেষে ফুকরার যুদ্ধে প্রায় চল্লিশ জন নিরীহ গ্রামবাসী তাদের হাতে শহীদ হন। কলাবাড়ি যুদ্ধের পর এখানকার বন্যাপ্লাবিত এলাকায় পাকি বাহিনী একই দিনে দুই শ' আশি জন গ্রামবাসীকে হত্যা করে। সাতপাড়া গ্রামের গোবিন্দচন্দ্র বিশ্বাস শিক্ষাব্রতী ছিলেন। বিশ্বাসবাবু সাতপাড়, বৌলতলি, সারিয়াদহে উচ্চ বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন। পনেরো বছর তিনি শিক্ষকতা করেন। উনিশে মে তাঁকে মকসুদপুর থানার বনবাড়িতে পাকি বাহিনী গুলি করে হত্যা করে। শুকতাইল গ্রামের ডাক্তার আব্দুল মান্নান মোল্লাকে পাকি বাহিনী নির্যাতনের পর হত্যা করে।

এখানে অন্য যাঁরা শহীদ হন, তারা হলেন আওলাদ আলী (কোমরোলা গ্রাম), আজিজুল হক শেখ (টঙ্গীপাড়া, পাটগাতি গ্রাম), আব্দুর রউফ (কাশিয়ানি, থানার পাতা গ্রাম), আব্দুল আলী শিকদার (চন্দ্রা গ্রাম), আব্দুল মোতালেব (হাকিমপুর গ্রাম), উলু মিয়া শেখ, কাজী আজহারুল ইসলাম, মজিবুর রহমান মুন্সি ও মহসিন মুন্সিঃ

www.pathagar.com

পাইককান্দি গ্রামের আনোয়ার হোসেন শিকদার ও ইসলামিয়া মেডিক্যাল হলের আব্দুল হাই শেখ। ঘোনাপাড়া গ্রামের মোঃ ইউনুস আলীকে রোজার ঈদের দিন ধরে নিয়ে হত্যা করা হয়। এ ছাড়া আরও যাঁদেরকে হত্যা করা হয়, তাঁরা হলেন বনগ্রাম নিবাসী গোলজার আলী খান, গোলাম আলী হাওলাদার (পুণ্যবতী গ্রাম), মোঃ বাচ্চু মিয়া (হাওলাদার গ্রাম), মতিয়ার রহমান মতি (মনিরকান্দি গ্রাম), সরওয়ার হোসেন (খালিশখালি গ্রাম), হানিফ মিয়া (ঘোনাপাড়া গ্রাম), রবিউল শিকদার (ফুকরা গ্রাম), রুস্তম (ঘোরগাতি গ্রাম), শেখ আব্দুল লতিফ (গোপালগঞ্জ), সুভাষ বিশ্বাস (খালিশখালি গ্রাম), শেখ গণি মিয়া (ঘোষের চর), হায়দার আলী খন্দকার (বাটিকামারী গ্রাম), হারুন অর রশীদ (পূর্ব নওখণ্ডা)।

গোপালগঞ্জের উপকণ্ঠে জয়বাংলা পুকুর বধ্যভূমিতে পাকি বাহিনী অসংখ্য নিরীহ বাঙালিকে হত্যা করে। এঁদের মধ্যে কয়েকজনের পরিচয় জানা যায়। এঁরা হলেন- ১। মাহবুবুর রহমান চৌধুরী (পিতা-মনসুর আলী) ২। গুলজার হোসেন চৌধুরী (পিতা-আহমদ হোসেন চৌধুরী) ৩। হারুন রশীদ মোল্লা (পিতা-আঃ রাজ্জাক মোল্লা, প্রধান শিক্ষক মানিকহার উচ্চ বিদ্যালয়) ৪। আসাদ সরকার (পিতা-আঃ খালেক সরদার) ৫। মোসলেম শেখ (পিতা-আঃ জাব্বার শেখ) ৬। বালা মোল্লা (পিতা-মোজাম মোল্লা) ৭। আবদুল বারেক শেখ (পিতা-আদম শেখ) ৮। ইউনুস আলী সিকদার (পিতা-মোশারফ হোসেন সিকদার) ৯। দাদ শেখ (পিতা-আবদুল সামাদ শেখ) ১০। আযাহার মোল্লা (পিতা-আঃ গফুর মোল্লা) ১১। সুধীর বিশ্বাস (পিতা-নবকুমার বিশ্বাস) ১২। শচীন্দ্রনাথ বিশ্বাস (পিতা-ষষ্ঠীচরণ বিশ্বাস) ১৩। নারায়ণ মণ্ডল (পিতা-বিচরণ মন্ডল) ১৪। সন্তোষ কুমার দাস (প্রভাষক-কায়েদে আজম মেমোরিয়াল কলেজ) ১৫। কুটি মিয়া শেখ ও আসাদ শেখ (পিতা-সলিমউদ্দিন শেখ) ১৬। মনি মিয়া (পিতা-রুস্তম শেখ) ১৭। বেলায়েত শেখ (পিতা-ইয়াকুব শেখ) ১৮। শচীন্দ্রনাথ বৈদ্য (পিতা-কৃষ্ণবন বৈদ্য) ১৯। কিবরিয়া খান ও ফিরোজ খান (পিতা-লালউদ্দিন খান) ২০। আবু তারা কাজী (পিতা-আজু কাজী) ২১। মাহাবুব আলী খান (পিতা-তনু খান) ২২। আবদুল লতিফ ফকির (পিতা-আরশাফ আলী ফকির) ২৩। ডা. মন্নান মোল্লা (পিতা-আবদুল গনি মোল্লা) ২৪। শওকত আলী (পিতা-ওয়াসিরউদ্দিন উকিল) ২৫। আবদুল আলী গাজী (পিতা-তফাজ্জাল গাজী) ২৬। আলাউদ্দিন কাজী (পিতা-আঃ খালেক কাজী) ২৭। আঃ মালেক (পিতা-কলমদার মল্লিক) ২৮। মোস্তাফিজুর রহমান বাচ্চু (পিতা-আবুবকর সিদ্দিক)। আশরাফ মোল্লা, শিহাবউদ্দিন মোল্লা, পিতা-রজু মোল্লা; হাশেম মোল্লা, পিতা-ইউনুস মোল্লা; আশরাফ আলি শেখ, পিতা-আবদুল জলিল শেখ; আবদুল মান্নান খালাসি, পিতা-নুরুল হক খালাসি। মুক্তিযোদ্ধা সংসদ গোপালগঞ্জ কমান্ড সূত্রে জানা যায়, এখানে দুই হাজার সাতচল্লিশ জন গ্রামবাসী পাকি বাহিনীর হাতে শহীদ হন।

www.pathagar.com

চট্টগ্রাম

আসামীঃ জেনারেল টিক্কা খান, লে. জেনারেল নিয়াজি, ব্রিগেডিয়ার বেগ, ব্রিগেডিয়ার আনসারী, কর্নেল জানজুয়া, কর্নেল ভাদী, মেজর বোখারী, মেজর জেড খান, মেজর আসলাম, মেজর হাদি, মেজর জামান।

অপরাধের ধরনঃ গণহত্যা, জাতিগত নিধন, ধর্ষণ, লুটপাট, অগ্নিসংযোগ।

সাক্ষী ঃ বালি রানী শীল, রবি রানী শীল, মোঃ রাউফুল হোসেন সুজা, কাজী পারভেজ শিখর, বেগম মুশতারী শফি।

ঘটনাকালঃ ছাব্বিশে মার্চ রাত থেকে ডিসেম্বর পর্যন্ত।

ঘটনাস্থল ঃ চট্টগ্রাম জেলা

সূত্রঃ যুদ্ধাপরাধ গণহত্যা ও বিচারের অন্বেষণ এবং WCFFC গবেষণা।

পাকি আর্মি চট্টগ্রামে সেইসব নিরপরাধ শ্রমিকদেরকে হত্যা করে যাঁদেরকে পঁচিশে মার্চ বন্দী করে সোয়াত জাহাজ থেকে অস্ত্র নামানোর কাজ করানো হয়েছিল। সাতাশে মার্চ বিকেলে ব্রিগেডিয়ার আনসারীর হুকুমে সারিবদ্ধভাবে দাঁড় করিয়ে মেশিনগানের গুলিতে নির্মমভাবে এই শ্রমিকদের হত্যা করা হয়। এ ছাড়া 'সোয়াতে' অস্ত্র এসেছে, এ সংবাদ বাইরে প্রচার হওয়ায় শ্রমিক নেতা ও শ্রমিকরা প্রতিরোধের সাথে জড়িত সন্দেহে পাকি বাহিনী বন্দরের তৎকালীন ডেপুটি কনজারভেটর জিএ কাজি ও সহকারী জেটি সুপারিন্টেনডেন্ট সেনবাবুসহ কয়েকজনকে হত্যা করে।

রেলে কর্মরত বিভিন্ন পদের অনূর্ধ্ব চল্লিশ জন অবাঙালি নিয়ে পাকি আর্মি সিভিল পাইওনিয়ার ফোর্স গঠন করে। এই ফোর্স পূর্ব রেলওয়ের আঠারোজন অফিসারসহ তেরো শ' বাঙালি কর্মচারীকে হত্যা করে। এরা পাকি বাহিনীর সরাসরি তত্ত্বাবধানে নারী পুরুষদের ধরে এনে পাহাড়তলী এলাকার বনাঞ্চল, ফয়'স লেক, ঝাউতলা, ইত্যাদি স্থানে হত্যা করত। একই কায়দায় পাকি বাহিনী সীতাকুণ্ডের শিবনাথ পাহাড় ও মীরশ্বরাই থানা এলাকার বধ্যভূমিতে হাজার হাজার বাঙালিকে হত্যা করে।

পাহাড়তলী ও ওয়্যারলেস কলোনি এলাকার বধ্যভূমিতে দশই নভেম্বর ভয়ঙ্কর হত্যাযজ্ঞ চালানো হয়। সব বয়সী নারী পুরুষকে ধরে এনে ধারালো ও স্বয়ংক্রিয় অস্ত্র

www.pathagar.com

দিয়ে এই হত্যাকাণ্ড সংঘটিত করা হয়। সারাদিন ধরে ওই হত্যাযজ্ঞ চলে। একেক দফায় দু'শ' জনকে হত্যা করা হয় বলে শোনা যায়। মুক্তিযুদ্ধের পর মীরশ্বরাই থানার পশ্চিম হিঙ্গুলী গ্রামের একটি পুকুর থেকে তিরাশিটি নরকঙ্কাল উদ্ধার করা হয়। ফেণী নদীর রেলসেতুকে পাকি বাহিনী বাঙালি হত্যার কেন্দ্র হিসেবে ব্যবহার করে। ছাগলনাইয়া গ্রামের চল্লিশ জনকে ধরে এনে এখানে হত্যা করা হয়।

পাঁচলাইশের ডাম্পিং ডিপোর কাছে রয়েছে বড় বধ্যভূমি। ষোলশহরের সিডিএ মার্কেটের কাছেও বধ্যভূমি রয়েছে। দামপাড়া গরীবুল্লাহ শাহ মাজারের পাশে প্রায় চল্লিশ হাজার বাঙালিকে হত্যা করা হয় বলে জানা যায়। দামপাড়া পুলিশ লাইনেও রয়েছে গণকবর। দামপাড়া গরীবুল্লাহর মাজারের পাশের দোকানটি ছিল নাছির আহমেদের। তিনি জানান, হত্যাযজ্ঞের শুরুতে চোখ বাঁধা অবস্থায় একদলকে গুলি করে হত্যা করা হলে অন্য লাইনে দাঁড়ানো লোকজন চিৎকার করত বলে হানাদাররা এখানে সাইলেন্সার ব্যবহার করত। বাহাত্তর সনের তেসরা জানুয়ারি 'দৈনিক বাংলা'য় এক সাক্ষাৎকারে তিনি জানান, ত্রিশে মার্চ একাত্তর থেকে ডিসেম্বরের প্রথম সপ্তাহ পর্যন্ত প্রতি সন্ধ্যায় মিলিটারিরা পাঁচ ছয় ট্রাক করে মানুষ ধরে আনত। এরপর গর্তের পাশে লাইন ধরে দাঁড় করিয়ে এঁদেরকে হত্যা করা হত।

চট্টগ্রাম কেন্দ্রীয় টেলিগ্রাম অফিসের পেছনের 'হোটেল ডালিম' ছিল আলবদরদের বন্দীশিবির। নিরীহ বাঙালিদেরকে অকথ্য নির্যাতন করা হয়েছে এই শিবিরে। সতেরোই ডিসেম্বর যাঁদেরকে এখান থেকে মুক্ত করা হয়, তাঁরা কেউই অক্ষত ছিলেন না। কারও শরীরের হাড় ভাঙা, কারও আঙুল কাটা, কারও একটা চোখ, একটা কান, একটা হাত নষ্ট। 'পূর্বদেশ', সাত জানুয়ারি বাহাত্তর সংখ্যায় ছাপা হয় এই শিবির থেকে উদ্ধারকৃত পশ্চিম মাদারবাড়ির আবুল কাশেম পেশকারের ছেলে আঠারো বছর বয়স্ক নাজমুল আহসান সিদ্দিকীর ভাষ্য। তিনি জানান, অত্যাচারের তীব্রতায় যখন পিপাসায় বুক ফেটে যেত তখন তারা প্রস্রাব করে দিয়ে সেটা খেতে বলত।

চট্টগ্রামের সাবেক বোয়ালখালি থানার শাকপুরা গ্রামটি বিশে এপ্রিল খুব ভোরে ঘিরে ফেলে পাকি সেনাবাহিনী। তারা গ্রামে আগুন লাগিয়ে দিয়ে নির্বিচারে হত্যা শুরু করে। প্রায় এক শ' পঞ্চাশ জনকে সেদিন এখানে হত্যা করা হয়। পঁচিশ মার্চের রাতে ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টাল সেন্টারে দু' হাজার পাঁচ শ' বাঙালি প্রশিক্ষণার্থী সৈনিকের ওপর বিশ বেলুচ রেজিমেন্টের সৈনিকরা অতর্কিতে হামলা চালিয়ে হত্যা করে। রাতভর হত্যাযজ্ঞ চালিয়ে ছাব্বিশে মার্চ ভোরে তাদের লাশ ট্রাকে ভরে নিয়ে যায়।

চট্টগ্রাম সেনানিবাসের ভেতরেও পাকি আর্মি বাঙালিদেরকে ধরে এনে হত্যা করে। কক্সবাজার সমুদ্রতীরের কেলাতলী, বাহার ছড়া, কক্সবাজার রেস্ট হাউজের সামনে তিনটে গণকবর থেকে বহু লাশ পাওয়া যায়। রেস্ট হাউজের সামনে যে সব লাশ

www.pathagar.com

পাওয়া গিয়েছিল তার অর্ধেকই ছিল মহিলা। ধারণা করা হয়, পাশবিক অত্যাচারের পর এঁদেরকে হত্যা করা হত। ১৯৯৯ সনের ডিসেম্বরে পতেঙ্গা বিমান বন্দরের কাছে কামানটিলা নামক স্থানে আবিষ্কৃত হয় একটা বধ্যভূমি।

একাত্তরের ষোলোই এপ্রিল শুক্রবার সকাল দশটায় ও দুপুর দুটোয় পাকি বাহিনী বোমারু বিমান থেকে পটিয়ার ওপর হামলা চালায়। এতে গুরুত্বপূর্ণ সরকারি, বেসরকারি ভবন, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ধ্বংস ও ক্ষতিগ্রস্ত হয় এবং বিশ জন বেসামরিক ব্যক্তি নিহত হন। পটিয়ায় এসে পাকি বাহিনী স্থানীয় কলেজে ঘাঁটি স্থাপন করে। পটিয়ায় আসার সময় তারা ব্যাপক গণহত্যা চালায়। মসজিদে নামাজরত মুসল্লিরাও এই হত্যাকাণ্ড থেকে বাদ যাননি। পাকিবাহিনীর হাতে নিহতদের মধ্যে ছিলেন সেনের হাটের সমাজসেবী ফয়জুল হক, পুস্তক ব্যবসায়ী শামসু, মনসা গ্রামের হামিদুল, চরকানাই হাইস্কুলের শিক্ষক সুমতি বড়ুয়া। কলেজে স্থাপিত ঘাঁটিতে সৈন্য সংখ্যা ছিল প্রায় তিন-চার শ'। এদের দলনেতা ছিল মেজর আসলাম। এ ছাড়া মেজর হাদির নেতৃত্বে আরেকটি দল পিটিআইতে ঘাঁটি স্থাপন করে। মে মাসের শেষের দিকে দোহাজারী পরিদর্শনে আসে পাকি বাহিনীর পূর্বাঞ্চলীয় অধিনায়ক লে. জেনারেল নিয়াজি। পটিয়ার জামিজুরি গ্রাম, মুজাফফরাবাদ গ্রাম, হাইদগাঁওয়ের পণ্ডিত বাড়ি (আশকার বাড়ি), কেলিশহর, ডনহরা, ভট্টাচার্য বাড়ি, পালপাড়া, গৈড়লা গ্রামে পাকি বাহিনী ব্যাপক গণহত্যা ও ধ্বংসযজ্ঞ চালায়।

ছাব্বিশে এপ্রিল জামিজুড়ি গ্রামে হামলা করে পাকি বাহিনী ডাক্তার করুণা কুমার চৌধুরী (৭০), শিক্ষক প্রফুল্ল ভট্টাচার্য, কবিরাজ তারাচরণ ভট্টাচার্যসহ এই বাড়ির মোট সতেরো ব্যক্তিকে হত্যা করে। তেসরা মে মুজাফফরাবাদে হামলা করে তারা স্থানীয় প্রবীণ শিক্ষক রামমোহন বিশ্বাস, বিশিষ্ট সমাজকর্মী মনমোহন চৌধুরী ও কিরণ রায় চৌধুরীসহ তিন শ' জনকে নির্বিচারে হত্যা করে। উনিশে আগস্ট পাকি বাহিনী হাইদগাঁও পণ্ডিত বাড়িতে (আশকার বাড়ি) হামলা করে। সকাল আটটা থেকে দশটা পর্যন্ত এ হামলায় এ বাড়ির মাস্টার উপেন্দ্রলাল চৌধুরী, মাস্টার অম্বিকাচরণ চৌধুরী, ডা. ভানেশ্বর চৌধুরীসহ এগারো জনকে তারা হত্যা করে। গুরুতর আহত হয়ে বেঁচে যান সারদাচরণ চৌধুরী ও সুধাংশু বিমল চৌধুরী। এ ছাড়া ছনহরা ও আলমদর গ্রামে পাকি বাহিনী হত্যা করে অ্যাডভোকেট দেবেন্দ্র বিকাশ ভট্টাচার্য ও ডা. প্রণবেশ ভট্টাচার্যকে। এগারোই ডিসেম্বর গাছবাড়িয়া পালপাড়া গ্রামে পাকি বাহিনী এসে নিধনযজ্ঞ শুরু করে। সতেরো জনকে হত্যার পর শিক্ষক ক্ষেত্রমোহন নাথের স্ত্রী আলো রানীকে ধর্ষণ করতে উদ্যত হলে আলো রানী কোনমতে তাদের হাত থেকে নিজেকে বাঁচিয়ে অদূরবর্তী জ্বলন্ত ঘরবাড়ির মধ্যে ঝাঁপ দিয়ে আত্মহত্যা করেন। পটিয়ার ধলঘাট গৈড়লা গ্রামে নভেম্বরে এক নিধনযজ্ঞ সংঘটিত হয়। ধনঞ্জয় ঘোষ, মধু ঘোষ, মুকুন্দ ভট্টাচার্যসহ অনেকে সেদিন শহীদ হন। পটিয়ার শহীদদের মধ্যে রয়েছেন-কেলিশহরের মণীন্দ্র লাল, বৈলতলির প্রফুল্লরঞ্জন, বরজার মিলনকান্তি দাস ও খোকন দাস, জিরি গ্রামের সিরাজুল ইসলাম, হাইদগাঁও এর হরেন্দ্রলাল নজী,

www.pathagar.com

গৈড়লার সুনির্মল ঘোষ, কেলিশহরের অমলকান্তি গুহ, শোভনদন্ডীর আমিনুল হক, তিয়ারকুলের জিতেনলাল পাল প্রমুখ।

কক্সবাজার সমুদ্রতীরে তিনটি গণকবর আবিষ্কৃত হয়। এখান থেকে পাঁচ শ'র বেশি লাশ তোলা হয়। এক ও দুই নম্বর হোটেলের সামনে থেকে সাত আটটি নরকঙ্কাল তোলা হয়। রেস্ট হাউজের সামনের কবর থেকে উঠানো কঙ্কালের অর্ধেকই ছিল মহিলার। ঝিলনঝা, কুরুশকুল, মহেশখালী ও দুলাহাজরা থেকে প্রায় দুশো মুসলমান ও হিন্দু মগ যুবতীকে পাকি বাহিনী ধরে আনে। সম্ভবত এগুলো তাঁদেরই কঙ্কাল ছিল।

মুক্তিযুদ্ধের সময় পাকিস্তানি সেনাবাহিনী চৌধুরীপাড়া, শীলপাড়া, জেলেপাড়াসহ আশেপাশের এলাকার নিরপরাধ বাঙালিদেরকে নানা অজুহাতে ধরে এনে পতেঙ্গার কামানটিলা নামক স্থানে গুলি করে হত্যা করত। তাঁদের করুণ আর্তনাদ চাপা পড়ত মাটিচাপা দেওয়া ওইসব গর্তের অভ্যন্তরে। এ ছাড়া বিভিন্ন এলাকায় পাকি বাহিনীর হাতে নিহতদের লাশও এখানে এনে মাটিচাপা দেওয়া হয়। স্বাধীনতার পর নিহতদের আত্মীয়স্বজন গর্ত খুঁড়ে আপনজনদের মৃতদেহ খুঁজে বের করার চেষ্টা করলে গলিত লাশের তীব্র দুর্গন্ধের কারণে তা আর সম্ভবপর হয়ে ওঠেনি। তবে মাটির প্রথম স্তরেই পাওয়া যায় নিহত অতুল শীলের চশমা ও হীরালাল শীলের পরিচয়পত্র।

একাত্তর সালের সাতাশে এপ্রিল কামানটিলার মৃত্যুপুরী থেকে বেঁচে আসা শীলপাড়ার চারজন ভাগ্যবান ও তাঁদের আত্মীয় স্বজনদের কাছ থেকে এ সব তথ্য পাওয়া যায়। সেদিন পঁচিশ ত্রিশজন পাকি সেনার একটি দল উত্তর পাড়ার পুলিন শীলকে সাথে নিয়ে শীলপাড়ায় প্রবেশ করে এবং সেখান থেকে আটত্রিশ জন নিরীহ বাঙালিকে আইডেনটিটি কার্ড দেওয়ার নাম করে মনমোহন শীলের বাড়ির সামনে জড়ো করে। তারপর সেই ঘুটঘুটে অন্ধকার রাতে আড়াই মাইল পায়ে হাঁটিয়ে তাদেরকে কামানটিলায় নিয়ে যায়। সেখানে রাত আড়াইটার দিকে হাতমুখ বেঁধে তিন জন করে এক একটি গ্রুপে ভাগ করে। তারপর তাঁদেরকে গর্তের পাশে দাঁড় করিয়ে পেট ও মাথা লক্ষ্য করে গুলি করে মাটিচাপা দেয়। সেই মৃত্যু দুয়ার থেকে ওইদিন পালিয়ে আসতে পেরেছিলেন হীরালালের স্ত্রী টংকেশ্বরী ও অমল কুমার শীল। রূপক শীল গুলিবিদ্ধ অবস্থায় পালিয়ে বাঁচলেও ক'দিন পরেই মারা যান।

পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর হিংস্র থাবা থেকে ফিরে আসা বালীরানী শীল বলেন, আমি তখন এক সন্তানের মা, আমার গর্ভে ছ'মাসের সন্তান। সে রাতে প্রথমবার গ্রামের অন্যান্য পুরুষের সাথে পাকি সেনারা আমাদের পরিবারের পুরুষদেরকেও ধরে নিয়ে যায়। নিয়ে যাওয়ার ঘন্টা খানেক পর তারা আবার আসে। তখনি চোখ পড়ে আমার ওপর। হানাদাররা আমাকে ধরে ফেলে। চিৎকার করে উঠি আমি। তারা বলে, 'বাত মাত করনা বেটি।' সেটা শুনে রেগে গিয়ে বললাম 'কেন বাত করবনা? তোরা আমার

www.pathagar.com

বাপ, ভাই, খুড়ো, সবাইকে নিয়ে গেলি, আর আমি চুপ করে থাকব?' এক পাকি সেনা এ সময় আমার হাত ধরে টানাটানি করছিল। শাশুড়ি হাতে পায়ে ধরলেন তাদের, 'ওরে নিও না, ওর পেটে বাচ্চা'। সেসব কথায় পাত্তা দিল না তারা। আমি চিৎকার করে বলি, 'হারামীর বাচ্চা তোদের রূহ নেই?'

এরপর এয়ারপোর্টের বধ্যভূমির কাছাকাছি এক ঘরে পাকি সেনারা আমাকে বেঁধে রাখে। ওরা ভেবেছিল হত্যাযজ্ঞ শেষ করে আমার দিকে মনোযোগ দেবে। পাশের ঘর থেকেই আমি মানুষের আর্তনাদ শুনতে পাই। কেউ পানি খেতে চাইলে তাকে প্রস্রাব খেতে দিচ্ছিল খান সেনারা। আমি বারবার চিৎকার করে বলেছি, "আনছিস যখন তখন মেরে ফেল।" এসময় লক্ষ্য করলাম যে, আমার বাঁধনটি বেশ আলগা। যে খুঁটির সাথে আমাকে বাঁধা হয়েছে, সেটাও নড়বড়ে। তখন সাহসী হয়ে উঠলাম। খুঁটিটা আস্তে আস্তে ভেঙে নিঃশব্দে দৌড় দিলাম। এত জোরে দৌড় দিলাম যে, কোন হুঁশ জ্ঞান ছিল না। এই ঘটনার কিছুদিন পর আমার একটা মরা বাচ্চা হয়। সেই রাতের ধকলে শিশুটি আর পৃথিবীর আলো দেখতে পারেনি। কিন্তু আমি বেঁচে আছি সেই অন্ধকার রাতের সাক্ষী হয়ে।

রবিরানী শীল সেই হতভাগ্যদের একজন, যাঁর বাবাকে ১৯৭১ সনে বাড়ি থেকে ধরে এনে কামানটিলায় হত্যা করা হয়। তিনি স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে বলেন, আমার বাবা সেদিন পরিবারের সবাইকে নিয়ে টমেটোর সালাদ দিয়ে রাতের খাবার খেতে বসেছিলেন। সেই অবস্থায় পাকি বাহিনী তাঁকে ধরে নিয়ে গিয়ে হত্যা করে। আজও বাবার কথা মনে হলে আমি কাঁদি। তিনি যুদ্ধের সময়ে এলাকার অবস্থা বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন, সেই সময় বাড়ির যুবতী মেয়েরা অন্ধকার রাতে ধানক্ষেত ও ঝোপঝাড়ে লুকিয়ে সম্ভ্রম রক্ষা করত। ডাকাতের প্রকোপও তখন বেড়ে গিয়েছিল অনেক। তারা পুরো শীলপাড়া লুটপাট করে বিরান করে দেয়। এমনকি অনেক বাড়ি থেকে ভাতের থালাটা পর্যন্ত নিয়ে যায়। রবিরানী শীলের মত ভক্তি, পূরবী, শচী এঁদের নিকটজনকেও যুদ্ধের সময় পাকি সেনারা নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করে। আজও তাঁরা আপনজন হারানোর সেই দুঃসহ স্মৃতি বুকে বয়ে বেড়াচ্ছেন।

চট্টগ্রামের শহীদ আকবর হোসেনের পুত্র রাউফুল হোসেন সুজা তার বাবার হত্যাকাণ্ডের বর্ণনা দিতে গিয়ে বলেন, দশই নভেম্বর ভোরে আমার বাবা পাহাড়তলীর আকবর শাহ্ জামে মসজিদ থেকে ফজরের নামাজ পড়ে ফিরছিলেন। সে সময় পাড়ার মধ্যে চার জনের লাশ পাওয়া যায়। পাকি বাহিনী মসজিদের সামনে থেকে লাশগুলো শনাক্ত করার জন্য আমার বাবাকে ধরে নিয়ে যায়। লাশ শনাক্ত করার পর তিনি বাড়ি ফিরে অফিসে যাওয়ার প্রস্তুত নিচ্ছিলেন। এমন সময় চার জন বিহারি এসে বলে, 'লাশ শনাক্ত করতে হবে, এজন্য আপনাকে ডাকছে।' এভাবে পাড়ার অনেককেই তারা ধরে নিয়ে যায়।

www.pathagar.com

বাবাকে নিয়ে যাওয়ার পর তিনি আর ফেরত আসেননি। এ খবর পাওয়ার পর বড় দুই ভাইকে বাবার লাশ খুঁজতে সাথে আমি ফয়'স লেকে যাই। তখন রাত সাড়ে আটটা হবে। লেক এলাকায় যে ব্যাপক গণহত্যা হয়েছে, সে খবর আগেই পেয়েছিলাম আমরা। আশপাশের এলাকার বাঙালি ছাড়াও দোহাজারী, নাজিরহাটগামী ট্রেন থামিয়ে অসংখ্য বাঙালিকে এই এলাকায় হত্যা করা হত। ফয়'স লেকে আমরা হাজার হাজার লাশ দেখতে পেয়েছিলাম। লাশগুলো দেখে বোঝা যাচ্ছিল, তাদেরকে জবাই করে হত্যা করা হয়েছে। মাথাগুলো বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছিল পাশের গর্তে। সেগুলো আবার এ্যাসিড দিয়ে পুড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল, যাতে কারও লাশ শনাক্ত করা না যায়। এই অবস্থায় বাবার লাশ আর খুঁজে পাইনি আমরা। প্রায় হাজার দশেক লাশ সেখানে পড়ে থাকতে দেখেছিলাম সে রাতে। ফিরে আসার পথে পাহাড়ের ওপরে চুরাশি জন মহিলার লাশ পড়ে থাকতে দেখলাম। টর্চের আলোয় আমরা দেখলাম যে, অধিকাংশ মহিলার পেট ফেড়ে দেওয়া হয়েছে। এঁরা সবাই গর্ভবতী ছিলেন। বধ্যভূমির পাশে সাদা বিল্ডিং এ পাকি সেনাদের ক্যাম্প ছিল। সেখানে বহু মেয়েকে বন্দী করে পাশবিক উল্লাসে মেতে উঠত পাকি সেনারা। এই লাশগুলো সেই হতভাগ্য মেয়েদের ছিল বলে মনে হয়। স্বাধীনতার পর এখানে এসে মাটিচাপা লাশের গন্ধ ছাড়া আর কিছুই পাওয়া যায়নি।

কাজী পারভেজ শিখর বলেন, গভীর রাতে পুরো পুলিশ লাইন ঘিরে ফেলে পাকি সেনারা। যদিও ভেতরের মানুষগুলো তা বুঝে উঠতে পারেননি। উনত্রিশে মার্চ দেখলাম যে, স্বাধীন বাংলার পতাকা নিয়ে খাকি পোশাক পরা কিছু মানুষ পাহাড় বেয়ে ওপরে উঠছে। বাড়ির টয়লেটের ওপরের স্টোর রুমের ভেন্টিলেটার দিয়ে আমি এটা দেখতে পেলাম। কিছুক্ষণ পর দেখি, ওরা পাহাড়িদের ঘরবাড়ি জ্বালিয়ে দিচ্ছে। অবলীলায় গুলি করে হত্যা করছে সাধারণ মানুষজনকে। চট্টগ্রাম শহরে আত্মীয়দের মধ্যে একমাত্র আমাদেরই নিজস্ব বাড়ি থাকায় পঁচিশে মার্চের পর অনেকেই আমাদের বাড়িতে আশ্রয় নিয়েছিলেন। অনেক মানুষ বাড়িতে, অথচ ইলেকট্রিসিটি নেই, পানি নেই। সে এক বিভীষিকাময় অবস্থা। আমার বাবা কাজী আলী ইমাম তখন স্টেট ব্যাংক অব পাকিস্তানে চাকরি করতেন। সকাল সাতটার দিকে বাড়ির রেলিংয়ের ওপর বসে দেখলাম, অল্প দু'একজন লোক চলাচল করছে। এ সময় বাবা আমার কাছ থেকে বাইরের অবস্থা জেনে নিলেন। তারপর ঘরে ঢুকে শার্ট গায়ে দিয়ে কাজের ছেলে রহিমের খোঁজ নিতে যাচ্ছিলেন। এমন সময় আমার ছোট খালু ড. গোলাম মোস্তফা খান বলেন, "ভাই কোথায় যাচ্ছেন? চলেন আমিও যাই, ব্লেড নেই, দাড়ি কামানো যাচ্ছে না।" এই বলে দু'জন বেরিয়ে গেলেন। এর মিনিট বিশেক পরেই আমরা গুলির শব্দ শুনতে পাই। এতে আমরা আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে পড়ি। এরই মধ্যে চাচাতো ভাই খোকন বাইরে থেকে দৌড়ে বাড়িতে এসে জানাল, বাবা ও খালুসহ অনেকে ধোপা পুকুরের পাশে মেঠো পথের কাছে পড়ে আছেন। পুরুষদের যাওয়া ঠিক হবে না ভেবে খালা, দাদী, মাসহ আমি ও আমার এক ভাই লাশের কাছে গেলাম। এ সময় দাদী ছেলেদের বাড়ি ফিরে যেতে বলে নিজেই লাশ দুটোকে টেনে

www.pathagar.com

বাড়ির ভেতরে নিয়ে আসেন। তখনও সবার মনে আশা, যদি প্রাণ থাকে। দাদী চাচাকে পানি দিলেন, বাবার নাম ধরে ডাকলেন। কিন্তু কোন উত্তর পেলেন না। তখন আমরা বুঝতে পারলাম, তাঁরা আর বেঁচে নেই। দাদী বাবার রক্ত নিজের গায়ে মেখে বিলাপ করতে লাগলেন। খুব কাছ থেকে গুলি করা হয়েছিল তাঁদেরকে।

পৌনে এক ঘন্টা পরে পাকি সেনারা বাড়ির দরজায় এসে লাথি মারতে শুরু করল। এ সময় বাড়ির সব পুরুষ পেছনের দরজা দিয়ে বড় চাচার বাড়িতে চলে যান। দরজা ভেঙে সৈন্যরা বাড়িতে ঢুকে পুরুষদের খোঁজ করে। আমার মা এবং ছোট খালা (যার স্বামী মারা গেছেন), কোরআন শরীফ পড়ছিলেন। পুরুষদের খোঁজ না পেয়ে তারা লাশ ফেরত চায়। দাদী লাশ দেবেন না। এ নিয়ে চলে তর্কাতর্কি। তারা পরে আসবে বলে বেরিয়ে যায়। পাকি সৈন্যরা চলে যাওয়ার পর এ বাড়ি বন্ধ করে লাশ নিয়ে সবাই পাশের বাড়িতে চলে যান। এরপর লাক্স সাবান দিয়ে গোসল করানো হয়। দাদীর নতুন ধুতি দিয়ে দু'জনের কাফন তৈরি হয়। কিন্তু দাফন কীভাবে হবে? অবশেষে বাড়ির মধ্যে সারারাত ধরে মহিলারা ছুরি, খুন্তি দিয়ে দেড় হাত গর্ত খোঁড়েন। ফজরের নামাজের সময় জানাজা পড়ে নতুন শীতল পাটি দিয়ে সেই গর্তেই তাদেরকে শুইয়ে দেওয়া হয় শেষ বারের মত। জায়গাটা যাতে কবরের মত না দেখায়, সেজন্য ওপরের মাটি সমান করে দেওয়া হয়।

বেগম মুশতারী শফি বলেন, সাতই এপ্রিল সকাল দশটায় দুই লরি ভর্তি পাকিস্তানি সৈন্য এসে আমাদের বাড়ি ঘেরাও করে। এর কিছুক্ষণ পর দরজায় ধাক্কাধাক্কি শুরু করে দেয় তারা। তখন লোকজনে আমাদের বাড়ি ভর্তি। আমার স্বামী ডা. শফি গিয়ে দরজা খুললেন। আজও সেই দুই সেনা অফিসারের নাম ভুলিনি আমি। একজন ছিলেন মেজর বোখারী, অপর জন মেজর জেড খান। তারা ড. শফিকে নিয়ে আমাদের বাড়ির পেছনে জমিদার তেওয়ারীকে খুঁজতে গেল। সেটাই প্রথম আমার নিজ চোখে মানুষ হত্যা করতে দেখা। তেওয়ারী বাড়ির সবাই চলে গিয়েছিলেন। শুধু ছিলেন মন্দিরের বৃদ্ধ পুরোহিত। অশীতিপর বৃদ্ধ পুরোহিত মেজরদের পা ধরবার জন্য এগিয়ে আসতেই তাঁকে গুলি করে হত্যা করে হানাদাররা। এরপর তারা ডা. শফিকে নিয়ে চলে যায়। বেলা সোয়া বারোটার দিকে তিনি ফিরে আসেন। পাকি সেনারা জিপে করে নামিয়ে দিয়ে যায় তাঁকে।" ব্রিগেডিয়ার বেগ তাঁকে চিকিৎসক বলে সসম্মানে বাড়িতে ফিরিয়ে দিয়ে যাওয়ার হুকুম দেয়। ডা. শফি ফিরে আসার পর আমরা বাড়ি ছেড়ে চলে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিই। কিন্তু বেলা দেড়টা দুটোর দিকে অন্য এক গ্রুপ আর্মি এসে আবার আমাদের বাড়ি ঘেরাও করে।

তারা এসে 'ওপর তলায় কে আছে' তা জিজ্ঞাসা করে । আমি বলি যে, ওপরে যে ভাড়াটিয়া ছিল তাঁরা ফেব্রুয়ারিতে চলে গেছে। এরপর তারা ওপর তলার তালা ভাঙে। সেখানে পাওয়া যায় ন্যাপ নেতা চৌধুরী হারুনের রেখে যাওয়া অস্ত্র গোলাবারুদ। ওপর তলায় ভুয়া ভাড়াটিয়ার নামে দলিল থাকলেও আমার কিছুটা ভুল হয়ে গিয়েছিল। কারণ প্রতিটি বাক্সে লাল কালি দিয়ে ২৭-৩-৭১ লেখা ছিল। অর্থাৎ

www.pathagar.com

ভাড়াটিয়ারা চলে যাওয়ার পরই এগুলো রাখা হয়। এরপর পাকি সেনারা ডা. শফি এবং আমার ছোটভাইকে দিয়ে ওই সব গোলাবারুদ ট্রাকে তোলায় এবং আমাকেসহ সবাইকে লরিতে উঠতে বলে। কিন্তু বাচ্চারা কান্নাকাটি করার ফলে আমাকে রেখে যায় এবং বলে যে, পালানোর চেষ্টা না করাই ভালো।

ডা. শফি বেরিয়ে যাওয়ার সময় বলে যান, "আমি আবার আসব।" সারাদিন বাড়িতে তিন চারজন আর্মি পাহারায় ছিল। রাতে কয়েকজন পাকি সেনা একজন কাবলিওয়ালাকে নিয়ে বাড়িতে এসে বলে, পঞ্চাশ হাজার টাকা দিলে আমার স্বামী ও ভাইকে তারা ছেড়ে দেবে। আমার কাছে তখন মাত্র সত্তরটি টাকা আছে। সে সময় বাড়িতে আমার বান্ধবী মাসুদা নবী ও তার ননদসহ কয়েকটি তরুণী। এদের ওপর কোন আঘাত আসতে পারে ভেবে তৎক্ষণাৎ বলি যে, আমাকে সময় দিতে হবে, আমি টাকা যোগাড় করব। তারা পরদিন সকালে আসবে বলে চলে গেল।

রাত তিনটের সময় শুরু হয় বৃষ্টি। আমার বাড়িতে আশ্রয় নেওয়া রেডিয়ো শিল্পী সাফাউন নবী আলমগীর বলেন, "আপা, পালাতে হবে, এই বৃষ্টিতেই সেটা সম্ভব।" সাতটি ছেলেমেয়ে নিয়ে বৃষ্টির রাতে ঘরবাড়ির মায়া কাটিয়ে আমরা সবাই একসাথে পালাই। স্বামী বা ভাই কারও কোন খোঁজ আর পাইনি। বহু জেলে, বন্দিখানায় খোঁজ নিয়েছি কিন্তু কেউ সন্ধান দিতে পারেনি তাঁদের।

জেনারেল টিক্কা খান, লে. জেনারেল নিয়াজি, ব্রিগেডিয়ার বেগ, ব্রিগেডিয়ার আনসারী, কর্নেল জানজুয়া, কর্নেল ভাদী, মেজর বোখারী, মেজর জেড খান, মেজর আসলাম, মেজর হাদি, মেজর জামান এবং তাদের সহযোগীরা চট্টগ্রামে সংঘটিত সকল যুদ্ধাপরাধের সাথে সরাসরি জড়িত ছিল। সুতরাং এইসমস্ত পাকি আর্মি ও তাদের সহযোগীদের ভয়ঙ্কর যুদ্ধাপরাধের জন্য বিচার হতে হবে।

আসামীঃ ব্রিগেডিয়ার সাদুল্লাহ খান, মেজর আব্দুল্লাহ।

অপরাধের ধরনঃ গণহত্যা, জাতিগত নিধন, ধর্ষণ, লুটপাট, অগ্নিসংযোগ।

সাক্ষী ঃ মুক্তিযোদ্ধা গাজী মোহাম্মদ রতন, সাদেক মিয়া, ওসমান উদ্দিন আহম্মদ।

ঘটনাকালঃ একাত্তরের এপ্রিল থেকে ডিসেম্বর পর্যন্ত।

ঘটনাস্থল ঃ ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলা।

সূত্রঃ যুদ্ধাপরাধ গণহত্যা ও বিচারের অন্বেষণ এবং WCFFC গবেষণা।

স্কুল, কলেজ, ব্যবসা প্রতিষ্ঠানসহ ব্রাহ্মণবাড়িয়ার সব কিছুই ধ্বংস করে দিয়েছিল পাকি বাহিনী। কলেজ প্রাঙ্গণ, ওয়াপদা প্রাঙ্গণ, ফাতিয়ারা , করুলিয়া খালের পাড়, উজানিসর সেতু সেই ভয়াল ঘটনার সাক্ষী। হাত চোখ বাঁধা হতভাগ্য বাঙালিদের

www.pathagar.com

এখানে এনে হত্যা করা হয়েছে দিনের পর দিন। পৌর এলাকার বাইরে কসবা, নবীনগর, আড়াইবাড়ি, দেবগ্রাম, তারাগান, আখাউড়া, বৈশাল, সোহাগপুর, ভাদরপুর, নাসিরনগর, আশুগঞ্জ, সরাইল, ঘড়িঘর, বিদ্যাকুট, লালপুর আড়াইসিতা, তালশহর প্রভৃতি এলাকা থেকে নিরপরাধ মানুষকে ধরে এনে হত্যা করে পাকি বাহিনী। সরাইল থানার শাহবাজপুরে মে মাসে পাকি বাহিনী সব ঘরবাড়ি জ্বালিয়ে দেয়। যাঁদের সামনে পায় গুলি করে হত্যা করে। স্বাধীনতার পর একটি গণকবর থেকে আবিষ্কৃত হয় ওই গ্রামের বৈকুণ্ঠ নাথ, মহেশ্বরী দাসী, তারিণী দাস, কৌশল্যা দাসী, জগৎমোহন দাস, প্রহ্লাদ দাস, শচীন্দ্রনাথ দাস, মুক্তময়ী দাসী ও বিধুমুখী দেবীর লাশ। পৈরতলা গ্রামে একুশে নভেম্বর ঈদের দিন বিকেলে পাকি সৈন্যরা আক্রমণ চালায়। কারফিউ জারি করে সব বাড়ির নারী-পুরুষ-শিশুদের তাড়িয়ে অনেক দূরে নিয়ে যায়। সেখানে ছয় সাতজন লোককে দিয়ে মাটি খুঁড়িয়ে সবাইকে হত্যা করে সেই গর্তেই চাপা দেয়। ব্রাহ্মণবাড়িয়া কারাগার থেকেও শত শত বন্দীকে এখানে এনে হত্যা করে নরপশুরা। স্বাধীনতার পূর্ব মুহূর্তে শহরের দক্ষিণে কুরুলিয়া খালের পাড়ে বুদ্ধিজীবীসহ চল্লিশ জনকে হত্যা করে পাকি হানাদাররা। এই হত্যার পেছনে ব্রিগেডিয়ার সাদুল্লাহ খান ও মেজর আব্দুল্লাহর ভূমিকা ছিল প্রধান।

ব্রাহ্মণবাড়িয়াতে পাকি বাহিনীর প্রথম আক্রমণের স্মৃতিচারণ করে মুক্তিযোদ্ধা গাজী মোহাম্মদ রতন বলেন, "এপ্রিলের প্রথম সপ্তাহে পাকি বাহিনী প্রথমবার ব্রাহ্মণবাড়িয়া আক্রমণ করে। বিমান হামলার মধ্য দিয়ে তারা আক্রমণের সূচনা করে। এই হামলায় আমরা টিকতে না পেরে সীমান্তে পেরিয়ে ভারতে চলে যেতে বাধ্য হই। তাদের বিমান হামলায় পুলিশ ডিপার্টমেন্টের দু'জন এবং আনসার বাহিনীর একজন শহীদ হন। নিয়াজ মোহাম্মদ স্কুলের পাশ থেকে তারা বন্দুক দিয়ে বিমানে গুলি করার চেষ্টা করছিলেন। বিমান ভূপাতিত করার জন্য যে কামান দরকার হয়, সেটা তারা জানতেন না। সেখানেই তাদেরকে হত্যা করা হয়। এরপর কুমিল্লা থেকে পাকি আর্মি মার্চ করে ব্রাহ্মণবাড়িয়ার দিকে অগ্রসর হতে থাকে। আমরা ওদের বিরুদ্ধে বেশিক্ষণ টিকতে পারিনি, পিছু হটে যেতে বাধ্য হয়ে ভারতে চলে যাই। পাকি বাহিনী শহরে প্রবেশ করে মুসলিম সাহেবের বাবা, চাচাসহ কয়েকজন আত্মীয়কে হত্যা করে। হত্যাকাণ্ডটি ছিল অত্যন্ত নৃশংস। পৈরতলায় ওইদিন তারা চার-পাঁচ জন সাধারণ লোককে হত্যা করে। শুধু পৈরতলাই নয়, সে সময় তারা ব্রাহ্মণবাড়িয়ার আনাচে কানাচে বহু লোককে হত্যা করে।

পাকি আর্মি গণহত্যা শুরু করে কুমিল্লা থেকে। ব্রাহ্মণবাড়িয়াতে এসে তারা গণহত্যায় মেতে ওঠে। যাকে যেখানে পেয়েছে, সেখানেই হত্যা করেছে। আমার নিজ গ্রাম বিজেশ্বরে তারা দু'জন লোককে হত্যা করে। এদের একজনের নাম আব্দুস সামাদ, অন্যজন বটু মিয়া। তাদের গুলি করে মাথায় খুলি উড়িয়ে দিয়েছিল। পাকি বাহিনী এদেরকে জিজ্ঞেস করে যে, এখানে মুক্তিবাহিনী 'কউন হ্যায়'। কিন্তু তারা কোন তথ্য দিতে না পারায় তাদেরকে এভাবে হত্যা করা হয়। উজানিসর সেতু ছিল পাকি

www.pathagar.com

আর্মির অন্যতম গণহত্যা স্পট। সেতু থেকে তিন-চার কিলোমিটার দূরের এক বাজারে পাকি আর্মির ক্যাম্প ছিল। সেখানে আট-দশ জন পাকি আর্মি ও রাজাকার থাকত। অনেকবার চেষ্টার পর রোজার ঈদের দিন ভোর চারটায় আমরা সেই ক্যাম্প আক্রমণ করি এবং দখল নিতে সক্ষম হই। পাকি আর্মি আখাউড়া, কসবা, নবীনগর, চারঘাট প্রভৃতি জায়গা থেকে নিরীহ বাঙালিদের ধরে এনে এখানে হত্যা করা হত। ডিসেম্বরের এক রাতে অপারেশনের উদ্দেশ্যে আমরা ভারতীয় বাহিনীর সাথে যৌথভাবে ব্রাহ্মণবাড়িয়ার কাছে অবস্থান করছিলাম। এ সময় পাকি আর্মি ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলখানায় আটক রাখা স্থানীয় লোকজন কাউতলী ব্রিজের পশ্চিম দিকে নিয়ে হাত পা বেঁধে গুলি ও বেয়নেট চার্জ করে হত্যা করে। নব্বই-পঁচানব্বই জনকে সে রাতে হত্যা করেছিল তারা।

শহর থেকে এক কিলোমিটার দূরে একটি রেল সেতুর কাছে গিয়ে দেখি পাকি আর্মি দু'শ' থেকে আড়াই শ' লোককে হত্যা করে, আবার কাউকে আহত অবস্থায় মাটিচাপা দিয়ে রেখেছে। আমরা সেখানে গিয়ে দেখি হাত, পা, চুল মাটির ওপরে বেরিয়ে আছে। এদের মধ্যে দু'জন মুক্তিযোদ্ধার লাশও আমরা পেয়েছিলাম। এলাকার লোকজন মিলে লাশগুলো মাটি চাপা থেকে উঠিয়ে পুনরায় দাফন করি। ওই জায়গায় বর্তমানে আমরা একটি স্মৃতিসৌধ তৈরি করেছি।

তিনি বলেন, স্বাধীনতার পর ব্রাহ্মণবাড়িয়াতে তৎকালীন নেতৃবৃন্দ শহীদদের তালিকা তৈরি করতে একটি জরিপ চালিয়েছিলেন। ওই জরিপ থেকে জানা যায়, আশুগঞ্জে সাইলো গোডাউনের পশ্চিম পাশে প্রায় পাঁচ হাজার লোককে হত্যা করা হয়। পাকি আর্মি নদীর চরে এসব লাশ পুঁতে রাখত। ব্রাহ্মণবাড়িয়া শহর এলাকায় যুদ্ধের ন'মাসে ছয় থেকে সাত হাজার লোককে তারা হত্যা করে। এদের মধ্যে বাইশ জন ছিলেন আমাদের নিজ গ্রামের।

নারী নির্যাতন প্রসঙ্গে নিজ চোখে দেখা একটি ঘটনার উল্লেখ করে তিনি বলেন, "পাঁচই ডিসেম্বর আমরা যখন ব্রাহ্মণবাড়িয়া অভিমুখে রওনা হয়ে আখাউড়া পৌঁছলাম, তখন আখাউড়া স্টেশনের পাশে দুটো বাঙ্কার দেখতে পাই। ওই বাঙ্কার থেকে আমরা দু'জন নিহত মহিলাসহ মোট সাতটি মেয়েকে উদ্ধার করি। তাদের দেহে ছিল বেয়নেটের অসংখ্য আঘাত। যে মেয়েগুলোকে আমরা সেখান থেকে জীবিত উদ্ধার করি, তাদের যে কী করুণ অবস্থা ছিল, তা ভাষায় প্রকাশ করার মত নয়। উলঙ্গ, ক্ষত বিক্ষত অবস্থায় ছিল তাদের দেহ। আমাদের কাছে যেসব গামছা কাপড় ছিল তাদেরকে সেগুলো পরতে দিই। যাওয়ার সময় পাকি আর্মি মাইন পুঁতে রেখে যায়। ওই মেয়েদের একজন সেই পুঁতে রাখা মাইন বিস্ফোরণে একটি পা হারিয়েছিলেন। তারপর আটই ডিসেম্বর এখানকার ওয়াপদা ভবন থেকে আমরা সাত-আট জন মেয়েকে উদ্ধার করি। সম্ভবত এরা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রী ছিলেন। কত ভয়ঙ্করভাবে যে তাদেরকে নির্যাতন করা হয়েছিল, তা ভাষায় প্রকাশ

www.pathagar.com

করবার নয়। পরে তাদেরকে আমরা অভিভাবকদের কাছে তুলে দেওয়ার ব্যবস্থা করেছিলাম। এই মেয়েরা ভারতে যাওয়ার পথে পাকিদের হাতে ধরা পড়ে। ওয়াপদা ভবনে আমাদের এলাকা থেকেও অনেক মেয়েকে ধরে আনা হয়েছিল। তারা লজ্জায় কিছু বলতে না চাইলেও আমরা পরবর্তীতে সবই জানতে পারি।

মুন্সিবাড়ি গ্রামের সাদেক মিয়া বলেন, ১৯৭১ সনে আমি কৃষিকাজ করতাম। তখন বোরো ধান কাটার সময়। আমরা কাঁচি নিয়ে ধান কাটতে যাওয়ার সময় আর্মির সামনে পড়ে যাই। তারা আমাদেরকে বলে, মুকামে চল। এসময় তারা আমাদেরকে তিতাস নদীর দক্ষিণ পাড়ে ওয়াপদার কিনারে নিয়ে যায়। তারপর কোদাল ও বেলচা দিয়ে বাঙ্কার খুঁড়তে বলে। আমার সাথে তখন গ্রামের আবন আলী ছিল। বাঙ্কার খোঁড়ার সময় দেখলাম যে, একটি বড় নৌকায় বত্রিশ জন লোক ধান বোঝাই করে নিয়ে যাচ্ছে। পাকি আর্মি তাদেরকে ডাক দিল। ভয়ে তারা নৌকা ভেড়াল। এরপর তাদেরকে নৌকা থেকে নামিয়ে লাইন করে গুলি করে। ওই বত্রিশ জনের মধ্যে একজন বেঁচে যান। তার বাড়ি বাড়েরা। তবে এদের মধ্যে কোন মহিলা ছিল না। আমরা দু'জন একত্রিশ জনকে হত্যা করতে দেখলাম সেখানে। হত্যার পর লাশগুলো তারা নদীতে ফেলে দেয়। পনেরো-বিশ দিন পর্যন্ত লাশগুলো নদীতে ভেসে ছিল। পচে গলে যাওয়া এই লাশগুলো মাছেরা ঠুকরে ঠুকরে খেত। এ কারণে সে সময় আমাদের এখানকার কেউই নদীর মাছ খেত না।

যুদ্ধের পুরো সময় আমাদেরকে ওই ক্যাম্পে কাজ করতে হয়েছে। অনেক সময় শাহবাজপুর থেকে মাধবপুর পর্যন্ত পায়ে হেঁটে গুলির বাক্স বয়ে নিয়ে যেতে হত। কাজ না করলে তারা মারধোর করত। কাজের জন্য আমাদেরকে মাসে বিশ টাকা করে দেওয়া হত। এখানে পাকি সেনাদের সংখ্যা ছিল দুই হাজারের ওপরে। কোন আর্মির নাম তখন আমরা জানতে পারিনি। আমাদেরকে দিয়ে তারা যেসব বাঙ্কার খোঁড়ায় যুদ্ধের সময়, সেগুলো তারা ব্যবহার করত। পাকি সেনারা রাজাকারদের সহায়তায় তামান্না মিয়ার বাড়ি ও একটি হিন্দু বাড়িসহ গ্রামের তিন চারটি বাড়ি পুড়িয়ে দেয়। আর্মির হাত থেকে বাঁচার জন্য আমাদের এখানকার মহিলারা মুক্তিযুদ্ধের পুরো সময়টা লুকিয়ে লুকিয়ে থেকেছে।

ওসমান উদ্দিন আহম্মদ বলেন, শাহবাজপুর পরপর দু'বার পাকি আর্মির দ্বারা আক্রান্ত হয়। এপ্রিলের সতেরো তারিখ রাত আটটায় প্রথমবার আক্রান্ত হয়। শাহবাজপুর ওয়াপদা রেস্টহাউজে হাজার হাজার পাকি সৈন্য সে সময় রির্জাভ থাকত। পাহাড়পুর, মোকন্দপুর ও তেলিয়াপাড়া প্রভৃতি এলাকায় তাদের কোন সৈন্য মারা গেলে এই রিজার্ভ থেকে সেখানে সৈন্য পাঠানো হত। এখানকার সৈন্যরা তাৎক্ষণিকভাবে সেক্টরে যুদ্ধ করতে যেত না। দুইদিন, তিনদিন কখনও বা সাতদিন তাদেরকে রিজার্ভে থাকতে হত। এই অবস্থায় ক্যাম্পে বন্দীর মত না থেকে তারা গ্রামে ঢুকে নারীদের ওপর পাশবিক নির্যাতন চালাত ও সাধারণ মানুষের ওপর

www.pathagar.com

নানাভাবে অত্যাচার নির্যাতন চালাত। যাদেরকে ইপিআর, পুলিশ বলে সন্দেহ হত, তাদেরকেই ধরে নিয়ে ওয়াপদার রেস্ট হাউস পুকুর পাড়ে হত্যা করত। এছাড়া যুদ্ধের সেক্টর থেকে পূর্বে পাহাড়পুর, মোকন্দপুর, তেলিয়াপাড়া ও মাধবপুর এলাকায় থেকে যে সব সন্দেহভাজন লোকজনকে তারা ধরে আনত, তাদেরকেও তিতাস নদীর পারে এই রেস্ট হাউজে হত্যা করা হত।

শাহবাজপুরের অনেক লোককে তারা হত্যা করেছে। তুলা বাদশা ও বিচু মিয়া নামে আপন দু'ভাইকে তারা হত্যা করে। তাদের বাবার নাম ছিল মঞ্জু মিয়া। আমাদের পাড়ার নায়েব আলী নামে এক লোক আত্মরক্ষার্থে রাজাকারে নাম লিখিয়েও তাদের হাত থেকে রেহাই পায়নি। বৈশামোরা ও রাজামারা কান্দিতেও তারা আটজন লোককে হত্যা করে। আমাদের পাশের নওগাঁও ও মজলিশপুর ইউনিয়নের নব্বই জন লোক একদিন নৌকা চড়ে এদিকে কাজ করতে আসছিল। তাদেরকে ডেকে নিয়ে একই দিনে সবাইকে হত্যা করে পাকি সেনারা। এরপর শাহবাজপুরের বিধুপুর গ্রামের হিরা মিয়া নামে একজনকে তারা হত্যা করে। শাহবাজপুরের প্রায় ত্রিশ জনকে তারা হত্যা করেছে। নিহতদের মধ্যে কোন মহিলা ছিল না। এদের নামের তালিকা মুক্তিযোদ্ধা সংসদ অফিসে আছে। একজন রাজাকার আমাকে বলেছে, ওয়াপদা রেস্ট হাউজে মেয়েদের ধরে এনে পাকি আর্মি পাশবিক নির্যাতন করত। এভাবে ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলায় ব্রিগেডিয়ার সাদুল্লাহ খান, মেজর আব্দুল্লাহ ও তাদের সহযোগীরা ব্যাপক গণহত্যা, ধর্ষণযজ্ঞ, জাতিগত নিধন, অগ্নিসংযোগ ও লুটপাট চালায়।

আসামীঃ ব্রিগেডিয়ার সফি, লে. কর্নেল ইয়াকুব মালিক, মেজর সুলতান, মেজর মোহাম্মদ ইয়াসিন খন্দকার, মেজর গার্দিজী, ক্যাপ্টেন বোখারী, ক্যাপ্টেন জাহিদ জামাল, ক্যাপ্টেন ইফতেখার হায়দার শাহ্, ক্যাপ্টেন নাসিম মালিক, ক্যাপ্টেন আগা বোখারী এবং সুবেদার মেজর ফয়েজ সুলতান।

অপরাধের ধরনঃ গণহত্যা, জাতিগত নিধন, ধর্ষণ, লুটপাট, অগ্নিসংযোগ।

সাক্ষী ঃ রমণী শীল, জেনারেল ইমামুজ্জামান, আব্দুল মালেক, মোঃ আলী আকবর মেম্বার, এসবি জামান, লোকমান খান, সুজরত আলী।

ঘটনাকালঃ একাত্তরের পঁচিশে মার্চ থেকে ডিসেম্বর পর্যন্ত।

ঘটনাস্থল ঃ কুমিল্লা জেলা।

সূত্রঃ যুদ্ধাপরাধ গণহত্যা ও বিচারের অন্বেষণ এবং WCFFC গবেষণা।

উল্লিখিত পাকি আর্মি একাত্তরে কুমিল্লা শহরকে হত্যা, নির্যাতন ও বধ্যভূমিতে পরিণত করেছিল। কুমিল্লা জেলায় এমন কোন থানা, এমন কোন গ্রাম ছিল না, যেখানে পাকিবাহিনী নির্মম হত্যাযজ্ঞ ও নির্যাতন চালায়নি। কুমিল্লা সেনানিবাসটিকে তারা বধ্যভূমি এবং গণকবরে পরিণত করেছিল। সেনাবাহিনীর বাঙালি অফিসার-সৈনিক,

www.pathagar.com

বুদ্ধিজীবী, রাজনীতিক, শিক্ষাবিদ, ছাত্র, কৃষক-শ্রমিক, সরকারি কর্মচারী, স্কুল-কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রী, গৃহবধূ, এমনকি মসজিদের ইমাম পর্যন্ত রক্ষা পাননি হানাদারদের হাত থেকে। ময়মনামতির পুরো এলাকার ঝোপঝাড়, ছোট ছোট টিলা, কাশবন, ডোবা ও নালার কাছে পাওয়া গেছে অসংখ্য নরকঙ্কাল। 'দৈনিক পূর্বদেশ', আঠাশে ফেব্রুয়ারি ১৯৭২ সনের এক প্রতিবেদনে দেখা যায়, ময়নামতি ক্যান্টনমেন্টে বারোটি গণকবর খনন করে প্রায় সাত হাজার নরকঙ্কাল পাওয়া গেছে। একই পত্রিকার সাতই জানুয়ারির অপর এক প্রতিবেদন থেকে জানা যাচ্ছে, দেশ স্বাধীন হওয়ার পর এখান থেকে বিবস্ত্র অবস্থায় সাতশ' মহিলাকে উদ্ধার করা হয়।

কুমিল্লা শহরে এবং তার আশেপাশের এলাকায় যে নির্যাতন ও হত্যাযজ্ঞ চালানো হয়, তার সাক্ষী বাঙালি অফিসার লে. ইমামুজ্জামান। উনত্রিশে মার্চ তাঁকে আরও অনেকের সাথে আটক করে সেনানিবাসে রাখা হয়। তাঁকে অন্যান্যের সাথে হত্যার উদ্দেশ্যে গুলি করা হলেও ভাগ্যের জোরে আহত হয়েও বেঁচে যান তিনি। ত্রিশে মার্চ বিকেল চারটায় একজন হানাদার ঘরে ঢুকে স্বয়ংক্রিয় আগ্নেয়াস্ত্রের সাহায্যে তাঁকেসহ তিন জন অফিসারের উপর গুলি চালায়। তাঁর সঙ্গী দু'জন সাথে সাথে প্রাণ হারান। অল্প কিছুক্ষণের মধ্যে তারও মৃত্যু হবে ধরে নিয়েছিলেন তিনি। গুলি করে সৈন্যটি বেরিয়ে যাওয়ার পর আরেকজন অফিসার হত্যালীলা তদারক করতে আসে। এ সময় তিনি মরার ভান করে পড়ে থাকেন। অফিসারটি পর্যবেক্ষণ করতে এসে বলে, "ঠিক হ্যায়, বাঙালি সব খতম হো গেয়া"। বন্দী অবস্থায় তিনি ঘরের জানালা দিয়ে বাঙালিদের গুলি করে হত্যা করতে দেখেছেন। বাঙালি ছেলেরা খেলারত অবস্থায় তাদের ওপর পাকি সেনারা সেখানে গুলি চালায় বলে তিনি জানান। ইমামুজ্জামান তাঁর সঙ্গীদের আর্তচিৎকার শুনেছেন এবং গুলিবিদ্ধ হয়ে মৃত্যুবরণ করতে দেখেছেন।

কুমিল্লার দেবপুর গ্রামের রমণী শীল পাকি বাহিনীর নির্যাতন ও হত্যাযজ্ঞের সাক্ষী। পাকি বাহিনী নিজেদের প্রয়োজনে তাঁকে বাঁচিয়ে রাখে। পরবর্তীতে এই রমণী শীলই প্রবীণ রাজনীতিবিদ ও ভাষা সৈনিক ধীরেন্দ্রনাথ দত্তের হত্যাকাণ্ডসহ বহু হত্যাকাণ্ডের সাক্ষ্য দেন। এ ছাড়া বরুড়া থানা, চাঁদপুর রেলওয়ে স্টেশন, হাজীগঞ্জ, লাকসাম সিগারেট ফ্যাক্টরি, লাকসাম রেলওয়ে কারখানায়ও চলে নির্যাতন ও গণহত্যা। লাকসাম রেলওয়ে কারখানার চিলেকোঠায় পাকি বাহিনী লুট করে আনা খেজুরের গুড় এবং মিষ্টি জাতীয় জিনিস ছিটিয়ে অজস্র পিঁপড়া জড়ো করে। তারপর সেই পিঁপড়ার মধ্যে ফেলে রাখে অত্যাচারে জর্জরিত সংজ্ঞাহীন মানুষগুলোকে। সারারাত বিষাক্ত পিঁপড়ার তীব্র দংশনে অনেকেই সেই চিলেকোঠায় মৃত্যুবরণ করতেন। ওই নির্মম অত্যাচারের পরও যাঁরা বেঁচে যেতেন, তাঁদের লাইন বেঁধে দাঁড় করিয়ে গুলি করে হত্যা করা হত। লাকসাম রেলওয়ে হাসপাতালের মালী মণীন্দ্রচন্দ্র, উপেন্দ্রচন্দ্র ও

www.pathagar.com

রামচন্দ্র পাকি সেনাদের অনেক কাজ করে দিতেন বলে তাঁরাও এসব ঘটনার সাক্ষী ছিলেন। ১৯৭১ সনের পঁচিশে মার্চ থেকে সাতই ডিসেম্বর পর্যন্ত কুমিল্লায় অন্তত বিশ হাজার নিরপরাধ নারী পুরুষকে হত্যা করা হয়। কুমিল্লায় বাঙালি নিধনযজ্ঞের নায়ক ছিল ব্রিগেডিয়ার সফি ও ক্যাপ্টেন বোখারী।

একাত্তরের এগারোই সেপ্টেম্বর কুমিল্লার আমড়াতলি ইউনিয়নের শরাফত আলীর বাড়িতে নিরাপদ আশ্রয়ে ছুটে যাওয়া ধনঞ্জয় খন্দকার বাড়ির ছাব্বিশ জন নারী পুরুষ শিশুকে পাকি আর্মি নির্বিচারে গুলি করে হত্যা করে। বাড়ির অন্যান্য স্থানে হত্যা করা হয় আরও দশজনকে। হত্যাকাণ্ডের পর আব্দুল খালেক ডাক্তারসহ আরও ছয়-সাত জন শহীদকে নিয়ে গণকবর দেওয়া হয়। নিহতরা হলেন- শরাফত আলী, তাঁর মেয়ে হাফেজা খাতুন, শামসুল হুদা খন্দকার, মোহাম্মদ কেরামত আলী, আবদুল হালিম, মোঃ বসু মিয়া, মন্তাজ আলী, আবদুল লতিফ, মোহাম্মদ আলী, ফরমান বিবি, আবদুর রাজ্জাক, রোকেয়া খাতুন, জোহরা বেগম, সালেহা বেগম, জসীম উদ্দীন, সেলিম মিয়া, রজ্জব আলী, রমিজ উদ্দীন, রহিম আলী, মেহেরুন্নেসাসহ আরও অনেকে। স্বাধীনতার পর কেবল বারোটি গণকবরেই পাওয়া যায় দশ হাজারেরও বেশি লাশ। সেনানিবাস ছিল মূল হত্যাপুরী, স্কোয়াড্রন রুমে উনত্রিশে মার্চ সাত শ' জনের মতো সামরিক বেসামরিক বাঙালির ওপর গুলি চালিয়ে হত্যা করা হয়। এঁদের মধ্যে থেকে বেঁচে গিয়েছিলেন আব্দুর রহমান।

সিগনাল লাইন সংলগ্ন গণকবর থেকে উদ্ধার করা হয় ব্রিগেড মসজিদের ইমাম মাওলানা আব্দুল মান্নান, লে. কর্নেল জাহাঙ্গীর, মেজর খালেক, মেজর হাসিব, ক্যাপ্টেন আইয়ুবসহ চব্বিশ জনের দেহাবশেষ। প্রবীণ রাজনীতিবিদ ভাষা সৈনিক ধীরেন্দ্রনাথ দত্তকে এ এলাকায় অমানুষিক নির্যাতনের পর হত্যা করা হয়। আগেই বলা হয়েছে কুমিল্লার দেবপুর গ্রামের রমণী শীল এ হত্যাযজ্ঞের একজন প্রত্যক্ষদর্শী। ক্যান্টনমেন্টের অধিবাসীদের ক্ষৌরকর্ম করতেন রমণী শীল। তিন নম্বর গোলন্দাজ বাহিনীর প্রধান লে. কর্নেল ইয়াকুব মালিকের নির্দেশে এই হত্যাকাণ্ড চালানো হয় বলে তিনি জানান। এর সাথে আরও ছিল মেজর সুলতান, মেজর মোহাম্মদ ইয়াসিন খন্দকার, ক্যাপ্টেন জাহিদ জামাল, ক্যাপ্টেন ইফতেখার হায়দার শাহ, ক্যাপ্টেন নাসিম মালিক, ক্যাপ্টেন আগা বোখারী এবং সুবেদার মেজর ফয়েজ সুলতান।

লাকসাম সিগারেট ফ্যাক্টরিটা হত্যাপুরী নামেই পরিচিত ছিল। যুদ্ধের ন'মাস এখানে এমন কোন নির্যাতন ছিল না, যা পাকিরা করেনি। লাকসাম থানার বিভিন্ন গ্রাম থেকে নিরীহ নারী পুরুষদের ধরে আনা হত। লাকসাম জংশনে অপেক্ষমাণ ট্রেন থেকে মেয়েদের ধরে নিয়ে খান সেনাদের আনন্দের জন্য ছেড়ে দেওয়া হত। তাঁরা মহিলাদের বিবস্ত্র করে কারখানার রেলিং বিহীন ছাদে দু'হাত ওপরে তুলে দিনভর

www.pathagar.com

হাঁটাত। আর রাতে মেজর গার্দিজী ও তার দোসররা এসব মেয়ের ওপর চালাত পাশবিক নির্যাতন। চাবুকের নির্মম আঘাতে এই নারীরা চিৎকার করে উঠতেন। কেউ কেউ মারাও যেতেন। আর অর্ধমৃতদের পুঁতে ফেলা হত কারখানার কোন এক কোণায়। লাকসাম রেলওয়ে হাসপাতালের মালী মণীন্দ্র চন্দ্র, উৎপল চন্দ্র ও শ্রীধাম চন্দ্র সে সময় কারখানার কাজ করতেন। ফ্যাক্টরিতে লাশ মাটিচাপা দেওয়া ছিল তাঁদের কাজ। উপেন্দ্র বর্তমানে পক্ষাঘাতগ্রস্ত। একাত্তরে ফেণী রেলওয়ে স্টেশনের হেড ক্লার্ক এস বি জামান ওই টোব্যাকো ফ্যাক্টরিতে পাঁচ দিন বন্দী ছিলেন। লাকসামের তৎকালীন স্টেশন মাস্টার লোকমান খান পাকি আর্মিকে ট্রেন থেকে শত শত মানুষকে জোরপূর্বক নামিয়ে বন্দী করে নিয়ে যেতে দেখেছেন। ফ্যাক্টরি পাহারাদার সুজরত আলীও দেখেছেন বিবস্ত্র অবস্থায় নারী পুরুষের ওপর পাকিদের বর্বর নির্যাতন।

কোতোয়ালী থানার সিএন্ডবির ডাকবাংলো ও লালমাইতে পাকি হানাদাররা ব্যাপক হত্যাকাণ্ড, নারী নির্যাতন, অগ্নিসংযোগসহ মানবতাবিরোধী কর্মকাণ্ড চালায়। এক সাক্ষাৎকারে বড় ধর্মপুর ও এর আশেপাশের গ্রামের প্রত্যক্ষদর্শী ও ক্ষতিগ্রস্ত মানুষ এ সম্পর্কে বিস্তারিত বলেন। সাতাশে মার্চ এ এলাকায় প্রবেশের পর থেকে ষোলোই ডিসেম্বর পর্যন্ত ন'মাসে পাকি হায়েনার দল সমগ্র লালমাই এলাকাকে হত্যা ও ধর্ষণের প্রেতপুরীতে পরিণত করে।

লালমাইয়ের স্থানীয় বাসিন্দা মোঃ আব্দুল মালেক বলেন, স্কাউট ভবনের পাশেই আমাদের বাড়ি। পঁচিশে মার্চের পরের দিন, অর্থাৎ ছাব্বিশে মার্চ পাকি আর্মি আমাদের এই জায়গা দখল করে নেয়। ছাব্বিশে মার্চ তারা এখানে এসে পাহাড় দখল করে আমার বাড়ি-ঘর পুড়িয়ে দেয় এবং শেলিং শুরু করে। আমার বাড়ির কিছুই অবশিষ্ট রাখেনি। ওরা আমার বড় বড় গাছগুলো অর্ধেক করে কেটে ফেলে। গাছের বাকি অর্ধেকাংশ এখনও জীবিত আছে। ডাকবাংলোতে ক্যাম্প করে তারা যুবক ছেলেদের বাড়ি থেকে ডেকে নিয়ে হাত পা পরীক্ষা করে দেখত যে, তারা কৃষিকাজ করে কি না। তারা আমাদের জিজ্ঞাসা করত, আমরা মুক্তিবাহিনীতে গিয়েছি নাকি রাজাকারে গিয়েছি। আমরা তখন বলি যে, 'আমরা কোন কিছুতেই যাইনি। আমরা কিছুই জানি না-রাজনীতিও বুঝি না। আমরা ক্ষেত খামারের কাজ করে খাই।' তারা বাইরে থেকে বহু লোকজনকে এখানে ধরে এনে বিনা অপরাধে হত্যা করে। তারা এখানে এত লোক হত্যা করেছে, যা গুণে বলা সম্ভব নয়। কলেজের (লালমাই কলেজ) প্রিন্সিপালের রুমে হিন্দু, মুসলিম, বৌদ্ধ ও খ্রিস্টান ধর্মাবলম্বী অসংখ্য লোকজন তারা এনে আটকে রাখত। সকালে শুধু রক্ত ছাড়া আর কিছুই দেখা যেত না। দশ হাজারেরও বেশি লোক এখানে এনে হত্যা করা হয়েছে বলে আমার ধারণা।

www.pathagar.com

আগে এখানে প্রায় কোন বাড়িই ছিল না। সবটাই তাদের দখলে ছিল। লালমাইয়ের এই এলাকাকে সে সময় ক্যান্টনমেন্ট সাব্যস্ত করা হয়েছিল। শহরে হত্যা করা সম্ভব হত না বলে এখানেই সব হত্যাকাণ্ড ঘটানো হত। একদিন আমার বাড়ির একটি গর্তে ত্রিশ জনকে হত্যা করে ফেলে রাখে তারা। এরা পূর্বদিকে অপারেশন করে সেখান থেকে লোকজন এখানে ধরে নিয়ে আসত। অনেককে মারতে মারতে কাহিল করে গুলি করে গর্তে ফেলে দিত। আমার বাড়ির গর্তে এখনও হাড়গোড় পাওয়া যাবে। যেদিন আমার বাড়িতে ত্রিশ জনকে হত্যা করে, সেদিন আমি মাঠে ধান কাটছিলাম। ক্যান্টনমেন্টের ভেতরে আমার ধান ছিল, তাই ধান কাটা ও অন্যান্য কাজের জন্য তারা আমাদের কয়েকজনকে পরিচয়পত্র দেয়। আমাদেরকে তখন তারা মারতে পারত না। সকাল বিকাল আমাদের বাড়িতে লোকজনের গমনাগমন হিসেব করে রাখত। বাড়িতে লোক এলে তাদেরকে হিসেব দিতে হত, চলে গেলেও হিসেব দিতে হত। এ সময় বাইরের থেকে অনেক মেয়েকে ধরে এনে তারা ডাকবাংলোয় রেখে ধর্ষণ করত। তাদের এই অবস্থা দেখে আমার পরিবারের মেয়েদেরকে বাইরে রেখে আসি। আমার বাড়িতে যে ত্রিশ জনের লাশ ফেলা হয়, সেটা স্বাধীনতার সপ্তাহ খানেক আগের ঘটনা হবে। যে সময় ভারতীয় বিমান যুদ্ধ শুরু করে সে সময়। আমার বাড়িতে হত্যাকাণ্ড ঘটানোর এক দিন পরে তারা চলে যায়। এখানে যার নেতৃত্বে এসব হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হয় তার নাম ছিল মেজর আকবর। তোরাব আলী ও আমাকে মিলিটারিরা এক সাথে ধরেছিল। আমাকে কৃষক বলে ছেড়ে দিলেও তোরাব আলীর ওপর বারো ঘন্টা ধরে নির্যাতন চালায়।

স্থানীয় মেম্বার লালমাই কলেজের চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারী আলী আকবর বলেন, একাত্তর সনে আমার বয়স ছিল চল্লিশ বছর। সে সময় কলেজে মাঝে মধ্যে আসা পড়ত। একদিন দেখি পাকি সেনারা কলেজের চেয়ার টেবিল ভাঙচুর করছে। কারণ এই কলেজের প্রতিষ্ঠাতা অধ্যক্ষ মরহুম আবুল কালাম আজাদ ছিলেন কুমিল্লা জেলার আওয়ামী লীগের নেতা। পরে তিনি সংসদ সদস্য হয়েছিলেন। একদিন ভাঙচুর করার সময় রাজাকার বাঙালি যারা ছিল, তাদেরকে বললাম, 'ভাই, কলেজ তো সবার জন্য, এই যে ভাঙচুর করছেন এটাতো ঠিক না'। এই কথা বলার পর তারা আমাকে ধমক দেয়। আরেকদিন তৎকালীন প্রিন্সিপাল আবুল কালাম আজাদ সাহেব খবর পাঠালেন, 'যদি তোমরা পারো তাহলে কলেজের কিছু কাগজপত্র আলমারি থেকে সরিয়ে রেখ'। তিনি তখন ভারতে ছিলেন। তখন আমি ও জব্বার আলী (সে সময় কলেজে চাকরি করত) কিছু কাগজপত্র কলেজের আলমারি থেকে বের করে রওনা হওয়ার পরপরই রেস্ট হাউজ থেকে পাকি সেনারা আমাদের লক্ষ্য করে গুলি ছোঁড়ে। আমাদের গায়ে অবশ্য গুলি লাগেনি। আমরা তখন একটা উঁচু জায়গায় ছিলাম,

www.pathagar.com

সেখানে থেকে গড়িয়ে নিচের দিকে পড়ি। তখন কলেজে আর্মি ঢোকেনি। অনেক সময় দেখতাম, বিভিন্ন গ্রামে অপারেশন চালিয়ে এখানে লোকজন ধরে নিয়ে আসত। আর্মি বহু লোককে ধরে এনেছে দেখেছি। কিন্তু তাদের কাউকে ফিরে যেতে দেখিনি। আমার গ্রাম থেকে প্রায় দু'মাইল দূরে অবস্থিত লোলবাড়িয়া গ্রাম থেকে যাঁদেরকে ধরে আনা হয়, তাঁদের আর ফেরত পাওয়া যায়নি। যাঁদের ধরে আনে, তাঁদের নাম-রাধাকৃষ্ণ (২৫), লোলবাড়িয়া; ভারত কবিরাজ (৪০), লোলবাড়িয়া; হরিদাস শীল (৪০), দীঘলগাঁও।

আমাদের বাড়ির মেয়েদেরকে সাত-আট মাইল দূরে রেখে আসি। কারণ সুন্দর মেয়ে দেখলে তারা ধরে নিয়ে যেত। আমাদের এখানকার একটি মেয়েকে পাকি আর্মি ধর্ষণ করে তাঁর নাম ফুলবানু, স্বামী আব্দুল খালেক, গ্রাম বড়ধর্মপুর। তিনি মঙ্গলমুড়া গ্রামের কলিমুল্লা মাস্টারের বাড়িতে গিয়ে আশ্রয় নিয়েছিলেন। মে বা এপ্রিল মাসে আর্মি মঙ্গলমুড়া গ্রামে অপারেশন চালায়। গ্রামের পুরুষরা তখন গ্রাম ছেড়ে পার্শ্ববর্তী নদী পার হয়ে চলে যায়। কিন্তু মেয়েটি কোথাও যেতে পারেনি। বাড়িতে ঢুকে পাকি সেনারা মেয়েটাকে ধর্ষণ করে রক্তাক্ত অবস্থায় ফেলে যায়। এরপর মেয়েটিকে তার অভিভাবকরা ডাক্তারখানায় নিয়ে চিকিৎসা করিয়ে সুস্থ করে তোলে।

পাকিদের গুলিতে আমার দু'বোন আহত হয়। এদের একজনের বুকে গুলি লাগে। আমার সেই চাচাত বোনের নাম তাহাজ্জাতুননেছা। আমার বোন সুফিয়া বেগমের পায়েও আর্মি গুলি করে। গুলি লাগার পর আমরা দু'তিন ভাই তাকে কাঁধে করে লালমাই বাজারে নিয়ে যাই। তখন পাঞ্জাবিরা বলে, 'তুম কাঁহা যা রাহেহো?' উত্তরে বললাম, 'আমার বোনের তবিয়ত খারাপ'। সত্য গোপন করে বললাম আমার বোন 'মুক্তি'র গুলিতে আহত হয়েছে, তাই হাসপাতালে নিয়ে যাচ্ছি। এরপর সদর হাসপাতালে এক মাস রেখে চিকিৎসা করানোর পর বাড়িতে নিয়ে যাই। এসময় পাঞ্জাবিরা শিবপুর গ্রামের দিকে গাড়ি নিয়ে যায় এবং কয়েকটা বাড়িঘর জ্বালিয়ে দেয়। সেখানে তারা গুলি করে কয়েকজনকে হত্যা করে। যাঁদেরকে পাকিরা হত্যা করে, তাঁদের নাম-আব্দুল হামিদ মইসান। (পঁয়ত্রিশ-চল্লিশ), পিতা-ইসলাম মইসান, তাজুল ইসলাম (পঁচিশ) পিতা-জফর আলী, ফজর আলী (পঞ্চাশ) পিতা-চান গাজী।"

কুমিল্লা জেলার সকল যুদ্ধাপরাধের জন্য ব্রিগেডিয়ার সফি, লে. কর্নেল ইয়াকুব মালিক, মেজর সুলতান, মেজর মোহাম্মদ ইয়াসিন খন্দকার, মেজর গার্দিজী, ক্যাপ্টেন বোখারী, ক্যাপ্টেন জাহিদ জামাল, ক্যাপ্টেন ইফতেখার হায়দার শাহ্, ক্যাপ্টেন নাসিম মালিক, ক্যাপ্টেন আগা বোখারী এবং সুবেদার মেজর ফয়েজ সুলতান ও তাদের সহযোগী পাকি সেনারা দায়ী।

www.pathagar.com

আসামীঃ মেজর ইফতেখার।

অপরাধের ধরনঃ গণহত্যা, জাতিগত নিধন, ধর্ষণ, লুটপাট, অগ্নিসংযোগ।

ঘটনাকালঃ একাত্তরের পঁচিশে মার্চ থেকে ডিসেম্বর পর্যন্ত।

ঘটনাস্থল ঃ চাঁদপুর জেলা

সূত্রঃ যুদ্ধাপরাধ গণহত্যা ও বিচারের অন্বেষণ এবং WCFFC গবেষণা।

নদীবেষ্টিত চাঁদপুর জেলাতেও পাকি হানাদাররা ব্যাপক হত্যা ও ধ্বংসযজ্ঞ চালায়। মেঘনা তীরের প্রাচীন এই শহরটিকে একাত্তর সনে তারা কসাইখানায় পরিণত করেছিল। সাতই এপ্রিলের পর থেকেই চাঁদপুর পাকি বাহিনীর দখলে চলে যায়। শহরের টেকনিক্যাল স্কুল, নুরিয়া হাই স্কুল, আক্কাস আলী হাই স্কুল, রেল স্টেশনের অফিস কক্ষসমূহ, রেস্ট হাউজ প্রভৃতি স্থানে নিরীহ জনসাধারণকে ধরে এনে দিনের পর দিন অমানুষিক নির্যাতন চালানোর পর হত্যা করা হয়। মেজর ইফতেখারের নেতৃত্বে চাঁদপুর শহরে প্রবেশের সময়ই পাকি সেনারা রাস্তার দু'পাশের ঘরবাড়ি জ্বালিয়ে দেয় এবং নির্বিচারে গুলি চালিয়ে ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করে। পুরান বাজার ও বন্দর শহরের প্রায় সকল দোকান লুটপাট করা হয়। হত্যার পর কত লাশ নদীতে ফেলে দেওয়া হয়েছে তার কোন হিসাবই আর পাওয়া যায়নি। রেল স্টেশন বধ্যভূমি, ফিশিং কর্পোরেশনের পেছনের বধ্যভূমিসহ চাঁদপুরে রয়েছে অনেকগুলো বধ্যভূমি। মেজর ইফতেখার ও তার সহযোগী পাকি আর্মি একাত্তরে চাঁদপুরে গণহত্যা, জাতিগত নিধন, ধর্ষণ, লুটপাট অগ্নিসংযোগ ঘটিয়ে মারাত্মক যুদ্ধাপরাধ সংঘটিত করে।

www.pathagar.com

সিলেট বিভাগ

আসামীঃ সরফরাজ খান, কর্নেল সরফরাজ মালিক, ক্যাপ্টেন নুরুউদ্দিন খান ও ব্রিগেডিয়ার ইফতেখার রানা।

অপরাধের ধরনঃ গণহত্যা, জাতিগত নিধন, ধর্ষণ, লুটপাট, অগ্নিসংযোগ।

সাক্ষী ঃ সিরাজ উদ্দীন আহম্মদ, শিবপ্রসাদ সেন চৌধুরী, সৈয়দা জেবুন্নেসা হক, সুহাসিনী দাস।

ঘটনাকালঃ পঁচিশে মার্চ থেকে বারোই ডিসেম্বর পর্যন্ত।

ঘটনাস্থল ঃ সিলেট জেলা।

সূত্রঃ যুদ্ধাপরাধ গণহত্যা ও বিচারের অন্বেষণ এবং WCFFC গবেষণা।

উপর্যুক্ত পাকি আর্মি একাত্তরে সিলেট জেলায় ব্যাপক গণহত্যা, ধর্ষণযজ্ঞ, জাতিগত নিধন, অগ্নিসংযোগ ও লুটপাট করে। সিলেটের সালুটিকর বিমান বন্দরের নিকটবর্তী মডেল স্কুলটিকে পাকি সেনা ও তাদের দোসররা গোটা ন'মাস বধ্যভূমি ও নির্যাতন কেন্দ্র হিসাবে ব্যবহার করে। অমানুষিক অত্যাচারের পর স্কুল প্রাঙ্গণেই নারী, পুরুষ ও শিশুদের হত্যা করা হত। স্কুলের বিভিন্ন কক্ষেও পাওয়া যায় অজ্ঞাত পরিচয় নারী পুরুষের লাশ। সিলেট শহরের ভেতরে সিভিল সার্জনের বাংলো বধ্যভূমি হিসেবে ব্যবহার করা হত। পাহাড়ের ওপর অবস্থিত এই বাংলোতে হত্যার পর লাশগুলোকে তারা কবর না দিয়ে বিভিন্ন দিকে ছুঁড়ে ফেলে দিত। সিলেটের খাদিমনগর, আদিত্যপুর, বুরুঙ্গা, ভাটপাড়া, গালিমপুর, হরিকোনা, উমরপুর প্রভৃতি স্থানেও পাকি সেনারা ব্যাপক হত্যাযজ্ঞ চালায়। আটই এপ্রিল সিলেট শহর পাকি বাহিনীর হাতে চলে যায়। এ মাসে তারা বিয়ানীবাজারে আসে ও গণহত্যা শুরু করে। প্রথম দিন তারা হত্যা করে আবদুল হামিদ চৌধুরী, আবদুল লতিফ, সাইদুর রহমান, সইয়ব আলী ও রজিদ আলীসহ আরো অনেককে।

অবরুদ্ধ আট মাসের এই হত্যাযজ্ঞে প্রাণ দিয়েছেন বিয়ানীবাজারের কয়েক শ' লোক। চারখাই ইউনিয়নের মোঃ ইয়াজ মিয়া দফাদার, মতিউর রহমান, রুপি নমশূদ্র ও নরেশ নমশূদ্র, দুবাগ ইউনিয়নের ইরশাদুর রহমান চৌধুরী, রুহেল আহমেদ

www.pathagar.com

চৌধুরী, তজমান আলী, লাই মিয়া, বলাই মিয়া, চুন্নু মিয়া, মুফজ্জিল আলী, ময়না মিয়া, আইয়ুব আলী, মাখন আলী, মুবই আলী, শেওলা ইউনিয়নের পংকি মিয়া দারোগা, আজমল আলীর ছেলে, রবীন্দ্র নমশূদ্র, আবদুল ওয়াহিদ, লেচু বিবি, বিয়ানীবাজারের আবদুল মান্নান, আবদুল মানিক, তাহির আলী, আবুল হোসেন, আফতাব আলীসহ অনেকেই এই হত্যাকাণ্ডের শিকার হন।

তেরোই এপ্রিল শহরের পুরান লেনের কানচন্দ্র দেবের বাড়িতে তাঁকেসহ বিজয় কুমার দত্ত, প্রীতিশচন্দ্র দে এবং মুকুলচন্দ্র দে'কে নির্মমভাবে হত্যা করা হয়। এদিনই খাঁ পাড়ার দালাল ওয়াহিদ উল্লাহ, সরাফত উল্লাহ এবং আবদুস সালাম সিলেটের অবসরপ্রাপ্ত ইনকাম ট্যাক্স সুপারভাইজার জিতেন্দ্র নাথ চৌধুরীকে কুপিয়ে হত্যা করে মাথা থেকে দেহ বিচ্ছিন্ন করে ফেলে। পরে তাঁর লাশ পুকুরে ফেলে দেওয়া হয়। তেরোই এপ্রিল ব্রিগেডিয়ার ইফতেখার রানা ধনাঢ্য ব্যক্তি বিমলাংশু সেনগুপ্তকে ধরে নিয়ে যায়। তিনি আর ফেরেননি। চা শ্রমিক নেতা পূর্ণেন্দু সেনগুপ্ত এবং নায়েব সত্যেন্দ্র ভৌমিককে ধরে নিয়ে তারা অকথ্য নির্যাতন চালায়। পরে অর্থের বিনিময়ে তাঁদের উদ্ধার করা হয়। আইনজীবী অর্ধেন্দুশেখর রায়কে তাঁর বাড়ির আঙিনায় খুন করে পাকি বাহিনী। অপর আইনজীবী শুভেন্দু শেখরকে বাড়ি থেকে ধরে নিয়ে যায়। পরে আর খুঁজে পাওয়া যায়নি তাঁকে।

উনত্রিশে মে সিলেট শহরের খাজাঞ্চি বাড়ি নামে পরিচিত বিশ্বনাথ চক্রবর্তীর বাড়ির সবাই রাতে খেতে বসেছিলেন। খাবারের সামনে থেকে তাঁদেরকে উঠিয়ে নিয়ে যাওয়া হয় গর্তের সামনে। দিনের বেলা এ বাড়ির সদস্যদের দিয়ে পাকি বাহিনী যে গর্ত খুঁড়িয়েছিল, রাতে গুলি করে সেই গর্তেই তাঁদেরকে ফেলে দেয়। এতে ভারতী দেবী, দেবেন্দ্র নাথ চক্রবর্তী, বিমলনাথ চক্রবর্তী, ব্রজেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, বিশ্বেশ্বর চক্রবর্তীসহ আরও অনেকে নিহত হন।

পাকি বাহিনী সিলেট শহর সংলগ্ন 'স্টার' চা বাগানে ঢুকে ব্যাপক গণহত্যা চালায় । একাত্তরের আঠারোই এপ্রিল পাকি বাহিনী বাগান এলাকায় প্রবেশ করে বাগান মালিক রাজেন্দ্র লাল গুপ্তর পরিবারের সদস্য ও শ্রমিকসহ উনচল্লিশ জনকে হত্যা করে। পরিবারের একমাত্র বংশধর পঙ্কজ কুমার গুপ্ত (শঙ্কর) অপ্রাপ্ত বয়স্ক হওয়ায় বেঁচে যান। এরপর পাঁচ ও ছয়ই মে তারা আবার বাগানে হামলা করে চারজনকে হত্যা করে এবং শঙ্করকে মারতে উদ্যত হয়। প্রাণভয়ে শঙ্কর বলে, 'আমি মুসলমান হব আমাকে মেরো না', তখন তাঁকে শহরের দর্জিপাড়ায় মতিন মিয়ার বাড়িতে এনে ধর্মান্তরিত করে নাম দেওয়া হয় আমানত আলী।

সিলেট শহরের মহাজন পট্টিতে ছিলেন তামা কাঁসার ব্যবসায়ী কালিপদ বণিক। ৪ঠা মে তাঁর বাড়িতে হামলা, লুটতরাজ ও অগ্নিসংযোগ করে পাকি বাহিনী। তাঁর বড় ভাই প্রাণগোবিন্দ বণিক ও নরেশ বণিকসহ সুনীল বণিক, সুখেন্দু বণিককে ধরে নিয়ে হত্যা করে। কালিপদ ধর্মান্তরিত হয়ে প্রাণে বাঁচেন। তাঁর নতুন নাম হয় আবদুর

www.pathagar.com

রহমান। এভাবে বৃহত্তর সিলেটের হবিগঞ্জের চুনারুঘাটে রাজার বাজার গ্রামে জনৈক গণেশ ও তার বোন দীপ্তিকে ধর্মান্তরিত করে নাম দেওয়া শুদ্ধ মিয়া ও রোকেয়া খাতুন।

মার্চ-এপ্রিলে সিলেট জেলার যেসব স্থানে পাকি বাহিনীর নির্যাতন ও গণহত্যা ব্যাপক হয়ে ওঠে, তার মধ্যে রয়েছে খাদিমনগর চা বাগান, উড়িয়া পাড়া, ইলাসকান্দি, খান চা বাগান, কালাগুল চা বাগান, তেলিয়াপাড়া চা বাগান, ভাড়াউড়া চা বাগান, দেওয়ান ছড়া চা বাগান, সিলেট হাসপাতাল, স্টার চা বাগান এবং সিলেটের দক্ষিণে অবস্থিত থানা পশ্চিম বালাগঞ্জ। ছয়ই মে সকাল থেকে এখানে হত্যাযজ্ঞ শুরু হয়। ইলাশপুর গ্রামের সুধীন চক্রবর্তী, বিধুরঞ্জন চক্রবর্তী, রমেশবন্ধন চক্রবর্তী, সহেশ কুমার পাল, খোকা ধর, দিগেন্দ্রকুমার দাস ও মনোরঞ্জন দেবকে ধরে নিয়ে হত্যা করা হয়। এরপর পাশের গ্রাম লাল কৈলাশে তারা হত্যা করে বিমল দেব,সুকুমার পাল, রঞ্জন দেব, রতন, গৌরীচরণ দেব, গুরুচরণ দেব ও মহুয়াচরণ দেবকে। দাসপাড়া গ্রামের গৌরীবরণ গুপ্ত, জিয়াপক গ্রামের জয়না মিয়া, মছদ্দর আলী, বরায়া গ্রামের আবদুল মতিন, মোবারকপুরের বিনোদ দাস, ওমরপুর গ্রামের ওজীব উল্লাহ, মদারিছ আলী, ইজলশাহ গ্রামের শফিকুর রহমান, ইসবপুরের প্রমোদ মালাকার, গুপ্তপাড়ার ভুবন মালাকার, পুরকায়স্থ পাড়ার রবীন্দ্র কুমার ধরকে তারা হত্যা করে। পরবর্তীতে ইলাশপুরে এসে পাকি বাহিনী নরেন্দ্র কুমার ভট্টাচার্য, দ্বিজেন্দ্র ভট্টাচার্য, মহেন্দ্র দেব, মহেশ মালাকার ও রবীন্দ্র বৈদ্যকে ধরে নিয়ে গিয়ে হত্যা করে। পাকি সেনারা নগরীকাপন গ্রামের আওয়ামী লীগ কর্মী আবদুল মন্নাফ, মড়লদা গ্রামের তোতা মিয়াকে ধরে এনে নিমর্মভাবে হত্যা করে। পাকি বাহিনীর নির্মম হত্যাযজ্ঞের কয়েকজন প্রত্যক্ষদর্শীর জবানবন্দী এখানে উল্লেখ করা হল।

আদিত্যপুর গণহত্যায় মারাত্মক আহত শিবপ্রসাদ সেন চৌধুরী তার জবানবন্দীতে বলেন, ভোট শেষ হওয়ার পর ধীরে ধীরে এগিয়ে এল একাত্তরের ছাব্বিশ মার্চ। এর আগে আমরা সাত মার্চে সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে উপস্থিত থেকে বঙ্গবন্ধুর ভাষণ শুনেছিলাম। সেখান থেকে বাড়িতে ফেরার পর স্বাধীনতা নিয়ে আলাপ-আলোচনার মধ্যে ছিলাম আমরা। কিন্তু পঁচিশ মার্চের কালরাতের খবর আমাদের মধ্যে আতঙ্কের সৃষ্টি করে। ছাব্বিশে মার্চ রেডিওতে আমি জিয়াউর রহমানের স্বাধীনতার ঘোষণাটি শুনেছিলাম। চট্টগ্রাম আমাদের কাছাকাছি, তাই সেটা শুনতে আমাদের কোন অসুবিধা হয়নি। তখনই বুঝতে পারলাম, পাকিস্তানিদের বিরুদ্ধে বাঙালির যুদ্ধ শুরু হয়ে গেছে। সে সময় চারদিকে একটা আতঙ্ক বিরাজ করছিল। পাকি আর্মি ভয়ঙ্কর হত্যা ও নির্যাতন শুরু করল। যে কারণে সিলেট থেকে হাজার হাজার মানুষ আমাদের এলাকায় এসে ভিড় করতে লাগল। কারণ আমাদের এখান থেকে নদী পথে সহজেই ভারতে যাওয়া যেত। আমরা যথাসম্ভব তাদেরকে সাহায্য করলাম। আমাদের বাড়ি ঘরে তাদের থাকার জায়গা করে দিলাম। যতদূর পারলাম, খাওয়া দাওয়ার ব্যবস্থা করলাম।

www.pathagar.com

আদিত্যপুরের গণহত্যাটি ঘটে চৌদ্দ জ্যৈষ্ঠ সোমবার। তখন ভোর পাঁচটা হবে বলে মনে হয়। গ্রামের লোকজন ঘুমিয়ে। শুধু যারা হালচাষ করত, তাদের দু'একজন উঠেছে কি ওঠেনি এরকম অবস্থা। এর মধ্যেই পাকি আর্মি সমস্ত গ্রামটা ঘিরে ফেলল। পাকি সেনাদের সংখ্যায় ছিল অনেক। সেই সাথে ছিল রাজাকার ও স্থানীয় দালালরা। তাদের সাথে একজন পাকি মেজর ছিল, যার নাম এই মুহূর্তে ঠিক মনে পড়ছে না। পাকি আর্মির গ্রাম ঘিরে ফেলার সংবাদ ছড়িয়ে পড়লে গ্রামবাসী যে যেদিকে পারে, উর্ধ্বশ্বাসে দৌড়াতে থাকে। যার যার মত লুকিয়ে থাকবার চেষ্টা করে। সবাই বিচ্ছিন্নভাবে পালাচ্ছিল। কারও সাথে কারও যোগাযোগ ছিল না। আমি আগেই কিছু কাপড়চোপড় একটা স্যুটকেসে ভরে রেখেছিলাম। চৌদ্দই জ্যৈষ্ঠ ভোর বেলা আমাকে সেই স্যুটকেসটি নিয়েই দৌড় দিতে হল। প্রথমে দৌড়ে পুকুর পাড়ে গেলাম। সেখানে গিয়ে দেখলাম পাকি আর্মি চতুর্দিক দিয়ে ঘিরে ফেলেছে। পালাবার কোন জায়গা নেই। উপায়ান্তর না দেখে পুকুর পাড়ের জঙ্গলের মধ্যে ঢুকে পড়লাম। জঙ্গলের পেছন দিকে একটা খালি বাড়ি ছিল। ওই বাড়ির ভেতরে একটি গর্ত বাঁশ দিয়ে ঢাকা থাকত। পালানোর জায়গা না পেয়ে সেই গর্তের মধ্যেই ঢুকে পড়লাম। গর্তটি ছিল জোঁকে একেবারে ঠাসা। জোঁকগুলো আমাকে একেবারে ছেঁকে ধরল। রক্ত শুষে নিতে লাগল। তবু জীবনের ভয়ে আমি সেখানে মরার মতোই পড়ে রইলাম। বুঝতে পারছিলাম, আমার রক্ত নিঃশেষ করে ফেলছে তবুও কিছু করতে পারছিলাম না। জোঁকগুলোকে দু'হাত দিয়ে যতই সরিয়ে দিই, ততই গায়ে এসে লাগে। তারা তখন ভয়ঙ্কর রক্তপিপাসু হয়ে উঠেছে।

গর্তের ভেতর থেকেই উঁকি দিয়ে দেখলাম, পাঞ্জাবিরা হাতের কাছে যাকে পাচ্ছে তাকেই ধরছে। আমার বাবাকেও তারা ধরে নিয়ে গেল। আমাদের বাড়িতে শ্যামপুর থেকে আসা যতীন্দ্র দত্ত পুরকায়স্থ নামে একজন লোক আশ্রয় নিয়েছিল তাকেও ধরে নিয়ে যেতে দেখলাম। আমার ভাই সুশান্ত সেন চৌধুরীকেও তারা ধরে নিয়ে যায়। আমার বাবাকে ধরার সময় মারধর করে। আমার জ্যাঠা বেশ স্বাস্থ্যবান ছিলেন। তাকেও পাকিরা অনেক মারধর করেছিল। সবাইকে ধরে ধরে আদিত্যপুর প্রাইমারি স্কুলে নিয়ে জড়ো করে। আমাকে যখন ধরে, তখন দুপুর বারোটা বাজতে দশ মিনিট বাকি। ভোর পাঁচটা থেকে দুপুর বারোটা পর্যন্ত ওই গর্তে লুকিয়ে থাকার সময় জোঁকগুলো আমার রক্ত খেয়ে প্রায় নিঃশেষ করে ফেলেছিল। আমাকে সম্ভবত তারা সবার শেষে ধরে ছিল।

আমার সাথে একজনকে যুক্ত করে কঠিনভাবে বাঁধল। আমাদেরকে বেঁধে ফেলার পাঁচ মিনিটের মধ্যেই ধৃত সবাইকে স্কুল ঘরের বাইরে নিয়ে এল। আমাদেরকে তিনটা লাইনে দাঁড় করানো হল। এই তিন লাইনে আমরা মোট পঁয়ষট্টি জন ছিলাম। ধৃত ব্যক্তিদের সবাই ছিলাম হিন্দু, একজনও মুসলমান ছিল না। আকাশের দিকে তাকিয়ে দেখলাম, ফর্সা নির্মেঘ আকাশ। জ্যৈষ্ঠের প্রখর রোদও যেন গায়ে লাগছিল না। আমাদের যে হত্যা করা হবে, সেটা বুঝতে পারছিলাম। তাই মনে হচ্ছিল এ রোদের

www.pathagar.com

মধ্যে যদি অনন্তকাল দাঁড়িয়ে থেকে বুক ভরে নিঃশ্বাস নিতে পারতাম? কিন্তু সে ভাবনা বেশিক্ষণ স্থায়ী হল না। লাইনে দাঁড় করানোর পর নরপিশাচরা পেছন দিক থেকে গুলি করা শুরু করল। এরপর আমি আর কিছু বলতে পারি না।

পাঞ্জাবিরা আমাদেরকে গুলি করে চলে যাওয়ার পর আমাদেরকে দেখতে অনেক লোক স্কুল মাঠে জড়ো হল। আমার তখন জ্ঞান ছিল। খুব তেষ্টা পেয়েছিল। এক জনের কাছে জল চাইলাম। অপরিচিত সেই মানুষটা আমার মুখে জল দিল। ঠিক এই সময় আমার এক সহোদর ভাই ও এক মামাতো ভাই সেখানে এসে উপস্থিত হল। তারা পাকি সেনাদের কবল থেকে পালিয়ে প্রাণ বাঁচাতে পেরেছিল। ওরা আমাকে টেনে তুলল এবং আমার হাতের বাঁধন খুলে দিল। আমি বেঁচে আছি দেখে আমাকে নদীর ওপারে নিয়ে যাওয়ার জন্য রওনা হল। তখন আমি মৃতপ্রায়। রাস্তার মধ্যে অনেকে আমার ভাইদের লাশ নিয়ে যেতে নিষেধ করল। লাশ নিয়ে যেতে গিয়ে তাদের জীবন বিপন্ন হওয়ার কথাও বলল। আমার ভাই তাদেরকে বলল, এখনও জান আছে। দেখি বাঁচাতে পারি কি না! নদী পার হওয়ার পর ওপারের মুসলিমরা আমার ভাইদের অনেক সাহায্য করেছিল। আমাকে যারা নিতে দিচ্ছিল না, তাদেরকে বকাঝকা করে বলল, এর জান আছে একে কেন নিতে দেবে না?

নদীর ওপারে একটা বটগাছ ছিল। নদী পার করে আমাকে ওই বটগাছ তলায় শুইয়ে রাখা হল। আমাকে যে পথ দিয়ে আনা হয়, তার পথে পথে আমার শরীর থেকে রক্ত ঝরে পড়ে। আমার ভাইরা আমাকে সেখানে রেখে সেই রক্ত মাটি ফেলে মুছে দিয়ে আসে, যাতে করে পাকি সেনারা রক্ত অনুসরণ করে আমাদেরকে নতুন করে আক্রমণ করতে না পারে। এরপর ওই গাছতলায় আমার ভাই ব্লেড দিয়ে কেটে আমার শরীর থেকে গুলি বের করার চেষ্টা করল। আমার তখন খুব ওষুধের দরকার। কিন্তু কোথাও ওষুধ পাওয়া যাচ্ছিল না।

আমার তখনো জ্ঞান ছিল। আমি তাদেরকে বললাম, আমি একটা স্যুটকেস জঙ্গলের মধ্যে ফেলে এসেছি। ওর ভেতরে কিছু ওষুধ আছে। তখন আমার বড় ভাই বলল যে, ওই স্যুটকেসে কোন ওষুধ নেই। তবুও একজন লোককে স্যুটকেসটি খুঁজে দেখবার জন্য পাঠানো হল। সে গিয়ে স্যুটকেস পেল না কিন্তু একটা ব্যাগ পেল। সে ব্যাগের মধ্যে একটা কমবায়োটিক ইনজেকশন ছিল। ইনজেকশন যদিও পাওয়া গেল, কিন্তু সিরিঞ্জ নেই। উপায়ান্তর না দেখে দূরের এক ডাক্তারের বাড়িতে সিরিঞ্জ আনার জন্য লোক পাঠানো হল। সেখান থেকে কোন রকমে একটা সিরিঞ্জ এনে আমাকে ইনজেকশনটি দেওয়া হল।

সবাই তখন বলল, বাঁচতে চাইলে পাঁচ-ছয় কিলোমিটার দূরে গৌরিপুর ইউনিয়নের হরিশ্যাম গ্রামে যাও। এখানেও যে কোন সময় আর্মি এসে পড়তে পারে। তখন কেউ বাঁচতে পারবে না। একথা শুনে আমার ভাই বলল তোমরা যাও, আমি যাব না। আমার ভাই এখনও বেঁচে আছে। তাকে একা ফেলে আমি কোথাও যাব না। তখন

www.pathagar.com

উপস্থিত লোকজন আমার ভাইকে বলল, দেখ তোমার ভাই মরে যেতে পারে। পাঞ্জাবিরা এলে তোমাকেও মেরে ফেলবে। তখন তোমার বংশ শেষ হয়ে যাবে। যদি তুমি ভাইকে ছাড়া না যেতে চাও, তাহলে তোমার ভাইকেও সাথে নিয়ে চল। বাঁচলে বাঁচবে, না হলে মরে যাবে। তখন আমি ভাইটাকে বললাম, তুমি এখান থেকে চলে যাও। আমার যদি হায়াত থাকে তাহলে আমি বাঁচব, না হলে মারা যাব। তুমি চলে যাও, অন্তত একজন মানুষ বেঁচে থাক। তখন আমার ভাই নিরুপায় হয়ে আমাকে একা ফেলে চোখের জল মুছতে মুছতে চলে গেল। সেখানে আমি শুধু একা পড়ে থাকলাম। পুরো এলাকা তখন জনমানবশূন্য। মুখে একটু জল দেওয়ারও কোন মানুষ নেই।

কিছুটা বেলা হলে দেখি আমি খড়ের ওপরে শুয়ে আছি। তার চারপাশ পিঁপড়া ঘিরে ধরেছে। লালচে কালো ধরনের বড় বড় পিঁপড়া। তারা ঝাঁক বেঁধে আমার ক্ষতস্থানে হামলে পড়ছিল। জনমানবশূন্য ঘরে আমাকে পড়ে থাকতে দেখে পিঁপড়াগুলো হয়ত ভেবেছিল, কোন লাশ পড়ে আছে। ক্ষতস্থানের অসহ্য যন্ত্রণার মধ্যেও আমি পিঁপড়ার কামড় অনুভব করতে পারছিলাম। রাতে কোথা থেকে একটি মেয়ে এসে যেন আমার সেবা করেছিল। মেয়েটি চলে যাওয়ার বেশ কিছুক্ষণ পর ওই গ্রামের আর একজন মহিলা আমার কাছে আসে। তখন সূর্য অনেকটা ওপরে উঠে গেছে। মহিলাটি জমাট বাঁধা রক্ত ও পিঁপড়া তাড়িয়ে দিয়ে আমাকে ভাত রান্না করে খাওয়াল। তখন আমের সময় ছিল। আমের রস করেও খাওয়ালো আমাকে।

সকালে আমার ভাইয়ের সাথে আরও কয়েকজন লোক এল। তারা পানি গরম করে আমার ক্ষত স্থানগুলো পরিষ্কার করে দিল। কিন্তু ডাক্তার ওষুধ কিছুই নেই। দু'দিন সেখানে থাকার পর তৃতীয় দিনে আমাকে বালাগঞ্জের হাসপাতালে নিয়ে গেল। সেখানে ডা. জাকারিয়া আমাকে প্রাথমিক চিকিৎসা দিল। কিন্তু সে আমাকে হাসপাতালে রাখতে অস্বীকার করল।

আমার ভাই তখন ডাক্তারকে একটু ব্যাণ্ডেজ করে দেওয়ার কথা বলল। একথা শুনে ডাক্তার জাকারিয়া বলল, ব্যান্ডেজ করে দিতে পারি। কিন্তু আমাকে পাঁচ শ' টাকা দিতে হবে। তখন পাঁচ শ' টাকার মূল্য অনেক। আমার ভাই বলল যে, আমাদের কাছে পাঁচটা পয়সাও নেই। ভাত খাওয়ারও পয়সাই নেই। আপনাকে পাঁচ শ' টাকা কোথা থেকে দেব? তখন আমি আমার ভাইকে বলি যে, আমার কাছে এক শ' টাকা আছে। প্রবাসী কাপ্তান মিয়া আমাকে অজ্ঞান অবস্থায় দেখে এক শ' টাকা রেখে গিয়েছিল। তারপর সেই ডাক্তার ওই এক শ' টাকা নিয়ে আমার ক্ষতস্থান ব্যান্ডেজ করে দিল।

আমাকে তারা তিনটি গুলি করে। একটা গুলি বাম হাতে লাগে, একটা পিঠে লাগে আর একটা বগলের নিচ দিয়ে বেরিয়ে যায়। আমাদের পরিবারের মোট ছয়জনকে তারা হত্যা করে। এর মধ্যে আমার বাবা গিরিশ চন্দ্র সেন চৌধুরী, ভাই সুভাষ চন্দ্র

www.pathagar.com

সেন চৌধুরী, কাকা রাধিকা চন্দ্র সেন চৌধুরী, কাকাত ভাই, এক জ্যাঠা ও আত্মীয় পরেশ চন্দ্রও ছিলেন। বুলু দেব রাইন নামে আমার এক আত্মীয় ছিল। তার ছোট ছোট দুটো বাচ্চা থাকায় তাকে আর হত্যা করেনি। এছাড়া সুশান্ত ও বুলুকে পাকিদের নির্দেশে সাদ মিয়া (দালাল) ধরে নিয়ে যায় এবং জোর করে মুসলমান বানায়। মুসলমান বানিয়ে প্রশান্তের নাম দেয় গোলাম হোসেন ও বুলুর নাম দেয় জাকির হোসেন। আমার ভাই সুশান্তের বয়স বারো চৌদ্দ বছর হলেও বুদ্ধিতে ভাল ছিল। সুযোগ বুঝে তারা সাদ মিয়ার কবজা থেকে পালিয়ে বাড়িতে আসে। কিন্তু বাড়িতে কাউকে না পেয়ে তারা ভারতে চলে যায়।

সেদিন আমাদের এখানে অনেক নারী নির্যাতিত হয়েছিলেন। নির্যাতিত হবার সময় মেয়েদের আর্তচিৎকার আমি নিজের কানে শুনেছি। আমাদেরকে প্রথমে যে ঘরে রাখা হয়েছিল, সেখান থেকে আমি ওই সব মেয়ের চিৎকার শুনেছিলাম। ঘরের মধ্যে নিয়ে হানাদারা এইসব মেয়ের উপর অত্যাচার চালায়। এদের নাম এখন আমার মনে পড়ছে না। সতীশের মেয়েরা নির্যাতিত হয়েছিল। এখানে ওই দিন নির্যাতিত হয়েছিল অসংখ্য নারী।

একাত্তরের ছাব্বিশে মে বর্বর পাকি বাহিনী সিলেটের বালাগঞ্জ থানার বুরুঙ্গা গ্রামে এক ভয়াবহ গণহত্যা চালায়। শান্তি কমিটির নামে সরল ও নিরীহ গ্রামবাসীদের বুরুঙ্গা হাই স্কুল মাঠে জড়ো করে ব্রাশ ফায়ারে ছিয়াত্তর জনের বুক ঝাঁঝরা করে দেয় তারা। নিবাস চক্রবর্তী এই নৃশংস হত্যাযজ্ঞের প্রত্যক্ষদর্শী। গণহত্যা স্পট থেকে তিনি ফিরে আসতে পারলেও তাঁর পিতা এবং পনেরো বছর বয়সী ছোট ভাই নিত্যরঞ্জন চক্রবর্তী শহীদ হন। নিবাস চক্রবর্তী জানান, 'সেদিন এখানে নারী নির্যাতনের ঘটনাও ঘটে। আমি শুনেছি যে গ্রামের বহু মেয়েকে পাকি আর্মি ধরে নিয়ে যায়। পেয়ারপুরের যে বাড়িতে আমি আশ্রয় নেই, সেই বাড়ির মেয়েদেরও তারা ধরে পাশবিক নির্যাতন করে। পেয়ারপুরের বেশ কয়েকটি পরিবারে এরকম ঘটনা ঘটেছে। পরবর্তীতে তাঁরা ভারতে চলে যান। এখানে ব্যাপকভাবে নারী নির্যাতনের ঘটনা ঘটলেও লজ্জায় কেউই তা এখন প্রকাশ করতে চান না। দু'জন নির্যাতিতা নারী এখনও এখানে আছেন। কিন্তু লোকলজ্জার ভয়ে তাঁরাও সে ঘটনা স্বীকার করেন না।'

সিলেটের প্রগতিশীল নারী আন্দোলনের অন্যতম নেত্রী সৈয়দা জেবুন্নেসা হক বলেন, একাত্তরের পঁচিশে মার্চ রাতে আমি সিলেট সদর হাসপাতালে ভর্তি ছিলাম। ওই রাতেই আমার বাচ্চা প্রসব হয়। সে সময় এত কিছু বুঝতে পারিনি। আমি অসুস্থ অবস্থায় আগের দিন হাসপাতালে ভর্তি হয়েছিলাম। এ কারণে বাইরের অবস্থা প্রত্যক্ষ করা আমার পক্ষে সম্ভব হয়নি। তাছাড়া সংগঠন করে বেড়ালেও বয়স খুব কম ছিল বলে সবকিছু ঠিক অনুধাবনও করতে পারতাম না। এখন যেভাবে মাঠে ময়দানে ঘুরে বেড়াই, তখনকার সময়ে সেটা এত সহজ ছিল না। বরাবরই সিলেটে পর্দা প্রথার বাড়াবাড়ি ছিল।

www.pathagar.com

পঁচিশে মার্চ রাত্রি দশটায় আমার তৃতীয় সন্তান ভূমিষ্ঠ হয়। আমি হাসপাতালের বেডে শুয়েছিলাম। এগারোটা সাড়ে এগারোটার দিকে আমার স্বামী এলেন। তাঁকে ভীষণ উদ্বিগ্ন মনে হচ্ছিল। আমাকে বললেন, 'শহরে পাঞ্জাবি আর্মি এসে ঢুকছে। আমরা রাস্তাঘাটে ব্যারিকেড দেওয়ার চেষ্টা করছি। খুব খারাপ পরিস্থিতি। তোমার সঙ্গে আর দেখা নাও হতে পারে।' এই বলে তিনি চলে গেলেন। তারপর সারারাত শহর জুড়ে প্রচণ্ড গোলাগুলির শব্দ হতে লাগল। আমি একলা একটা মেয়ে, অসুস্থ শরীর ও সদ্যজাত শিশুটিকে নিয়ে অজানা আশঙ্কায় বারবার কেঁপে উঠছিলাম। ছাব্বিশে মার্চ সকালে এসে গেল। শহর জুড়ে তখন কারফিউ। এর মধ্যেই সদরুদ্দিন, মিয়াজী ও শোয়েব চৌধুরী তিনজন একসঙ্গে এসে হাসপাতালে ঢুকলেন। তাঁরা অনেক ঘুরে হাসপাতালের পেছন দিকে দিয়ে সেখানে যেতে পেরেছিলেন। আমি তাঁদেরকে আমার উদ্বেগের কথা জানালাম। তাঁরা বললেন, 'না, ভাবী, ওরা আমাদের কিছু করতে পারবে না।' আমি হাসপাতালের ডাক্তার শামসুদ্দিন সাহেবের চিকিৎসাধীন ছিলাম। উনি এসে বললেন, ভাবী, আমরা আপনাকে নিয়ে খুব দুশ্চিন্তায় আছি। কতক্ষণে যে আপনাকে এখান থেকে বের করে দিতে পারব তা বুঝে উঠতে পারছি না।'

সেদিন হাসপাতালে আমি অন্তত ন'টা গুলিবিদ্ধ মরদেহ দেখতে পেয়েছিলাম। আরও অনেকে আহত ছিলেন। কিন্তু সবাইকে আমি দেখতে পারিনি। আমি তো অসুস্থ ছিলাম, বেড থেকে নামা ই নিষেধ ছিল। তার ওপর যেহেতু আমি সিলেটে মোটামুটি পরিচিত মুখ, এ কারণে বাইরের কেউ দেখে ফেললে সমস্যা হতে পারত। ভোরবেলা থেকেই কারফিউ শুরু হয়েছিল, কিন্তু সাধারণ মানুষ যারা বুঝতে না পেরে ভোরে বাইরে বের হয়েছিল, তাদের ওপর পাকি আর্মি গুলি করে। গুলিবিদ্ধ ও নিহতদের মধ্যে দুধওয়ালা, ফুল কুড়ানি ব্রাহ্মণ এ ধরনের লোকজনই বেশি ছিল। তারপর হঠাৎ দেখি সিরাজ ভাই (সিরাজ উদ্দীন আহমেদ) এসেছেন। আমি তাঁকে দেখে অবাক হলাম। বললাম, 'সিরাজ ভাই আপনি!' সিরাজ ভাই তখন চাপা কণ্ঠে বললেন, এই, আমি এখন সিরাজ ভাই না, আমি এখন ডাক্তার। তোমাকে হাসপাতাল থেকে নিয়ে যেতে এসেছি।' দেখি তাঁর গায়ে ডাক্তারের এ্যাপ্রন। ডা. শামসুদ্দিনও তাঁর সঙ্গে রয়েছেন।

তারপর আমি বাড়িতে গেলাম। তখন সুরমার ওপারে রেল স্টেশনের পাশে ছিল আমাদের পুরাতন বাড়ি। কিন্তু বাড়িতে গিয়ে আমি হাউমাউ করে কেঁদে ফেলি। বাড়িতে আমার আরও দুটো বাচ্চা রেখে গিয়েছিলাম। কিন্তু ফিরে দেখি, তারা সেখানে নেই। পুরো বাড়ি ফাঁকা। তারপর পাশের বাড়ি থেকে জানতে পারলাম, বাচ্চা কাচ্চারা সবাই শ্রীরামপুরে আমার মামা শ্বশুরের বাড়িতে চলে গেছে। তাই আমিও শ্রীরামপুরে চলে গেলাম। এরপর থেকে সেই যে শুরু হল পায়ে হাঁটা, যুদ্ধের ন'মাস আমাকে কেবল ছুটেই বেড়াতে হয়েছে। জীবন বাঁচানোর তাগিদে আমি মানুষের বাড়িতে বাড়িতে আশ্রিত থেকেছি, কিন্তু নিজের শ্বশুরবাড়িতে যেতে সাহস

www.pathagar.com

করিনি। বালাগঞ্জে গিয়েও মানুষের বাড়িতে বাড়িতে থাকতে হয়েছে। শেষের দিকে শেরপুরের বড় হাজীপুরে এক এমসিএ'র বাড়িতে একটানা চার মাস ছিলাম। তবে সে জায়গাটাও খুব নিরাপদ ছিল না। মাঝে মাঝেই খবর পেতাম, আর্মি এসে হানা দেবে। এ রকম শুনলেই গ্রামের সব মহিলা বাচ্চা-কাচ্চা নিয়ে পাশের হাওড়ে গিয়ে আশ্রয় নিত। আমিও তাদের সঙ্গে ওইভাবে পালিয়ে পালিয়ে জীবন রক্ষা করেছি।

তারপর ডিসেম্বরের ছাব্বিশ তারিখ থেকে আমরা নির্যাতিত নারীদের পুনর্বাসনের কাজ শুরু করি। শহরে পাকি আর্মির প্রধান ঘাঁটি মডেল স্কুল, ক্যাডেট কলেজ প্রভৃতি জায়গায় আমরা অনুসন্ধানে গিয়েছি। আর্মির এই ঘাঁটি ও ক্যাম্পগুলোতে আমরা গণহত্যা ও নারী নির্যাতনের বহু আলামত পেয়েছিলাম। ক্যাম্পের একটা দেয়ালে রক্ত দিয়ে লেখা সেই বাক্যটি এখনও আমার চোখে ভাসে-'আমি আর বাঁচতে চাই না'। বিভিন্ন আলামত দেখে আমার মনে হয়েছে মনিপুরী সম্প্রদায়ের মেয়েদেরকেই বেশি নির্যাতন করা হয়েছে। আমরা সেখানে মনিপুরী মেয়েদের প্রচুর স্কার্ট, টপস ও অন্যান্য পোশাক পড়ে থাকতে দেখেছি। মনিপুরী খ্রিস্টানরা স্কার্ট টপস এবং বিষ্ণুপ্রিয়া ও অন্যরা তাদের নিজেদের পোশাক পরে। সেগুলো ওখানে পড়ে ছিল। এ ছাড়া বাঙালি মেয়েদের নির্যাতনের অনেক আলামতও আমরা সেখানে পেয়েছিলাম। বাঙালি পুরুষদের মাটিচাপা দেওয়া অনেক মৃতদেহও আমরা সেখানে দেখতে পাই।

এয়ারপোর্টে পাকিস্তানি আর্মির বাঙ্কার থেকে আমরা দু'জন জীবিত মেয়েকে উদ্ধার করেছিলাম। দুটো মেয়েই ভীষণ অসুস্থ ছিল। তারা আমাদেরকে জানিয়েছিল, দিনের পর দিন বাঙ্কারে আটকে রেখে পাকিস্তানি আর্মি তাদের ওপর পালাক্রমে পাশবিক নির্যাতন চালিয়েছে। এভাবে নির্যাতনের ফলে তাদের একজন অন্তঃসত্ত্বা হয়ে পড়ে। পাকি সেনারা তাদেরকে বাড়ি থেকে ধরে এনেছিল। সে সময় বাংলাদেশের অন্যান্য জায়গায় যেমন নির্যাতনের পর ধারালো বেয়নেট দিয়ে মেয়েদের দেহ ছিন্নভিন্ন করে ফেলত, সিলেটে কিন্তু আমরা সেরকম পাইনি। তবে সিলেটের বিভিন্ন অঞ্চলে গিয়ে আমরা দেখেছি, অনেক মেয়েকে বাবা মার সামনেই নির্যাতন করা হয়েছে। নির্যাতনের সময় হয়ত বাবা মাকে বেঁধে রেখেছে, পরে তাদেরকে হত্যা করেছে। পীরপুর, পীরনগর, করিমগঞ্জ বর্ডার প্রভৃতি এলাকায় এগুলো বেশি ঘটেছে। তখন বয়স কম ছিল, স্পিরিট ছিল। এ কারণে দূর-দূরান্তে গিয়ে খোঁজ খবর করেছি, সাহায্য করতে চেষ্টা করেছি। তখন গ্রামে গ্রামে ঘুরতে গিয়ে দেখেছি, মানুষের এমন অবস্থা যে, খাবার তো ছিলই না এমনকি থালাটা পর্যন্ত ছিল না। চালের সাথে আমরা তাদেরকে ভাতের থালাও কিনে দিয়েছি তখন। পাকিরা যেসব বাড়িঘর পুড়িয়ে দিয়েছিল, সেখান থেকে আমরা দুটো নির্যাতিত মেয়েকে পাই। এভাবে সাহায্য করতে গিয়ে আমরা অনেক নির্যাতিত মেয়ে পাই, যাদের জন্য পরবর্তীতে পুনর্বাসন কেন্দ্র খুলতে হয়েছে। রায়নগরে এজন্য বঙ্গবন্ধু আমাদেরকে একটা খালি বাড়ি দিয়েছিলেন। এটাকেই আমরা গুছিয়ে নিয়ে পুনর্বাসন কেন্দ্র হিসাবে চালু করি।

www.pathagar.com

এই পুনর্বাসন কেন্দ্রে আমরা শুধুমাত্র অন্তঃসত্ত্বা মেয়েই পেয়েছিলাম ঊনপঞ্চাশ জন। সবাই পাকিস্তানি সৈন্যদের পাশবিকতার শিকার হয়েছিলেন। কখনও আমরা তাদেরকে খবর পেয়ে নিয়ে এসেছি, কখনও বা তাদের আত্মীয়-স্বজনরা এনে রেখে গেছে। বাবা সঙ্গে করে এনে রেখে গেছে, ভাই সঙ্গে করে এনে রেখে গেছে। সেসময় এই লোকগুলোর যে অভিব্যক্তি ও আকুতি আমরা দেখেছি, তা কখনও ভোলা সম্ভব নয়। তাঁরা তাদের এই কষ্টের কথা কাউকে জানাতে পারেননি। কী করবেন তাও বুঝতে পারেননি। শেষে আমাদের কেন্দ্রের কথা শুনে মেয়েকে, বোনকে, কিংবা আত্মীয়কে নিয়ে এসেছেন। আর নির্যাতিতাদের অবস্থা তো বলাই বাহুল্য। শেষ পর্যন্ত ঊনপঞ্চাশ জন অন্তঃসত্ত্বা মেয়ের ভেতর থেকে সাতচল্লিশ জনকে আমরা এ্যাবরশন করিয়ে দিই। তারপর ক'দিন কেন্দ্রে রেখে চিকিৎসা করে একটু সুস্থ হলে বাড়িতে পাঠিয়ে দিয়েছি। আর বাকি যে দু'জন মেয়েকে এ্যাবরশন করা সম্ভব হয়নি, তাদের অবস্থা ছিল খুব খারাপ। সাত মাস হয়ে গিয়েছিল। ডাক্তার এ্যাবরশন করতে ভয় পাচ্ছিলেন। শেষ পর্যন্ত কেন্দ্রেই রেখে দিতে হয় তাদেরকে। পরে তাদের বাচ্চা প্রসব হয়েছে। পুনর্বাসন কেন্দ্রে মেয়েদের এ্যাবরশন করেছিলেন ডা. নায়েব উদ্দিন। তিনি এখন সৌদিতে থাকেন। ডা. এরশাদ আলীও সে সময় সহযোগিতা করেছিলেন। তিনি সম্ভবত মৌলভীবাজারে আছেন।

রায়পুর পুনর্বাসন কেন্দ্রে প্রায় আশি জন নির্যাতিতা নারীকে পুনর্বাসন ও চিকিৎসা সেবা প্রদান করা হয়। এঁদের মধ্যে মুসলমান মেয়েই বেশি ছিলেন। হিন্দু ও মনিপুরী মেয়েরাও ছিলেন। এই মেয়েদের প্রায় সবাই দেখতে ছিলেন সুশ্রী। মনিপুরী মেয়েরাও কিন্তু দেখতে সুন্দর। নাকটা একটু চাপা হলেও তা তাদের সৌন্দর্যে বাধা হয়ে দাঁড়ায় না। পুনর্বাসন কেন্দ্রের মেয়েরা কোন পাকি সৈন্যের নাম আমাদের জানাতে পারেননি। তবে আমি শুনেছি, সরফরাজ নামে একজন অত্যাচারী আর্মি অফিসার এখানে ছিল।

সিলেটের প্রবীণ রাজনীতিক সিরাজ উদ্দিন আহমদ বলেন, আমরা সেদিন হাসপাতালে অনেকগুলো মৃতদেহ ও আহত লোকজন দেখেছিলাম। লাশের সংখ্যা প্রায় বিশ পঁচিশটার মত হবে। ডা. শামসউদ্দীন আমাদেরকে লাশগুলো দেখান। গুলিবিদ্ধ অনেক আহত লোককেও দেখলাম। আর্মি গুলি করলে পুলিশের বাঙালি সদস্যরা তাদেরকে হাসপাতালে রেখে যায়। আহত নিহতদের সবাইকেই খুব নিরীহ সাধারণ মানুষ বলে মনে হচ্ছিল। আমি আহত কয়েকজনের সাথে কথা বললাম। একজন বলল, সে ভোরে চাঁদনী ঘাটে মুখ ধুচ্ছিল, এ সময় তাকে গুলি করা হয়। একজন বলল, সে মসজিদ থেকে ফজরের নামাজ পড়ে ফেরার সময় গুলিবিদ্ধ হয়েছে। একজন স্কুল শিক্ষককেও পেলাম, যার নাম এখন মনে করতে পারছি না। তিনি আমাকে জড়িয়ে ধরে খুব কান্নাকাটি করতে লাগলেন। এসব দেখে যখন চলে আসছি, তখন শুনি এক মহিলা সিরাজ ভাই, সিরাজ ভাই বলে ডাকছে। কাছে গিয়ে দেখি, আমাদের মহিলা এমপি জেবুন্নেসা। আমি তাকে সেখানে দেখে খুব অবাক

www.pathagar.com

হয়ে গেলাম। সে বলল, রাতে তার একটি বাচ্চা হয়েছে এজন্য হাসপাতালে আছে। এত গোলাগুলি ও লাশ দেখে সে খুব ভয় পেয়ে গিয়েছিল। আমি তাকে বললাম, তোমার চিন্তার কিছু নেই। আমরা তোমাকে এখান থেকে নিয়ে যাব। তখন বয়স কম ছিল, সাহসও ছিল। পাড়ার ভেতরের রাস্তা দিয়ে প্রাণেশ বাবুর বাড়ির সম্মুখে নিম্বার্ক আশ্রমের পেছন দিক দিয়ে ঢুকলাম। তখন পুরোহিত ইশারা করে আমাকে একটা কক্ষের ভেতরে ঢুকিয়ে দিলেন। ওই সময়ই আর্মি সেখানে আসছিল। আমি পেছন দিক দিয়ে যাওয়ার কারণে তাদেরকে দেখতে পাচ্ছিলাম না। পুরোহিত তাদেরকে আসতে দেখেছিলেন। এরপর গুলি হতে শুনলাম। কিছুক্ষণ পর ওই কক্ষ থেকে বেরিয়ে দেখি, তিনটা মৃতদেহ পড়ে আছে। রক্তে আশ্রমের মেঝে ভেসে যাচ্ছে। গুলিবিদ্ধ একজনের নাম ছিল পাঁচু। তখনও তার দেহ থেকে রক্ত ঝরছিল। এরা সবাই আশ্রমে থাকত।

বারোই ডিসেম্বর আমি ভারত থেকে বাড়িতে ফিরে আসি। বাড়িতে তখন আমার মা-বোন ও চাচারা ছিলেন। আমার পিতা জীবিত ছিলেন না। সিলেট শহরে ঢুকে বিভিন্ন জায়গায় মৃতদেহ পড়ে থাকতে দেখেছি। দাড়িয়াপাড়ার রসময় স্কুলের মাঠে গিয়েও দেখলাম, কয়েকটা লাশ পড়ে আছে। এয়ারপোর্টের দিকেও অনেক লাশ পড়ে ছিল। আমি সেখানে যেতে পারিনি। সেখানকার বাঙ্কারে অনেক মেয়ে ছিল। এখন আর তার কোন সন্ধান নেই। দু'একজন যারা এখনও জীবিত আছে, তারা মুখ খুলবে না। সে সময় বাঙ্কারে এমন অসুস্থ মেয়েও পাওয়া গেছে, যাদেরকে তুলে আনতে হয়েছে। নিজ থেকে উঠে দাঁড়াবার শক্তি ছিল না।

প্রবীণ রাজনীতিবিদ সুহাসিনী দাস সিলেটের নারী নির্যাতন প্রসঙ্গে বলেন, দেশ স্বাধীন হওয়ার পর ন্যাপ নেতা আমিনুর রশিদ চৌধুরী ও দিব্যেশ বাবু আমাকে সালুটিকরের একটা বাড়িতে নিয়ে যান। যেখানে পাকি আর্মি মেয়েদের বন্দী করে রাখত। আমি ওই বিল্ডিং এর দোতলায় উঠে দেখি সেখানে মেয়েদের পেটিকোট, রক্ত মাখা ছেঁড়া শাড়ি ও ব্লাউজ পড়ে আছে। পাকি আর্মি এসব মেয়েদেরকে নির্যাতনের পর হত্যা করে মাটিচাপা দিয়ে রেখে যায়। তখনও নিহত মেয়েদের হাত পা, চুল এসব বেরিয়েছিল। আমার পরিচিত কয়েকটি মেয়েকেও পাকি আর্মি নির্যাতন করার পর হত্যা করে। নির্যাতিত মেয়েদের দু'চারজন এখনও বেঁচে আছেন। কয়েকজনকে পরে বিয়েও দেওয়া হয়। বুরুঙ্গায়ও দু'তিনটা মেয়ে পাকি আর্মির পাশবিক নির্যাতনের শিকার হন। তাঁদের নাম পরিচয় জানা থাকলেও আমি আজ পর্যন্ত কারও কাছে সেটা প্রকাশ করিনি।

সিলেট জেলার কমিউনিস্ট পার্টির সাধারণ সম্পাদক বীর মুক্তিযোদ্ধা এ্যাডভোকেট বেদানন্দ ভট্টাচার্য পাকি বাহিনীর হত্যা ও নারী নির্যাতন প্রসঙ্গে বলেন, আটপাড়ার হোমিওপ্যাথ এক ডাক্তারের তিন ভাতিজিকে পাকি সেনারা তুলে নিয়ে যায়। পরে তাঁদের আর কোন খোঁজ পাওয়া যায়নি। ওই ডাক্তারকেও পরে তারা হত্যা করে। এ

www.pathagar.com

ছাড়া নির্যাতিতা নারী যাঁরা সিলেটে আছেন, তাঁরা নিজেরাও এসব ঘটনা স্বীকার করতে চান না। যুদ্ধের পরে রায়নগরের রাজবাড়িতে একটি পুনর্বাসন কেন্দ্র খোলা হয়েছিল। সেখানে বহু নির্যাতিতা নারী আশ্রয় নিয়েছিলেন। পরবর্তীতে তাঁদেরকে বিভিন্নভাবে পুনর্বাসিত করা হয়। এখানে যেসব পাকি আর্মি এসব নির্যাতন চালিয়েছিল, তাদের মধ্যে অন্যতম ছিল সরফরাজ মালিক (র‍্যাঙ্ক জানা যায়নি) ও ব্রিগেডিয়ার ইফতেখার রানা।

ব্রিগেডিয়ার ইফতেখার রানা, কর্নেল সরফরাজ মালিক, ক্যাপ্টেন নুরুউদ্দিন খান প্রমুখ পাকি আর্মি অফিসার ও তাদের সহযোগীরা সিলেটে এসব যুদ্ধাপরাধ ঘটায়। সুতরাং, এদের সবাই যুদ্ধাপরাধের দায়ে অভিযুক্ত।

আসামীঃ জেনারেল নিয়াজী, ক্যাপ্টেন ইউসুফ, ক্যাপ্টেন গোলাম রসুল, মেজর আজিজ খটক, ক্যাপ্টেন রফিক, ক্যাপ্টেন গোলাম রসুল, সুবেদার লাল খান, কর্নেল সরফরাজ মালিক, মেজর আজিজ, ব্রিগেডিয়ার ইফতেখার রানা, বিগ্রেডিয়ার আল-ফালা।

অপরাধের ধরনঃ গণহত্যা, জাতিগত নিধন, ধর্ষণ, লুটপাট, অগ্নিসংযোগ।

সাক্ষী ঃ শিবশঙ্কর তাঁতী, এম এ গফুর, মোঃ আব্দুল গফুর, কেদারলাল হাজরা।

ঘটনাকালঃ একাত্তরের মার্চ থেকে আটই ডিসেম্বর পর্যন্ত।

ঘটনাস্থল ঃ মৌলভীবাজার জেলা।

সূত্রঃ যুদ্ধাপরাধ গণহত্যা ও বিচারের অন্বেষণ এবং WCFFC গবেষণা।

এসব পাকি আর্মি অফিসার ও তাদের সহযোগীরা তৎকালীন মৌলভীবাজার মহকুমায় ব্যাপক গণহত্যা, ধর্ষণ জাতিগত নিধন, অগ্নিসংযোগ ও লুটপাট চালায়। পাকি বাহিনী চা বাগানের নিরীহ শ্রমিকদের প্রশিক্ষণের নামে শ্রীমঙ্গল কলেজের পাশে রাহামারার পুলে একত্রিত করে হত্যা করে। এদিন এখানে হত্যা করা হয় চিনিলাল হাজরা, গুরা হাজরা, টিমা হাজরা, শনিচারা হাজরা, হুলা গোয়ালা, হিংরাজ হাজরা, কৃষ্ণবরণ হাজরা, মহারাজ হাজরা, লুনুলাল হাজরা, মংগুরা হাজরা, ভুমাররান্দ তুরিয়া, সমমাঝি, নকুল হাজরা, কালাচান্দ ঘাটুয়ার, সুখনন্দন, বিকিয়া বরণ, ইন্দ্র ভূঁইয়া, ফাগু হাজরা, রামলাল হাজরা, শিবমুড়া, বৈহত ভূঁইয়া, বুকো বেলি, রাজকুমার মাল, রামলাল মাল, ফেরুয়া গৌড়, রামকৃষ্ণ গৌড়, রামচরণ গৌড়, গবিনা গৌড়, ভজুয়া হাজরা, গঙ্গা বাড়ই, ডিগসীল মেম্বারের ছেলে, গজদত্ত কাহার, গঙ্গাকুশী, চুনি হাজরা, অমৃতা হাজরা, ক্ষুদিরাম হাজরা, বীরবল হাজরা, ব্রজনারায়ণ গোয়ালা, রামদত্ত হাজরা, রাম ছুড়কু হাজরা, মাংরা তুরিয়া, পুরকু হাজরাসহ আরও অনেককে।

www.pathagar.com

২ মে মৌলভীবাজার জেলার কমলগঞ্জ থানার চৈত্রঘাটের কাছে পর্তাবী গ্রামে প্রবেশ করে পাকিস্তানি সেনাবাহিনী নরেন্দ্র কুমার দেব, নৃপেন্দ্র কুমার দেব, সুখময় দেব ও সোনাচান্দ দেবকে হত্যা করে। পাকি সেনাদের অন্য একটি দল চৈত্রঘাটে হামলা চালিয়ে হত্যা করে ইরেশলাল দত্ত, যতীন্দ্র মোহন দে, সোনাচান্দ দে, সুধেন্দু দেব, সুরেশ দেব, বনমালী গোস্বামী, মদনমোহন দত্ত, সম্মত দত্ত, রাজকুমার দে এবং ডা. আবদুস শহীদকে। পাঁচই মে হবিগঞ্জের মাধবপুর থানার মুরশ চা বাগানে এসে বিহারি অনন্ত রায়, সাংকি মুণ্ডা, চান্দা মুণ্ডা, বিদ্যাচরণ বাগচী, বলি গোড় ও চুনু সাওগালকে হত্যা করা হয়। রাজাকারদের সহায়তায় তারা মৌলভীবাজার সদর থানার নারিয়া গ্রামে আক্রমণ করে। এই হামলায় সাবিত্রী কুমার দেব, প্রসন্ন কুমার দেব, যোগেন্দ্র কুমার দেব, শ্রীধর কুমার দেব, উমেশচন্দ্র দেব, মুখ্যরানী দেব, দয়ালহরি দেব, পেচনকুমার দেব, রাকেশচন্দ্র, সোনাচন্দ্র দেব, গঙ্গাচরণ দেব, নকুল দেব, স্বদেশ দেব, অধর দেব, দশাই দেব, সেনাই বৈদ্য, পচা বৈদ্য, হরিন্দ্র বৈদ্য, যতীন্দ্র বৈদ্য, নিখিল বৈদ্য প্রমুখ প্রাণ হারান। শ্রীমঙ্গলের বিভিন্ন চা বাগান, ওয়াপদা রেস্ট হাউজ হত্যা ও নির্যাতনের কেন্দ্র হয়ে উঠেছিল। মৌলভীবাজারের অসংখ্য বধ্যভূমিতে রয়েছে নাম না জানা শহীদদের নিহত হওয়ার নিদর্শন। নিচে কয়েকজন প্রত্যক্ষদর্শীর জবানবন্দী তুলে ধরা হল।

শ্রীমঙ্গল লেবার হাউজের ফিল্ড এ্যাসিস্ট্যান্ট সিন্দুরখান চা বাগানের মুক্তিযোদ্ধা শিবশঙ্কর তাঁতী একাত্তর সনে টিপরাছড়া চা বাগানে ছিলেন। নারী নির্যাতন সম্পর্কে তিনি বলেন, খেজুরছড়ায় লক্ষ্মী নামে এক মেয়েকে পাকি বাহিনী ধর্ষণের পর হত্যা করে। বাগানে জ্যোৎস্না নামে আর একজন ড্রাইভারের স্ত্রী ছিলেন। পাকি আর্মি ওই ড্রাইভারকে কাজের নাম করে অন্যত্র নিয়ে গেলে ভিন্ন এক দল আর্মি এসে তাঁর ওপর পাশবিক নির্যাতন চালায়। তিনি বর্তমানে নাসিমাবাদে থাকেন। হরিণছড়া, খেজুরছড়া ও ফুলছড়াসহ অনেক এলাকায় পাকি বাহিনী নারী নির্যাতন চালায়। ভুক্তভোগী ও প্রত্যক্ষদর্শীদের সাক্ষাৎকার থেকে জানা যায় যে, ওই তিনটি চা বাগানে কমপক্ষে এক শ' জন নারী পাকি বাহিনীর হাতে দীর্ঘ সময় ধরে গণধর্ষণের শিকার হয়েছিলেন।

শমসের নগরের এম এ গফুর ওরফে নেতা গফুর বলেন, আমাদের এখানে প্রথম পাকি আর্মি আসে মার্চের আট কী নয় তারিখে। সেদিন তারা এখানকার আওয়ামী লীগের অফিস সেক্রেটারি ও ছাত্র ইউনিয়নের আব্দুর রইচকে ধরে নিয়ে যায়। তাদেরকে মৌলভীবাজার জেলে আটকে রাখে। সে সময় পাকি ক্যাপ্টেন গোলাম রসুলের নেতৃত্বে একদল সৈন্য মৌলভীবাজার এসডিওর বাংলোতে থাকত। তারাই ওই দু'জনকে ধরে নিয়ে যায়। সম্ভবত আঠাশে মার্চ কমলগঞ্জ থেকে ক্যাপ্টেন গোলাম রসুলের বাহিনী শমসের নগরে এসে মিছিলে গুলি করে। গুলি চালানোর পর তারা ভানুগাছ চলে যায়। তাদের গুলিতে একজন ম্যাজিশিয়ান নিহত হন। তাঁর নামটা

www.pathagar.com

এখন ঠিক মনে করতে পারছি না। পরে গোলাম রসুল বাঙালি ইপিআরের গুলিতে নিহত হন।

এই ঘটনার পর মেজর আজিজ খটকের নেতৃত্বে পাকি আর্মি শমসের নগরে ব্যাপক গণহত্যা ও নারী নির্যাতন চালায়। তারা আমার বাবা আব্দুল গণি, আমার বড় ভাই আব্দুন নূর ও ছোট ভাই আব্দুশ শুকুরকে হত্যা করে। আমার বাবা ও ভাইদেরকে যেদিন হত্যা করা হয়, সেদিন এখানকার আরও অনেককেই পাকিরা হত্যা করে। সম্ভবত সেটা মে মাসের তিন অথবা চার তারিখ ছিল। ওই দিন আওয়ামী লীগের ইউনিয়ন সেক্রেটারি পীযূষকান্তি পাল, তার ভাই প্রভাস পাল ও আব্দুল বারীকেও পাকিরা হত্যা করে। এ ছাড়া আনসার কমান্ডার আমজাদ মিয়াকে বাড়ি থেকে ধরে নিয়ে হত্যা করে। কমলগঞ্জ হাই স্কুলের সহকারী প্রধান শিক্ষক রমেশ দাসকেও তারা হত্যা করে। পতনউসার ইউনিয়নের শহীদ উদ্দীনকে, সিরাজ ঠিকাদারের বাড়ির দুই তিনজনকে ও দুর্গা প্রসাদ নামে আরও একজনকে তারা হত্যা করে। একাত্তরে এই এলাকায় পাকি বাহিনী ব্যাপক গণহত্যা চালায়। শমসের নগর বধ্যভূমিতে কমপক্ষে এক হাজার বাঙালি পাকিদের বর্বর গণহত্যার শিকার হন।

পাকি আর্মি শমসের নগরের প্রায় সব বাড়িতে গিয়েই নারী নির্যাতন চালায়। এছাড়া তারা শমসের নগর ডাকবাংলোয় মেয়েদের ধরে নিয়ে পাশবিক নির্যাতন চালায়। তবে এসব ঘটনা এখন কেউ স্বীকার করতে চায় না। অনেকে বেঁচেও নেই। দু'একজনের নাম বলতে পারি, এদের মধ্যে জৈমত খাঁর বোনকে সুবাদার লাল খান ভয়ঙ্করভাবে ধর্ষণ করে। পরে সে তাকে বিয়ে করে বলে শোনা যায়। পাকিস্তান টি এ্যাসোসিয়েশনের হেড ক্লার্ক রিজভি সাহেবের মেয়ের ওপরেও তারা পাশবিক নির্যাতন চালায়। তিনি এখনও জীবিত আছেন। প্রাক্তন চেয়ারম্যান আব্দুল হান্নানের মেয়ের ওপরেও পাকি আর্মি পাশবিক নির্যাতন চালায়। তবে এটা তারা এখন স্বীকার করে না। আরও বহু নারীর ওপর পাকি আর্মি নির্যাতন চালায়। শুধুমাত্র সুবেদার লাল খান ও তার সাঙ্গপাঙ্গরাই পঞ্চাশ ষাটটি মেয়ের ওপর লাগাতার যৌন নির্যাতন চালিয়েছে। মেজর খটক ও ক্যাপ্টেন রফিক এইসব নারী নির্যাতন ও হত্যাকাণ্ডের নেতৃত্ব দিত।

শমসের নগর বাজার কমিটির সভাপতি মোঃ আব্দুল গফুর বলেন, পাকি বাহিনী মুক্তিযুদ্ধের ন'মাসে আমাদের এখানকার পাড়া মহল্লার যেসব বাড়িতে গিয়েছে, সেখানেই নারী নির্যাতন করেছে। আমার বাড়িতেও তারা এরকম ঘটনা ঘটায়। যারা মুক্তিযুদ্ধে অংশ নিতে চলে গেল, তারা তো গেলই। কিন্তু আমরা যারা দেশে থাকলাম, তাদের ওপর পাকি বাহিনী ও তাদের দোসররা ভয়ংকর নির্যাতন শুরু করে। আমি মা-বাবার একমাত্র সন্তান হওয়ায় আমাকে মুক্তিযুদ্ধে যেতে দেওয়া হয়নি। আমি তখন ঘরের বাইরে বের হতাম না। হঠাৎ একদিন চার গাড়ি আর্মি আমার বাড়ি ঘেরাও করে ফেলে। তখন রাত আনুমানিক এগারোটা হবে।

www.pathagar.com

তারা আমাকে ঘেরাও করে ধরে ফেলল। তারা আমার জ্যাঠা বাসের মিয়া ও অন্য একজনের কথা আমার কাছে জানতে চায়। সেই আমার চাচাকে ধরে ফেলতে সক্ষম হয় তারা। এরপর তাকে ও আমাকে তারা গরুর দড়ি দিয়ে হাত পা বেঁধে ফেলল। সেখান থেকে তারা আমাকে আর এক চাচার বাড়িতে নিয়ে গেল। বাড়ি ঘেরাও করার পর সেখানে তারা আমার চাচাকে পেল না। ঘরের ভেতরে আমার যুবতী চাচাত বোন ও চাচী ছিল। পাকি সৈন্যরা ঘরের মেঝেতে ফেলে তাদের দু'জনকেই ধর্ষণ করল। আমি তখন বাইরে হাত পা বাঁধা অবস্থায় পড়ে আছি। এক ঘন্টা ধরে পাকি আর্মি তাদের ওপর পাশবিক নির্যাতন চালায়। পাঁচ সাত জন পাকি আর্মি তাদেরকে নির্যাতন করেছিল। আমি নিজের চোখে আমার আত্মীয়দের ওপর পাকি বাহিনীর সেই পাশবিক নির্যাতন প্রত্যক্ষ করলাম। আমার ওই চাচাত বোনের নাম শরীফুল। পরে সে লজ্জায় শমসের নগর ছেড়ে অন্যত্র গিয়ে মারা যায়। আমার চাচীও নির্যাতনের অল্প কিছু দিনের মধ্যে মারা যান।

আমার চাচার বাড়িতে নির্যাতন শেষ করে তারা আমাকে শমসের নগর ডাকবাংলোয় নিয়ে যায়। সেখানে গিয়ে দেখলাম, চব্বিশ জন লোককে একটা রুমে আটক রাখা হয়েছে। আমার চাচা এবং আমাকেও তাদের মধ্যে ঢুকিয়ে দিল। সেখানে ঢোকার পরে দেখলাম, প্রত্যেকটা লোকের গায়ের ওপর মাছি উড়ছে। তাদেরকে ওপর এত নির্যাতন চালানো হয়েছিল যে সবার গায়ে পচন ধরে গিয়েছিল। সেখান থেকে তারা প্রতি রাতে চারজন করে লোক মেরে ফেলত। আমরা ভেতরে বসে শুনতাম যে, তাদেরকে কুলাউড়া, শমসের নগর বিমানঘাঁটি ও মনু নদীর ব্রিজের ওপর নিয়ে হত্যা করা হচ্ছে। আমি সেখানে পাঁচদিন বন্দী অবস্থায় ছিলাম। ওই পাঁচদিনে তারা আমাকে এমন নৃশংসভাবে পিটিয়েছিল, যার বর্ণনা দেওয়া আমার পক্ষে সম্ভব নয়। কখনও হাত পা বেঁধে পিটিয়েছে, কখনও পায়ের নিচে ফেলে পিষেছে। কখনও কাঠ বুকের ওপরে দিয়ে দু'জন দু'দিকে থেকে চেপে ধরেছে। আমাকে মারতে মারতে শুইয়ে ফেলে ঘরের দরজা বুকের ওপরে দিয়ে দু'জন দু'দিক থেকে চেপে ধরেছে। শেষে পাঁচ হাজার টাকা নগদ দিয়ে ও এক লাখ ইট দেওয়ার অঙ্গীকার করে আমি তাদের কাছ থেকে ছাড়া পাই। সে সময় এখানকার পাকি আর্মির সার্বক্ষণিক চার্জে ছিল ক্যাপ্টেন রফিক।

নারী নির্যাতন প্রসঙ্গে আব্দুল গফুর আরও বলেন, সুবেদার লাল খান এখানকার সুন্দর খাঁর মেয়েকে যথেচ্ছ পাশবিক নির্যাতন চালায়। পরে ঘটনাটি ব্যাপক জানাজানি হয়ে গেলে সে মেয়েটাকে লোক দেখানো বিয়ে করে। সেই মেয়েটার একটা বাচ্চাও হয়েছিল। শমসের নগরে যেভাবে আমার বাড়িতে নারী নির্যাতন করে, সেরকমভাবে এখানকার প্রতিটি বাড়িতে গিয়ে পাকি আর্মি তাদের দোসরদের সহযোগিতায় নারী নির্যাতন চালায়। কিন্তু লজ্জায় এ কথা কেউ এখন স্বীকার করতে চায় না।

www.pathagar.com

গণহত্যা প্রসঙ্গে আব্দুল গফুর বলেন, শমসের নগর এয়ারপোর্টের রাস্তার ধারে পাঁচ শ' থেকে সাত শ' মানুষকে পাকি আর্মি হত্যা করে। আর দু'শ' থেকে তিন শ' লোককে রানওয়ের পূর্বদিকের গর্তে নিয়ে হত্যা করা হয়। এদের মধ্যে নেতা গফুরের বাবা ও ভাইসহ অনেকেই আছেন। আমাদেরকে দিয়ে পাকি আর্মি জোরপূর্বক সেখানে অনেক লাশ মাটিচাপা দেওয়ায়। এখানকার লোকজন তখন লাশ মাটিচাপা দেওয়ার কাজ করতে বাধ্য হয়েছে। বর্তমানে সেখানকার মাটি সমান করে ফেলা হয়েছে। বধ্যভূমির কোন চিহ্নই আর অবশিষ্ট নেই।

ভাড়াউড়া চা বাগানের কেদারলাল হাজরা বলেন, আমার স্পষ্ট মনে আছে এপ্রিল মাসের বিশ তারিখ পাকি বাহিনী সিলেট ও শেরপুর থেকে এসে শ্রীমঙ্গল দখল করে নেয়। বিশ তারিখের মধ্যেই শ্রীমঙ্গলে নেতৃস্থানীয় যারা ছিল, তারা শহর ও বাগান ছেড়ে নিরাপদ স্থানে চলে যায়। বাকিরাও পয়লা মে নাগাদ যাওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছিল। আমি নিজেও শেরপুর চলে গিয়েছিলাম। শেরপুরে পাকি আর্মি ও মুক্তিযোদ্ধাদের সঙ্গে বড় রকমের একটা যুদ্ধ হয়। মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য রেশন, গোলবারুদ গাড়ি ভর্তি করে নিয়ে আমরা শ্রীমঙ্গল থেকে শেরপুর যাই। আমার সাথে বাগানের রনজিত ও ফাগু ড্রাইভার ছিল। পরবর্তীতে ফাগু ড্রাইভারকে পাঞ্জাবিরা হত্যা করে।

পয়লা মের আগের দিন রাতে পাকি আর্মি শ্রীমঙ্গলের বহু বাড়িঘর পুড়িয়ে দেয়। আমাদের মধ্যে যারা তখনও বাগানে ছিল, তারা সে রাতেই ভারতে চলে যাওয়ার জন্য প্রস্তুতি নেয়। সকাল থেকেই প্রস্তুতি নেওয়ার কাজ শুরু হয়। আটটা/নয়টা নাগাদ পাকি সৈন্যরা পূর্বের রেল লাইনের দিক থেকে বাগানে ঢুকে চারদিক ঘিরে ফেলে। বাগানের পেছন দিক দিয়ে জঙ্গলের ভেতরে যাওয়ার রাস্তা, ভারতে যাওয়ার রাস্তা, সর্বত্রই তারা পজিশন নিয়ে নেয়। এই সময় বাগানের চৌকিদার অমৃত হাজরা ড্রেস পরে আর্মির সামনে এসে তার পরিচয় দেয়। কিন্তু পাকি আর্মি তাকে গুলি করে হত্যা করে। সে একটু বোকা টাইপের লোক ছিল। কিছু বুঝে উঠতে পারেনি। পাকি বাহিনী বাগানের প্রতিটি বাড়িতে ঢুকে আঠারো থেকে ষাট বছরের পুরুষদের যাকে সামনে পায় ধরে ফেলে। পাকি হানাদাররা 'আপ লোক হামারা মদদ কিজিয়ে, হাম শ্রীমঙ্গল মে ক্যাম্প বানায়েগা, পানি চাহিয়ে, পয়সা যা লাগে দেগা'–এইসব বলে বাগানের প্রায় চুয়ান্ন জন পুরুষকে ভাড়াউড়া শ্রীমঙ্গল রোডের কালীবাড়ির সামনে ধরে নিয়ে যায়।

সেদিনটি ছিল শুক্রবার। আমাদের সবাইকে রাস্তার পাশে নিয়ে তিনজন তিনজন করে লাইনে দাঁড় করায়। পঁচিশ গজ লম্বা লাইন হয় আমাদের। অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে পাকি মিলিটারিরা প্রস্তুত। প্রত্যেকের হাতেই স্টেনগান। তাদের এক গ্রুপ রাস্তার ওপরে আরেক গ্রুপ নিচে পজিশন নেয়। কী ঘটতে পারে, পরিষ্কার বুঝতে পারছিলাম। আমাদেরকে কেন এভাবে লাইন করানো হচ্ছে জানতে চাইলে এক পাকি সৈন্য মাদারচোদ, লাইন কিউ করেগা? প্রভৃতি জঘন্য ভাষার গালাগাল দেয়।

www.pathagar.com

এরপর হঠাৎ তিন/চার ফুট দূর থেকে আমাদের ওপর ফায়ার করা শুরু করে। নাভি ও দু'হাঁটু টার্গেট করে তারা গুলি করে। আমার সামনের পাকি সেনাটি যখন গুলি করে তখন মসজিদে জুম'আর আজান শুরু হল। এতে সম্ভবত তার মনোসংযোগে ব্যাঘাত ঘটে। এ কারণে গুলি আমার নাভিতে না লেগে পেটের পাশের চামড়া ভেদ করে বেরিয়ে যায় এবং দু'পায়ের হাঁটুর সামান্য নিচে গিয়ে লাগে। প্রত্যেককে যে কতগুলো করে গুলি করা হয়েছিল, তার কোন হিসাব নেই। কারও ওপর এক শ' গুলি আবার কারও গায়ে গুলিই লাগেনি এমনও হয়েছে। সেদিনের গণহত্যা থেকে আমরা সাত জন বেঁচে গিয়েছিলাম।

পরবর্তী ঘটনা আরও মর্মান্তিক ও ভয়াবহ। গুলি করার পরও তারা কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে লক্ষ্য করল যে, কেউ বেঁচে আছে কি না। আস্তে আস্তে সবার গোঙানি থেমে গেলে পাকি আর্মি চলে যায়। পাঁচ সাত মিনিট সংজ্ঞাহীন অবস্থায় থাকার পর সংজ্ঞা ফিরে এলে আমি উঠে দাঁড়ানোর চেষ্টা করি। অতি কষ্টে কোনমতে মাথাটা তুলতে সক্ষম হই। উহ্! চারিদিকে শুধু লাশ আর লাশ, কারও মাথা নেই, কারও হাত-পা নেই, নাড়িভুড়ি বেরিয়ে গেছে। সে এক বীভৎস দৃশ্য! আমি আবারও জ্ঞান হারালাম। মিনিট দশেক পর জ্ঞান ফিরলে এরপর বহু কষ্টে পা টেনে টেনে ছ্যাঁচড়াতে ছ্যাঁচড়াতে বাড়ির দিকে রওনা হলাম। যাওয়ার সময় দেখি যে কুকুর, গরু, শুয়োর ও মানুষ একই সাথে মরে পড়ে আছে। কেউ রাস্তায়, কেউ চড়ার মধ্যে, কেউ ড্রেনের মধ্যে, ভয়ঙ্কর দৃশ্য! অতি কষ্টে বাড়িতে পৌঁছে দেখি বাবা নেই। আমার একটা পা গুলি লেগে একেবারে অকেজো হয়ে গিয়েছিল। আরেকটা পা দিয়ে কোনমতে ছ্যাঁচড়াতে পারছিলাম। চারদিকে মহিলাদের চিৎকার, আজাহারি। আত্মীয় পরিজনদের খোঁজাখুজি ও ছুটোছুটি চলছে। কাউকে কাউকে গণহত্যা স্পট থেকে নিয়ে আসা হচ্ছিল। কারও দেহ হয়ত অক্ষত ছিল, কিন্তু পা ছিল না, কারও হয়ত পা অক্ষত ছিল কিন্তু দেহ ছিল না। সেখানে যে সাত জন বেঁচে ছিলাম, তাদের মধ্যে কেবল আমিই নিজে নিজে বাড়ি ফিরতে পেরেছিলাম। অন্যদেরকে আত্মীয় স্বজনরা তুলে এনেছিল। বিকালের দিকে এসে পাকিরা গণহত্যা স্পটে ফিরে এসে মৃতদেহগুলোকে মাটিচাপা দিয়ে চলে যায়।

শ্রীমঙ্গলে সংঘটিত নারী নির্যাতন প্রসঙ্গে কেদারলাল হাজরা বলেন, এখানকার অসংখ্য নারী পাকি বাহিনীর নির্মম নির্যাতনের শিকার হন। তবে বাগানের অল্পবয়সী মেয়েদের বেশিরভাগই তখন নিরাপদ স্থানে চলে গিয়েছিল। একারণে পঞ্চাশ ষাট বছর বয়সী মহিলারাও তাদের ঘৃণ্য পাশবিক নির্যাতনের হাত থেকে রেহাই পায়নি। বিভিন্ন জায়গা থেকে মেয়েদের ধরে এনেও এখানে নির্যাতন করা হয়েছে। শুধুমাত্র ভাড়াউড়া বাগানেই পঁয়তাল্লিশ জন মহিলা পাকি আর্মির ধর্ষণের শিকার হয়েছিলেন। ঘরে ঘরে ঢুকে তারা মহিলাদের ওপর অত্যাচার চালায়। সে নির্যাতনের মাত্রা ছিল

www.pathagar.com

অত্যন্ত নির্মম ও জঘন্য। নির্যাতিত নারীদের প্রায় সবাইকেই আমরা চিনি। তাদের অনেকেই মারা গেছে। তবে তাদের কেউই লিস্টেড নয়। একে আমাদের হিন্দু সমাজ, তার ওপর বাগানের মধ্যে এমন তথ্য জানতে পারলে তারা সমাজচ্যুত হয়ে যাবে। সেই ভয়ে কেউ নাম লিস্ট করায়নি। এ কারণে জানার পরও তাদের নাম বলা সম্ভব হচ্ছে না। বীরবল হাজরা নামে এক সংবাদ বাহককে পাকি সেনারা ওয়াপদা রেস্ট হাউজে অমানবিক অত্যাচারের পর হত্যা করে। বেয়নেট দিয়ে খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে তাকে হত্যা করা হয়েছিল।

এভাবে পাকি সেনারা তদানিন্তন মৌলভীবাজার মহকুমায় ভয়ঙ্কর গণহত্যা, ধর্ষণযজ্ঞ ও তাণ্ডব চালায়। মৌলভীবাজারে সংঘটিত সকল অপরাধের জন্য ব্রিগেডিয়ার ইফতেখার রানা, ব্রিগেডিয়ার আল-ফালাই, কর্নেল সরফরাজ মালিক, মেজর আজিজ খটক, ক্যাপ্টেন রফিক, জেনারেল নিয়াজী, ক্যাপ্টেন ইউসুফ, ক্যাপ্টেন গোলাম রসুল, সুবেদার লাল খান, মেজর আজিজ ও তাদের সহযোগীরা দায়ী।

www.pathagar.com

খুলনা বিভাগ

আসামীঃ কমান্ডার গুলজারিন, মেজর ইসতিয়াক, মেজর বেলায়েত খান, মেজর একরাম, মেজর জাফর, মেজর বানোরি, ক্যাপ্টেন আকরাম, ক্যাপ্টেন গণি, মেজর আব্দুল্লাহ, কর্নেল খটক, মেজর জুবলি, লে. কোরবান, মেজর আব্বাসী, মেজর ইকবাল বাহার, লে. রফিক, মেজর আলতাফ করিম।

অপরাধের ধরনঃ গণহত্যা, জাতিগত নিধন, ধর্ষণ, লুটপাট, অগ্নিসংযোগ।

সাক্ষী ঃ ফেরদৌসী প্রিয়ভাষিণী, মোঃ আব্দুস সাত্তার সিকদার, মোঃ মুজিবর রহমান, মোঃ আব্দুল গফ্ফার শেখ, আব্দুস সাত্তার গাজী, মোঃ শের আলী সরদার, কমল কান্তি বিশ্বাস, মোঃ এরশাদ আলী মোড়ল, মোঃ হাদিস।

ঘটনাকালঃ একাত্তরের মার্চ থেকে ডিসেম্বর পর্যন্ত।

ঘটনাস্থল ঃ খুলনা জেলা

সূত্রঃ যুদ্ধাপরাধ গণহত্যা ও বিচারের অন্বেষণ এবং WCFFC গবেষণা।।

একাত্তরে এসব পাকি আর্মি ও তাদের সহযোগীরা নদীবহুল খুলনা জেলা ও তার আশপাশের এলাকায় ব্যাপক গণহত্যা, ধর্ষণ ও যুদ্ধাপরাধ সংঘটনে উন্মত্ত হয়ে উঠেছিল। খুলনার খালিশপুরের বিভিন্ন এলাকা হয়ে উঠেছিল পাকি আর্মি ও অবাঙালিদের অভয়ারণ্য। সেখানে কোন বাঙালি প্রবেশ করলে আর প্রাণ নিয়ে ফিরতে পারত না। সেখানকার নিউজপ্রিন্ট মিলসহ অন্য চটকলগুলোতে পাকি বাহিনী বাঙালি শ্রমিকদেরকে পরিকল্পিতভাবে হত্যা করে। সে সময় খালিশপুর থেকে রূপসার দিকে নিয়মিত শ্রমিকদের লাশ ভেসে আসত। খুলনা নিউজপ্রিন্ট মিলে শ্রমিকদের কাজে যোগ দিতে বলায় বাঙালি শ্রমিকরা পেটের দায়ে কাজে যোগ দিয়েছিলেন। যোগদানের পরপরই তাঁদেরকে গ্রেফতার করে একে একে হত্যা করে রূপসা নদীতে ভাসিয়ে দেওয়া হয়। নৌকমান্ডার গুলজারিনের নির্দেশে ক্রিসেন্ট জুট মিলের এক্সাইজ ইন্সপেক্টরকে হত্যা করার পর টুকরো টুকরো করে ঝুলিয়ে রাখা হয়। স্বাধীনতার পর পিপলস জুট মিলের শ্রমিক কলোনির ল্যাট্রিনের সেফটি ট্যাঙ্কের ভেতর দুই হাজারের বেশি মানুষের কঙ্কাল পাওয়া যায়। এঁদের হাত পা ছিল বাঁধা। খালিশপুর ময়দানের পুকুরের কাছে, খুলনা রেলওয়ে স্টেশনের শিকারপাড়া,

www.pathagar.com

ফেরিঘাট, স্টেশন রোডের পরিত্যক্ত গুদাম, কাস্টমস ঘাট, গোয়ালখালি, ভৈরবের তীরে ক্রিসেন্ট জুট মিল, শহরের উপকণ্ঠে কান্তপুরের চিলমারী এলাকা, খুলনার হেলিপোর্ট, ফরেস্ট ঘাট ছিল হত্যাকাণ্ডের প্রধান প্রধান স্থান। প্লাটিনাম জুট মিলে চলত লোমহর্ষক হত্যাকাণ্ড। বয়লারের সামনে তিন ফুট উঁচু প্রাচীরের পাশে বসানো হত বাঙালি শ্রমিকদের। তাঁদেরকে বস্তাবন্দি করে ফেলে দেওয়া হত বয়লারে। কখনও এঁদের দেহের বিভিন্ন অংশ আলাদাভাবে বয়লারে ঢুকিয়ে পোড়ানো হত। এই পদ্ধতিতে নিহতদের কয়েকজন হলেন হারুন, হেমায়েত, আজিজ। এপ্রিলে চরের হাটে নির্মম হত্যাযজ্ঞ চালায় পাকি বাহিনী। যাত্রীভর্তি লঞ্চ থামিয়ে মালামাল লুট করে গুলি চালিয়ে ঝাঁঝরা করে দেওয়া হয় তাঁদের দেহ। প্রায় পাঁচ শ' লোককে হত্যা করা হয় সেদিন। খুলনা থেকে দেড় মাইল দূরে গল্লামারীতে পাকি সেনারা প্রতি রাতে শতাধিক ব্যক্তিকে বেতার কেন্দ্রের সামনে নিয়ে হত্যা করত। সেখান থেকে লাশগুলো ট্রাক ভর্তি করে গল্লামারীতে নিয়ে ফেলে দেওয়া হত। কয়েকজন প্রত্যক্ষদর্শী ও ক্ষতিগ্রস্তের সাক্ষ্য এখানে তুলে ধরা হয়।

প্রত্যক্ষদর্শী মোঃ হাদিস বলেন, সে সময় আমি খালিশপুর পিপলস্ জুট মিলে চাকরি করতাম। মার্চের প্রথম দিকে আমি কর্মস্থল ছেড়ে গ্রামের বাড়িতে, চলে যাই। দেশ স্বাধীন হওয়ার পর কাজে যোগ দিই। সে সময় বয়লার থেকে দুই বালতি মানুষের দাঁত উদ্ধার করা হয়, প্রায় ষাট দিন পর্যন্ত সেগুলো সর্ব সাধারণের প্রদর্শনের জন্য রাখা হয়েছিল। হাউজিং কলোনিতে বিহারিরা একটি মেয়ের স্তন কেটে নিয়েছিল। আমি বিহারি ছেলেদেরকে সেই কাটা স্তন নিয়ে খেলতে দেখেছি। এর পরপরই বিহারিদের ভয়ে আমি এলাকা ছেড়ে পালিয়ে যাই। সে সময় খালিশপুর হাউজিং পানির ট্যাংকের কাছে অনেক মাথার খুলি পাওয়া গিয়েছিল, যা স্বাধীনতার পর সরকার ট্রাকে করে নিয়ে যায়।

একাত্তরের বিশে মে দেশের সবচেয়ে বড় গণহত্যাটি সংঘটিত হয় চুকনগরে। ঘরবাড়িহারা প্রায় দশ হাজার নিরীহ নরনারী ও শিশুকে পাকি সেনারা সেদিন পাখির মত গুলি করে হত্যা করেছিল। চুকনগর গণহত্যার প্রত্যক্ষদর্শীদের একজন ডুমুরিয়ার এরশাদ আলী মোড়ল। তার পিতা চেকন আলী মোড়ল (৭০) চুকনগর গণহত্যার প্রথম শহীদ ব্যক্তি। তিনি বলেন, চুকনগর বাজার থেকে এক কিলোমিটার দূরে একটি রাস্তা আছে যেখান থেকে মালথিয়া গ্রামে যাওয়া যায়। মালথিয়া গ্রামেই আমার বাড়ি। একাত্তর সনের বিশে মে বৃহস্পতিবার একটা মিলিটারির গাড়ি সাতক্ষীরার দিক থেকে চুকনগর আসে। সে গাড়িতে খান সেনারা ছিল।

আমি, আমার বাবা ও বড় ভাই একসাথে রাস্তার পাশের জমিতে হালচাষ করছিলাম তখন। মিলিটারির গাড়ি দেখে আমার বাবা আমার নাম ধরে বললেন, এরশাদ, মিলিটারির গাড়ি আসছে, তাড়াতাড়ি পালিয়ে যা। এই কথা বলার পর আমরা সেখান থেকে দৌড়ে দু' শ' হাত দূরে আমাদের বাড়িতে চলে যাই। আমরা দূর থেকে দেখতে পেলাম, খান সেনারা গাড়ি থেকে নেমে আমার বাবাকে কিছু জিজ্ঞেস করছে।

www.pathagar.com

কী জিজ্ঞেস করছিল তা আমরা জানতে পারিনি। গুলি করার আগে বাবা চিৎকার করে বলে ওঠেন, তোরা পালা। তখন আমরা নিজেদের বাড়ি থেকে আরও দূরে সরে যাই।

এরপর মিলিটারিরা রাস্তার অপর সাইডে চলে যায় এবং বটিয়াঘাটা, দাকোপ, ছিয়ানব্বই গ্রাম প্রভৃতি এলাকা থেকে আগত হাজার হাজার শরণার্থীর ওপর নির্বিচারে গুলি শুরু করে। আমরা দেখতে পেলাম, মেশিন গানের ব্রাশ ফায়ারে হাজার হাজার মানুষ পাখির মতো পড়ে যেতে লাগলেন। বৃদ্ধ-মহিলা-পুরুষসহ আনুমানিক দুই থেকে তিন হাজার মানুষকে সেখানেই তারা হত্যা করে। সেখানে আমাদের এক কাকা সুরেন ভূষণ কুণ্ডুও তাদের গুলিতে নিহত হন। তাঁর ছেলে জীবিত আছেন, কিন্তু বর্তমানে এখানে থাকেন না, খরনিয়াতে থাকেন। এ ছাড়া দাসবাড়ির তিন চার জন লোকও নিহত হন। এরপর মিলিটারিরা ওখানকার একটি রাস্তা দিয়ে পূর্ব দিকে যায় এবং সেখান থেকে চুকনগর বাজারে গিয়ে গুলিবর্ষণ শুরু করে। বাজারে তাদের গুলিতে হাজার হাজার মানুষ নিহত হন। চুকনগর সরদার বাড়ি ও অন্যান্য এলাকায় প্রায় চার হাজার মানুষকে গুলি করে হত্যা করে তারা। সকাল সাড়ে ন'টা থেকে বিকেল তিনটা পর্যন্ত তারা অবিরাম গুলি চালিয়ে হাজার হাজার নিরীহ মানুষকে হত্যা করে। সাতক্ষীরা থেকে প্রথমে এক গাড়ি পাকি আর্মি আসে। পরে আরও দু'গাড়ি আর্মি এসে তাদের সাথে যোগ দেয়। এরপর হত্যাযজ্ঞ শেষ করে তারা গাড়িসহ সাড়ে তিনটায় সাতক্ষীরার দিকে চলে যায়।

এর মধ্যে আমার বাবাকে যখন আমরা কবর দিচ্ছিলাম, তখন পাকি সেনারা পুনরায় আমাদের বাড়িতে আসে। তখন বাবার লাশ কবরের পাশে ফেলে রেখে আমরা আবার দূরে চলে যাই। এ সময় বাড়িতে কেবল আমার মা ছিলেন। মার কাছ থেকে দুধ ও অন্যান্য জিনিস খেয়ে পাকিরা চলে যায়। এরপর আমরা নিহত আত্মীয়ের পাশে দৈবক্রমে বেঁচে যাওয়া দু'এক জনকে বসে থাকতে দেখি। হঠাৎ দেখলাম, একটা মেয়েশিশু তার মৃত মায়ের দুধ খাচ্ছে। সেখানে অন্য কোন লোক ছিল না। মরা মানুষের দুধ খেতে দেখে আমি চিৎকার করে বলে উঠলাম, 'তোরা কে কোথায় আছিস, মেয়েটা কার, নিয়ে যা। কিন্তু কোন লোক পাশে ছিল না। তখন একজনকে চুকনগরের দিকের এই মাঠ দিয়ে দৌড়ে যেতে দেখে ভাবলাম লোকটা হয়ত মেয়েটার কেউ হতে পারে। পরে দেখলাম, লোকটা মরা লাশ সরিয়ে কাকে যেন খুঁজছে। তখন আমি তাকে বললাম, কী ব্যাপার তুমি কাকে খুঁজছ?' তখন সে বলল, আমার বাড়ি মঙ্গলকোট, আমার একটা ভাইপো বাড়ি থেকে এসেছে, কিন্তু তাকে খুঁজে পাচ্ছি না। তাই লাশের মধ্যে তাকে খুঁজছি। আমি তাকে বললাম, এত লাশের মধ্যে তাকে খুঁজে পাবেনা। তুমি ভাই কী জাত?' তখন সে বলল যে হিন্দু, তার পদবী দাস। আমি বললাম, দেখ ভাই, হিন্দু সম্প্রদায়ের এই মেয়েটার মা-বাবা মারা গেছে, মরা মায়ের দুধ খাচ্ছে। তুমি একই ধর্মের মানুষ, তুমি একে নিয়ে যাও। পরে দেখাশুনা যা করতে হয় আমি করব। এরপর সে মেয়েটাকে নিয়ে গেল। আমি তার

www.pathagar.com

কাছ থেকে ঠিকানা নিলাম এবং পরে তার বাড়ি গিয়ে দেখলাম যে, তার কোন সন্তান নেই। পরে ওই মেয়েটাকে সে লালন পালন করে, আমিও সাধ্যমত সাহায্য সহযোগিতা করি। আমরা মালথিয়া গ্রামের বাবু দাসের সাথে পরে তার বিয়ে দিই। দুটো সন্তান হয়েছে মেয়েটার। তবে গরীবের ঘর তাই খুব সুখে শান্তিতে নেই। বিশ পচিঁশটা করে লাশ প্রতিদিন ঘ্যাংরাইল নদীতে টেনে টেনে ফেলেছি। চার পাঁচদিন যাবত আমরা এই কাজ করি। আর চুকনগরে যে লাশ পড়েছিল, তা সব ভদ্রা নদীতে ফেলা হয়।

প্রত্যক্ষদর্শী শহীদ বাবুরাম বিশ্বাসের ছেলে কমলকান্তি বিশ্বাস বলেন, তখন চুকনগর বাজারে আমাদের স্টেশনারি দোকান ছিল। বাবা ওই দোকানটি চালাতেন। বাবা ও আমি সেদিন দোকানে ছিলাম। বাবা সকাল বেলা আমাকে বললেন, 'তুমি বাড়ি থেকে খেয়ে এসো, তারপর আমি খেতে যাব।' দোকান থেকে বেরিয়ে আমি বাড়ির মধ্য রাস্তা পর্যন্ত গিয়েছি এর মধ্যেই গুলির শব্দ শুনতে পেলাম। আমাদের বাড়ি চুকনগর বাজার থেকে কোয়ার্টার মাইলের মত দূরে হবে। আমি তখন তেমন কিছু বুঝিনি। আমাদের চুকনগর বাজারের আশপাশ সে সময় লোকে লোকারণ্য।

বাড়ি গিয়ে দেখি, সবাই চারদিকে ছুটোছুটি করছে। আমার এক জ্যাঠতুতো ভাইয়ের কাছে শুনলাম যে বাজারে ব্যাপক গোলাগুলি হচ্ছে। এটা শুনে আমার মনে একটু ভয় হল। ভাবলাম বাবা একা দোকানে আছেন। কী করি, কোনদিকে যাই। এরপর বাড়ি গিয়ে দেখি ঘরের দরজা জানালা সব বন্ধ। আমার বড় ভাই, মা, বোন অন্যদের সাথে দূরে সরে গেছেন। আমি কাউকে না পেয়ে প্রায় ঘন্টা খানেক পর এক পা দু'পা করে বাজারের দিকে এগুতে লাগলাম। তখন বাজারের পাশে তন্ত্রীবায় পাড়ার হাজরা তন্ত্রীর বাড়িতে হানাদাররা আগুন ধরিয়ে দিয়েছে। আগুন দেখে আমি আর বাজারের দিকে এগুতে সাহস পেলাম না। এ অবস্থায় সেখানে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে দেখলাম অস্ত্রশস্ত্র হাতে খাকি পোশাকপরা চার পাঁচ জন লোক আগুনের আশপাশ দিয়ে ঘুরছে। আমি তখন বাঁশঝাড়ের পাশে দাঁড়িয়ে। এ সময় তারা সেখানে একটা গুলি করল। গুলিটা একটা বাঁশের গায়ে গিয়ে লাগল। গুলি লেগে বাঁশটা কাত হয়ে পড়ে গেল। আমি এই অবস্থা দেখে আর কোন কিছু না ভেবে ছুট দিলাম। এক ছুটে দু'কিলোমিটার দূরে গিয়ে পড়ে গেলাম। এরপর সাড়ে চারটার দিকে আমরা সেখান থেকে ফিরে আসি। তখন রাস্তায় লোকজন বলল, 'যাও বাবা, এখন বাড়ি ফিরে যাও। তোমাদের ওখানে গোলাগুলি বন্ধ হয়েছে।' বাড়ি এসে দেখি হৃদয়বিদারক দৃশ্য, চারদিকে কান্নার রোল। চারপাশে লাশ দেখে আমার মাথা ঘুরে গেল। একটা পুকুরে দেখি উনিশটা লাশ, অন্য একটা পুকুরে দেখি সতেরোটা লাশ। বাড়িতে মা কান্নাকাটি করছে; আমি বললাম, 'মা, আমরা সব ফিরে এসেছি, তুমি কান্নাকাটি করো না। আমরা সুস্থ আছি।' মা তখন বললেন, 'বাপরে, তোর বাবা নেই।' এই কথা শুনে আমি জ্ঞান হারিয়ে ফেললাম। মনে হল, আমার ভেতরে প্রাণ নেই। তারপর থেকে অনেক দুঃখ কষ্টে মানুষ হয়েছি।

www.pathagar.com

চুকনগর গণহত্যার যে বীভৎস দৃশ্য আমি দেখেছি, তা ভাষায় প্রকাশ করার মত নয়। আমার বাড়ির পাশে চৌদ্দ বছরের একটা ছেলেকে দেখেছিলাম যার পুরুষাঙ্গ ও অণ্ডকোষ গুলিতে উড়ে গিয়েছিল। বিকাল বেলা যখন ফেরত আসি তখনও দেখলাম, সে বেঁচে আছে। তবে খিঁচুনি শুরু হয়েছে। কিন্তু আমি তার পাশে যাওয়ার সাহস পাইনি। অনেকেই আহত অবস্থায় বেঁচে ছিলেন। কিন্তু তাঁদের বাড়ি এখানে না হওয়ায় পরে তাঁদের আত্মীয়-স্বজনরা খবর পেয়ে তাঁদেরকে নিয়ে যান।

চুকনগর গ্রামের মৃত আখেদ সরদারের ছেলে শের আলী সরদার বলেন, বিশে মে সকালে আমি বাড়িতে ছিলাম। ন'টার সময় মালথিয়া গ্রামের দিক থেকে গুলিবর্ষণ শুরু হয়। গুলিবর্ষণ ক্রমেই বাড়তে থাকে। এর মধ্যে ডিস্ট্রিক্ট বোর্ডের কাঁচা রাস্তা দিয়ে একটি মিলিটারির গাড়ি ঘুরে চেয়ারম্যান বদর সাহেবের বাড়ির সামনে গেল। বদর সাহেবের বিল্ডিংয়ের বারান্দায় চুকনগর গ্রামের মহেজের আট বছরের একটি মেয়ে বসেছিল। তাকে মিলিটারিরা গুলি করে সেখানেই হত্যা করে। চেয়ারম্যানের বাড়ি থেকে তারা কাঁচা রাস্তা দিয়ে আমাদের বাড়ির সামনে এল। ভাবলাম আর বাঁচা সম্ভব হবে না। তখন বাড়ি ছেড়ে দিয়ে আমরা পার্শ্ববর্তী শুকনো পুকুরের ভেতরে গিয়ে বসলাম। কিন্তু সেখানে বসেও বাঁচা যাবে না বুঝতে পেরে হামাগুড়ি দিয়ে গোরস্থান হয়ে আমরা রশি খানিক দূরে (৮০ হাতে এক রশি) চলে গিয়ে একটি গর্তের মধ্যে বসে পড়ি। সেখানে দেখলাম, আমাদের বাড়ির পশ্চিম পাশের হিন্দুদের ঘরবাড়িতে আগুন লাগিয়ে দেওয়া হয়েছে। এরপর পাকি আর্মি রাখাল কবিরাজের বাড়িতে আগুন দিল। তখন আমরা ভাবলাম, আমাদের ঘরবাড়িও থাকবে না। এর মধ্যে দেখলাম চেয়ারম্যান বাড়ি থেকে সাত আটজন 'পাকিস্তান জিন্দাবাদ' স্লোগান দিতে দিতে এগিয়ে যাচ্ছে। তখন আমি ওই পানির গর্তের ভেতর থেকে বেরিয়ে এসে ওদের সাথে যোগ দিলাম। আর আমাদের বাড়ির মেয়েদের ওই গর্তের ভেতর বসে থাকতে বললাম। স্লোগান দিতে দিতে আমরা যখন মালোপাড়ার দিকে এগোলাম, তখন তারা জিজ্ঞেস করল, তুম কৌন হো? মালাউন হো, না মুসলমান হো? তখন আমরা বললাম, না স্যার, আমরা মুসলমান। তখন তারা বলল যে, কী রকম মুসলমান, দেখা তো যাচ্ছে মালাউনের মতো। এরপর বলল, কাপড় উঁচু কর, আমাদের সবাইকে তখন তারা কাপড় উঁচু করে পুরুষাঙ্গ দেখাতে বাধ্য করে। মুসলমানি করা হয়েছে কি না তা দেখার পর বলল, ঠিক আছে। এরপর তারা হেঁটে পাকা রাস্তার দিকে গেল। ড্রাইভাররা তখন গাড়িগুলো ব্যাক করে বাজারের কাছে এনে সাতক্ষীরার দিকে চলে গেল।

ভদ্রা নদীর ধারে আমার পনেরো বিঘার একটি ঘের ছিল। সেখানে অনেক মানুষকে গুলি করে মারা হয়। আমি সেটা দেখার জন্য গেলাম। যেয়ে দেখি লাশের ওপর লাশ পড়ে আছে। অগুণতি লাশ। চর, বাগান আর ঘের দিয়ে সেখানেই কমপক্ষে তিন হাজার লাশ পড়ে থাকতে দেখলাম। কিন্তু এত লাশ সরানো আমার পক্ষে সম্ভব নয়, তাই হতাশ হয়ে গেলাম।

www.pathagar.com

গল্লামারীর গণহত্যা প্রসঙ্গে বানিয়াখামার পশ্চিম পাড়ার অধিবাসী আব্দুল গফফার শেখ বলেন, একদিন সন্ধ্যায় আমি দোকান বন্ধ করে বাড়ি যাচ্ছি। লায়ন্স স্কুলের সামনে যাওয়ার পর একটা মিলিটারির গাড়ি হু হু করে আসতে দেখলাম। আমার সাথে আমাদের গ্রামের একটা লোক গরু নিয়ে যাচ্ছিল। হঠাৎ করে মিলিটারির গাড়িটা আমাদের সামনে এসে দাঁড়িয়ে গেল। আমরা ভাবছি এই বোধহয় গুলি করে দিল। কিন্তু তা আর করল না। জিজ্ঞেস করল, 'বাড়ি কোথায়?' হিন্দু না মুসলমান তাও জিজ্ঞেস করল এবং কলেমা পড়তে বলল। কিন্তু ভয়ে কলেমা ভুলে গিয়েছিলাম। তখন তারা গালিগালাজ করে ঘাড়ে একটা থাপ্পড় দিয়ে চলে যায়। এরপর আমরা বাড়ি ছেড়ে দক্ষিণ বেরাইদ চলে যাই। কিন্তু সেখানে ডাকাতের ভয় থাকায় আবার বাড়ি ফিরে আসি। রাতে যখনই তাদের গাড়ি যেত, তার পরপরই আমরা গুলির শব্দ শুনতে পেতাম। রেডিয়ো সেন্টারের ওপাশে আমাদের জমি ছিল। মাঝে মধ্যে আমাদেরকে সেখান দিয়ে যেতে হত। দেখতাম, বিভিন্ন জায়গায় লাশ পড়ে আছে। লাশের গন্ধে তখন গল্লামারীর বাতাস ভারী হয়ে উঠেছিল। রেডিয়ো সেন্টার আক্রমণের দিন রাত দু'টা আড়াইটার দিকে এমন গোলাগুলি শুরু হল যে, মনে হচ্ছিল আমাদের মাথার ওপর দিয়ে গুলি যাচ্ছে। তখন আমরা বাড়ির মেয়েদের গ্রামের ভেতর রেখে আসি। আর আমরা পুরুষরা পুকুরে গিয়ে বসে থাকি। পুকুরে তখন পানি ছিল না। সকালবেলা দেখি বেঙ্গল রেজিমেন্টের লোকেরা সাদা গেঞ্জি গায়ে কালো প্যান্ট পরে রক্তাক্ত শরীরে চলে যাচ্ছে। এঁরা মুক্তিবাহিনীর লোক ছিলেন। আমরা তাঁদেরকে কিছু কাপড়চোপড় দিয়ে বললাম, আপনারা তাড়াতাড়ি পেছন দিক দিয়ে চলে যান। রাস্তা দিয়ে মিলিটারিরা যাচ্ছে। দেখতে পেলে আমাদেরও ক্ষতি হবে। সকাল দশটার দিকে পাকি সেনারা রাস্তা দিয়ে যেতে যেতে বলল, তোমরা এলাকা ছেড়ে চলে যাও।

গল্লামারী হত্যাকাণ্ড প্রসঙ্গে মুজিবর রহমান বলেন, সে সময় আমি খুলনা পৌরসভায় চাকরি করতাম। গল্লামারীতে সে সময় শুধু বিল ছিল। লোকজনের বসতি ছিল না বললেই চলে। আমরা রাতে বাড়িতে কোন রকমে থাকতাম। সকাল হলেই শহরে চলে যেতাম। যেদিন মুক্তি বাহিনী রেডিয়ো সেন্টার আক্রমণ করে, সেদিন প্রচুর গোলাগুলি হয়। মুক্তি বাহিনী রেডিয়ো সেন্টারের পাশে যে বাগান ছিল সেখান থেকে গুলি করা শুরু করে। সে সময় নদী খালে সব সময় লাশ ভাসত। আমি ওদিকে তেমন যেতাম না। একদিন কোন কাজে সেখানে গিয়ে লাশ ভাসতে দেখলাম। ভয়ে কেউ ওদিকে তখন যেত না। রেডিয়ো সেন্টারে ঢোকার মুখে বাবলা গাছতলায় দেখলাম, দুটো কলাগাছ পাশাপাশি রাখা ও তার তলা দিয়ে ড্রেন কাটা। আমরা শুনেছি কলাগাছের মাঝখানে মানুষের গলা রেখে তারা জবাই করত ও রক্ত ড্রেনে ঝরে পড়ত। অসংখ্য লোককে এখানে হত্যা করা হয়। কিন্তু কত লোক হত্যা করা হয়েছে তা নির্দিষ্ট করে বলতে পারব না। এখানে জবাই করেই বেশি মানুষ হত্যা করা হয়েছে বলে আমাদের ধারণা। তবে গুলি করেও মাঝে মাঝে মানুষ হত্যা করা হয়েছে।

www.pathagar.com

গল্লামারীর পবন শিকদারের পুত্র আব্দুস সাত্তার সিকদার একজন খ্যাতনামা মুক্তিযোদ্ধা কমান্ডার। রেডিয়ো সেন্টারের সামনে বাবলা গাছতলায় বা রেডিয়ো সেন্টারের ভেতরে যে সমস্ত গণহত্যা চালানো হত, তার থেকে মাত্র দু' শ' গজ দূরত্বের মধ্যেই তাঁর বাড়ি। তিনি বর্তমানে হার্টের রোগী। কষ্ট করে যে কথাগুলো তিনি বলেন, তা এখানে তুলে ধরা হল।

একাত্তরের ছাব্বিশে মার্চের আগের ঘটনা। তখন ফরাজী পাড়া মোড়ের বরিশাল বেকারীর ওখানে আমাদের দুটো দোকান ছিল। তখন আমরা এ বাড়িতে ছিলাম না। ডান পাশের মোড়ে ব্রিজের কাছাকাছি একটা বাড়িতে ছিলাম। এখানে ছাব্বিশে মার্চের আগে মিলিটারিরা তিন জনকে গুলি করে হত্যা করে। তারা ডাব ও মাছের নৌকার লোক ছিল। আমরা বাড়িতে দাঁড়িয়ে তাদের হত্যার দৃশ্য দেখতে পাই। বাংলাদেশ ব্যাংকের কাছে গিয়েও কয়েকজন লোককে মৃত অবস্থায় পড়ে থাকতে দেখি। এরপর আমার স্ত্রীকে বাবার বাড়ি মোল্লাহাটে রেখে আমি মুক্তিযুদ্ধে চলে যাই। আমার বাবা তখন বাড়িতে ছিলেন। খান সেনারা তাঁকে দিয়ে এই বাড়ির সমস্ত কলাগাছ কাটিয়ে নেয় এবং বাড়িতে আজান দেওয়ায়। তারপর ছোট একটি ছেলেকে দিয়ে আমাদের ঘরে আগুন লাগিয়ে দেয়। আমার বাবা তখন খোরশেদ মেম্বারের বাড়িতে থাকতেন। আগের রেডিয়ো সেন্টারে ঢুকতে যে পুরানো রাস্তাটা, সেখানে একটা বাবলাগাছ ছিল। ওখানে সবাইকে ধরে এনে পাকি বাহিনী জবাই দিত। আর রাস্তার পাশ দিয়ে খাল ছিল, সেই খাল দিয়ে লাশ ভেসে গিয়ে নদীতে পড়ত। স্বাধীনতা লাভের আগের দিন পর্যন্ত এখানে মানুষ জবাই করা হয়েছে। ট্রাকে করে মানুষ এনে তারা এখানে জবাই করত। লাশগুলো জোয়ারের পানিতে বিলে উঠে যেত। এখানকার সারা বিলে মানুষের হাড়গোড় এখনও পাওয়া যাবে। পাকি আর্মি ইটের ওপরে রেখেও মানুষ জবাই করত।

মুক্তিযোদ্ধা আব্দুস সাত্তার আরও বলেন, যখন আমরা গল্লামারী রেডিয়ো সেন্টার দখল করি, তার চার দিন আগে হাতিবুনিয়া গ্রামে আসি। স্বাধীন হওয়ার চার দিন আগে আমরা রেডিয়ো সেন্টার দখল করি। সেখানে আমরা ভয়াবহ হত্যাকাণ্ডের নিদর্শন দেখতে পাই। স্তন কাটা অনেক মহিলাকেও সেখানে পেয়েছিলাম। কয়েকজন জীবিত মহিলাকে পেয়ে তাদেরকে বলি যে, তোমরা চলে যাও। তারা বলে, আমাদেরকে পৌঁছে দেন। আমরা তাঁদেরকে রাস্তা পর্যন্ত পৌঁছে দিতে গেলে তাঁরা বলে যে, আমাদেরকে ডা. আজিজুর রহমান সাহেবের বাসায় পৌঁছে দেন। ওখানে গেলে আমরা বাঁচতে পারব। তখন আমার তাদেরকে সেখানে পৌঁছে দিয়েছিলাম। রেডিয়ো সেন্টারের ভেতর থেকে পাঁচ ট্রাক মাথা আর হাড় পাওয়া গিয়েছিল। এখানকার খালে বিলে এখনও বহু হাড়গোড় ও মাথার খুলি পাওয়া যাবে।

ফেরদৌসী প্রিয়ভাষিণীর জবানবন্দী থেকে জানা যায়, পাকি আর্মি অফিসার ও জওয়ানরা খুলনা শহর ও এর প্রত্যন্ত অঞ্চলে ব্যাপক ধর্ষণ ও হত্যাযজ্ঞ চালায়। প্রিয়ভাষিণী নিজেই কমান্ডার গুলজারিন, মেজর ইসতিয়াক, মেজর বেলায়েত খান,

www.pathagar.com

মেজর একরাম, মেজর জাফর, মেজর বানোরি, ক্যাপ্টেন আকরাম, ক্যাপ্টেন গণি, মেজর আব্দুল্লাহ্, কর্নেল খটক, মেজর জুবলি, লে. কোরবান, মেজর আব্বাসী, মেজর ইকবাল বাহার, লে. রফিক, মেজর আলতাফ করিম প্রমুখ আর্মি অফিসারের ধর্ষণের শিকার হন। শুধু তাই নয়, নাম না জানা আরও অনেক পাকি আর্মি এই সব ধর্ষণ ও হত্যাযজ্ঞের সাথে সংশ্লিষ্ট ছিল। প্রিয়ভাষিণীর ভাষ্য 'এপ্রিল থেকে পরবর্তী পাঁচ মাস পর্যন্ত চেনা অচেনা মিলিয়ে প্রতিদিন অন্তত তিন জন করে পাকি সেনা সদস্য আমাকে ধর্ষণ করেছে।' সুতরাং খুলনায় অবস্থানরত সকল পাকি আর্মি অফিসার যুদ্ধাপরাধের দায়ে অভিযুক্ত।

আসামী ঃ মেজর জুবলী, লে. আতাউল্লা, মেজর রাজ্জাক, মেজর শাকিল খান, ক্যাপ্টেন আতাউল্লাহ শাহ্, খান মোশাররফ, হাবিলদার গফ্ফার খান, হাবিলদার ইমরান খান, রাশেদ খান, মালেক।

অপরাধের ধরনঃ গণহত্যা, জাতিগত নিধন, ধর্ষণ, লুটপাট, অগ্নিসংযোগ।

সাক্ষী ঃ অ্যাডভোকেট এমএ আনসারী, মোঃ রায়হান উদ্দীন, সিকদার মোশারফ হোসেন, মোঃ গোলাম মোস্তাফা লোটন, মোঃ এনায়েত উল্লাহ সোম, হাফিজুর রহমান।

ঘটনাকালঃ একাত্তরের ষোলোই মে থেকে ছয়ই ডিসেম্বর পর্যন্ত।

ঘটনাস্থল ঃ ঝিনাইদহ জেলা।

সূত্রঃ যুদ্ধাপরাধ গণহত্যা ও বিচারের অন্বেষণ এবং WCFFC গবেষণা।

ষোলোই এপ্রিল ঝিনাইদহ দখল করে নেয় পাকি বাহিনী। শহরে ঢুকেই তারা ব্যাপক গণহত্যা, লুটপাট ও অগ্নিসংযোগ শুরু করে। একটু থিতু হয়ে শুরু করে ধর্ষণযজ্ঞ। এই শহরে পাকিস্তানিদের বুলেটের প্রথম শিকার হন ক্যাডেট কলেজের চৌকিদার গাজী। শহরের অবস্থা জানার জন্য সাইকেল নিয়ে বেরিয়েছিলেন তিনি। ঘাতক পাকি সৈন্যরা বুলেটে ঝাঁঝরা করে দেয় তাঁর দেহ। ক্যাসেল সেতুর নিচে গড়িয়ে পড়ে তাঁর লাশ। এই সেতুর পাশে রয়েছে অসংখ্য নিরপরাধ বাঙালির মৃতদেহ। শোনা যায় বাঙালির লাশ দিয়ে পাকিস্তানি ও তার এদেশীয় দোসররা সড়ক তৈরি করে তার ওপর দিয়ে সদর্পে হাঁটা চলা করত।

আঠারোই এপ্রিল বারো পাঞ্জাব রেজিমেন্টের ক্যাপ্টেন ইকবাল কলেজের অধ্যাপক কর্নেল হালিম খানকে তাঁর বাংলোর পেছনে বেয়নেট ও তলোয়ারের আঘাতে হত্যা করে। কর্নেল রহমানের কাছ থেকে টাকা ও ঘড়ি ছিনিয়ে নেয়। এ ছাড়াও কলেজের মালী সাত্তার ও চৌকিদার জুব্দীনকে হত্যা করে। ঝিনাইদহ মহকুমায় পাকিস্তানিরা কমপক্ষে ছয় হাজার মানুষকে হত্যা করে। চার হাজার আট শ' উনআশি জন হয় পিতৃমাতৃহীন। নারী ধর্ষণসহ বিভিন্ন নির্যাতনের শিকার হয় এক লাখ পঁচাত্তর হাজার চার শ' পঞ্চাশ জন। কয়েকজন প্রত্যক্ষদর্শী বিবরণ এখানে তুলে ধরা হলঃ

www.pathagar.com

১. অ্যাডভোকেট এমএ আনসারী (৫২) বলেন, তেইশে মার্চ যশোর ক্যান্টনমেন্ট থেকে পাকি আর্মি ঝিনাইদহের ওপর দিয়ে কুষ্টিয়া যায়। পঁচিশে মার্চ বিদেশী রেডিয়োর মাধ্যমে আমরা ঢাকা আক্রমণের সংবাদ পাই। পরের দিন মেজর জিয়ার ভাষণ শুনে আমরা বুঝতে পারি যে, যুদ্ধ শুরু হয়ে গেছে। তখনই বুঝতে পারলাম, আমাদেরকে সত্যিই যুদ্ধের জন্য প্রস্তুতি নিতে হবে। এ কারণে এপ্রিলের শুরু থেকে আমরা ক্যাডেট কলেজের প্রফেসর, পুলিশ অফিসার ও আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে আবার প্রশিক্ষণ নিতে আরম্ভ করলাম। তেইশে মার্চে যে সমস্ত পাকি আর্মি কুষ্টিয়া গিয়েছিল, তাদের ফিরে আসার সময় সাধারণ মানুষ বাধার সৃষ্টি করে। বাধা পেয়ে পাকি আর্মি কুষ্টিয়া ও যশোর সড়কের পূর্ব পশ্চিমে দু'গ্রুপে বিভক্ত হয়ে যশোর যাওয়ার চেষ্টা চালায়। তখন হরিণাকুণ্ডু, শুতলিয়া গ্রাম ও অন্যান্য স্থানে বাঙালিদের দ্বারা বাধাপ্রাপ্ত হলে তুমুল সংঘর্ষ বাঁধে। এতে অনেক পাকি আর্মি ও বাঙালি মারা যায়। লাঠি, ঢাল, সড়কি, রাম দা ও দু'একটি আগ্নেয়াস্ত্র দিয়ে এদিন বাঙালিরা তাদেরকে প্রতিহত করার চেষ্টা চালায়।

এরপর থেকে পাকি আর্মি কয়েকবার ঝিনাইদহে প্রবেশের চেষ্টা করে। ষোলোই এপ্রিল তারা পাকাপোক্তভাবে ঝিনাইদহে প্রবেশ করে। প্রথম দিন তারা বারোবাজার পর্যন্ত আসে। এরপর একটু একটু করে এগুতে থাকে। কারণ বাঙালিরা রাস্তায় বড় বড় গাছের গুঁড়ি ফেলে রেখেছিল। এইসব বাধা অতিক্রম করে পাকি আর্মির ঝিনাইদহে প্রবেশ করতে অনেক অসুবিধা হয়। তারা তিন বার চেষ্টার পর ঝিনাইদহে প্রবেশ করতে সক্ষম হয়। প্রত্যেক বারই ঝিনাইদহের পার্শ্ববর্তী গ্রামগুলোতে ব্যাপক হত্যাকাণ্ড চালায়। এই সময়ে তারা কালিগঞ্জের এমপি ইকবালের ছেলে আলেকজান্ডারকে হত্যা করে। প্রায় দু'শ' নিরীহ বাঙালিকে তারা এই তিন দিনে হত্যা করে। ষোলই এপ্রিল ঝিনাইদহে আসার পথে পাকি আর্মি দুপুরের মধ্যেই চিত্রা নদীর তীর এলাকা বিশখালীতে পৌঁছে যায়। কিন্তু বাঙালিরা বিশখালীর ব্রিজ আগেই ভেঙে ফেলেছিল। তখনও এ এলাকায় মুক্তি বাহিনী গঠিত হয়নি। স্থানীয় প্রতিরোধ বাহিনী গঠিত হয়েছিল কেবল। এই প্রতিরোধ বাহিনীর সাথে পাকি আর্মির ব্রিজে এক ভয়াবহ যুদ্ধ হয়। এই যুদ্ধে আমাদের গোলাম মোস্তফা, মাহমুদ, ইসলাম, দুখি ও নাজির হোসেনসহ পনের বিশ জন বাঙালি শহীদ হন।

নারী নির্যাতনের অনেক ঘটনা এখন চাপা পড়ে গেছে। স্বাধীনতার পর আমি পনের বিশ জন নির্যাতিতা নারীর খোঁজ পেয়েছিলাম। এর মধ্যে পল্টন নামে এক ব্যক্তি নির্যাতিতা হওয়ার কারণে তার স্ত্রীকে গ্রহণ করেনি। এ ছাড়া বাদশার মাসহ অনেক নির্যাতিত নারীকেই আমি চিনি। কিন্তু এখন তাদের নাম বলা যাবে না। ঝিনাইদহে অনেকগুলো গণকবর রয়েছে। তার মধ্যে ক্যাডেট কলেজের বাউন্ডারির মধ্যে সবচেয়ে বড় গণকবরটি অবস্থিত।

www.pathagar.com

২. মোঃ রায়হান উদ্দীন বলেন, এখানে সাত জন মিলিশিয়া ছিল। এদের লিডার ছিল মেজর জুবলী। সারেন্ডারের আগে জুবলী এখান থেকে পালিয়ে যশোরে চলে যায়। মেজর জুবলী এখানে বহু নারীর ওপর পাশবিক নির্যাতন চালায় ও লুটপাট করে। আমি এখানকার প্রায় বিশ জন মহিলার পরিচয় জানি, যারা মেজর জুবলী ও তার সহযোগীদের দ্বারা ধর্ষিত হন। বয়রায় একজন নির্যাতিত মহিলা আছে যার নাম রিজিয়া। এ ছাড়াও অনেকে আছেন। এখানে মেজর জুবলীর সাথে লে. আতাউল্লা নামে একজন পাকি আর্মি ছিল। সেও নানা অপকর্মে আতাউল্লার সহযোগী হিসাবে কাজ করে।

আমার জানা মতে, শৈলকূপা ও কামান্নায় দু'টি গণকবর আছে। কামান্নার গণকবরে সাতাশ জন মুক্তিযোদ্ধা শায়িত আছেন। আদাইপুর ও শৈলকূপা ব্রিজের কাছে একটি করে গণকবর রয়েছে। স্বাধীনতা যুদ্ধে শৈলকূপার গ্রামগুলোতে প্রায় এক হাজার মানুষকে হত্যা করা হয়েছে। এখানকার মনোরঞ্জন বাবু ও তার স্ত্রীকে বস্তায় ভরে নদীতে ফেলে দিয়ে হত্যা করে পাকিরা। শৈলকূপায় নারী নির্যাতনের অনেক বীভৎস ঘটনা ঘটেছে।

৩. সিকদার মোশারফ হোসেন (সোনা সিকদার) বলেন, এপ্রিলের ছয় তারিখে পাকি বাহিনী প্রথম শৈলকূপায় আসে। এর পূর্বে শৈলকূপা আমাদের নিয়ন্ত্রণে ছিল। আওয়ামী লীগসহ গ্রামের সব লোকজন মিলে আমরা পাকি বাহিনীকে প্রতিরোধের চেষ্টা করেছিলাম। শৈলকূপায় ঢোকার পর পাকি বাহিনী থানায় এসে আশ্রয় নেয়। হাসপাতালটাকেও তারা নিয়ন্ত্রণে নিয়ে নেয়। তারপর তারা পিস কমিটি গঠন করে। পিস কমিটির চেয়ারম্যান ছিল তোবারক হোসেন মোল্লা, ভাইস চেয়ারম্যান হাবিবুর রহমান জোয়ার্দ্দার ও সেক্রেটারি ছিল মজনু। রাজাকার বাহিনী গঠন করার পর কমান্ডার হয় নওশের আলী, আর ডেপুটি কমান্ডার হয় নজরুল ইসলাম জোয়ার্দ্দার।

চৌদ্দই ডিসেম্বর শৈলকূপা থানা ঘেরাও করার পর সেখানে রাজাকার, পিস কমিটির সদস্যসহ চৌদ্দ জন পাকি আর্মি আমাদের হাতে ধরা পড়ে। পরের দিন ভারতীয় আর্মি দু'তিন জন রাজাকারসহ পাকি আর্মিদেরকে আমাদের কাছ থেকে নিয়ে যায়। ওই চৌদ্দ জন পাকি আর্মি এবং তাদের সহযোগীরা শৈলকূপা থানায় অনেক হত্যাকাণ্ড ঘটায়। তারা রাজাকারদের সাথে নিয়ে বিভিন্ন এলাকায় লুটপাট ও ধ্বংসযজ্ঞ চালায়। বহু ঘরবাড়ি পুড়িয়ে দেয়। এক জনকে বস্তায় ভরে নদীতে ফেলেও দেয়। একাত্তরে সংঘটিত এখানকার নারী নির্যাতনের সকল ঘটনাই প্রায় চেপে রাখা হয়েছে। এসব ঘটনা কেউ কাউকে জানাতে চায়নি। ফলে নারী নির্যাতনের ঘটনা তেমন প্রকাশ হয়নি।

লাঙ্গলবাঁধ এলাকায় কৃষক ও রাখাল শ্রেণীর চৌদ্দ জন লোককে পাকি বাহিনী এক সাথে হত্যা করে। তাদের সাথে একজন হিন্দু ছিল, যে খুব ভাল মিষ্টি বানাতে পারত। স্থানীয় লোকজন তাকে ছেড়ে দেওয়ার অনুরোধ করলে আর্মি তাকে ছেড়ে

www.pathagar.com

দেয়। চিত্তর নানা বলে এক জন লোক বাজারের মধ্য থেকে ধরে নিয়ে যাওয়ার সময় নদীতে লাফ দিয়ে পড়ে বেঁচে যায়। যেদিন চৌদ্দ জনকে হত্যা করা হয়, সেদিন এই এলাকায় বহু নারী নির্যাতনের ঘটনা ঘটে। অনেক বাড়িঘর পুড়িয়ে দেওয়া হয়। লাঙ্গলবাঁধের কাছে এক মুক্তিযোদ্ধার মাকেও পাকি আর্মি ধর্ষণ করে।

৪. মোঃ গোলাম মোস্তাফা লোটন বলেন, একাত্তরে আমি ছাত্র ছিলাম। পাকি সেনারা যেখানে গাড়ি বহর নিয়ে প্রবেশ করতে সক্ষম হত সেখানেই গণহত্যা, ধর্ষণযজ্ঞ ও লুটপাট চালাত। হরিণাকুণ্ডে প্রায় তিন চার শ' সাধারণ লোক মারা যায়। তখন আমরা যুদ্ধক্ষেত্রে থাকলেও খবর পেয়েছিলাম যে অনেকের আত্মীয়স্বজন মারা গেছে, অনেকে নিখোঁজ হয়েছে। পরহাটি গ্রাম থেকে একদিন সাত জনকে ধরে এনে হত্যা করে পাকি বাহিনী। চাকলাপাড়া স্কুলের কুয়ার মধ্যে মানুষকে হত্যা করে ফেলে দিত তারা। বর্তমানে ওই কুয়োর ওপর বিল্ডিং হয়েছে।

নারী নির্যাতন প্রসঙ্গে তিনি বলেন যে, কলাবাগানের একটি মেয়েকে পাকি বাহিনী পাকিস্তানে ধরে নিয়ে যায়। গোলাম মোস্তফার পরিচিত তিন চারজন নারীও পাকি বাহিনীর পাশবিক লালসার শিকার হন। শৈলকূপা মুক্ত হলে সেখানকার বাঙ্কার থেকে রোকেয়া নামের এক নির্যাতিত মেয়েকে উদ্ধার করা হয়। তা ছাড়া পিটিআই, ক্যাডেট কলেজ, চাকলাপাড়া প্রভৃতি স্থানে পাকি বাহিনীর ঘাঁটি ছিল। যাওয়ার সময় সেসব জায়গা তারা পুড়িয়ে দেয়, যাতে নারী নির্যাতন ও গণহত্যার কোন চিহ্ন অবশিষ্ট, না থাকে।

৫. মোঃ এনায়েত উল্লাহ সোম বলেন, যেদিন প্রথম পাকি বাহিনী কাঞ্চননগর আসে সেদিন ছিল বুধবার। তারা পিয়ারাভিটা ব্রিজের কাছে ক্যাম্প স্থাপন করে। এই ক্যাম্পে বহু লোককে পাকি বাহিনী ধরে এনে হত্যা করে। দু'জন মহিলাকে ক্যাম্পে ধরে নিয়ে যেতেও দেখেছি আমরা। রাজাকার সায়েম মোল্লা পাকিদের নির্দেশে তার চাচাকে গুলি করে হত্যা করে। আমার পরিচিত মুজিবর নামের একজনকেও গুলি করে হত্যা করে সে। এ ছাড়া একদিন স্টেডিয়ামের কাছে দুটো লাশ পড়ে থাকতেও দেখেছি আমি।

ডাব পাড়ানোর জন্য একদিন পাকি আর্মি আমাকে বাড়ি থেকে ক্যাম্পে নিয়ে ধরে যায়। খান মোশাররফ নামে একজন পাকি আর্মি অফিসার আমাকে গাছে চড়ে ডাব পেড়ে দিতে বলে। তার গায়ে তিনটা 'তারা' চিহ্নিত ব্যাজ ছিল। ক্যাম্পে গাফ্‌ফার খান ও ইমরান খান নামে দু'জন হাবিলদার শ্রেণীর পাকি সৈন্যও ছিল। আমি গাছে চড়তে পারি না বললে ওই অফিসার বলে যে 'গাছে উঠে ডাব পেড়ে না দিলে তোমাকে গুলি করা হবে।' উপায় না দেখে আমি ডাব পেড়ে তাদেরকে খাওয়াই। এরপর পাকি সৈন্যরা আমাকে বলে যে, আমি গ্রাম ছেড়ে না পালালে তাদের কাজ করে দিতে হবে। একথা শুনে আমি বাড়ি থেকে চার পাঁচ মাইল দূরে বিজয়নগরে চলে যাই। পরে সেখান থেকে আড়াপাড়ায় যাই। দেশ স্বাধীন হওয়ায় পর সেখান থেকে গ্রামে ফিরে আসি।

www.pathagar.com

বশির উদ্দীন আহমেদ বলেন, ছয়ই এপ্রিল পাকি বাহিনী প্রথম এই এলাকায় আসে এবং বহু লোককে হত্যা করে। পাড়াগঞ্জ এলাকায় আগুন লাগিয়ে দেয়। তখন ইপিআর, আনসার, ভিডিপি, পুলিশ ও অন্যের নিয়ে প্রতিরোধ বাহিনী গঠন করা হয়। ষোলোই এপ্রিল আমরা বিষয়খালীতে প্রতিরোধের দায়িত্বে ছিলাম। সেদিন ছিল শুক্রবার। পাকি বাহিনী কখন যে বিষয়খালী এসে আমাদেরকে ঘেরাও করে ফেলেছিল, সেটা আমরা বুঝতে পারিনি। আমাদের পেছনে ইপিআর সদস্যরা আছে বলে মনে করেছিলাম। কিন্তু সেটা সঠিক ছিল না। দু'জন সিপাই ও এক জন হাবিলদার আমাদের আট জনকে ধরে নিয়ে কোর্টের বারান্দায় আটকে রাখে। সেখানে আরও তিন জন বন্দী ছিলেন। সেখানকার একটি ঘরে লুট করা ঘড়ি, চশমা, টাকা পয়সা ও অন্যান্য মূল্যবান জিনিস বোঝাই ছিল। আমার মাথা থেকে পা পর্যন্ত তল্লাশি চালিয়ে পাকি বাহিনী ত্রিশটি টাকা ও একটি ইয়ুথ কলম পায়। এরপর তারা আমাদেরকে তাদের ঘাঁটিতে নিয়ে যায়। ঘাঁটির ইনচার্জ আমরা ইপিআর বাহিনীর সদস্য কি না তা জিজ্ঞাসা করে। এরপর আমাদের আট জনের হাত পিঠমোড়া দিয়ে বেঁধে প্রাক্তন চেয়ারম্যান বিল্লালের বাসার পেছনে ইটের ঢিবি সংলগ্ন ফাঁকা জায়গায় নিয়ে যায়। প্রথমেই তারা আমাদের শুয়ে পড়ার আদেশ দেয়। সবাই শুয়ে পড়লে চোখ বন্ধ করতে বলে। চোখ বন্ধ করার কিছুক্ষণ পরই প্রত্যেককে দুটো করে গুলি করা হয়। আমার হাতে ও পেটে গুলি লাগে। পেটে যে গুলিটা লাগে, তা একপাশ দিয়ে ঢুকে অন্যপাশ দিয়ে বেরিয়ে যায়। আমার পাশের পাঁচ ছয় জনকে হাত-পা দাপাতে দাপাতে নিস্তেজ হয়ে পড়তে দেখলাম। কিন্তু আমি একবারের জন্যও জ্ঞান হারাইনি। মৃতের মত পড়ে থাকলাম। এরপর পাকি সৈন্যরা আমাদের হাতের বাঁধন খুলে দিয়ে চলে গেল।

প্রায় এক ঘন্টা পর তিন জন পাকি সেনা ফিরে এল। একজনের হাতে অস্ত্র, বাকি দু'জনের হাতে মাটি খোঁড়ার খুন্তি। এরপর দু'জন মিলে একটা বড় গর্ত খুঁড়ল। একজন সৈন্য পরীক্ষা করে বলে 'আভি দো আদমী জিন্দা হ্যায়।' অন্য দু'জন পরীক্ষা করে বলল 'কিছুক্ষণ পরই মারা যাবে।' এরপর তারা লাশের চুল ও পা ধরে গর্তে রাখতে থাকে। প্রথমে দুটো লাশ পাশাপাশি লম্বা করে খোঁড়া গর্তে রাখে। তার ওপরে আরও দু'জন রাখে এভাবে একটার পর একটা লাশ রাখতে থাকে। সবার ওপরে আমাকে ও অন্য যে ব্যক্তি বেঁচে ছিলেন, তাঁকে রাখে। এরপর লুট করা একটি সাদা চাদর দিয়ে ঢেকে আমাদের মাটিচাপা দিয়ে চলে যায় ওরা। চলে যাওয়ার পর মাটি ও চাদর সরিয়ে আমরা দু'জন বের হয়ে আসি। মাটিচাপা দেওয়ার ফলে আমাদের ক্ষতস্থানে মাটি লেগে রক্ত বন্ধ হয়ে যায়। পাশে তাদের ঘাঁটি থাকায় সেখান থেকে পালিয়ে আসাও কঠিন ছিল। তিন চার ঘণ্টা অপেক্ষা করার পর সুযোগ বুঝে সন্ধ্যা সাতটার দিকে খুব সাবধানে ওখান থেকে সরে আসি। তৃষ্ণায় আমাদের অবস্থা শোচনীয় হয়ে পড়ে। কালিকাপুর পৌঁছে দেখি, দু'মাইলের মধ্যে কোন মানুষজন নেই; পানিও নেই। টিউবওয়েলগুলো পর্যন্ত ভেঙে ফেলা হয়েছে। এরপর একটা পুকুরে নেমে পানি খেলাম। কিন্তু পুকুর থেকে আর পাড়ে উঠতে পারছিলাম না। সারারাত পুকুরের মধ্যেই থাকলাম। আমার সাথে যিনি ছিলেন, তিনি এসময় অন্যদিকে চলে যান। ফজরের নামাজের সময় পুকুরের মালিক আমাকে দেখতে পেয়ে পার্শ্ববর্তী খালের ওপারে আশ্রয়ের ব্যবস্থা করেন। তারপর আমাদের গ্রামের

www.pathagar.com

চেয়ারম্যান শওকতকে খবর দেওয়া হয়। ডা. সিরাজুল ইসলাম আমার চিকিৎসা করেন। এরপর আমি ধীরে ধীরে সুস্থ হয়ে উঠি। বশির উদ্দীন পাকি আর্মির মধ্যে ক্যাপ্টেন আতাউল্লাহ শাহ্‌র নাম মনে করতে পারেছেন। যুদ্ধের পর সে এখানেই ধরা পড়ে।

৬. হাফিজুর রহমান ঝিনাইদহে পাকি বাহিনীর নারী নির্যাতন সম্পর্কে জানান, আমি নিজে বহু মহিলাকে ক্যাম্পে ধরে নিয়ে যেতে দেখেছি। এদের কেউ কেউ পরবর্তীতে ফিরে আসে। অনেককে আবার নয় মাস ক্যাম্পে বন্দী করে রেখে নির্যাতন করা হয়। কাঞ্চননগর এলাকা থেকে প্রায় দশজন নারীকে ধরে নিয়ে যায় বর্বররা। নির্যাতিতা নারীদের অনেকের পরিচয় জানলেও তাদের সম্মানের কথা ভেবে আমি তাদের নাম বলতে চাচ্ছি না। আমি বানু নামে একজনের কথা আপনাদের বলছি। কারণ তার ঘটনা এলাকার সবাই জানে। পরবর্তীতে এসব হতভাগ্য নারীদের অনেকেই মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে ফেলেন। অনেকের স্বামী তাদের স্ত্রীদের মেনে নেয়নি এবং অনেকে আত্মহত্যা করেন।

ঝিনাইদহে পাঁচটি গণকবর আছে। এছাড়া শৈলকূপার কামান্না, বিষয়খালী এবং ঝিনাইদহ ক্যাডেট কলেজের আশেপাশেও গণকবর রয়েছে। দীর্ঘ ন'মাস রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের পর ছয়ই ডিসেম্বর সর্বপ্রথম ঝিনাইদহ মুক্ত হয় এবং ঝিনাইদহে প্রথম বাংলাদেশ সিভিল প্রশাসন প্রতিষ্ঠিত হয়।

তৎকালীন ঝিনাইদহ মহকুমায় মেজর জুবলী, লে. আতাউল্লা, খান মোশাররফ, মেজর রাজ্জাক, মেজর শাকিল খান, ক্যাপ্টেন আতাউল্লাহ শাহ্‌, হাবিলদার গফ্‌ফার খান, হাবিলদার ইমরান খান, রাশেদ খান, মালেক প্রমুখ পাকিস্তানি আর্মি ও তাদের সহযোগীরা উপরিউক্ত যুদ্ধাপরাধসমূহ সংঘটিত করে। এ সব আর্মির সবাই যুদ্ধাপরাধের দায়ে দণ্ডিত হওয়ার যোগ্য।

আসামীঃ ক্যাপ্টেন আজমল, মেজর রিয়াজ খান, মেজর রিয়াজ, সিপাহী ইউসুফ খান, আব্দুস সালাম খান, মোসলেম খান, হাবিলদার ওহিদ মিয়া, নায়েব লতিফ খান, নাসির খান, ইউনুস।

অপরাধের ধরনঃ গণহত্যা, জাতিগত নিধন, ধর্ষণ, লুটপাট, অগ্নিসংযোগ।

সাক্ষী ঃ মুক্তিযোদ্ধা খান আলী, মোঃ সিরাজুল ইসলাম, আব্দুল মজিদ খান, মোঃ সিরাজুল ইসলাম।

ঘটনাকালঃ সতেরোই এপ্রিল থেকে সাতই ডিসেম্বর একাত্তর পর্যন্ত।

ঘটনাস্থল ঃ মাগুরা জেলা।

সূত্রঃ যুদ্ধাপরাধ গণহত্যা ও বিচারের অন্বেষণ এবং WCFFC গবেষণা।

একাত্তরে ক্যাপ্টেন আজমল, মেজর রিয়াজ খান, সিপাহী ইউসুফ খান, আব্দুস সালাম খান, মোসলেম খান, হাবিলদার ওহিদ মিয়া, নায়েব লতিফ খান, নাসির খান, ইউনুস প্রমুখ পাকি আর্মি তৎকালীন মাগুরা মহকুমাকে, ধ্বংসের জনপদে পরিণত করেছিল।

www.pathagar.com

সে সময় মাগুরার নবগঙ্গা নদী বাঙালির রক্তে ভরে গিয়েছিল। ঢাকা-মাগুরা সড়কের পাকা সেতুটি ছিল প্রধান বধ্যভূমি। বিভিন্ন গ্রাম থেকে যুবকদের ধরে এনে গলায় দড়ি বেঁধে নদীর ওপর ঝুলিয়ে গুলি করা হত। তারপর নিহতদের লাশ ফেলে দেওয়া হত নদীতে। মাগুরা ইসলামী ছাত্র সংঘের রিজু ও কবিরকে মানুষ হত্যার জন্য পাকি বাহিনী যশোর সামরিক ছাউনিতে প্রশিক্ষণ দিয়ে নেয়।

একাত্তরের এপ্রিল মাসে পাকি সেনারা মাগুরার দখল নেয়। পাগলবাড়িয়া গ্রামের লালুকে 'জয় বাংলা' বলার দায়ে গুলি করে হত্যা করা হয়। শহরের নতুন বাজারে গিয়ে পাটের গুদামে আগুন লাগিয়ে দেয় তারা এবং ব্যবসায়ী জগবন্ধু দত্তকে হত্যা করে তাঁর বাড়িটাকে জেলখানা বানায়। পাকি সেনারা পিটিআই ভবনে বাঙালিদের অত্যাচার ও হত্যা করে পেছনের মাঠে পুঁতে রাখত। এই অফিসেই মেয়েদেরকে ওপর ধর্ষণ ও নির্যাতন করত। এঁদেরকেও হত্যার পর সেখানকার মাঠে গণকবর দেওয়া হত। কয়েকজন প্রত্যক্ষদর্শীর জবানবন্দী নিচে উল্লেখ করা হল।

মুক্তিযোদ্ধা খান আলী রেজা বলেন, সতেরোই এপ্রিল পাকি বাহিনী প্রথম মাগুরায় আসে। ওয়াপদা কলোনি, পিটিআই ভবন এবং উপজেলা পরিষদে তারা ক্যাম্প স্থাপন করে। সেখানকার দত্ত বাড়িতেও একটা নির্যাতন সেল ছিল। পাকি হানাদার বাহিনী এখানে এসে প্রথমে পিস কমিটি গঠন করে। পিস কমিটির সদস্যরাই রাজাকার বাহিনী গঠন করে সমগ্র মাগুরা জেলা নিয়ন্ত্রণ করা শুরু করে। রাজাকাররা কাটাখালি, নতুন বাজারের ব্রিজ, এলাকা ও রাস্তার মোড়ে মোড়ে পাহারা দিত। কাউকে স্বাধীনতার পক্ষ শক্তির লোক বলে সন্দেহ হলে ক্যাম্পে ধরে এনে নির্যাতন করত। অনেককে তারা কুমার নদীর তীরে নিয়েও গুলি করে হত্যা করে। নবগঙ্গার পাড়েও অগুনতি নরনারীকে হত্যা করা হয়। পিটিআই ভবনের ভেতরের পুরো অশংটাই ছিল গণকবর। প্রত্যক্ষ সাক্ষীদের অনেকেই বলেছেন যে, এখানে প্রায় চার পাঁচ হাজার নারী পুরুষকে নির্যাতন শেষে হত্যা করে মাটিচাপা দেওয়া হয়েছে।

একদিন তাদের কবল থেকে পালানোর চেষ্টা করে আমি ধরা পড়ে যাই। সে দিনের নির্যাতনে এক পর্যায়ে আমার মুখ দিয়ে ফেনা উঠে গেলে আমি অজ্ঞানের মতো পড়েছিলাম। পাকি বাহিনী সে অবস্থায় আমাকে মাঠে ফেলে রেখে বিল্ডিংয়ের ভেতর ঢুকলে আমি তারকাঁটার বেড়া পার হয়ে পালানোর চেষ্টা করি। এ সময় হানাদাররা দেখতে পেয়ে চিৎকার করে বলে ওঠে, 'আসামী ভাগ গেয়া'। আমার লুঙ্গি কাঁটাতারে লেগে ছিড়ে যায়। আমি দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে ছুটতে থাকি। পাকি বাহিনীও আমার পেছনে পেছনে ছোটে। ছুটতে ছুটতে নদীতে এসে একটি নৌকায় উঠে নদী পার হওয়ার চেষ্টা করি। নৌকা মাঝ নদীতে পৌছালে পাকি হানাদাররা নৌকা ঘাটে ভেড়াতে বলে। মাঝি অসহায় হয়ে নৌকা ফেরাতেই আমি সব পোশাক খুলে শুধু জাঙ্গিয়া পরে নদীতে ঝাঁপ দিই। সাঁতার কাটার মতো শক্তিও আমার শরীরে তখন ছিল না। অন্যদিকে এমনভাবে গুলিবৃষ্টি শুরু হয় যে, মাথাও উঁচু করতে পারছিলাম না। উপায়ন্তর না দেখে হাত উঠিয়ে সারেণ্ডার করি। এরপর পাকি সৈন্যরা আটটা

www.pathagar.com

নৌকা নিয়ে এসে আমাকে ধরে কাম্পে নিয়ে যায়। দুপুর বারোটার দিকে পালানোর চেষ্টা করে বিকাল সাড়ে চারটায় আমি আবার ধরা পড়ে যাই। সেদিন সন্ধ্যা পর্যন্ত আমার ওপর অমানবিক নির্যাতন চালানো হয়। রাইফেলের বাঁট দিয়ে পায়ে প্রচণ্ড আঘাত করে তারা। সন্ধ্যার পর তারা আমাকে ডাকবাংলোর হলরুমের টয়লেটে ঢুকিয়ে দেয়। টয়লেট এত নোংরা ছিল যে, দম বন্ধ হয়ে আসছিল। মারের আঘাতে আমার শরীর ফুলে যায়। রাত দশটার পর আরও কিছু বন্দীকে সেখানে ঢোকানো হল। যেখানে মোটামুটি পাঁচ ছয় জনের জায়গা হয়, সেখানে বিশ জনকে ঠেসে ঢুকিয়ে দিল তারা। ওই বিশ জনের মধ্যে সনৎকুমার অধিকারী, প্রমোদকুমার মণ্ডলসহ অনেকেই আমার পরিচিত ছিলেন। এরাও মুক্তিযোদ্ধা ছিলেন। আমি সবার ঘাড়ের ওপর মাথা রেখে দরজায় ছোট্ট ফাঁক দিয়ে কোনমতে নিঃশ্বাস নিলাম। পানির পিপাসায় তখন কাতর হয়ে পড়ি আমি। চিৎকার করে পাকিদের এক সহযোগীকে ডেকে পানি খেতে চাইলে সে দরজায় এমন জোরে লাথি মারে যে, আমার নাকে লেগে আবার রক্ত ঝরা শুরু হয়। এ রকম অবস্থায় সারারাত কেটে যায়। পরদিন আমার ছোট ভাইয়ের ক্লাসমেট রাজাকার শহীদুল ইসলামের সাহায্যে টয়লেট থেকে বের হয়ে হলরুমে থাকার জায়গা পেলাম। হলরুমটি ছিল রাজাকারদের কার্যালয়। অতিরিক্ত আঘাতের ফলে আমার সারা শরীর অবশ হয়ে গিয়েছিল। পরে পেটালে কোন ব্যথা আর অনুভব করতাম না। শুধু থপ থপ শব্দ হত, আর শরীর ফেটে রক্ত পড়ত। এসময় ক্যাপ্টেন আজমল মাগুরার দায়িত্বে নিয়োজিত ছিল। এছাড়াও হাবিলদার শের শাহ নামে এক পাকি আর্মির নাম মনে পড়ে। আমার এক মামা ক্যাপ্টেন আজমলের কাছে সুপারিশ করার পর আমার ওপর নির্যাতন বন্ধ হয়।

ছয়ই ডিসেম্বর মাগুরায় মিত্রবাহিনী বোম্বিং শুরু করে। সেদিনই রাতে পার্শ্ববর্তী ক্যাম্পের সব বন্দীকে জেলা পরিষদের ডাকবাংলোয় এনে জড়ো করা হয়। যশোর, ঝিনাইদহ, কুষ্টিয়া, চুয়াডাঙ্গা, মেহেরপুর থেকে বন্দীদের ধরে এনে আমাদের সাথেই আটকে রাখে। সাতই ডিসেম্বর আমার বাবা হলরুমের দরজায় এসে ডাকলে কয়েকজন আমাকে ধরে দরজার কাছে নিয়ে যান। এসময় বাবা আমাকে বললেন যে, বোম্বিং-এর ফলে পাকি আর্মি পালিয়ে গেছে। শুধু নোমানী ময়দানে এক গাড়ি আর্মি আছে, তারা চলে গেলেই তোমরা মুক্তি পাবে। আশেপাশে অস্ত্রধারী রাজাকাররা থাকলেও তারা ভীত হয়ে পড়ে। এসময় আমার বাবা এক রাজাকারের কাছ থেকে অস্ত্র কেড়ে নিয়ে হলরুমের দরজা খুলে দেন। তখন বন্দীরা দল বেঁধে ছুটে বেরুতে শুরু করলে আমি মেঝেতে পড়ে যাই। আমার শরীরের ওপর দিয়েই বন্দীরা ছুটে বেরুতে থাকে। পরে বাবা আমাকে ঘাড়ে উঠিয়ে বাড়িতে নিয়ে আসেন। কিন্তু আমাদের ওপর আবার আক্রমণ হতে পারে ভেবে আমরা ভয়ে মাগুরা শহর ছেড়ে গ্রামে চলে যাই।

নারী নির্যাতন প্রসঙ্গে তিনি জুন-জুলাইয়ের একটি মর্মান্তিক ঘটনার উল্লেখ করেন। হেলেন নামে ছাত্র ইউনিয়নের একজন তুখোড় নেত্রীকে মোহাম্মদপুর থানা এলাকা

www.pathagar.com

থেকে ধরে পিটিআই ক্যাম্পে নিয়ে আর্মি তার ওপর অমানুষিক নির্যাতন চালায়। পাকি বাহিনী অত্যন্ত নৃশংসভাবে জীবন্ত অবস্থায় জিপের পেছনে বেঁধে তাকে সারা শহর ঘোরায়। তার শরীরের মাংস রাস্তায় ইটের সাথে লেগে গিয়েছিল। তিন/চার ঘন্টা এভাবে ঘোরানোর পর সকাল আটটার দিকে তাকে গুলি করে হত্যা করা হয়। বহু মানুষ সেদিন এই ভয়ঙ্কর দৃশ্য প্রত্যক্ষ করেন।

মোঃ সিরাজুল ইসলাম (সিরাজ) একাত্তরের স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে বলেন, একাত্তরে আমি মাগুরা কলেজের দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্র ছিলাম। পরবর্তীতে আমাদের গ্রামে পাকি আর্মি এসে ইউনিয়ন বোর্ডের অফিসে ক্যাম্প স্থাপন করে। তারা গ্রামের অসংখ্য বাড়িঘর পুড়িয়ে দেয়। কামান্নায় সাতাশ জন নিরীহ লোককে পাকিরা হত্যা করে। এরমধ্যে সাত আটজন ছিলেন আমাদের হাজিপুর গ্রামের। লতিফ ও আউয়াল নামে দু'জন রাজাকার পাকি সেনাদেরকে এসব কাজে সাহায্য করে। এসব রাজাকাররা আমাদের শিক্ষক মোশারফ হোসেন ও নান্টু মিয়াকে অমানবিকভাবে পিটিয়ে নির্যাতন করে।

নারী নির্যাতন প্রসঙ্গে তিনি বলেন, পাকি আর্মি গ্রামে ক্যাম্প স্থাপন করার পর গ্রাম পুরুষশূন্য হয়ে পড়ে। অনেক মা বোনকেই তখন আর্মি ও রাজাকারদের নির্যাতনের শিকার হতে হয়। আমাদের আত্মীয়-স্বজনের মধ্যেই অনেক নারী নির্যাতিত হয়েছেন, তাদের নাম এখন বলা যাবে না। আমি নির্দিষ্ট পাঁচ সাতটি পরিবারের বিশজনের মতো নারীকে চিনি, যারা পাকি আর্মি ও রাজাকার কর্তৃক নির্যাতিত হয়েছিল।

আব্দুল মজিদ খান সে সময়ের হত্যা ও নির্যাতনের বর্ণনা দিতে গিয়ে বলেন, যেদিন মাগুরায় পাকি আর্মি আসে, তার পরেরদিন আমাদের কয়েকজনকে পাড়া থেকে ধরে নিয়ে যায়। আমরা সংখ্যায় ছিলাম ছাব্বিশ জন। আমাদেরকে প্রথমে পিটি আইতে নিয়ে যাওয়া হয়। টেলিফোনের তার দিয়ে সবার হাত, পা ও গলা বেঁধে রোলার দিয়ে সারারাত মারধর করা হয়। চারজন পালাক্রমে খাটের স্ট্যান্ড ও বুটের লাথি দিয়ে আমাদেরকে আঘাত করে। বুট দিয়ে লাথি মারলে আমার ঠোঁট ফেটে যায়। অনেকের নাক মুখ ও মলদ্বার দিয়ে রক্ত বের হতে থাকে। পরের দিন সেখান থেকে আমাদেরকে মাগুরা জেলখানায় নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানেও আমাদের ওপরে চলে অমানুষিক নির্যাতন। আমি কী করি জানতে চাইলে বলি যে, আমি কৃষিকাজ করি। তখন আমাদের তিনজনকে তারা চুয়ান্ন ধারায় জামিন দেয়। বাকিদের মার্শাল ল' এ্যাক্টের মধ্যে ফেলে দেওয়া হয়।

জামিন পেয়ে আমি ভারতের রানাঘাটে চলে যাই। আমার আগেই মুজাহিদ ট্রেনিং নেওয়া ছিল। ভারতের সাথে যুদ্ধের জন্য পাকি আর্মি মাগুরায় অনেককেই এই ট্রেনিং দিয়েছিল। রানাঘাটের নেতারা ট্রেনিং-এর কথা জানতে পেরে বলল, তোমার তো ট্রেনিং আছে, তুমি যুদ্ধ করতে পারবে। এরপর আমি দেশে ফিরে আসি। মাগুরায় তখন পাকি বাহিনী ও তার দোসরদের নৃশংস হত্যাকাণ্ড ও নির্যাতন চলছে। আমার

www.pathagar.com

সামনেই রাজাকারদের সহায়তায় পাকি সেনারা জগদত্তকে হত্যা করে তারই বাড়ির গেটের ভিতরের একটি গর্তে মাটিচাপা দেয়। তার বাড়িতে পাঁচটি সিন্দুক ছিল। সেগুলোও লুটপাট করে নিয়ে যায়। এরপর তারা একদিন শ্মশানঘাটে ষাটজনকে লাইনে দাঁড় করিয়ে গুলি করে হত্যা করে। সেদিন সেখান থেকে গুলিবিদ্ধ অবস্থায় ছয়জন বেঁচে যান। তাদের হাসপাতালে ভর্তি করা হলে পাকি বাহিনীর নির্দেশে কুখ্যাত রাজাকার কবির ও রিজু হাসপাতালে ঢুকে তাদেরকে গুলি করে হত্যা করে। আর পিটিআইতে কত লোককে হত্যা করেছে, তার কোন হিসাব নেই। তবে অনুমান করা যায়, চার পাঁচ হাজার নিরীহ বাঙালিকে তারা সেখানে হত্যা করেছে। আমার বাড়ি পিটিআই দেওয়াল সংলগ্ন হওয়ায় হত্যাকাণ্ডগুলো দেখতে আমার কোন অসুবিধা হয়নি। লাশগুলো বেশিরভাগ সেখানেই পুঁতে রাখা হয়। বাকিগুলো শ্মশানে পুড়েছে, কিছু পানিতে ভেসে গেছে। আমার চাচাতো ভাই কাদের খানকেও তাদের সাথে হত্যা করা হয়েছিল। পিটিআইতে কমপক্ষে হাজার খানেক মহিলাকে তারা হত্যা করে। এসব মহিলাদের দূর দূরান্ত থেকে ট্রাকে করে নিয়ে আসা হত। পূর্ব থেকে বড় বড় গর্ত খুঁড়ে রাখা হত। হত্যার পর তাদের সেই গর্তে ফেলে দেওয়া হত।

মেজর রিয়াজ খান ছিল এখানকার কোম্পানির হেড। তার সাথে কিছু সেপাই ছিল, যাদের নাম আমি জানি না। মেজরের নাম মনে থাকার কারণ যেদিন আমাদের বন্দী করা হয়, সেদিনই মেজর রিয়াজ রাতে এসে আমাদেরকে ঘুমাতে নিষেধ করে। রাতে তারা আমাদের মারধর করে। নির্যাতনের কারণে আমি আজও অসুস্থ, এই ঘটনার পর আমার অপারেশন করতে হয়েছিল।

নারী নির্যাতন প্রসঙ্গে তিনি বলেন, নারী নির্যাতনের, যেসব ঘটনা এখানে ঘটেছে, তা ভাষায় প্রকাশ করা কষ্টকর। হেলেন নামে এক মেয়েকে পাকি আর্মি তাদের গাড়ির পেছনে বেঁধে সমগ্র মাগুরা শহর ঘুরিয়ে হত্যা করে। এই নির্যাতনের ঘটনা আমি নিজ চোখে দেখেছি। দিনের বেলায় সেটি সংঘটিত হওয়ায় অনেকেই প্রত্যক্ষ করেছে। আর যে হত্যাকাণ্ডগুলো রাতের বেলায় লোকচক্ষুর অন্তরালে হয়েছে, তার কোন সাক্ষী নেই।

মাগুরার পার্শ্ববর্তী অঞ্চল থেকে মহিলাদের ধরে এনে পিটিআই, সারের গোডাউন, মাগুরা কলেজ ও ডাকবাংলোয় রেখে পাকি আর্মি ধর্ষণ করত। এ রকম অসংখ্য মেয়েকে পাকি বাহিনী এখানে হত্যা করেছে। ভায়না গ্রামে পাকি আর্মি যে ঘাঁটি ছিল, সেখানেও বহু নারীকে নির্যাতন করা হয়। মাগুরায় যেসব মহিলাদের নির্যাতন করা হয়, তাদের দুই একজন ছাড়া সবাইকে হত্যা করা হয়। যে দু'একজন আছেন তারা এখন মুখ খুলতে রাজি হন না।

মোঃ সবদার হোসেন বিশ্বাস বলেন, এপ্রিল মাসের মাঝামাঝি সময়ে পাকি আর্মি যশোর থেকে মাগুরায় আসে। বিকেল চারটার দিকে তারা মুকাম বাজার এলাকায় এসে অগ্নিসংযোগ করে। এরপর গ্রামের নিরীহ নারী পুরুষদের ওপর অত্যাচার শুরু করলে গ্রামের মেয়েরা নদীর ধারের উঁচু পাট ক্ষেতে গিয়ে লুকিয়ে পড়ে। পাকি

www.pathagar.com

আর্মির হাত থেকে রক্ষা পেতে ওই পাট ক্ষেতে প্রায় এক শ' জন মহিলা আশ্রয় নেয়। আমি তখন চিত্রা নদীর অন্যপারে ছিলাম। পাট ক্ষেত থেকে প্রায় এক শ' গজ দূরে। আমবাগানে লুকিয়ে থাকা অবস্থায় আমি দেখতে পেলাম, খান সেনারা আমার পরিচিত চম্পা নামে একটি মেয়েকে ধরে ফেলল। চম্পা ভয়ে তাদেরকে পাট ক্ষেতে লুকিয়ে থাকা অন্য মেয়েদের সন্ধান বলে দেয়। তখন পাকি আর্মি পাট ক্ষেতে ঢুকে মেয়েদের উপর গণধর্ষণ চালায়। সেদিন গ্রামের সেই অসহায় মেয়েদের ওপর যে পাশবিক অত্যাচার আমি দেখেছি, তা ভাষায় প্রকাশ করার মতো নয়। সেদিন পাকি আর্মির সাথে কোন রাজাকার ছিল না। আমার ধারণা, সেদিন তারা কমপক্ষে ত্রিশ জন নারীকে ধর্ষণ করেছিল। ধর্ষণের পরপরই তারা গাড়িতে করে অন্যস্থানে চলে যায়।

মোঃ সিরাজুল ইসলাম বলেন, ইপিআর এর সদস্য হিসেবে আর্মি তখন যাদবপুর, বেলতা, কাশিপুর, চৌগাছা বিভিন্ন এলাকায় ছিলাম। পঁচিশে মার্চ রাতে বিহারি পাঞ্জাবি ইপিআর কর্মকর্তা হাবিলদার ওহিদ মিয়া, নায়েব লতিফ খান, নাসির খান ও ইউনুস খান আমাদের অস্ত্র ও পোশাক কেড়ে নিয়ে তাড়িয়ে দেয়। আমি সেখান থেকে পরে কোটচাঁদপুরে চলে আসি। আমার সঙ্গে কালিগঞ্জের আরেকজন বাঙালি ছিলেন। তার নাম রেজাউল। কোটচাঁদপুর থেকে আমরা সংগঠিত হয়ে ঝিনাইদহের বিভিন্ন জায়গায় যুদ্ধ করি। কোটচাঁদপুরে একটি আনসার ক্যাম্পে তারা প্রায় চার/পাঁচ হাজার নিরীহ লোককে হত্যা করে। পাঞ্জাবি বাহিনী এই নৃশংস হত্যাকাণ্ড ঘটায়।

নারী নির্যাতন সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে তিনি দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলেন, নারী নির্যাতন সম্পর্কে আর কী বলব, আমার তিন মাসের নব বিবাহিতা স্ত্রী রোকেয়া বেগমও তাদের নির্যাতনের শিকার হন। যুদ্ধের মাঝামাঝি সময়ে শুনতে পাই তাকে পাকি আর্মি ধরে নিয়ে গেছে। যুদ্ধ ক্ষেত্রে থাকায় তখন কিছুই করতে পারিনি। রঘুনাথপুর থেকে পাকি আর্মি তাকে কোটচাঁদপুরে আনসার ক্যাম্পে নিয়ে নির্যাতনের পর হত্যা করে। তারা আমার বাবা এবং ছোট ভাইকেও নির্যাতন করে।

মোঃ আব্দুল হালিম মোল্লা বলেন, ভারত থেকে যুদ্ধের ট্রেনিং শেষ করে বাড়ি ফিরে এসে দেখি আমার দাদী ছাড়া বাড়িতে কেউ নেই। আমাদের এক পরিচিত জন ডা. রুহুল আমিন তার পরিবারসহ সে সময় আমাদের বাড়িতে আশ্রয় নিয়েছিলেন। রুহুল আমিন তাঁর স্ত্রী ও সন্তানদের বাড়িতে পৌছে দেয়ার দায়িত্ব আমার ওপর দিয়ে পালিয়ে যান। আমি তাদেরকে পৌছে দেওয়ার উদ্দেশ্যে গরুর গাড়িতে করে রওনা হই। পিটিআই স্কুল পার হতেই চারজন রাজাকার ও দুইজন আর্মি আমাকে ধরে। আমার ছোট ভাই আমার সাথে থাকলেও তারা শুধু আমাকে মাজেদুল হকের বাসার সামনে নিয়ে ব্যাপক মারধর করে। তারপর ট্রেজারিতে নিয়ে যায়। সেখানে দিনে হাতে পায়ে হ্যাণ্ডকাপ দিয়ে ফেলে রেখে রাতে নির্যাতন করা হত। তাদের নির্যাতনের ধরন ছিল নৃশংস। তারা আমার পায়ে পেরেক পুঁতে রাখত। শরীরে আগুনের ছ্যাঁকা

www.pathagar.com

দিত, খেজুরের কাঁটা নখের ভিতর ঢুকিয়ে দিত। এক পর্যায়ে তারা আমার হাঁটুর দুই জায়গায় রগ কেটে দেয়। সে সব নির্যাতনের চিহ্ন এখনও আমার শরীরে রয়েছে।

আমরা ভারত থেকে যুদ্ধের ট্রেনিং নিয়ে এসেছি এবং আমার বাড়িতে দুই তিন জন মুক্তিযোদ্ধা আশ্রয় নিয়েছেন এই সংবাদের ভিত্তিতেই তারা আমাকে ধরে নিয়ে গিয়েছিল। বন্দী থাকা অবস্থায় একদিন এক পাকি সেনা এসে অন্য সৈন্যদেরকে বলল, ঠেরো ইয়ার, মাত মারো। তারা কৌশলে আমার কাছ থেকে বিভিন্ন তথ্য জেনে নিতে চেয়েছিল। কিন্তু কোন তথ্য আমি তাদেরকে দিইনি। আর্মির একজনের নেমপ্লেটে লেখা ছিল মেজর রিয়াজ। আরও যেসব পাকি আর্মি সেখানে ছিল, তারা হল সিপাই ইউসুফ খান, আব্দুস সালাম খান ও মোসলেম খান।

আমার সাথে আরও তিন জনকে নির্যাতন করা হয়েছিল। আমাদের চার জনকে একসাথে বেঁধে পাকি বাহিনীর নির্দেশে কবির রাজাকার হেলমেট দিয়ে আঘাত করে। একজনের মাথায় অত্যধিক আঘাত লাগলে তার মাথার মগজ বের হয়ে সে সেখানেই মারা যায়। তার মৃতদেহটাও আমাদের তিনজনের সাথে কিছুক্ষণ বাঁধা ছিল। তারপর আমাদেরকে তারা জগবন্ধুর বাড়িতে নিয়ে যায়। জগবন্ধুর বাড়ির নিচ তলায় ছিল রাজাকার ক্যাম্প। ওখানে দিনের বেলায় রেখে সন্ধ্যার পর আমাদেরকে ট্রেজারিতে নিয়ে আসত। সেখানে আড়াই দিনের মধ্যে একবেলা শুধু আমাদেরকে একটি রুটি খেতে দিয়েছিল। আমার সাথের দুইজনকে পরদিন ট্রেজারিতে নিয়ে পাকিরা হত্যা করে।

তারা আমাকেও হত্যার পরিকল্পনা করেছিল। মোয়াজ্জেম নামে এক লোক পাকি আর্মির রান্নার তদারকি করত। সে আমার পরিচিত থাকায় তার সহায়তায় আমি রক্ষা পাই। পাকি আর্মি যখন আমাকে ব্রিজের কাছে নিয়ে হত্যা করার পরিকল্পনা করে, তখন সে আড়াল থেকে সেটা শুনে ফেলে। সে আমার হ্যাণ্ডকাফ খুলে দেয় এবং তারের ওপর কম্বল দিয়ে আমাকে বেড়া পার করে দেয়। আমার শরীরে তখনও কিছু শক্তি অবশিষ্ট থাকায় আমি পালিয়ে আসতে সক্ষম হয়েছিলাম। কলেজের পেছন দিয়ে গফুর মিয়ার বাড়ির পাশ দিয়ে আমি বাড়িতে গিয়ে উঠি। আমার চাচা এক খ্রিস্টান পরিবারের সহযোগিতায় আমাকে মাগুরায় পার করে দেন। তারপর আমি বেশ কিছুদিন বিভিন্ন অঞ্চল ঘুরে কলকাতায় চলে যাই।

উপরে উল্লিখিত সকল যুদ্ধাপরাধের দায়ে ক্যাপ্টেন আজমল, মেজর রিয়াজ খান, সিপাহী ইউসুফ খান, আব্দুস সালাম খান, মোসলেম খান, হাবিলদার ওহিদ মিয়া, নায়েব লতিফ খান, নাসির খান, ইউনুস প্রমুখ পাকি আর্মি ও তাদের সহযোগীরা অভিযুক্ত।

www.pathagar.com

আসামী ঃ মেজর শোয়েব।

অপরাধের ধরন ঃ গণহত্যা, জাতিগত নিধন, ধর্ষণ, লুটপাট, অগ্নিসংযোগ।

সাক্ষী ঃ তারিকুল হক তারিক, প্রথম আলোর কুষ্টিয়া প্রতিনিধি।

ঘটনাকালঃ পঁচিশে মার্চ থেকে মুক্তিযুদ্ধের পরবর্তী সময়।

ঘটনাস্থল ঃ কুষ্টিয়া শহর ও তার আশপাশ এলাকা।

সূত্রঃ প্রথম আলো, ২০ মার্চ ২০০৪, যুদ্ধাপরাধ গণহত্যা ও বিচারের অন্বেষণ।

মুক্তিযুদ্ধের সময় তারিকুল হক তারিক কুষ্টিয়ায় ছিলেন। বর্তমানে তিনি সাংবাদিকতা পেশার সাথে জড়িত। দৈনিক 'প্রথম আলো'র কুষ্টিয়া প্রতিনিধি। তিনি জানান, ১৯৭১ সালের পঁচিশ মার্চের রাতে যশোর সেনানিবাস থেকে সাতাশ বেঙ্গল রেজিমেন্টের একটি কোম্পানি মেজর শোয়েবের নেতৃত্বে কুষ্টিয়া শহরে প্রবেশ করে। মেজর শোয়েব কুষ্টিয়া শহরে ঢুকেই কারফিউ জারি করে। তারপর ত্রিশ ঘন্টাব্যাপী কারফিউয়ের মধ্যে পাকিস্তানি আর্মির এই দলটি কুষ্টিয়া শহরে ব্যাপক হত্যা, ধর্ষণ ও নির্যাতন চালায়। এ রাতে তারা একজন পথচারীকে হত্যা করে তার লাশ গুম করে ফেলে।

মার্চের আঠাশ তারিখ থেকেই পাকিস্তানি আর্মি তাদের দোসর বিহারিদের সহযোগিতায় এই শহরে খুন, ধর্ষণ, লুট ও অগ্নিসংযোগ করে সাধারণ মানুষের জীবন দুর্বিষহ করে তোলে। শুধু তাই নয়, মেজর শোয়েবের নেতৃত্বে শহরের আশেপাশের গ্রামগুলো থেকে কিশোরী ও তরুণী মেয়েদের ধরে নিয়ে স্থানীয় হাউজিং কলোনিতে বন্দী করে পাশবিক নির্যাতন চালায়। যুদ্ধের পুরো সময় পাকিস্তানি আর্মি তাদের এই অপকর্ম চালিয়ে যায়। তাদের পাশবিক নির্যাতন থেকে চারদিনের প্রসূতি পর্যন্ত রেহাই পায়নি। সে সময় প্রতি রাতেই হাউজিং কলোনি থেকে অসহায় নারীদের করুণ আর্তনাদ ভেসে আসত।

শহরের উপকণ্ঠের রক্সি সিনেমা হল ছিল শান্তি কমিটি ও বিহারিদের আস্তানা। এখানে হত্যা করা হয় কুষ্টিয়া পৌরসভায় চেয়ারম্যান আবুল কাশেম ও শীলপাড়ার কোহিনুর বেকারির মালিকের পুরো পরিবারটিকে। গড়াই নদীর ধারের জুয়েল এ্যালুমিনিয়াম ফ্যাক্টরির মধ্যকার তেঁতুল গাছের দুটো শাখার মাঝখানে মাথা চেপে ধরে ধারালো অস্ত্র দিয়ে নিরীহ বাঙালিদেরকে হত্যা করা হত। শহরের বিশিষ্ট ব্যক্তিদের মধ্যে হাসান ফয়েজ, আজগর আলী, ননী গোপাল রায় এবং ফুটবলার সোহরাওয়ার্দীকে এই রকম নৃশংস পন্থায় হত্যা করা হয়। সে সময় কুষ্টিয়ায় সংঘটিত সকল হত্যাকাণ্ড, ধর্ষণযজ্ঞ, লুটপাট ও অগ্নিসংযোগের সাথে মেজর শোয়েব ও তার অধীনস্থ পাকি সেনারা দায়ী।

www.pathagar.com

বরিশাল বিভাগ

আসামী ঃ ক্যাপ্টেন মুনির, সুবেদার সিদ্দিক, ইয়ামিন, হানিফ (র‍্যাংক অজ্ঞাত)।

অপরাধের ধরনঃ গণহত্যা, জাতিগত নিধন, ধর্ষণ, লুটপাট, অগ্নিসংযোগ।

সাক্ষী ঃ নূরজাহান বেগম, হরেকৃষ্ণ রায়, কমলিনী হালদার, বিপুল হালদার, অতুলচন্দ্র বালা, লালচাঁদ ফকির, কান্তরঞ্জন বৈষ্ণব, বিমল পাত্র, দেবেন্দ্রনাথ পাত্র, আবদুর রশীদ ভূঁইয়া।

ঘটনাকালঃ একাত্তরের পঁচিশ মার্চ থেকে স্বাধীনতার পূর্ব পর্যন্ত।

ঘটনাস্থল ঃ বরিশাল জেলা

সূত্রঃ যুদ্ধাপরাধ গণহত্যা ও বিচারের অন্বেষণ এবং WCFFC গবেষণা।

১৯৭২ সনে প্রাথমিক জরিপে বরিশালে নিহতের সংখ্যা পঞ্চাশ হাজারের বেশি বলে উল্লেখ করা হয়। এর সাথে রয়েছে ধর্ষণ, লুটপাট ও অগ্নিসংযোগ। পাকি ক্যাপ্টেন মনির, সুবেদার সিদ্দিক, ইয়ামিন হানিফসহ তাদের সহযোগীরা এই সকল অপকর্মের সাথে সরাসরি জড়িত ছিল। সাতাশে এপ্রিল পাকি বাহিনী শহরে ঢুকে গণহত্যা শুরু করে। পানি উন্নয়ন বোর্ড অফিস ছিল এদের মূল ঘাঁটি। বরিশালের ত্রিশ গোডাউন কম্পাউন্ডের পেছনের গেট থেকে নদীর পাড় পর্যন্ত বিশ বিঘা ধানি জমি সে সময় গণকবর ও বধ্যভূমি হয়ে উঠেছিল। ভোলার ওয়াপদা কলোনি ছিল নির্যাতন কেন্দ্র। কলোনির রেস্ট হাউজে ক্যাপ্টেন মুনির হোসেন এবং সুবেদার সিদ্দিক রাতের পর রাত পাশবিক অত্যাচারের পর হত্যা করেছে বহু মেয়েকে। কয়েকজন প্রত্যক্ষদর্শী ও ক্ষতিগ্রস্তের সাক্ষ্য এখানে তুলে ধরা হল।

গৌরনদীর বঙ্কুরা গ্রামের চৌদ্দ বছরের ডানপিটে মেয়ে নূরজাহান ছিলেন খানিকটা একরোখা। মুক্তিযুদ্ধের শেষ দিকে উজিরপুর থানায় শিকারপুর এলাকায় পাকি বাহিনীর হাতে ধরা পড়েন তিনি। তাঁর কাজ ছিল মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য সংবাদ আনা নেওয়া। শিকারপুর ক্যাম্পে পাকি সেনাদের রান্নার তদারকি করতেন নূরজাহানের এক খালু। তাঁর সাথে দেখা করার নাম করে নানা তথ্য জেনে নিতেন নূরজাহান। অন্যান্য দিনের মতো সেদিনও তিনি চিঠি নিয়ে শিকারপুর যাচ্ছিলেন। লক্ষ্য ছিল

www.pathagar.com

কোন বাস পেলে সেটাতে উঠে পড়া। কিন্তু সেটা আর সম্ভব হয়নি। এর মধ্যেই ট্রাক নিয়ে পাকি সেনারা নূরজাহানের পিছু নেয়। যদিও তিনি বাসে উঠেছিলেন, কিন্তু ভালোভাবে হাতল ধরতে পারেননি। পেছন থেকে গুলি করে পাকি আর্মি। গুলি তাঁর ডান পায়ে লেগে বেরিয়ে যায়। বাস থেকে পড়ে গিয়ে নূরজাহান দৌড়াতে দৌড়াতে এক বাড়িতে গিয়ে ওঠেন। আহত অবস্থায় নূরজাহানকে দেখে ওই বাড়ির লোকজন উদ্বিগ্ন হয়ে পড়ে। প্রাণভয়ে ভীত পরিবারটিকে বাঁচানোর জন্য নূরজাহান হাত তুলে বেরিয়ে এসে পাকিবাহিনীর কাছে আত্মসমর্পণ করেন। এ সময় রাইফেল দিয়ে তাঁর মাথায় আঘাত করে এক পাকি সেনা। মাটিতে লুটিয়ে পড়েন তিনি। কাঁধে করে গাড়িতে তুলে নেওয়ার পর জ্ঞান হারান নূরজাহান। পরে গৌরনদী স্কুলে পাকি বাহিনীর ক্যাম্পে দেখতে পান নিজেকে। একটু সুস্থ হওয়ার পর মুক্তিবাহিনীর খবর জানবার জন্য শুরু হয় নূরজাহানের ওপর অত্যাচার। হাত পা বেঁধে পুকুরে ফেলে রাখা হত, বেয়নেট দিয়ে সারা শরীরে খোঁচানো হত। আঙুলের মাঝে ইট চেপে ধরে চাপ দেওয়া হত। তখনও সাবালিকা হননি নূরজাহান। অথচ তাঁর ওপর পাশবিক অত্যাচার চালানো হত প্রতিদিন অসংখ্যবার। খানসেনাদের লোলুপতার সেই চিহ্ন এখনও তাঁর শরীরে রয়ে গেছে কামড়ের দাগ হয়ে। নূরজাহান জানান, শারীরিক অত্যাচার যারা করেছে, তারা সবাই পাকিস্তানি সৈন্য। এই দুঃখের কথা বলতে গিয়ে কান্নায় ভেঙে পড়েন নূরজাহান। পাকিস্তানি ক্যাম্পে এক মাস পাঁচ দিনের সেই লোমহর্ষক যৌন নির্যাতন নূরজাহানকে চিরতরে পঙ্গু করে দিয়েছে।

পাকি বাহিনীর নির্মম ও বর্বর পাশবিক নির্যাতনের অন্য একটি ঘটনা নিজের গ্রামে দেখেছিলেন নূরজাহান। পাকি বাহিনী গ্রাম আক্রমণ করলে সবাই বিভিন্ন জায়গায় লুকিয়ে পড়েন। গ্রামের রমেশ ডাক্তারের বাড়ির গাছের ওপর লুকিয়েছিলেন নূরজাহান। ডাক্তারের স্ত্রীর মাত্র তিন দিন আগে বাচ্চা হয়েছিল। কিন্তু পাকিস্তানি সৈন্যরা সেই বউটিকে একের পর এক ধর্ষণ করে।

আগৈলঝাড়া থানার সুজনকাঠি গ্রামের হরেকৃষ্ণ রায় বলেন, একাত্তর সালে আমি এই গ্রামে ছিলাম। সে সময় পালিয়ে পালিয়ে থাকতে হত আমাদের। পাকি হানাদাররা কোন তারিখে আমাদের গ্রামে আসে, তা আমার সঠিক মনে নেই। তবে সে সময় আমি ইরি ধানের ব্লক করছিলাম, সেটা মনে আছে। সে কারণে আমাকে প্রায়ই গৌরনদীতে যেতে হত। হানাদাররা যখন হামলা শুরু করে, তখন গৌরনদী যাওয়া প্রায় বন্ধই হয়ে গিয়েছিল। বেশি দরকার না হলে ওদিকে আমরা যেতাম না। পরে তো গৌরনদীতে হিন্দুদের যাতায়াত এক রকম বন্ধই হয়ে যায়।

পাকি বাহিনীর অত্যাচারের হাত থেকে আমাদের রক্ষা করার জন্য সে সময় আমাদের প্রতিবেশী মুসলমানরা পঞ্চাশ, সত্তর কখনও বা আশি জন করে পাহারা দিতে আসত। ঐ সময় যারা গ্রামে ছিল তাদের সবারই ঘরবাড়ি ছিল ভাঙাচোরা। তখন এখানে একটি বড় বাগান ছিল। আর্মি আসার কথা শুনলে আমরা ভয়ে সেখানে লুকাতে যেতাম। আমাদের বাড়ির উত্তর পাশের ঐ বাগানে বসলে দেখা যেত, পাকি

www.pathagar.com

আর্মি কোন দিক থেকে এসে কোন দিকে যায়। চৈত্র মাসের দিকে তারা আমাদের গ্রামে আসে। তারা আমাদের ধরার চেষ্টা করে। কিন্তু কাউকে খুঁজে পায়নি। আমাদের নগর বাড়ির পিএল অজিত বাবুর ছেলের সাথে আমি জমি চাষ করতাম। তিনি অনেক খবরাখবর রাখতেন। তিনি একদিন বললেন, 'আজ দিনের বেলা তোরা বাড়িতে থাকিস না, রাতে বাড়ি যাবি।

ওইদিন এক শ' থেকে দেড় শ' পাকিস্তানি আর্মি গাড়িতে করে আমাদের এখানে আসে। আমি নিজের চোখে তাদের আসতে দেখেছি। তারা দেখতে প্রায় একই রকম ছিল। তারা সোজা এই গ্রামে এসে ঢুকে পড়ে। সে সময় আমাদের বাড়ির দক্ষিণ দিকে একটি বিল ছিল। আমরা ভয়ে সেদিকে পালিয়ে গেলাম। কিন্তু আমার ছেলেকে নিয়ে বিলের পানিতে হাঁটতে অসুবিধা হচ্ছিল। এদিন হানাদাররা কাটিরা গ্রাম থেকে পশ্চিম দিকে গিয়ে অনেক লোককে হত্যা করে। এই গ্রামে কোন মুসলমান ছিল না। এটি ছিল হিন্দু অধ্যুষিত গ্রাম। ওই গ্রামের কেউ হানাদারদের হাত থেকে বাঁচতে পারেননি। আর্মি আসতে দেখে গ্রামের নারী পুরুষ সবাই একসাথে দৌড়াচ্ছিলেন। তাঁদেরকে ওই অবস্থাতেই গুলি করে হত্যা করা হয়। আমি বাড়ি আসার পথে পড়ে থাকা যে সমস্ত লাশ দেখতে পাই তার সংখ্যা পাঁচ শ' থেকে সাত শ'র কম ছিল না। তাঁদেরকে বকের মতো গুলি করে মারা হয়। মহিলার সংখ্যা কম ছিল, কারণ তাঁরা আগেই সরে পড়েছিলেন। আর্মির সাথে যে মেজর ছিল, সে এক সাধুকে কালীবাড়িতে গুলি করে হত্যা করে। সাধুর নাম ছিল রায়চরণ বৈরাগী। তিনি যখন পূজো করছিলেন, তখন ওই পাকি মেজর তাঁকে পেছন দিক থেকে গুলি করে হত্যা করে।

এরপর হানাদাররা আবার আমাদের বাড়িতে আসে। আমি তখন বাড়িতে। আমাদের পরিবারের সদস্য সংখ্যা ছিল একুশ জন। সে দিন আমার বাবা বড়শি দিয়ে পুকুরে মাছ ধরছিলেন। এই সময় হানাদাররা আমাদের বাড়িতে এসে আমার কাকা, ভাই, পিসামশাইকে ধরে ফেলে। আমার বয়স তখন চল্লিশের কাছাকাছি। বাড়িতে জামাই এসেছিল বেড়াতে, তাঁকেও তারা ধরে। এক সাথে মোট ছয় জনকে তারা ধরেছিল। এই ছয়জনের মধ্যে কেবল একজন (জামাই) আহত অবস্থায় ফিরে আসতে পেরেছিলেন। তাঁর পায়ে গুলি লেগেছিল। গুলি খেয়ে তিনি খালের মধ্যে পড়েছিলেন, পরে ভাসতে ভাসতে সেখান থেকে ফিরে এসেছিলেন। পাকি বাহিনী ওইদিন ছয়জনকে দড়ি দিয়ে হাত পা বেঁধে গৌরনদীতে নিয়ে হত্যা করে।

রাজিহার গ্রামের কমলিনী হালদার বলেন, আমার স্বামীকে পাকি বাহিনী হত্যা করে। তিনি কীর্তন গানের বেহালা বাজাতেন। একাত্তর সালের চৈত্র মাসের প্রথম দিন পাকি বাহিনী আমাদের বাড়িতে আগুন লাগিয়ে দেয়। আমরা তখন সবাই পালাচ্ছিলাম। এই রকম অনেকেই তখন পালাচ্ছিল। তখন একদিক দিয়ে মিলিটারি আসত, আর আমরা অন্যদিক দিয়ে পালিয়ে যেতাম। এর মধ্যে একদিন আমাদের 'ফাদার' আসলেন। তিনি আমাদের ক্রুশ, বাইবেল ও কার্ড দিয়ে বললেন, 'এগুলো তোমরা

www.pathagar.com

যারা খ্রিস্টান তারা বাসায় রাখবে। তোমাদের কিছু হবে না। তোমাদের আর পালিয়ে থাকতে হবে না। পাকি আর্মি এলে এগুলো দেখাবে।'

আষাঢ় মাসের দুই তারিখে ওদেরকে হত্যা করা হয়। আমাদের বাড়ির লোকজন তখন কেউ জমিতে, কেউ বা বাইরে। তখন সকাল দশটার মতো হবে। পাশের গ্রামের লক্ষণ দাসকেও তারা হত্যা করে। লক্ষণ দাস ছিলেন আমাদের বাড়ির পশ্চিম পাশের কোদাল ধোয়াই গ্রামের। তাঁর হাতি ছিল, হানাদাররা হাতিসহ তাঁকে হত্যা করে। গুলির শব্দ শুনে আমরা বাড়ির বাইরে আসি। তখন পশ্চিম দিক থেকে দুটো স্পিড বোট আসে। এ সময় আমাদের বাড়ির একটা ছেলে বলল, ওরা গুলি করতে পারে, তোমরা ভেতরে চলে যাও। আমরা বাড়ির ভেতরে গেলে আশপাশ থেকে কিছু হিন্দু মহিলা আমাদের বাড়িতে এসে আশ্রয় নেন। তখন কিছু রাজাকার এসে বলল, তোমাদের ভয় নেই, ওরা তোমাদের কিছু বলবে না। ওদের কিছু ডাব পেড়ে খেতে দাও। তখন ওদেরকে আমরা ক্রুশ, কার্ড, বাইবেল এসব দেখলাম। ওরা বলে যে, ভয় নেই। চল্লিশ পঞ্চাশটা ডাব পেড়ে ওদেরকে খেতে দেওয়া হল। এটা আমাদের সকালের নাস্তা খাওয়ার পরের ঘটনা। এ সময় ওরা বলল যে, খালের পারে একটি নৌকা আটকা পড়ে থাকায় তাদের স্পিড বোট যেতে পারছে না, তাই তারা কয়েকজনকে সেখানে নিয়ে যাবে। এ সময় আমার এক বোকা ধরনের চাচা শ্বশুর দাউরি হালদারের হাত ধরে মিলিটারিরা টানাটানি শুরু করে। তখন তাঁর বড় ভাই সোমেল বলেন, আমার ভাই বোকা, ওকে ছেড়ে দেন।

মিলিটারিরা সংখ্যায় ছিল পনেরো ষোলজন। সাথে রাজাকাররাও ছিল। তারা আমাদের বাড়ির ন'জনকে ধরে নিয়ে যায় এবং বলে যে, ভয় নেই। তারা এঁদেরকে নিয়ে নৌকায় তোলে। আমার ভাসুরের শরীরে তখন ফোঁড়া ছিল। হানাদাররা তাঁকে এই অবস্থায় ঘর থেকে টেনে বের করে। তাঁর শরীর থেকে তখনও রক্ত ঝরে পড়ছিল। এ অবস্থা দেখে আমি চিৎকার করে উঠি। ওর বাবা তখন বলে, কেঁদো না, বাচ্চাদের নিয়ে বাড়ি যাও। আমি তখনও রাস্তায় বসে কাঁদছি। এমন সময় গুলির শব্দ শুনতে পেলাম। ওঁদেরকে বাকালহাটে ধরে নিয়ে সেখানেই এক সাথে গুলি করে হত্যা করা হয়। আমার চিৎকার শুনে আশেপাশের সবাই ছুটে আসে। বাড়ির অন্যান্য বউ-ঝিরা চিৎকার করে কেঁদে ওঠে। আশপাশ থেকে হিন্দুরাও কিছুক্ষণ পর সেখানে আসে।

এর মধ্যেই খবর আসে যে, পাকি আর্মি যাদেরকে ধরে নিয়ে গিয়েছিল, তাঁদেরকে বাকালহাটে নিয়ে হত্যা করেছে। হাটের পাশের পানির ধারে নিয়ে তাঁদেরকে গুলি করা হয়। আজাহার নামে একটা মুসলমান ছেলে এসে আমাদের এই খবরটা দিয়েছিল। গুলি করার পর তাঁরা পানির মধ্যে ছটফট করে মারা যান। ওঁদের মধ্যে থেকে দু'জনকে তুলে আনা হয়, যাঁরা পরে বেঁচে গিয়েছিলেন। বেঁচে যাওয়া সেই দুই জনের নাম হল মুকুল হালদার ও সুকুমার হালদার। এর মধ্যে মুকুল হালদার এখনও

www.pathagar.com

বেঁচে আছেন। মৃত সাত জনের মধ্যে এক জনের কপাল ফেটে ঘিলু বের হয়ে গিয়েছিল। মানুষের পেটের নাড়িভুঁড়ি যে কেমন, সেটা আমরা তখন প্রথম দেখি। সেইসব স্মৃতি মনে পড়লে আজ, শিউরে উঠতে হয়। মৃত ৭ জনের নাম ছিল– ১. বিমল হালদার, ২. দানিয়েল হালদার, ৩. স্যামুয়েল হালদার, ৪. জয়নাল হালদার, ৫. টমাস হালদার ৬. অগাস্টিন হালদার ও ৭. নরেন হালদার। এই সাতজনকে আমাদের বাড়ির উঠানে একসাথে মাটিচাপা দেয়া হয়। ক্রুশ বানিয়ে জায়গাটা এখনও আমরা চিহ্নিত করে রেখেছি।

রাজিহার গ্রামের বিপুল হালদার বলেন, একাত্তর সনে আমি গ্রামেই ছিলাম। পাকি আর্মি যখন ওই নয় জনকে ধরে নিয়ে যায়, তখন আমি বাড়িতে। আমার সামনেই ওঁদেরকে তারা ধরে নিয়ে যায়। তাঁদেরকে নিয়ে যাওয়ার কিছুক্ষণ পর দুটো গুলির শব্দ শুনি। কিছুক্ষণ পরে শুনতে পাই যে, তারা নয় জনকেই মেরে ফেলেছে। লোকজন তাঁদের লাশ পরে নিয়ে আসে.। হত্যার খবর শুনে দেবেন্দ্র হালদার নামে আমার এক বৃদ্ধ জ্যাঠা সেখানে গিয়ে দেখেন যে, তাঁদের মধ্যে দু'জন বেঁচে আছেন। তাঁরা খালের ধারে আহত অবস্থায় পড়েছিলেন। বাকি সাত জন ঘটনাস্থলেই মারা যান।

আমাদের গ্রামে মিলিটারিরা প্রথম দিনেই পাঁচ থেকে সাত শ' ঘর পুড়িয়ে দেয়। এটা ছিল আষাঢ় মাসের প্রথম দিকের ঘটনা। ওই দিন তারা এক দেড় শ' লোককে হত্যা করে। ওই লোকগুলো তখন জমিতে কাজ করছিল। এরপর মিলিটারি আরও নয় বার আমাদের গ্রামে আসে। নয় বারই তারা আমাদের বাড়িতে আসে। প্রতিবারই হানাদাররা আমাদের বাড়িতে অমানুষিক নির্যাতন চালায়। তারা কখনও স্পিড বোটে, কখনও বা হেঁটে গ্রামে আসত।

পাকি আর্মি দেখে আমার জ্যাঠা শরৎ বাবু (বয়স আনুমানিক ৭০ বছর) ভয় পেয়ে দৌড় দেন। তখন তাঁর খুব জ্বর ছিল। তিনি খই খাচ্ছিলেন। তাঁকেও তারা ধরে ফেলে এবং উঠানের মধ্যে বসিয়ে সেই অসুস্থ বুড়ো মানুষটাকে এবং বাইরে থেকে ধরে আনা আরো দুটো ছেলেকে তারা গুলি করে হত্যা করে। এটি আমার দেখা সব চেয়ে নৃশংস ঘটনা। যখন আমি লাশগুলোর কাছে আসি, তখন দেখি আমার জ্যাঠা হা করে ওপরের দিকে তাকিয়ে আছেন। তাঁর মুখের ভেতর তখনও সাদা সাদা খই দেখা যাচ্ছিল।

রাজিহার উচ্চ বিদ্যালয়ের সহকারী প্রধান শিক্ষক অতুলচন্দ্র বালা বলেন, পঁচিশ মার্চের কয়েক দিন পর ডিগ্রি পরীক্ষার ফরম পূরণ করে বাড়ি ফেরার কথা ভাবছিলাম। এ সময় দেখতে পেলাম যে, গৌরনদীতে মিলিটারির গাড়ি এসে পড়েছে। তখন দেশের অবস্থা খুবই খারাপ, ক্রমেই অবস্থা আরও খারাপের দিকে যাচ্ছিল। চাঁদশী থেকে মিলিটারিরা ঘরবাড়ি পোড়াতে শুরু করে এবং রাজিহারের পূর্ব সীমানা পান্থবাড়ি পর্যন্ত সেটা চালু রাখে। এ সময় আর্মি দেখে সেখানকার পুরুষ

www.pathagar.com

মহিলা সবাই মাঠের মধ্য দিয়ে দৌড়ে পালানোর চেষ্টা করতেন। সেই দৌড়ানো অবস্থাতেই তাঁদেরকে গুলি করে হত্যা করা হয়। যেখানে তাঁদেরকে হত্যা করা হয়, সে স্থানের নাম কেতনারকোলা।

আমরা এ সময় পশ্চিম দিক থেকে ফিরে এসে ওদের অবস্থা দেখতে গেলাম। রাংতা গ্রামে গিয়ে দেখি সেখানে চাঁদশীর স্বপন বোস ও তাঁর দুই বোনকে হত্যা করা হয়েছে। এই স্বপন বোস এসএসসি পরীক্ষায় প্রথম হয়েছিলেন। মনে হচ্ছিল, তাঁরা যেন জীবন্ত অবস্থায় শুয়ে আছেন। তাঁদের চোখগুলো তখনও খোলা ছিল। পূর্বদিকে গিয়ে আরও বেশ কিছু লাশ ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ে থাকতে দেখলাম। সেখান থেকে দক্ষিণ দিকে যেয়ে দেখি, এক বৃদ্ধ ও তাঁর স্ত্রী ঘরের মধ্যে পুড়ে মরে আছেন।

অতুলচন্দ্র বালার সাক্ষাৎকার গ্রহণের সময় পাশ থেকে একজন বলেন, আমাদের এখানে মইজুদ্দিন মাতব্বর নামে এক লোক ছিলেন। তিনি প্রায়ই বলতেন, 'মিলিটারি এলে আমি তাদেরকে স্যালুট দিয়ে দাঁড়াব, দেখো তারা আমাকে কিছুই বলবে না।' সেই মইজুদ্দিনকেও হানাদাররা গুলি করে হত্যা করেছিল।

অতুল চন্দ্র বলতে থাকেন, এই হত্যাকাণ্ডের ক'দিন পর পাকিবাহিনী বাকালহাট দিয়ে আবার এখানে আসে। আমরা আবারও যে যেদিকে পারি পালিয়ে যাই। একদিন দেখি তারা দুটো স্পিড বোট নিয়ে এসেছে। আমাদের বাড়ির পাশেই ছিল আমার এক জ্যাঠা বিমল হালদারের বাড়ি। তিনি বলতেন, কোন বিপদ হলে যেন তাঁর বাড়ি যাই। সেখানে কোন বিপদের সম্ভাবনা নেই। কিন্তু আমি তাঁর বাড়িতে যাইনি। কারণ তাঁর বাড়িতে কোন পুরুষ লোক ছিল না। আমাকে দেখে সবাই প্রশ্ন করতে পারে। তাই আমি সেখানে না গিয়ে খাল পার হয়ে অন্যত্র সরে গিয়েছিলাম। ওই জ্যাঠার বাড়িতে মিলিটারি এসে মা-বোনদের ওপর পাশবিক নির্যাতন চালায়। ওই বাড়ির পুরুষরা নারী নির্যাতনে বাধা দিলে হানাদাররা ওই বাড়ির ন'জন পুরুষকে ধরে বাকালহাটে নিয়ে হত্যা করে। চারজন মহিলাকে তারা সে বাড়িতে নির্যাতন করেছিল। এঁরা ছিলেন অগাস্টিনের স্ত্রী, তারামল হালদারের স্ত্রী, টমাসের স্ত্রী প্রমুখ। পাকি হানাদাররা নির্যাতনের পর ওই বাড়ির মহিলাদের হত্যা না করলেও গৌরনদী কলেজে মহিলাদের ধর্ষণ করার পর হত্যা করত।

পাকি বাহিনীর আত্মসমর্পণের পর আমরা দেখতে পাই, কলেজের দক্ষিণ কোণার ঘরে দু'থেকে তিন হাত পুরু মহিলাদের লাশ পোড়ানো অবস্থায় রয়েছে। ওই লাশগুলো মেডিসিন দিয়ে পোড়ানো হয়েছিল। মহিলাদের চুলের কাঁটা, সোনার জিনিসও আমরা সেখানে দেখেছিলাম। কলেজের দক্ষিণ পশ্চিম কোণার নিচ তলায় দেড় থেকে দু'হাজার মহিলার লাশ পড়ে ছিল। আমরা ডেটা সংগ্রহ করতে গিয়ে এই সংখ্যার কথা জানতে পারি। আমাদের কলেজের ডিগ্রির ছাত্রী চন্দ্রার লাশও এর মধ্যে ছিল। চন্দ্রার মতো এরকম আরও অনেক মেয়ের সে সময় কোন খোঁজ পাওয়া যায়নি। রাজিহার কলেজের প্রিন্সিপ্যাল এখানকার হাড়গুলো পরিষ্কার করান। পরিষ্কার করার পর হাড়গুলো মাটিতে পুঁতে ফেলা হয়।

www.pathagar.com

অতুলচন্দ্র বালা আরও বলেন, আমরা একদিন গৌরনদীর হাতেম মিয়ার বাড়ির পাশ থেকে দেখলাম, কয়েকজন পাকি আর্মি রাস্তায় হাঁটাহাটি করছে। এর কিছুক্ষণের মধ্যেই এক দম্পতিকে তাঁদের একটা বাচ্চাসহ সেদিকে আসতে দেখলাম। পাকি আর্মি তাঁদেরকে আটকিয়ে বাচ্চাটার দু'পা ধরে আছাড় মারল। পুরুষটার মাথা ইট দিয়ে ভেঙে ফেলে মহিলাকে নিয়ে কলেজের ভেতরে ঢুকে গেল। আমার দেখা সবচেয়ে হৃদয়বিদারক ঘটনা এটিই।

রাংতা গ্রামের লালচাঁদ ফকির বলেন, আমার বয়স তখন আঠারো বছর। পয়লা জ্যৈষ্ঠ সকাল আটটায় ঘুম থেকে উঠে আমাদের বাড়ির পূর্ব দিকের রাইস মিলে গেলাম। সে সময় আমি ওই রাইস মিলে মেশিনের কাজ করতাম। রাইস মিল থেকে তাকিয়ে দেখি, দক্ষিণ দিক থেকে পাকিস্তানি আর্মি আসছে। তাদের আসতে দেখে আমি দৌড় দিলাম।

দূর থেকে দেখলাম, পাকিরা রাইস মিল সংলগ্ন বাঁশের পুল অতিক্রম করে উত্তর পারে চলে যাচ্ছে। প্রায় দশ বারো জন মিলিটারি ওই পুল পার হল। তখন পূর্বদিক থেকে হাজার হাজার মানুষ ছুটে আসছিল। মিলিটারিরা ওই সব ছুটে আসা মানুষদের লক্ষ্য করে গুলি করতে শুরু করে। গুলি শুরু হওয়ার পরপরই মানুষগুলো প্রাণের ভয়ে দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে পড়েন। কিছু লোক গুলি খেয়ে মাঠের মধ্যেই পড়ে গেল। যাঁরা গুলি খেয়ে পড়ে যায়, তাঁদের মধ্যে একজন ছিল স্বপন। সাথে ছিল তাঁর দু'বোন। গুলি খাওয়া লোকদের মধ্যে দু'জন পুরুষ ও আটজন মহিলা ছাড়া অনেক শিশুও ছিল। বৈয়ার বাড়িতে আশ্রয় নেওয়া অসংখ্য নরনারী ও শিশুকে পাকি বাহিনী সেদিন হত্যা করেছিল। আমার নিজ চোখে দেখা সেই হতভাগ্যদের সংখ্যা ছিল আড়াই শ'র মতো। পরদিন বিভিন্ন এলাকা থেকে লোকজন এসে তাঁদের আত্মীয়স্বজন ও বাচ্চাদের নিয়ে যায়।

বাড়ি ফিরে দেখি, সেখানেও হানাদাররা অনেক লোককে হত্যা করেছে। তারপর শুনি, পশ্চিম দিকেও তারা অনেক মানুষকে মেরে ফেলেছে। আমাদের আত্মীয়রা পশ্চিম দিকে থাকায় আমরা দ্রুত সেদিকে ছুটে গিয়ে দেখি, আমার চাচাতো ভাই আবদুল হক ও দুই ভাতিজা ফরহাদ ও রশীদ গুলিবিদ্ধ হয়েছেন। চাচাতো ভাই আবদুল হক পরের দিন মারা যান। গঙ্গাস্নান নামক স্থানের দক্ষিণ দিকে এই হত্যাকাণ্ড ঘটানো হয়। এখানে একসাথে পাঁচ জনকে সারিবদ্ধভাবে দাঁড় করিয়ে গুলি করা হয়। এসব হত্যাকাণ্ড একইদিনেই ঘটানো হয়েছিল। কারণ সেদিন মিলিটারিরা ভাগ ভাগ হয়ে বিভিন্ন জায়গায় ছড়িয়ে পড়েছিল। আমাদের আত্মীয় তিনজনকে নিয়ে আসার পর শুনি যে, উত্তর পাড়ে আরও অনেক লোক মারা গেছে। আমরা শুধু ওই তিন জনকেই নিয়ে এসেছিলাম। কারণ তাঁরা জীবিত ছিলেন। সেখানে মোট বারো জনকে গুলি করা হয়। তার মধ্যে তিন জন বেঁচে যান।

www.pathagar.com

এরপর বৈয়ার বাড়ি গিয়ে দেখি, সেখানে একজন লোক ছাড়া সবাই নিহত হয়েছেন। যে লোকটি বেঁচে ছিলেন তিনি অন্য জায়গার লোক। তাঁর কোমরে একটা খুঁতে (টাকার থলে) ছিল, ওতে টাকা ও সোনাদানা ছিল। সম্ভবত তিনি বন্ধকের মহাজন ছিলেন। গুলি লাগার পরে তাঁর টাকা পয়সা সোনাদানাগুলো আশেপাশেই ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়েছিল। তখনও তিনি কথা বলতে পারছিলেন। সেখানে কাদের নামে একজন লোকও ছিলেন। তিনিসহ আমি ওই লোকটিকে কোলে করে বাড়ির দিকে নিয়ে আসছিলাম। এমন সময় শুনতে পেলাম, মিলিটারিরা আবার পশ্চিম দিকে আসছে। তখন আমরা দক্ষিণ দিকে সরে যাই।

উত্তর পারের এক বাড়িতে এসে দেখি, একজন বৃদ্ধ মহিলা (রকমন মোল্লার মা) গুলিতে আহত হয়েছিলেন। এই বৃদ্ধার খুব তামাকের নেশা ছিল। আমি দেখলাম, ওই বৃদ্ধা গুলি লাগা অবস্থায়ই দেয়ালে হেলান দিয়ে হুঁকোয় তামাক খাচ্ছেন। তাঁর ছেলের বউ ও বাচ্চাদেরও গুলি লাগে, যাঁদের অধিকাংশই তখন মারা গিয়েছিলেন। আমরা ফিরে আসার কিছুক্ষণ পর শুনি যে, পাকিরা ফিরে এসে ওই বৃদ্ধা রকমন মোল্লার মাকে পুনরায় গুলি করে হত্যা করেছে। মিলিটারিরা চলে যাওয়ার পর আমরা গিয়ে দেখি ওই বৃদ্ধা মরে পড়ে আছেন। আমার পিতাকেও তারা ধরে নিয়ে গিয়েছিল কিন্তু ছেড়ে দিয়েছিল পরে।

এরপর আমরা লাশের স্তূপ থেকে জীবিত ও মৃতদের আলাদা করার কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়ি। আমরা বিভিন্ন দলে ভাগ হয়ে এ কাজ করছিলাম। সব মিলিয়ে সতেরো আঠারো জনের মতো মানুষ জীবিত ছিলেন। এঁদের মধ্যে অনেকেই দু'তিনদিন পর মারা যান। আহতদের কেউ কেউ এখনও বেঁচে আছেন। কেউ কেউ পঙ্গু হয়ে গেছেন। এঁদের মধ্যে একজন আছেন মাঝিও। আমরা স্থানীয় বাইশ জনের লাশ পেয়েছিলাম। বাইরের কতজন ছিল, তার সঠিক সংখ্যা বলতে পারব না। বাইরের এই লাশগুলো নৌকা করে তাঁদের আত্মীয় স্বজনরা নিয়ে গিয়েছিল। চাঁদশী ও তর্কির লোকেরা নৌকা ভর্তি করে তাদের পরিচিত লাশগুলোই কেবল নিয়ে যায়। সেখানে বাইরের আরও প্রায় চল্লিশ পঞ্চাশজন অপরিচিত লোকের লাশ ছিল, যেগুলো কেউ নিয়ে যায়নি। এর মধ্যে মহিলার সংখ্যা ছিল সাত আটজন, শিশু আট দশজন, আর বাকিরা ছিলেন পুরুষ। তার মধ্যে দশ থেকে পনেরো বছরের কিশোরসহ বৃদ্ধদের লাশও ছিল। এই রকম কবর আমরা আরও দিয়েছি। যেমন গৌরনদীতে মিলিটারিরা যাঁদের হত্যা করত, তাঁদের লাশগুলো খালের পানিতে ভেসে আসত। লাশ থেকে দুর্গন্ধ ছড়াতো এবং শেয়াল কুকুর টেনে টেনে খেত। আমরা এরকম দশ পনেরোটা লাশ মাটিচাপা দিয়েছিলাম। রাস্তার ধারের গঙ্গাস্নান ও পশ্চিম দিকে লাশের দুর্গন্ধের জন্য আমরা এক মাস সেদিকে যেতে পারিনি।

রাংতা গ্রামের কান্ত রঞ্জন বৈষ্ণব বলেন, প্রথম যেদিন মিলিটারি আসে সেদিন আমি গনি মিয়ার জমিতে কাজ করছিলাম। গনি মিয়ার এক শ' জন কাজের লোক ছিল।

www.pathagar.com

চাঁদশী থেকে মিলিটারি আসার খবর পেয়ে তিনি আমাদের কাজ ছেড়ে বাড়ি ফিরে যেতে বলেন। আমরা তখন বাড়ি ফিরে যাই। মিলিটারি যখন গ্রামে ঢোকে, তখন বেলা এগারোটা বা তার চেয়ে কিছু বেশি হয়েছিল। ওরা এসেই ঘরবাড়িতে আগুন ধরিয়ে দেয়। আমি ও আমার ভাই (বর্তমানে ভারতে আছে) তখন গাছের ওপরে ছিলাম। আমরা দৌড়ে গিয়ে জমিতে কাজ করা লোকদের বলি যে মিলিটারি এসে গেছে। কিন্তু তাঁরা আমাদের কথা বিশ্বাস করেননি।

পরে আমার ভাই ও বৌদি আমাকে হাত ধরে পুকুরের কচুরিপানার মধ্যে ডুবিয়ে রাখেন। এভাবে অনেক লোক সেদিন পানিতে লুকিয়ে ছিলেন। আমরা আমাদের টাকা পয়সা, ট্রাংক, স্যুটকেস সবকিছু ঘরে ফেলে রেখে পুকুরের পানিতে এসে লুকিয়ে পড়ি। লুকিয়ে থাকা অবস্থায় আমরা গুলির শব্দ শুনতে পাই। মাথার ওপর কচুরিপানা থাকা অবস্থায় আমি শুনতে পেলাম যে, এক মিলিটারি আরেক মিলিটারিকে 'হানিফ ভাই' ও 'ইয়ামিন ভাই' বলে ডাকছে। এভাবে আমি দু'জন মিলিটারির নাম জানতে পারি। যদিও সেখানে অনেক মিলিটারি ছিল।

পানির মধ্যে থাকতে তখন আমার খুব কষ্ট হচ্ছিল। কাঁকড়ায় কামড়াচ্ছিল। খুব ব্যথা পাচ্ছিলাম। ব্যথা সহ্য করতে কষ্ট হচ্ছিল। তার ওপর পানি ছিল খুব ঠাণ্ডা। আমার বড় ভাই রাজনদা' জোর করে আমাকে পানির মধ্যে ধরে রেখেছিলেন। গোলাগুলি শেষ করে মিলিটারিরা চলে গেলে আমরা বাড়িতে এসে দেখি, তারা স্যুটকেস ভেঙে টাকাপয়সা সব নিয়ে গেছে। শুধু কাঁচা টাকাগুলো ফেলে রেখে গেছে। স্যুটকেসগুলো তারা বুটের লাথি দিয়ে ভেঙেছে। বাড়ির মহিলারা সবাই তখন পালিয়ে ছিলেন। তাই পাকি সেনারা তাদের খুঁজে পায়নি। ওই জায়গায় এগারো জন মুসলমান ছিলেন। তাঁদেরকে পাকিরা গুলি করে হত্যা করে। উত্তর দিকে ছিল আমার মামা বাড়ি। সেখানে দুই থেকে আড়াই শ' লোককে পাকি বাহিনী হত্যা করেছিল।

ওখানে আমার ভাতিজা মন্মথের গায়ে গুলি লাগে। গুলিটা বুকের মধ্যে দিয়ে ঢুকে পিঠ দিয়ে বেরিয়ে যায়। সে তখন জোরে জোরে নিঃশ্বাস নিচ্ছিল। তাঁর মা পানি তখন খাওয়ানোর জন্য বলছিলেন। আমি তার মায়ের কথামত তাকে পানি খাওয়ালাম। পানি খেয়ে নিঃশ্বাস নেওয়ার পরপরই তাঁর শরীর থেকে আরও রক্ত বেরিয়ে যায়। এর অল্প কিছুক্ষণের মধ্যেই মন্মথ মারা যায়। এরকমভাবে সে সময় অনেক লোক মারা গিয়েছিল। এঁদের মধ্যে মুকুন্দ, নিতাই সাহা, কুণ্ডুসহ আরও অনেকে ছিল। সেই সব মর্মান্তিক দৃশ্য দেখতে আমার ভীষণ কষ্ট হচ্ছিল।

রাজিহার গ্রামের বিমল পাত্র বলেন, মিলিটারিরা সেদিন পশ্চিম দিক থেকে এসেছিল। তারা বৈয়ার পাড় থেকে কেতনার ভিটার দিকে যায়। তখন স্থানীয় লোকজন পূর্বদিকে পালাতে থাকে। এভাবে তখন মিলিটারি আসত একদিক দিয়ে, আর মানুষ পালাত অন্যদিক দিয়ে। যখন হানাদাররা কেতনার ভিটা থেকে গুলি করে বেশি মানুষ মারতে পারছিল না, তখন তারা ধান ক্ষেত ও পানির মধ্য দিয়ে পান্থবাড়িতে যায়। সেখানে মন্দিরে তপস্যারত এক গোঁসাইকে গুলি করে তারা হত্যাযজ্ঞের সূচনা করে।

www.pathagar.com

আমি তখন বিশ পঁচিশজন লোকের সাথে পুড়ে যাওয়া ঘরবাড়ির একপাশে লুকিয়ে আছি। এ সময় একজন এসে বলল, 'এভাবে থাকা নিরাপদ নয়।' তখন আমি দৌড়ে ধানক্ষেতের পানি পেরিয়ে বাড়ির দিকে যাওয়া শুরু করি। দৌড়ানো অবস্থায় আমি অনেক মানুষকে গুলি খেয়ে পড়ে যেতে দেখলাম। এক বৃদ্ধকে খুব মর্মান্তিকভাবে গুলি খেতে দেখলাম। তিনি গরু নিয়ে টেকের ওপর বসেছিলেন। তাঁর খুব শ্বাসকষ্ট ছিল। ওই বৃদ্ধকে যখন গুলি করা হয়, তখন তাঁর শরীরটা শূন্যে লাফিয়ে উঠে ছিটকে পড়ে যায়। তিনি সেখানেই মারা যান। আমি যখন দৌড়ে কটিয়ার ভিটার দিকে যাচ্ছিলাম, তখন আমার পেছনেও আর্মি দৌড়াচ্ছিল। তাদের সাথে রাজাকার ছিল কি না, তা দেখিনি। ঘরবাড়ি পোড়ানোর ধোঁয়ায় কাউকে ভাল করে চেনা যাচ্ছিল না। তারা সংখ্যায় সত্তর পঁচাত্তরজনের মতো ছিল।

আর্মি চলে যাওয়ার পর আমরা লাশগুলো গর্ত করে পুঁতে রাখি। এই রকম চারটা গর্ত এখানে আছে। এখানকার প্রতিটি গর্তে পর্যায়ক্রমে ৮৫, ৬০, ৪০, ও ৩০ টি লাশ পুঁতে রাখা হয়। এই গর্তগুলো করেছিল স্থানীয় লোকজন। আমি তখন অনেক ছোট ছিলাম। তাঁদের কোন সাহায্য করতে পারিনি। শুধু সাথে সাথেই ছিলাম। এই চারটা গর্ত খুঁড়লে এখনও হাড়, কঙ্কাল পাওয়া যাবে। আমি ওই গর্তগুলো এখনও দেখাতে পারব। গর্তগুলোতে মহিলাদের লাশই বেশি ছিল। কারণ পুরুষরা আগেই পালিয়ে গিয়েছিলেন। মহিলারা দ্রুত পালাতে পারেননি। শিশুদের লাশও ছিল অনেক। একজন মহিলা তাঁর দু'তিন মাসের ছেলেকে কোলে নিয়ে বেড়ার কোণায় লুকিয়ে ছিলেন। তাঁর সাথে আরও কয়েকটা ছোট ছোট ছেলে-মেয়ে ছিল। এঁদের সবাইকে পাকি বাহিনী গুলি করে হত্যা করে। এক পরিবারে ছ'জন লোক ছিল। ছ'জনের মধ্যে পাঁচ জনকেই পাকি সেনারা হত্যা করে। শুধু একজন বেঁচে যায়। এই গণহত্যায় আমার পিতা শহীদ হয়েছেন। তাঁর নাম বাটেশ নাথ। তাঁকে আমরা আলাদাভাবে কবর দিয়েছিলাম। তাঁর লাশের সৎকার করা সম্ভব হয়নি।

রাজিহার গ্রামের দেবেন্দ্রনাথ পাত্র বলেন, সে সময় আমি প্রায় সত্তর পঁচাত্তরজনের লাশ টেনেছি। এঁদের মধ্যে রাধা, কেষ্টসহ আরও অনেকের লাশ ছিল। এখানে চল্লিশটার মতো পুরুষের লাশ ছিল। বাকি লাশগুলো ছিল মহিলা ও শিশুদের। একদিন পর লাশগুলো আমরা দড়ি দিয়ে টেনে টেনে নিয়ে আসি। আমাদের বাড়িতে দশ জনকে গুলি করে হত্যা করা হয়। এদের মধ্যে বিনু ও মঙ্গল নামে আমার দু'জন চাচাতো ভাই, চার জন ভাইঝি, আমার বউদি ও পরিবারের অন্য একজন সদস্য ছিল। লাশের গায়ে যে সোনার গহনা ছিল, তা রাতের আঁধারে চোরে নিয়ে যায়। আমরা যে লাশগুলো মাটিচাপা দিই, সেগুলোকে তিন চার হাত গর্তের মধ্যে একটার ওপর একটা করে শুইয়ে দিয়েছিলাম। ছেচল্লিশ জনের আরেকটা গণকবর আছে অনিল ব্যাপারীর বাড়িতে। কেতনার কোলার চেয়ে এখানে নিহতের সংখ্যা ছিল অনেক বেশি। এখানে বিভিন্ন ডোবায় লাশ ভরে যায়। পরে সেগুলো ভেসে ওঠে। অনেক লাশ কুকুরেও খেয়েছে।

www.pathagar.com

আমি একবার মিলিটারির মুখোমুখি পড়ে যাই। সেদিন আমরা উনিশ জনের মতো লোক জমিতে কাজ করছিলাম। তখন সকাল দশটা হবে। এর আগেই পূর্ব দিকে সকাল আটটায় তারা আগুন লাগিয়ে দেয়। আমরা ভেবেছিলাম, এদিকে আর কিছু হবে না। কিন্তু একজন লোক এসে বলল, মিলিটারিরা এদিকে আসছে। আমরা তখন দৌড় দিলাম। আমার সাথে কান্দির পারের দু'জন লোক ও আমার বাবা ছিলেন। উনিশ জনের মধ্যে আমরা চারজন ছাড়া বাকি পনেরো জন অন্য দিকে পালিয়ে যান। ওই পনেরো জন মিলিটারির সামনে গিয়ে পড়েন। এঁাদের সবাইকে পাকি বাহিনী গুলি করে হত্যা করে। এই গণহত্যা সংঘটিত হয় একাত্তরের পয়লা জ্যৈষ্ঠ, রোববার। আমরা লাশগুলোকে সোম, মঙ্গল ও বুধবারে কবর দিয়েছিলাম। সেই সব লাশের মধ্যে দেখলাম, এক মহিলা ও তাঁর কোলের শিশুর মাথার খুলি উড়ে গেছে কিন্তু বাচ্চার মুখে তখনও মায়ের স্তন ধরা। বাচ্চাটি মায়ের দুধ পানরত অবস্থায় মারা যায়। যে সমস্ত লাশ কবর দেয়া হয়নি, তাঁদের কঙ্কাল থেকে বিশ পঁচিশটা মাথার খুলি এনে আম গাছে টাঙিয়ে রেখেছিলাম। এক বছর পর মোল্লা পাড়া থেকে একজন লোক এসে সেগুলো নিয়ে যায়।

উত্তর বিজয়পুরের আবদুর রশীদ ভূঁইয়া একাত্তরে পার্শ্ববর্তী তর্কি বালিকা বিদ্যালয়ের শিক্ষক ছিলেন। সে সময় তিনি পাকি হানাদার বাহিনীর হত্যাযজ্ঞ ও নির্যাতন প্রত্যক্ষ করেন। আমাদের প্রতিনিধিকে এ বিষয়ে তিনি বলেন, আমি তখন আমার গ্রাম থেকে বাইশ মাইল দূরে বরিশাল শহরে মাঝে মধ্যে যেতাম। একদিন ফেরার পথে দেখলাম, দুই তিনজন মিলিটারি লাইট পোস্টের সাথে এক লোককে বেঁধে কুড়াল দিয়ে কোপাচ্ছে। এ ধরনের ঘটনা সে সময় আরো অনেক দেখেছি। একদিন দেখলাম, গৌরনদী কলেজে একজন লোককে হত্যা করে খালের পাড়ে ফেলে দিচ্ছে। সন্ধ্যার পর যখন পাশের গ্রাম থেকে বাড়ি ফিরতাম, তখন প্রতিদিন চার পাঁচটা করে গুলির শব্দ শুনতে পেতাম। সে সময় আমাদের খালে পাড়ে লাশ পড়ে থাকতে দেখতাম। আমরা বাঁশ দিয়ে ঠেলে লাশগুলো খালের পানিতে নামিয়ে দিতাম। ন'মাসে এরকম পঞ্চাশ ষাটটা লাশ আমরা দেখেছি। সব লাশ ছিল পুরুষের।

তবে মহিলাদের কলেজে ধরে নিয়ে যেত বলে আমরা শুনেছি। ফুলেশ্বরী, আগৈলঝাড়া প্রভৃতি জায়গা থেকে মহিলাদের ধরে আনা হত। কত মহিলা সেখানে ছিল, তার সঠিক সংখ্যা আমার জানা নেই। পাকি হানাদাররা কলেজের পেছনের পুকুরে তর্কির দেওয়ানের দু'ভাইকে জবাই করে পশ্চিম পাশে কবর দেয়। দেশ স্বাধীন হওয়ার পর সেখান থেকে অনেক কঙ্কাল ওঠানো হয়। আমি নিজেও দশ বারোটি মাথার খুলি পেয়েছিলাম।

ক্যাপ্টেন মুনির, সুবেদার সিদ্দিক, ইয়ামিন, হানিফ (র‍্যাংক অজ্ঞাত) প্রমুখ পাকিস্তানি আর্মি ও তদের সহযোগীরা বরিশাল জেলা শহরসহ সেখানকার সকল গণহত্যা, ধর্ষণ, অগ্নিসংযোগ ও লুটপাটের সাথে সরাসরি জড়িত ছিল। সুতরাং তারা যুদ্ধাপরাধের দায়ে অভিযুক্ত ও শাস্তি পাওয়ার যোগ্য।

www.pathagar.com

আসামী ঃ কর্নেল আতিক, মেজর নাদের পারভেজ, ক্যাপ্টেন এজাজ, ক্যাপ্টেন কাদরি, ক্যাপ্টেন এরশাদ (কর্নেল জানজুয়ার আত্মীয়), সুবেদার সেলিম, ইউসুফ (র‍্যাঙ্ক অজ্ঞাত, ক্যাপ্টেন এরশাদের ভাগ্নে), হাবিলদার শাহনেওয়াজ, সুবেদার সেলিম (মৃত), সিপাহী সিদ্দিকুর রহমান।

অপরাধের ধরনঃ গণহত্যা, জাতিগত নিধন, ধর্ষণ, লুটপাট, অগ্নিসংযোগ।

সাক্ষী ঃ এম. রাব্বানী ফিরোজ, তুষার কান্ত মোসিদ, আবুল কালাম মহিউদ্দিন, জামালুল হক, অধ্যাপক রমেন্দ্রনাথ সিকদার, ঠাকুরচাঁদ মজুমদার, মনখুশী সিকদার, শান্তি বালা মন্ডল, অরুণবরণ চক্রবর্তী, সুবেদার আব্দুল আজিজ সিকদার।

ঘটনাকালঃ একাত্তরের পঁচিশ মার্চ থেকে স্বাধীনতার পূর্ব পর্যন্ত।

ঘটনাস্থল ঃ পিরোজপুর জেলা।

সূত্রঃ যুদ্ধাপরাধ গণহত্যা ও বিচারের অন্বেষণ এবং WCFFC গবেষণা।

আসামী কর্নেল আতিক, মেজর নাদের পারভেজ, ক্যাপ্টেন এজাজ, ক্যাপ্টেন কাদরি, ক্যাপ্টেন এরশাদ (কর্নেল জানজুয়ার আত্মীয়), সুবেদার সেলিম, ইউসুফ (র‍্যাঙ্ক অজ্ঞাত, ক্যাপ্টেন এরশাদের ভাগ্নে), হাবিলদার শাহনেওয়াজ, সুবেদার সেলিম (মৃত), সিপাহী সিদ্দিকুর রহমান প্রমুখ পিরোজপুর জেলায় ব্যাপক গণহত্যা, ধর্ষণ, জাতিগত নিধন, লুটপাট ও অগ্নিসংযোগ চালায়।

একাত্তরের চৌঠা মে পাকি বাহিনী কর্নেল আতিক ও ক্যাপ্টেন এজাজের নেতৃত্বে পিরোজপুর শহর আক্রমণ করে। তারা হিন্দু বাড়িগুলোতে হামলা চালিয়ে অগ্নিসংযোগ করে। কালিবাড়ি রোডের দু'পাশে মাছিমপুর, পালপাড়া, শিকারপুর, রাজারহাট, কুকারপাড়া, ডুমুরতলা, কদমতলা, নামাবপুর, আলমকুঠি, ঢুকিগাতি, রাণীপুর, পারের হাট, চিংড়াখালি এলাকায় তারা ধ্বংসযজ্ঞ চালায়। পাঁচই মে দালালদেরকে সহযোগিতা না করায় অভিযোগে ও মুক্তিযুদ্ধকে সমর্থন করায় এসডিও আবদুর রাজ্জাক, ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট মিজানুর রহমান ও এসডিপিও ফয়জুর রহমান আহমেদকে (কথাশিল্পী হূমায়ূন আহমেদের পিতা) গ্রেফতার করা হয়। ছয়ই মে দুর্নীতি দমন বিভাগের দারোগা হীরেন্দ্র মহাজনসহ সবাইকে পাকি সেনারা বলেশ্বর নদীর পাড়ে গুলি করে হত্যা করে। চব্বিশে মে তারা দৈহারী ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যানের বাড়ির সামনে সতেরো জনকে হত্যা করে। খাড়াবাগ গ্রামের অনুলি রানিকে হাতপা বেঁধে জীবন্ত পুড়িয়ে মারে। স্বরূপকাঠি থানা আওয়ামী লীগের সহ সভাপতি শামসুল হককে হুলারহাটে হত্যা করে। চৌঠা জুন পাকি সেনারা ছাত্র লীগের সভাপতি ওমর ফারুককে হত্যা করে। এ মাসেই পিরোজপুর সদর থানার তেজকাঠি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সামনে খালের তীরে তেইশজনকে পাকি সেনারা হত্যা করে। কৃপখোলা গ্রামে আইয়ুব আলী মেম্বারের পরিবারের চৌদ্দ জন সদস্যকে

www.pathagar.com

একইভাবে হত্যা করা হয়। সমাজ সেবক সতীশ মাঝি, ডা. ওয়াজেদ আলী হাওলাদার, ছাত্রনেতা সাওগাতুল আলম, সগীর, জিয়াউদ্দিন, মোস্তফা, আনোয়ারুল কাদির, গণপতি হালদার, সুধীর, রঞ্জন, মালেক, অমল, বীরেন ও শামসুল হককে ছয়ই জুন হত্যা করা হয়।

স্বরূপকাঠি থানার আটঘর কুড়িয়ানা মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের পেছন দিকের ডোবায় চার'শ' নিরীহ বাঙালিকে হত্যা করে মৃতদেহ মাটিতে পুঁতে রাখে পাকি আর্মি। সোহাগদল গ্রামের কাছারিউল্লার বাড়িতে সাত জনকে হত্যা করে পাকি সেনারা। সরকারি কলেজের গাবতলী পুকুরে এগারো জনকে হত্যা করে ফেলে রেখে যায়। স্বরূপকাঠি থানার মৌকালীতে শহীদের হাটে সতেরোই বৈশাখ নয়টি বাড়িতে অগ্নিসংযোগ করে দু'জন গ্রামবাসীকে হত্যা করা হয়। ছাব্বিশে বৈশাখ তারা আবার গ্রামে আসে এবং বস্ত্র ব্যবসায়ী মতিলাল দেবনাথের দোকান লুট করে। ওইদিন তিনিসহ মোট আঠারো জন পাকি সেনাদের হাতে নিহত হন। ছয়ই জ্যৈষ্ঠ সসীদে গ্রামে গুলি করে দু'ব্যক্তিকে হত্যা করা হয়। এঁদের একজন স্থানীয় স্কুল সেক্রেটারি কালিকান্ত মণ্ডল। পঁচিশে শ্রাবণ শংকরধবল গ্রামে পাকি বাহিনী সুনীল সরকার ও রোহিণী কুমার মণ্ডলকে হত্যা করে। এ ছাড়া কুড়িয়ানা, সসীদে, বাউকাঠিসহ জলাবাড়ির তেত্রিশটি গ্রাম জ্বালিয়ে দেওয়া হয়। নাজিরপুর, বানারিপাড়া থানায় কয়েক শ' লোককে হত্যা করা হয়। শুধু পিরোজপুর জেলাতেই সাতটি থানায় ত্রিশ হাজার লোককে হত্যা করে পাকি বাহিনী। কয়েকজন প্রত্যক্ষদর্শীও ক্ষতিগ্রস্তের জবানবন্দী এখানে উল্লেখ করা হল।

১. অধ্যাপক রমেন্দ্রনাথ সিকদার বলেন, একাত্তরের উনিশে মে পাকি বাহিনী এখানে এসে গ্রামের গার্লস ও বয়েজ হাই স্কুল, কুড়িয়ানা বাজারসহ গ্রামের এক শ' বিশটি ঘর পুড়িয়ে দেয়। ফলে সাধারণ গ্রামবাসীরা পেয়ারা বাগানে গিয়ে আশ্রয় নেন। দেশেহারা এসব গ্রামবাসীগণ তখন মানবেতর জীবন যাপন করছিলেন। প্রতি মুহূর্তে মৃত্যুর আশঙ্কা তাঁদেরকে তাড়া করে ফিরছিল। ঠিক সে মুহূর্তে মেজর নাদের পারভেজসহ অন্যান্য পাকি আর্মি অফিসারের নেতৃত্বে পাকি আর্মি কুড়িয়ানা স্কুলে ক্যাম্প স্থাপন করে।

এই ক্যাম্পের স্থায়িত্ব ছিল এগারোই জুন থেকে বাইশে জুন পর্যন্ত। এই এগারো দিনে এক শ' পঞ্চাশ থেকে এক শ' সত্তরজন নিরীহ বাঙালিকে হানাদাররা হত্যা করে। পেয়ারা বাগানে তিনটা নালা ছিল। মাঝের নালাটিতে আমি এক শ'টি লাশ দেখেছি। স্কুলে ক্যাম্প থাকাকালীন আমি পার্শ্ববর্তী গ্রাম মাহমুদকাঠিতে গিয়ে আশ্রয় নিয়েছিলাম। বাইশ তারিখ ক্যাম্প উঠে যাওয়ার পরপরই দু'চার জন বন্ধুসহ গ্রামে ফিরে আসি। এ সময় আমি পেয়ারা বাগানের পার্শ্ববর্তী বধ্যভূমিটি দেখি। এখানকার লাশগুলোর কিছু কিছু ছিল পিঠমোড়া করে বাঁধা। কারও হাতপা বাঁধা, কারও বা কোমরে দড়ি বাঁধা। লাশগুলো দেখে মনে হচ্ছিল, একই দড়িতে বেঁধে সবাইকে গুলি

www.pathagar.com

করা হয়েছে। লাশের ওপরে লাশ পড়ে ছিল। শিশুসহ বেশ কিছু লোক সে সময় বধ্যভূমিটি দেখার জন্য ভিড় জমায়। কমল নামের একটি শিশু এ দৃশ্য দেখে জ্ঞান হারায়। এখানে একই দড়িতে আনুমানিক পনেরো বিশ জন করে বেঁধে গুলি করে হত্যা করা হয়। গ্রামের ভেতর দিয়ে যেতে যেতে আমরা কঠুরাকাঠি ও আদমকাঠির মধ্যবর্তী এলাকায় একজন লোক খুঁজে পাই। তাঁর কাছ থেকে জানতে পারি, গ্রামের কিরণ সিকদারের বাড়িতে বিশ জনের মত ধর্ষিতা মহিলাকে পরিচর্যা করার জন্য একটি পরিত্যক্ত কক্ষে রাখা হয়েছে। এই বিশ জন ধর্ষিতা মহিলার মধ্যে দু'চারজনকে আমি চিনি। তবে সামাজিক কারণে তাঁদের নাম প্রকাশ করতে পারছি না। কুড়িয়ানা গ্রামের দশ বারো জন মহিলা পাকি বাহিনী কর্তৃক ধর্ষণের শিকার হন। এঁদের সবাই প্রায় মারা গেছেন। তবে দু'তিনজন এখনও জীবিত আছেন।

আমার বাড়িতে আমার দাদা কাশিষ্য সিকদার, জিতেন সিকদার, যজ্ঞেশ্বর সিকদার, কাকিমাসহ (উপেনের মা) পাঁচ জন পাকি বাহিনীর হাতে নিহত হন। কুড়িয়ানা গ্রামে বিশ জনের মত নিরীহ গ্রামবাসীকে হত্যা করা হয়। গ্রামের কোন বাড়িঘর পাকি বাহিনীর ধ্বংসযজ্ঞ থেকে বাদ যায়নি। সব বাড়িঘরই তারা জ্বালিয়ে দেয়। শুধু যে ঘরটাতে নির্যাতিত মহিলাদের আশ্রয় দেওয়া হয়েছিল, সেটা আধপোড়া অবস্থায় ছিল। শশী, দমত্যকাঠি, দেশাইনখান এসব এলাকা থেকে ধরে আনা মহিলারাই কিরণ সিকদারের পোড়া ঘরটিতে গ্রামের কিছু লোকের সহযোগিতায় প্রাথমিক চিকিৎসা পেয়েছিলেন। পেয়ারা বাগান থেকে স্থানীয়রা পালিয়ে যেতে পারলেও প্রায় দুই হাজারের মতো বহিরাগত মানুষ পালিয়ে যেতে পারেন নি। কঠুরাকাঠির অন্নদাচরণ বিশ্বাস ও যজ্ঞেশ্বরসহ অসংখ্য লোককে এখানে হত্যা করা হয়। পরে জানা যায়, প্রায় তিন হাজারের মতো মানুষকে পেয়ারা বাগান এলাকায় হত্যা করা হয়েছিল।

যুদ্ধ থেমে গেলে সবাই যখন গ্রামে ফিরে আসেন, তখন গ্রামগুলো জনশূন্য ছিল, গাছপালায় ঢেকে গিয়েছিল ঘরবাড়ি। সে সময় চারদিকে মানুষের কঙ্কালে এক বিভীষিকাময় পরিবেশের সৃষ্টি হয়। গ্রামগুলোকে মনে হয়েছিল এক একটা পুরানো শ্মশান। বাহাত্তর সালের এপ্রিল মাসে তৎকালীন মন্ত্রী কামরুজ্জামান সাহেব কুড়িয়ানা পরিদর্শনে আসেন। কুড়িয়ানা বধ্যভূমিতে পাওয়া মাথার খুলি, কঙ্কাল ও হাত পায়ের বিচ্ছিন্ন অংশ মোট চারখানা আড়াই মণ বস্তায় ভরে তিনি ঢাকায় নিয়ে যান। গ্রামের সাধারণ মানুষের হাড়গোড়গুলো পেয়ারা বাগানের বিভিন্ন স্থানে পুঁতে রাখা হয়েছিল। রমেন্দ্রনাথের বাড়ির পাশে ও পেছনে কিছুটা দূরে কালভার্টের কাছে বড় দু'টি বধ্যভূমি রয়েছে। এই দু'টি বধ্যভূমিতে কতজনকে হত্যা করা হয়েছে, তা কেউ বলতে পারেন নি। তবে দুটো বধ্যভূমিতে দু'শ জনের কঙ্কাল রয়েছে বলে অনেকে মত প্রকাশ করেন।

www.pathagar.com

২. কুড়িয়ানার ঠাকুরচাঁদ মজুমদার বলেন, সে সময় পেয়ারা বাগানে পনেরো শ'র মত মানুষ আশ্রয় নিয়েছিলেন। এদের প্রায় সবাই পাকি বাহিনীর হাতে নিহত হন। ষষ্ঠীচরণ, চার জন আত্মীয় ক্ষেত্রমোহন, অনুকূল মজুমদার, নগেন মজুমদার ও সুরেন্দ্র মজমুদারকে পাকি বাহিনী গুলি করে হত্যা করে। তিনি নিজে পেয়ারা বাগানে লুকিয়ে থাকার কারণে প্রাণে বেঁচে যান। পাকি বাহিনী হত্যাকাণ্ড ঘটিয়ে চলে যাওয়ার পর বাড়িতে এসে তাঁর পিতা ও অন্য চার জন আত্মীয়ের লাশ দেখতে পান। এ ছাড়া আরও অনেকগুলো হত্যাকাণ্ড তিনি সে সময় দেখেছেন। কিন্তু বয়সের ভারে ন্যুব্জ হয়ে যাওয়ায় সেগুলো পুরোপুরি বলতে পারেননি।

৩. মনখুশী সিকদার একাত্তর সালে পাকি হানাদার বাহিনী কর্তৃক ধর্ষিত, হয়েছিলেন। পাকি সেনাদের সেই বন্য পাশবিক অত্যাচারের কথা বলতে গিয়ে তাঁর দু'চোখে অশ্রুর বাঁধভাঙা ঢল নামে। ত্রিশ বছর ধরে তিনি সেই অত্যাচারের কথা মনে করে কাঁদলেন। তিনি বলেন, গ্রামের অন্যান্য নারীর সাথে আমাকেও পাকি হানাদাররা তাদের ক্যাম্পে ধরে নিয়ে যায়। তারা গ্রামের সব মহিলাকেই তাড়া করেছিল। কিন্তু আমি আমার ন'বছরের কন্যা সন্ধ্যা, এক খুড়ি শাশুড়ি ও এক জাসহ দশ জন পাকি হানাদার বাহিনীর হাতে ধরা পড়ে যাই। আমাদেরকে টেনে হিঁচড়ে তারা কুড়িয়ানা ক্যাম্পে নিয়ে যায়। ক্যাম্পে আনার পর তারা আমাকে দিয়ে মরিচ, মশলা বাটায় ও রান্নাবান্না করায়। পাকি হানাদাররা আমাদের সবার ওপরেই পাশবিক নির্যাতন চালিয়েছিল। আমার ন'বছরের মেয়ে সন্ধ্যা ছাড়া বাকি দশজনের সবাই বিবাহিত ছিলেন। অনেকের সাথে ছোট ছেলেমেয়ে ছিল। কোলের বাচ্চাগুলো তখন চিৎকার করে কাঁদছিল। ধৃত মহিলাদের বয়স নয় থেকে পঁয়ত্রিশ বছরের মধ্যে। স্বরূপকাঠি ও মাহমুদকাঠির রাজাকাররাও পাকিস্তানি মিলিটারিদের সাথে আমাদের ওপর অত্যাচার করে। মিলিটারিরা মোট চারদিন ক্যাম্পে আটকে রেখে আমাদের ওপর যৌন নির্যাতন করেছিল। অত্যাচারের ধরন এত জঘন্য ছিল যে, তার বর্ণনা দেওয়া আমার পক্ষে সম্ভব নয়। হানাদাররা আমাদের ওপর পাশবিক নির্যাতন চালিয়ে রক্তাক্ত করে দিয়েছিল।

ক্যাম্পে চার দিন বন্দী থাকার সময় আমরা অনেক লোককে হত্যা করতে দেখি। নিহতদের মধ্যে কোন নারী ছিল না। ওই চার দিনে তারা নব্বই জনের মত বাঙালিকে হত্যা করে। এসব পুরুষের আশেপাশের গ্রাম থেকে ধরে এনে হত্যা করা হয়। পাশবিক নির্যাতনের পর হানাদাররা আমাদেরকে লাঠি দিয়ে আঘাত করে জানতে চায়, 'মুক্তি কোথায়?' জবাবে মুই বলি যে, 'হেইয়া মুই চিনি না।' আমি তখন বিধবা ছিলাম। স্বাধীনতার ছ'বছর আগে আমার স্বামী হিমাংশু কুমার সিকদার তিন ছেলে ও এক মেয়েকে রেখে অকালে মারা গিয়েছিলেন। মনখুশী আরও কয়েকজন বীরাঙ্গনার কথা উল্লেখ করে বলেন, আমার সাথে শোভা (৩৫), সুরুচি (১৮), দুলি (কমবয়সী), মুকুন্দ ঢালির বউ ও রঙিলার মা নির্যাতিত হন। এইসব বীরাঙ্গনার সাথে আমিও কুড়িয়ানা থেকে অন্যত্র চলে গিয়েছিলাম। পরে অনেক দ্বিধাদ্বন্দ্বের পর বাড়ি

www.pathagar.com

ফিরে আসতে বাধ্য হই। আমার মেয়ে সন্ধ্যা তখন থেকেই অসুস্থ হতে শুরু করে এবং এই ঘটনার অল্প কিছু দিনের মধ্যেই সে মারা যায়। আমি পাঁচ ছয়দিন পর নিজের বাড়িতে ফিরে আসি। বাড়িতে এসে পোড়া ভিটের ওপর শুধু কয়লা ও ছাইয়ের স্তূপ দেখতে পেয়েছিলাম।

৪. শান্তি বালা মণ্ডল বলেন, যখন এখানে মিলিটারির লঞ্চ আসে, তখন আমরা বাড়ির উঠানে হাঁটাহাঁটি করছিলাম। মিলিটারির লঞ্চ দেখার পর আমরা একটা নালার ভেতরে গিয়ে লুকিয়ে পড়ি। সেখানে আমি আমার শাশুড়ি ও দুই ছেলেমেয়েকে সাথে নিয়ে লুকিয়ে ছিলাম। তখন পাকিরা আমাদেরকে খুঁজছিল। এ সময় তারা পেয়ারা বাগান ও আশপাশের অনেক লোককে মারধর করে। আবার অনেক পুরুষ ও মহিলাকে তারা ধরেও নিয়ে যায়। পেয়ারা বাগানে তারা অনেককে গুলি করে হত্যা করে। যে সমস্ত পুরুষদের হায়েনারা ধরে নিয়ে যায়। তাঁদের সবাইকে হত্যা করা হয়। দু'চারজন মহিলাকে ছেড়ে দেয়। তবে তাঁদের ওপর পাশবিক নির্যাতন করা হয়েছিল বলে শুনেছি।

পেয়ারা বাগানে আমি কাপড় দিয়ে তৈরি করা একটা ঘরে ছিলাম। সে সময় দু'জন মিলিটারি আমার কোলের ছোট মেয়েটাকে কেড়ে নেয়। এরপর অন্য একজন মিলিটারি আমার যৌন নির্যাতনের চেষ্টা করে। সে আমার কোমরের কাপড় বেয়নেট দিয়ে ফেড়ে ফেলে। এরপর কিছু দূর গিয়ে একটি কুমড়া গাছের পাশে দাঁড়িয়ে হাতে একটু কুমড়া নিয়ে আমাকে ডাকে। কুমড়া নেব কি না, জিজ্ঞাসা করে। কাছে গেলে অত্যাচারের মাত্রা বাড়তে পারে ভেবে প্রায় উলঙ্গ শরীরে আমি বলি, 'আমার ঘরে অনেক কুমড়া আছে। কুমড়া লাগবে না, তোমরা আমার মেয়েকে ফিরিয়ে দাও।

মেয়েকে নিয়ে বাড়ি ফিরে আসার পর আমি আশা রানী মণ্ডলকে (ধর্ষিতা, স্বামী বিন্দু মণ্ডল) আমার ঘরে আশ্রয় দেই। বাবার বাড়ির বাগানে নিয়ে পাকি সেনারা তাঁকে ধর্ষণ করেছিল। সেখান থেকে আশা রানী ডাক্তার দেখিয়ে শ্বশুরবাড়ি আসেন। কিন্তু লজ্জায় নিজের ঘরে না গিয়ে আমার ঘরে এসে ওঠেন। পাকি বাহিনীর নির্যাতনের পর আশা রানী হাঁটতে পারছিলেন না। তাই গোপনে ডাক্তার দেখান। এ ব্যাপারে আশা রানী আমাকে বলেন, কি বলব কাকিমা, লজ্জার কথা, আমার শরীরে খুব কষ্ট।

শান্তি বালার বড় জা পুতুল রানী মণ্ডলও একই বাড়িতে ছিলেন। মেয়ে কৃষ্ণা ও কোলের একটি শিশুকে নিয়ে তিনি দুপুরের রান্না করছিলেন। এ সময় একজন আর্মি তাঁর সামনে এসে হাত ধরে টানাটানি করে। বিয়ের প্রলোভন দেখিয়ে যৌনকর্ম করার প্রস্তাব দেয়। সে সময় তাঁর বৃদ্ধ শাশুড়ির চেঁচামেচিতে তিনি শ্লীলতাহানি থেকে কোন রকমে রক্ষা পান।

শান্তিলতা মৈত্র (স্বামী মনোরঞ্জন মৈত্র) পাশের বাড়ির গৃহবধূ। গ্রামের অনেকের ঘরের সাথে তাঁদের ঘরও পুড়িয়ে দেওয়া হয়। তাঁর স্বামীকেও পাকিবাহিনী হত্যা করে। তাকে তারা ঝালকাঠি নিয়ে যায়। তারিখটা শান্তিলতার মনে নেই, তবে

www.pathagar.com

শুক্রবার এবং বাংলা অগ্রহায়ণ মাস ছিল বলে তিনি মনে করতে পারেন। কোলে শিশু সন্তান ছিল বলে তারা শান্তিলতাকে নিতে পারেনি। তবুও তাঁকে ধরে টানাহেঁচড়া করেছিল। পাশের ঘরের মালতীর স্বামী মজুমদারকেও তারা ধরে নিয়ে গিয়েছিল। গ্রাম থেকে আনুমানিক বিশ জন পুরুষকে তারা ধরে নিয়ে যায়, যাঁদের লাশ ফেরত পাওয়া যায়নি। দু'দিন পর শুধু মজুমদারের গুলিবিদ্ধ পচা লাশটি নদীর চরে পড়ে থাকতে দেখা যায়।

৫. অরুণবরণ চক্রবর্তী বলেন, সেদিন ছিল সরস্বতী পূজা। গ্রামে পূজা করানোর পুরোহিত না থাকায় আমি নিজেই পুরোহিতের দায়িত্ব পালন করছিলাম। আমার বাড়ির দু'টি মন্দির পাকি হানাদাররা পুড়িয়ে দিয়েছিল। আমাকে তারা বেয়নেট দিয়ে খুঁচিয়ে মারার চেষ্টা করে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত আমি বেঁচে যাই। বেয়নেটের পাঁচ ছ'টি ক্ষতচিহ্ন নিয়ে আমি এখনও বেঁচে আছি। ওই এলাকায় যে সমস্ত পাকি বাহিনীর নেতৃত্বে নির্যাতন চালানো হয় তাদের তিনজনের নাম আমার মনে আছে। এরা হল পটুয়াখালীতে মেজর নাদির পারভেজ, ঝালকাঠিতে ক্যাপ্টেন আজমল ও লে. তারিক।

আমি আগে থেকেই বাড়িতে পাকিস্তানি পতাকা উড়িয়েছিলাম। ভেবেছিলাম পাকিস্ত ানি পতাকা ওড়ালে আমার কোন ক্ষতি হবে না। কিন্তু বাস্তবতা ছিল আমার ধারণা থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন। ক্যাপ্টেন র‍্যাঙ্কের একজন জুনিয়র পাকি অফিসার ও কিছু সৈন্য প্রথমদিন আমার বাড়িতে আসে। কিন্তু আমি এই এলাকার মেজর (নাম মনে করতে পারেননি) এর নাম ভাঙিয়ে কিছুক্ষণের জন্য পরিস্থিতি শান্ত রাখতে পেরেছিলাম।

অনেকে বলেছেন, অরুণবরণের বাড়িতে পাকিস্তানিরা ক্যাম্পের মত করেছিল। তবে তিনি এ ব্যাপারে কিছু বলতে রাজি হননি। নারী নির্যাতন প্রসঙ্গে একটি ঘটনার কথা উল্লেখ করে তিনি বলেন, নির্যাতনের পর কম বয়সী একটি মেয়েকে পাকি হানাদাররা বেয়নেট দিয়ে খুঁচিয়ে রক্তাক্ত করে। এই মেয়েটিকে পরে স্বেচ্ছাসেবকরা সম্ভবত ইউনিসেফের একটি লঞ্চে তুলে দেন। আরও অনেক ঘটনা আমি সে সময় নিজ চোখে দেখেছি।

ক্যাপ্টেন এজাজের নেতৃত্বে পাকি সেনারা পরদিন সকালেই গ্রামে হামলা চালিয়ে তেরো জনকে হত্যা করে। পিস কমিটির সদস্যদের সহায়তায় তারা হিন্দুদেরকে ধরে হাসপাতালের ভিতরে নিয়ে হত্যা করে। এই বধ্যভূমিতে প্রায় পঞ্চাশ জনকে হত্যা করা হয়েছে। এছাড়া গুলি করে কত লাশ যে, নদীতে ফেলে দেওয়া হয়েছে, তার সঠিক সংখ্যা কেউ জানে না। পরবর্তীতে আমরা জানতে পারি কয়েকজনকে গুলি করার পরও বেঁচে যান। এরা হলেন কার্তিক দাস, পশারিবুনিয়ার বিজয় কৃষ্ণ বালা ও রনজিৎ কুমার। এদের হাতে এখনও গুলির চিহ্ন আছে। এখানে অবস্থানকারী পাকি সেনাদের মধ্যে ক্যাপ্টেন এজাজ এবং সিপাহী সিদ্দিকুর রহমানের নাম আমার মনে আছে। তারা কম করে হলেও এখানকার পাঁচ শ' ঘরবাড়ি জ্বালিয়ে দিয়েছিল। এসব

www.pathagar.com

ক্ষতিগ্রস্ত ঘরবাড়ির বেশিরভাগই ছিল হিন্দুদের। নারী নির্যাতন প্রসঙ্গে তিনি বলেন, এখানে নির্যাতিত মহিলার সংখ্যা প্রায় পঞ্চাশ জন হবে, এদের মধ্যে হিন্দু, মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের মহিলাই আছেন। ভাণ্ডারিয়া থানার ভিটাবাড়িয়া গ্রামেই বেশি নারী নির্যাতন হয়েছে। এখানে নারী নির্যাতনের সবচেয়ে মর্মস্পর্শী ঘটনা শফীজউদ্দীনের মেয়ের ঘটনা। তার বাড়ি বোর্ড স্কুলের পাশে। সে তার আঠারো উনিশ বছরের মেয়েকে নিয়ে পাকি সেনাদের হাতে তুলে দিয়েছিল। আর্মি রাতভর মেয়েটিকে ধর্ষণ করে। কী কারণে সে নিজের মেয়েকে হায়েনাদের হাতে তুলে দিয়েছিল, তা আমি জানি না। স্বাধীনতার পরে তাকে আমি ধরে এনেছিলাম। স্কুল মাঠে শফীজ উদ্দীনের বিচার হয়েছিল। বিচারে তাকে এক শ' বেত্রাঘাত করা হয়েছিল। পরে মেয়েটিকে সে অন্যত্র বিয়ে দেয়। ছায়া রানী নামে আরেকজন সুন্দরী মহিলাকে আমি চিনতাম, যার ওপর পাশবিক নির্যাতন চালানো হয়েছিল। তাঁর স্বামী গণেশকে পাকিরা নির্মমভাবে হত্যা করে। ছায়ারানী তখন দুই সন্তানের জননী। নির্যাতিত হওয়ার পর তিনি আমার কাছে আশ্রয়ের জন্য এসেছিলেন।

৭. পারেরহাটের জামালুল হক বলেন, পাকি আর্মি একাত্তর সালের পাঁচই মে ক্যাপ্টেন এজাজের নেতৃত্বে পিরোজপুরে প্রবেশ করে। প্রথমে তারা থানায় এসে ওঠে। তারপর পিরোজপুর সরকারি বালক বিদ্যালয়ে ঘাঁটি স্থাপন করে। পিরোজপুরে ঢুকেই তারা অগ্নিমূর্তি নিয়ে শহরতলীর পূর্বপাশা কেষ্টনগর গ্রামে আসে। সেখান থেকে দু'টি গ্রুপে বিভক্ত হয়ে একটি গ্রুপ খামকাটা গ্রামে ঢুকে ধানক্ষেতে লুকিয়ে থাকা পনেরো ষোল জন নিরীহ গ্রামবাসীর ওপর এলোপাতাড়ি গুলি চালায়। গুলিতে বারো তেরো জন মারা যান। এঁদের মধ্যে মনীন্দ্র মিত্র এবং নীলকান্ত মিত্র নামে দু'জনের নাম এই মুহূর্তে আমার মনে পড়ছে। যাঁদেরকে হত্যা করা হয়েছিল, তাঁদের লাশ দাহ করার অবস্থা তখন ছিল না। পরবর্তী সময়ে এসব লাশ শিয়াল কুকুরের পেটেই যায়।

এরপর পাকি আর্মি শহরে ঢুকে বাজারের ভিতর এলোপাতাড়ি গুলি ছুঁড়তে থাকে। গুলিতে একজন মারা যান। বাজারে হামলা করার পর তারা তাদের ঘাঁটিতে ফিরে যায়। একদিন পর আবার শহরের রাজনৈতিক কর্মী, মুক্তিযোদ্ধা এবং যারা মুক্তিযোদ্ধাদের সাহায্য সহযোগিতা করেছিলেন, তাদের আট দশটি বাড়ি গান পাউডার ছিটিয়ে আগুন লাগিয়ে দেয়।

নারী নির্যাতন প্রসঙ্গে তিনি বলেন, শুধু পিরোজপুর শহরেই নির্যাতিত মহিলার সংখ্যা এক শ' পঞ্চাশ জন হবে। এঁদের মধ্যে বেশিরভাগই ছিল হিন্দু পরিবারের। পিরোজপুরের নাছিমপুর, মসিদবাড়ি, কেষ্টনগর, মিত্রবাড়ি, শিকারপুর, মাটকাঠি, রায়েরকাঠি, কদমতলা, আলমকাঠি, ব্রাহ্মণকাঠি, চলিশা, দুর্গাপুর ছিল হিন্দু অধ্যুষিত এলাকা। রাজাকারদের সহায়তায় পাকি বাহিনী রাতের বেলা এই সমস্ত বাড়ি আক্রমণ করে যুবতী মেয়েদের ধরে নির্যাতন করেছে। নির্যাতিত মহিলাদের মধ্যে

www.pathagar.com

বুলু, অনিমা সরকার, পরিণীতা সাহা, নীলা, বিজলী, শান্তি প্রমুখের নাম জানা যায়। এঁদের বেশিরভাগই পরবর্তীতে এলাকা ছেড়ে চলে যান।

পাকি আর্মি প্রসঙ্গে তিনি বলেন, ক্যাপ্টেন এজাজ এখানে প্রথমে দায়িত্ব নিয়ে আসে। অক্টোবরের দিকে সে চলে যাওয়ার পর সুবেদার সেলিম এখানকার দায়িত্ব পায়। সুবেদার সেলিম যুদ্ধের শেষ পর্যন্ত এই এলাকায় ছিল। সে যখন বুঝতে পারল যে, তারা দখল দারিত্ব বজায় রাখতে পারবে না তখন পাকিস্তানি আর্মি ও মিলিশিয়ারা এখান থেকে পালিয়ে যাওয়ার পরিকল্পনা করে। পালিয়ে যাওয়ার সময় তারা পিরোজপুর সোনালী ব্যাংক লুট করে। লুট করা অর্থ নিয়ে তারা খুব তাড়াহুড়ো করে একটি খোলা জিপে রওনা হয়। কিন্তু একটি ব্রিজ পার হওয়ার সময় নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে আমগাছের সাথে ধাক্কা খেয়ে জিপটি পার্শ্ববর্তী খাদে পড়ে যায়। সুবেদার সেলিম নিজেই গাড়ি ড্রাইভ করছিল। তার মাথায় আঘাত লাগলে সে দুর্ঘটনাস্থলেই মারা যায়।

তিনি আরও জানান, পিরোজপুর এলাকায় তিনটি বধ্যভূমি আছে। একটি হচ্ছে বলেশ্বর নদীর ঘাট। আনুমানিক তিন চার শ' লোককে এখানে হত্যা করা হয়। এখানে একটি শহীদ মিনারও নির্মাণ করা হয়েছে। আরেকটি বধ্যভূমি হচ্ছে হুলারহাট পুরনো স্টীমার ঘাট। পাকি সেনারা বিভিন্ন এলাকার অগুণিত মানুষকে একত্রে করে হত্যা করেছিল। দুর্গাপুরের বধ্যভূমিতেও মাঝে মাঝে হত্যা করা হত। এছাড়াও পারেরহাট বন্দর এলাকায় তারা কিছু কিছু হত্যাকাণ্ড ঘটিয়েছিল।

৮. আবুল কালাম মহিউদ্দিন বলেন, পিরোজপুর ছিল একাত্তরে পাকি বাহিনীর এক দুর্ভেদ্য ঘাঁটি। মে মাসে ক্যাপ্টেন এজাজের নেতৃত্বে তারা পিরোজপুরে প্রবেশ করে। পরে সুবেদার সেলিম, হাবিলদার শাহনেওয়াজ তার সাথে যোগ দেয়। শহরে প্রবেশ করেই তারা নির্বিচারে হত্যা, ধর্ষণ ও লুটপাট শুরু করে এবং অধিকাংশ ঘরবাড়িতে আগুন লাগিয়ে দেয়। শিশু, যুবা, বৃদ্ধ কেউ তাদের হাত থেকে রেহাই পায়নি। অমাবস্যা নামে এক ভদ্রলোকের বৃদ্ধ ঠাকুরদাদাকেও তারা হত্যা করে। ফজলুল, সেলিম, জাহাঙ্গীর, বাচ্চু এরাও তাদের হাতে নিহত হন।

স্বাধীনতার পর এসে শুনতে পাই, এখানে পাকি আর্মি ব্যাপক নারী নির্যাতন চালায়। আমাদের প্রতিবেশী অ্যাডভোকেট ভুবন মোহন চক্রবর্তীর মেয়ে লীলা আমার সহপাঠি ছিল। সে খুব সুন্দরী ছিল। পাকি আর্মি এই মেয়েটির ওপর ব্যাপক পাশবিক নির্যাতন চালায়। স্বাধীনতার পর একদিন তাঁর সাথে দেখা হলে সে আমার কাছে পাকি বাহিনীর পাশবিক নির্যাতনের নির্মম ঘটনা জানায়। তার যে মনোকষ্ট আমি তখন অনুভব করেছি, সেটা ভাষায় প্রকাশ করার মত নয়। একজন নারীর সম্ভ্রম হারালে আর কী থাকে? আর সে তো শিক্ষিতা ও রুচিবান। আমাকে এই ঘটনা বলার তিন চারদিন পরেই সে লজ্জা, অপমান ও লোক জানাজানির ভয়ে ভারতে চলে যায়। তার বাবা ছিল বৃদ্ধ এবং একটি ভাই ছিল abnormal. এই ঘটনার পর তার

www.pathagar.com

পরিবারের অবস্থা কী হয়েছিল, তা বাইরে থেকে কারও পক্ষে উপলব্ধি করা সম্ভব ছিল না। আবুল কালাম জানান, এখানে একজন যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধা আছেন, যিনি একজন বীরাঙ্গনাকে বিয়ে করেছেন। বর্তমানে তিনি কদমতলা ইউনিয়নের চেয়ারম্যান। রফিক হায়দার নামে আরেকজন পুলিশ ইন্সপেক্টর, যিনি পরে জাসদে যোগ দেন। তিনিও একজন বীরাঙ্গনাকে বিয়ে করেছিলেন।

৯. পাকি আর্মি ও রাজাকারদের দোসর তুষার কান্ত মোসিদ বলেন, একাত্তর সনে একটা ভয়াবহ পরিস্থিতির মধ্যে আমরা ছিলাম। কিছু সংখ্যক পিস কমিটির সদস্যদের হাতে জীবন তুলে দিয়ে সংশয়ের ভিতর দিন পার করতে হয়েছে। সে সময়কার অনেক ঘটনা আমি নিজ চোখে দেখেছি। অক্টোবর মাসের একদিন বেলা সাড়ে নয়টা অথবা দশটার সময় আমরা কয়েকজন নির্মলদার চায়ের দোকানে বসে আছি। এ সময় দেখলাম, কাউখালী থেকে ধরে আনা আট দশজন লোককে থানা থেকে আর্মি ক্যাম্পে পাঠানো হচ্ছে। তাদের সামনে একজন লম্বা লোক, পরনে লম্বা আলখাল্লা ও মাথায় টুপি। পুলিশের কাছে জিজ্ঞেস করে জানতে পারি যে, কাউখালীর দালালরা তাদের ধরিয়ে দিয়েছে। থানায় নির্দেশ ছিল কোন সন্দেহজনক লোক ধরা হলে তাদেরকে ক্যাম্পে পাঠিয়ে দিতে হবে। সন্দেহজনক হওয়ায় তাদের ক্যাম্পে পাঠানো হচ্ছিল। পরে শুনেছি, এখান থেকে দেড় কিলোমিটার দূরে বলেশ্বর নদীর জেটিতে অন্ধকারে তাঁদেরকে হত্যা করা হয়। এ রকম ঘটনা প্রতিদিনই ঘটত। একদিন পাকি সেনারা আমাদের পাশের বাড়িতে হামলা করে অনন্ত নামের একজনকে ধরে নিয়ে সাথে সাথে গুলি করে হত্যা করে। আরেকদিন সিনেমা হল থেকে সাতাশ জনকে ধরে নিয়ে দু'জনকে গুলি করে হত্যা করা হয়। বাকিদের কোন রকমে ছাড়িয়ে আনা সম্ভব হয়। এদের মধ্যে কুদ্দুস নামের একজন জানায়, তাদের পনেরো বিশ জনকে নিয়ে পুরনো সিও বাড়ির বাথরুমে আটকে রাখে। ওই রুমের এক কোণে একটি লোহার রড দেখে সে, যার মধ্যে নর মাংস লেগে ছিল। রডটি কেন সেখানে রাখা হয়েছে জানতে চাইলে সেখানকার বন্দীরা জানায়, লোহার রডটি আগুনে পুড়ে লাল হলে তা এক এক করে সকলের পায়খানার রাস্তা দিয়ে ঢুকিয়ে দেওয়া হত। যতক্ষণ পর্যন্ত রডটি ঠাণ্ডা হয়ে তার মধ্যে মাংস না বেঁধে, ততক্ষণ সেটা ঢুকিয়ে রাখা হয়। কুদ্দুস সেখান থেকে ভাগ্যক্রমে বেঁচে আসে। বর্তমানে সে বরিশালে থাকে।

এখানকার পাকি আর্মি অফিসারদের বিষয়ে তিনি বলেন, এখানে প্রথমে এসেছিল ক্যাপ্টেন এজাজ। এজাজ চলে যাওয়ার পর আসে ক্যাপ্টেন এরশাদ। সে কর্নেল জানজুয়ার আত্মীয় ছিল। এরপর সুবেদার সেলিম, ক্যাপ্টেন এরশাদের ভাগ্নে ইউসুফ যুদ্ধের শেষ পর্যন্ত এখানে ছিল। সুবেদার সেলিম এবং ইউসুফ ছিল চরম অত্যাচারী। নারীঘটিত অত্যাচারগুলো তাদের দ্বারাই বেশি সংঘটিত হয়।

www.pathagar.com

নারী নির্যাতন সম্পর্কে তিনি বলেন, এখানকার সবচেয়ে বীভৎস নারী নির্যাতনের ঘটনাটি ছিল ভাগীরথীর। সারা শহরের মানুষ দেখেছে সেই নৃশংস ঘটনা। ভাগীরথী তখন বিধবা। তাঁর দুটো সন্তান ছিল। এই এলাকায় প্রথম তাঁকেই দিকেই পাকি বাহিনী ধর্ষণ করেছিল। এরপর থেকে পাকি সেনাদের ক্যাম্পে তাঁর যাওয়া আসা ছিল। যেহেতু সে একবার তাদের ক্যাম্পে গিয়েছিল, তাই মুক্তিযোদ্ধারাই তথ্য সংগ্রহ করার জন্য তাকে সেখানে পাঠাত। কিন্তু একটা অপারেশনে ভাগীরথী ধরা পড়ে যায়। ভাগীরথী মুক্তিবাহিনীর কথা মত আর্মিকে ভুল তথ্য দিয়েছিল। যাতে পাকিবাহিনীর অনেক সৈন্য মারা পড়ে। তারা যখন বুঝতে পারে ভাগীরথী ভুল তথ্য দিয়েছে, তখন তাকে খবর দিয়ে ক্যাম্পে এনে তার ওপর অমানুষিক নির্যাতন চালায়। এক পর্যায়ে সুবেদার সেলিম তার হাত পা বেঁধে মোটর সাইকেলের পিছনে নিয়ে সারা শহর ঘুরে বেড়ায়। তখন তার পরনে ছিল শুধু ব্লাউজ আর পেটিকোট। আমি এক শ' গজ দূর থেকে দেখেছি মোটর সাইকেলের পিছনে দড়ি বাঁধা একটি মেয়েকে এক পাকি আর্মি টেনে নিয়ে যাচ্ছে। লোকটিকে সরাসরি দেখা যায়নি। তবে সে ছিল সুবেদার সেলিম। মোটর সাইকেল দিয়ে টানার আগেই তাকে নির্যাতন করে অর্ধমৃত করে ফেলা হয়েছিল। এক ঘুরা দিয়ে ক্যাম্পের কাছে নেওয়ার আগেই তাঁর মৃত্যু হয়।

ইউসুফ ছিল আরেক নারী লোভী বিকৃত লালসার লোক। জিঞ্জার ভেরিজ নামে এক প্রকার ওষুধ ছিল, যা সিরাপের কাজে লাগত বলে ওষুধের দোকানে রাখা হত। সে জিঞ্জার ভেরিজকে মদ হিসাবে পান করত। একটি রাইফেল হাতে নিয়ে সে ফরিদ মেডিকেল হলের পেছনের রুমে গিয়ে বসে জিঞ্জার ভেরিজ পান করত, আর বিভিন্ন জায়গা থেকে মেয়েদের ধরে এনে নির্যাতন করত। ঢাকেশ্বরী মিষ্টান্ন ভাণ্ডারের মালিক রাঁধারমন ঘোষের মেয়েদেরকে ধরে এনে সে তার পাশবিক লালসা চরিতার্থ করত। আমার জানা মতে, দশ বারো জন নারীকে প্রতিদিন রাতের বেলা ধরে নিয়ে আবার সকালে ফেরত দেওয়া হত। ক্যাপ্টেন যখন বরিশাল যেত, তখন সুবেদাররা তাদের নিয়ে পাশবিক নির্যাতন চালাত। এইসব মহিলাদের কেউ কেউ এখনও জীবিত আছেন। এঁদের অনেকে বিয়ে করে ঘর সংসার করছেন। এঁদের সামাজিক অবস্থার কথা বিবেচনা করে নামগুলো গোপন রাখা উচিত বলে আমি মনে করি।

১০. আব্দুল মান্নান বিশ্বাস নারী নির্যাতন সম্পর্কে বলেন, ভাণ্ডারিয়া থানার ভিটাবাড়িয়া, গাজীপুরী, পশারিবুনিয়া এবং ইতরির প্রায় বিশ পঁচিশ জন নারী পাকি বাহিনীর হাতে নির্যাতিত হন। আমাদের পার্শ্ববর্তী বাড়েবাড়ি গ্রামের একটি মেয়েকেও তারা নির্যাতন করেছিল। মেয়েটির নাম আমার এখন মনে নেই।

১১. এম. রাব্বানী ফিরোজ পাকিদের গণহত্যা সংক্রান্ত তথ্য দিতে গিয়ে বলেন, তৎকালীন ন্যাশনাল ব্যাংকের পাশে একটি বড় গণকবর ছিল। আমরা সেখানে গিয়ে

www.pathagar.com

কারও কারও হাত পা বেরিয়ে থাকতে দেখেছিলাম। যাদেরকে হত্যা করা হয়েছিল, তাদেরকে দিয়েই গর্ত খোঁড়ানো হয়। তারপর গর্তের পাশে দাঁড় করিয়ে গুলি করে ওই গর্তের মধ্যেই তাদেরকে মাটিচাপা দেওয়া হত। পরে আমরা ওই লাশগুলোকে ভাল করে মাটিচাপা দিই এবং জায়গাটি বেড়া দিয়ে ঘিরে দিই।

এই গণকবরে প্রায় পাঁচ থেকে সাত 'শ মানুষকে মাটিচাপা দেওয়া হয়। এছাড়া নদীর পাড়েও তারা বহু লোককে হত্যা করেছে। কতজনকে হত্যার পর নদীতে ভাসিয়ে দেওয়া হয়, তার কোন সঠিক হিসাব নেই। পটুয়াখালী জেলখানা থেকে আমরা বন্দীদের পঞ্চাশটি ও বিশ পঁচিশ জন বাঙালি পুলিশ সদস্যের লাশ উদ্ধার করি। এদেরকে মাটিচাপা দেওয়া হয়। পটুয়াখালীর তৎকালীন ডিসির সহযোগিতায় আমরা সেই লাশগুলো চাপা দেওয়া মাটি থেকে উঠিয়ে কবর দেওয়ার ব্যবস্থা করি। তবে বরগুনাতে পাকি সেনারা আরো বেশি বাঙালি হত্যা করে। গণহত্যার বহু স্পট এখানে আছে। আমরা পাথরঘাটায় গিয়েও এরকম বহু গণহত্যার নিদর্শন দেখেছি।

এছাড়াও জুলাই মাসে দোগাছি গ্রামের রমণীকান্ত মণ্ডল, দাসচন্দ্র মণ্ডল ও আব্দুল হামিদকে পাকি বাহিনী হত্যা করে। আগস্ট মাসে সাহসী তরুণ আইনজীবী মুক্তিযোদ্ধা আব্দুল জব্বার ধামুইরহাট থানার ফাঁসিপাড়ায় পাঞ্জাবি ক্যাপ্টেন কাদরীর হাতে ধরা পড়লে তিন দিন তাঁকে গাছে ঝুলিয়ে বেয়নেট দিয়ে খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে ও এক পর্যায়ে চোখ উপড়ে ফেলে হত্যা করা হয়। শহীদ জব্বারের পিতার নাম আহম্মদ আলী, বাড়ি বক্তারপুর। নভেম্বরে জাফরাবাদ গ্রামের পাঁচ ব্যক্তিকে পাকি বাহিনী হত্যা করে। এঁরা হলেন দিলবর মন্ডল, তাঁর স্ত্রী, আদম মণ্ডল, ইছব মণ্ডল ও অহির ফকির। একই মাসের শেষের দিকে মহাদেবপুর থানার চক আতিয়ার গ্রামে কলেজ ছাত্র হামিদুর রহমান ও পাবনা গ্রামের আফজাল হোসেনকে তারা হত্যা করে। নিহত আরও কয়েকজন হলেন শামসুল হক (১৪), ইউনুস আলী (১৫), কুরান সাহানা (৫০), চেরু প্রামাণিক (৪৬), রশিদ তালুকদার (৪৫); আয়চাঁদ (৪৫) পিতা বশির উদ্দিন ঠিকাদার।

পিরোজপুর জেলায় একাত্তরে সংঘটিত সকল অপরাধের সাথে কর্নেল আতিক, মেজর নাদের পারভেজ, ক্যাপ্টেন এজাজ, ক্যাপ্টেন কাদরি, ক্যাপ্টেন এরশাদ (কর্নেল জানজুয়ার আত্মীয়), সুবেদার সেলিম, ইউসুফ (র‍্যাঙ্ক অজ্ঞাত, ক্যাপ্টেন এরশাদের ভাগ্নে), হাবিলদার শাহনেওয়াজ, সুবেদার সেলিম (মৃত), সিপাহী সিদ্দিকুর রহমান প্রমুখ পাকিস্তানি আর্মি দায়ী।

www.pathagar.com

আসামী ঃ মেজর নাদের পারভেজ, মেজর ইয়ামিন, ক্যাপ্টেন মুনির হোসেন, গুল বাদশা, হাবিলদার শাহাদৎ হোসেন।

অপরাধের ধরণঃ গণহত্যা, জাতিগত নিধন, ধর্ষণ, লুটপাট, অগ্নিসংযোগ।

সাক্ষী ঃ রবীন্দ্রনাথ হালদার, বাদল ব্যানার্জী, সুভাষ চন্দ্র রায়, শামসুল হক, দুলাল চন্দ্র সাহা

ঘটনাকালঃ একাত্তরের ছাব্বিশে এপ্রিল থেকে স্বাধীনতার পূর্ব পর্যন্ত।

ঘটনাস্থল ঃ পটুয়াখালী।

সূত্রঃ যুদ্ধাপরাধ গণহত্যা ও বিচারের অন্বেষণ এবং WCFFC গবেষণা।

একাত্তরের ছাব্বিশে এপ্রিল পাকি বাহিনী পটুয়াখালী আক্রমণ করে গণহত্যা শুরু করে। তাদের হাতে আনসার বাহিনীর অনেক সদস্য নিহত হয়। হত্যাযজ্ঞের শিকার অনেককে তাঁদের আত্মীয় স্বজনরা নিয়ে দাফন করে। আবার অনেক লাশ মাতব্বর বাড়ির গণকবর, কালিকাপুর তুলাতলীর গণকবরে দাফন করা হয়। আনসারদের দাফন করা হয় জেলা প্রশাসকের বাসভবনের দক্ষিণ পাশের গণকবরে। মুক্তিযুদ্ধের পরবর্তী দিনগুলোতে পাকি হানাদার ও তাদের দোসর রাজাকার আলবদররা শত শত লোককে ধরে এনে পুরাতন জেলখানার অভ্যন্তরে হত্যা করে। একেকটি কবরে আট দশটি করে লাশ বিনা জানাজায় দাফন করা হয়।

পটুয়াখালী জেলখানার ভেতরেও গণকবরের সন্ধান পাওয়া যায়। এখানকার প্রতিটি গর্তে চার পাঁচ জন করে মানুষের লাশ পুঁতে রাখা হয়েছিল। জেলের ভেতরে প্রায় পাঁচ শ' বন্দীকে গুলি করে হত্যা করে মাটিচাপা দেওয়া হয়। জেলখানার প্রাচীরগুলোর গায়ে এখনও বুলেটের চিহ্ন বিদ্যমান। মেজর নাদের পারভেজের নির্দেশে একদিনে জেলের ভেতর ষাট সত্তর জনকে হত্যা করা হয়। পটুয়াখালী মাতব্বর বাড়ি, কালিকাপুর এবং জেলা প্রশাসকের বাসভবনের দক্ষিণ পাশেও রয়েছে গণকবর। পাকি বাহিনীর উপরিউক্ত আর্মি অফিসারগণ সরাসরি এসব হত্যাকাণ্ডের সাথে জড়িত ছিল।

১. বাদল ব্যানার্জী বলেন, পঁচিশ মার্চের গণহত্যার ঠিক এক মাস পর অর্থাৎ ছাব্বিশে এপ্রিল পাকি বাহিনীর তিনটি প্লেন পটুয়াখালীতে আসে। প্লেনগুলো পটুয়াখালীতে এসে অবিরাম শেলিং শুরু করে। এক ঘন্টা গুলি বর্ষণের পর প্লেন তিনটা চলে যায়। ঠিক আধাঘন্টা পরে ওই প্লেন তিনটি দু'টি হেলিকপ্টারসহ ফিরে এসে পুনরায় শেলিং শুরু করে। মুক্তি বাহিনীর সদস্যরা দু'একটা গুলি ছুঁড়লেও তা বিমান ধ্বংস করার মত কিছু ছিল না। কারণ তখন মুক্তিযোদ্ধাদের হাতে অস্ত্রশস্ত্র বলতে তেমন কিছুই ছিল না। মাতবর বাড়ির কাছে হেলিকপ্টার থেকে পাকি সেনারা নামে। নামার

www.pathagar.com

পরপরই তারা দু'টো গ্রুপে ভাগ হয়ে একটা জৈনকাঠীর দিকে অপরটি জেলা প্রশাসকের বাড়ির দিকে যায়। জৈনকাঠীর দিকে যে গ্রুপটা যায়, তারাই বেশি হত্যাকাণ্ড ঘটায়। কারণ মানুষজন তখন আর্মির ভয়ে ওই দিক দিয়েই পালাচ্ছিল। কিন্তু সামনে খাল থাকায় লোকজন সেটা পার হতে পারেনি। সে সময় খালে জোয়ার ছিল। এ অবস্থায় যাকে যেখানে পায়, বর্বররা গুলি করে হত্যা করে। ছাব্বিশে এপ্রিল সন্ধ্যায় এই ঘটনা ঘটে। ওই দিন তারা আড়াই হাজার লোককে হত্যা করে। আমরা সেদিন নিহতদের তথ্য সংগ্রহ করেছিলাম। তাছাড়া ঐ হত্যাকাণ্ড থেকে বেঁচে আসা কিছু লোক আমার বাড়িতে এসে আশ্রয় নিয়েছিলেন। তাদের কাছ থেকে আমি তথ্য সংগ্রহ করি।

ওই রাতে গানবোটে করে আর্মির আরও একটি গ্রুপ পটুয়াখালীতে আসে। কারা এসেছিল, তাদের নাম বলতে পারব না। তবে এখানে ছত্রী সেনার একটা ট্রুপ ছিল এবং নাদের পারভেজের নেতৃত্বে অন্য আর একটি দল ছিল। এদিন দুপুরে যে দলটি ডিসি আওয়াল সাহেবের বাসার দিকে যায়, তারা ডিসিকে দেখে হাত তুলতে বলে। ডিসিকে তারা চিনত না। ডিসি সাহেব হাত তোলার পরেও তারা তাঁর কোমরে গুলি করে। পাকি সেনারা ডিসিকে চিনতে পারেনি। গুলির পর ডিসিকে চিনতে পেরে তারা তাঁকে হাসপাতালে নিয়ে চিকিৎসা করায়। সেদিন যাদেরকে হত্যা করা হয়, তাদের সবাইকে বিচ্ছিন্নভাবে মাটিচাপা দেওয়া হয়। কারও কারও লাশ নদীর স্রোতে ভেসে যায়। পটুয়াখালীর মাতবর বাড়ির কাছে সতেরো জনের একটা গণকবর আছে। পুরনো জেলখানার ভেতর বড় বড় তিনটি গণকবর আছে। এছাড়া নতুন জেলখানার পাশে আনসার বাহিনীর সাত জনের একটি গণকবর আছে। জেল খানার ভেতরে চার পাঁচ শ' লাশ মাটিচাপা দেওয়া হয়। সে সময় জেলখানার ভেতরে ও অন্যান্য গণকবর থেকে যে সমস্ত লাশ তোলা হয়, সেখানে মহিলাদের অনেক চুল পাওয়া যায়।

পটুয়াখালীর জেলখানায় প্রথম দিন পাকি বাহিনী একটি কামরায় এক শ' পঞ্চাশ জনের মত মহিলাকে বন্দী করে রাখে। এই মহিলাদের দিনের পর দিন নির্যাতন করা হয়। আমি অনেককেই চিনি কিন্তু নাম বলতে পারব না। পটুয়াখালী সদরেই আছে পঁচিশ জনের মত বীরাঙ্গনা। একজন প্রফেসরের স্ত্রী আছেন, যিনি সমাজ কল্যাণ অধিদপ্তরে চাকরি করেন। অন্য একজন আছেন নারী পুনর্বাসন কেন্দ্রে। নারী পুনর্বাসন কেন্দ্রের ওই মহিলা পাকিস্তানি আর্মির ধর্ষণের ফলে গর্ভবতী হয়ে পড়েন। সেই কন্যা সন্তানকে তিনি এম.এ. পাস করিয়েছেন। তার ভাল বিয়েও হয়েছে। সে এখন ঢাকায় চাকরি করে।

জেলখানার ভেতর গুলি খেয়ে একটি লোক কচু গাছের ভেতরে গিয়ে লুকায়। সেখান থেকে গোঙানির শব্দ শুনে রুস্তম নামে এক পাকি দালাল তাকে ধরে নিয়ে হত্যা

www.pathagar.com

করে। একাত্তরের নয় মাসে পটুয়াখালীতে প্রতিদিন গড়ে বিশ পঁচিশ জনকে হত্যা করা হয়। গলাচিপা থানায় একদিনে একত্রিশ জন, ছোট বিঘায় একদিনে সাত জন, চিকনিকান্দি ও অন্যান্য এলাকায় প্রতিদিন এভাবে মানুষ হত্যা করা হত। নয় মাসে এখানে সাত আট হাজার লোককে হত্যা করা হয়েছে। লোয়ালিয়া, কালিকাপুর প্রভৃতি এলাকায় অনেকগুলো নারী নির্যাতনের ঘটনা ঘটে। আমাদের এখানকার ট্রেজারি অফিসার মি. দত্তের স্ত্রীকে নাদের পারভেজ রক্ষিতা করে রেখেছিল।

২. রবীন্দ্রনাথ হালদার বলেন, একাত্তরের ছাব্বিশে এপ্রিল পাকি বাহিনী প্রথম পটুয়াখালী আসে। সেদিন আমি, বাদল ব্যানার্জী, সাহেদ উল্লাহ্, নূর হোসেন, আলম ও রেজাউল হোসেন যুদ্ধের প্রস্তুতির জন্য রাইফেল আনতে থানায় যাই। হঠাৎ শব্দ শুনে দেখি, আকাশে দু'টো যুদ্ধ বিমান উড়ছে। থানার কন্ট্রোলরুম তখন বন্ধ ছিল। তালা ভেঙে শুনলাম টেলিফোনের রিং বাজছে। ফোন তুলে শুনি প্লেন থেকে এক্সচেঞ্জকে বলছে থানায় পাকিস্তানি পতাকা ওড়াতে। সংগ্রাম পরিষদের সভাপতি আবুল কাশেমকে ফোন করে একথা জানালে তিনি আমাদেরকেই সিদ্ধান্ত নিতে বলেন। তখন আমরা তালা ভেঙে থানার মজুদ অস্ত্রগুলো নিয়ে নেই। রাইফেল নিয়ে লাউকাঠি নদীর পাড়ে আসার কিছুক্ষণের মধ্যেই ছত্রীসেনা নামতে শুরু করে। প্লেন ল্যান্ড করার পর আক্রমণের প্ল্যান করা হয়। কিন্তু পাকি বিমানবাহিনী ল্যান্ড না করে বোম্বিং শুরু করে। আমরা সেখান থেকে নৌকা করে অন্যত্র চলে যাই। আমাদের নৌকা লক্ষ্য করে শেল নিক্ষেপ করা হয়। তখন আমরা মৌকরণ থেকে আঙ্গারিয়া যাচ্ছিলাম। সন্ধ্যার পর আঙ্গারিয়া থেকে আমরা দেখতে পাই যে, সমস্ত পটুয়াখালী শহরে আগুন জ্বলছে।

পটুয়াখালীর পুরান বাজার এবং বণিক পট্টি পুড়ে সম্পূর্ণ ধ্বংস হয়ে যায়। প্রথম দিনেই সেখানে কয়েক শ' লোক মারা যায়। রাজাকার মণ্ডমিয়া ও মহিউদ্দিনসহ অন্যান্য রাজাকার পাকি আর্মির বিকৃত লালসা চরিতার্থ করার জন্য বাঙালি মেয়েদেরকে ধরে আনত। নাদের পারভেজ এখানকার ট্রেজারি অফিসার মি. দত্তের স্ত্রী ও শ্যালিকাকে জোরপূর্বক রক্ষিতা হিসেবে ব্যবহার করে। এছাড়া বিভিন্ন গ্রাম থেকে নাদের পারভেজের মনোরঞ্জনের জন্য মেয়েদের ধরে আনা হত।

রবীন্দ্রনাথ হালদার আরো বলেন, দশ বারোটা ভদ্র পরিবারের নির্যাতিত মহিলাকে তিনি চেনেন। কিন্তু নিরাপত্তা ও সম্মানের কথা ভেবে তাদের পরিচয় দেননি। তবে যুদ্ধপরবর্তী সময়ে বীরঙ্গনারা যাতে সমাজে স্বাভাবিক জীবন যাপন করতে পারে, সে জন্য সবাই তাঁদেরকে সহযোগিতা করেন। বীরাঙ্গনাদের একজনের আজও বিয়ে হয়নি। তিনি চাকরি করতেন, বর্তমানে অবসরপ্রাপ্ত। একাত্তরে ওই মহিলার পুরান বাজারের বাসাটিকে পাকি আর্মি রংমহল বানিয়েছিল। পাকি বাহিনী সেখানে বহু নারীকে ধরে এনে সম্ভ্রমহানি করে। গলাচিপাসহ বিভিন্ন অঞ্চল থেকে হিন্দু মুসলিম

www.pathagar.com

সব ধর্মের মহিলাদেরই ধরে আনা হত। পাকি আর্মি শহরের মহিলাদের হত্যা না করলেও গ্রামের অনেক মহিলাকে হত্যা করে। রেনু নামের একজন পাগল মহিলাকেও পাকিরা হত্যা করে। শহরের ভদ্র পরিবারের মহিলারা লজ্জায় অপরাধীদের বিরুদ্ধে কোন কেস করেননি।

রবীন্দ্রনাথ হালদার বলেন, পটুয়াখালীতে তিনটি গণকবর আছে। ২৬ মে মাতব্বর বাড়িতে বহু লোককে হত্যা করে মাটিচাপা দেওয়া হয়। ডিসির বাসার সামনে এবং জেলখানার ভেতর রয়েছে বাকী দুটো গণকবর। চিকনি কান্দিতেও একটি গণকবর আছে বলে তিনি জানান।

৩. দুলাল চন্দ্র সাহা বলেন, পঁচিশ মার্চের এক মাস পর পাকি বাহিনী পটুয়াখালী আসে। পাকি ছত্রী বাহিনী নামার পর আমি সাঁতরিয়ে নদী পার হয়ে পর হাউলিয়াপুর এক আত্মীয়ের বাড়িতে যাই। সেখানে আমার মা বাবাও আশ্রয় নিয়েছিলেন। প্রায় আট নয় দিন পর তাঁদের সাথে আমার সাক্ষাৎ ঘটে। নদী পার হওয়ার সময় আমি কয়েকজনের মৃতদেহ পড়ে থাকতে দেখেছিলাম।

দুলাল চন্দ্র পাকি বাহিনীর হাতে তাঁর বাবার বন্দী হওয়ার ঘটনা বলতে গিয়ে জানান, পাকি বাহিনী আমতলী থেকে আমার বাবাকে ধরে এনে নির্যাতন করে। গুলি করার কথা থাকলেও শান্তি কমিটির দু'জন সদস্য বাবার পরিচিত ছিল বলে দয়া করে বাবাকে তারা ছেড়ে দেয়। বাবাকে ছেড়ে দিলেও তাঁর কোন খোঁজ খবর পাচ্ছিলাম না আমরা। তবে আমি সেখানে থাকিনি। দু'একদিনের মধ্যেই সেখান থেকে পটুয়াখালী চলে আসি। বাসায় এসে দেখি, ঘরের দরজা জানালা সব ভাঙা। জিনিসপত্র লুটপাট করে নিয়ে গেছে। তবে বাবা বাসাতেই ছিলেন। আমি ও বাবা কোনমতে রাতটা কাটানোর পর, সকালে পাকিবাহিনী এসে আমাকে ধরে নিয়ে যায়।

পাকি বাহিনীর নৃশংস নির্যাতনের বর্ণনা দিতে গিয়ে তিনি বলেন, প্রথমে আমাকে পুলিশ ফাঁড়িতে নিয়ে যাওয়া হয়। দু'ঘন্টা পর থানায় নিয়ে মুক্তি বাহিনীতে কবে যোগদান করেছি, রাজশাহীতে ট্রেনিং নিয়েছি কি না, মুক্তিযোদ্ধা কে কে আছে, এসব জিজ্ঞাসা করতে থাকে। জিজ্ঞাসাবাদের পাশাপাশি ভয়ংকর নির্যাতন করতে থাকে। সেদিন আমার সাথে থানায় আরও চার জন ছিলেন। পরদিন সকালে আমাকে সার্কিট হাউজে নিয়ে আবারও অমানুষিক নির্যাতন করে। সেখানে চেয়ারে বসিয়ে সমস্ত শরীরে লাঠি দিয়ে পেটায়। রোলার দিয়ে হাঁটুতে, পায়ে, পিঠে, হাড়ে হাড়ে আঘাত করে, আঙুল মেঝের উপর রেখে রাইফেলের বাঁট দিয়ে থেঁতলে দেয়। নির্যাতনের ফলে অনেক বার আমি অজ্ঞান হয়েও পড়েছি। তিন দিন পর আমাকে মেজর নাদের পারভেজের কাছে নিয়ে গেলে, আমি মেজরকে বলি যে, আমি নির্দোষ, আমাকে ছেড়ে দিন। সেদিন নাদের পারভেজের সাথে পাকি বাহিনীর এদেশীয় দোসর

www.pathagar.com

মোতাহার, সলিমুল্লাহ, বিহারি খান, শামসু, তোফা মিয়া এদেরকে দেখতে পাই। নাদের পারভেজ আমাকে বলে তুম মুক্তিবাহিনী, তুম দেশ বাংলাকা মুক্তিসেনা- ইসকো জেলমে ভেজ দো, আচ্ছা করকে মালিশ দো'। এরপর আমাকে জেলের এক সেলে নিয়ে আটকে রাখে। দুই দিন ধরে রোলার, রাইফেলের বাঁট দিয়ে মেরে শরীরের বিভিন্ন অংশ ফাটিয়ে দেয়। এতে আমার পিঠে বড় বড় দাগ হয়ে যায়।

জেলখানায় অন্য বন্দীদের ওপর নির্যাতন প্রসঙ্গে তিনি বলেন, তিনদিন পর সেল থেকে আমাকে হল রুমে নিয়ে যাওয়ার পর সেখানে আমার চোখের সামনেই তিন চার জনকে হত্যা করা হয়। প্রথমে তালিকা অনুযায়ী নাম ডেকে তাদেরকে অন্য একটা কক্ষে নিয়ে রাখে। বিকাল পাঁচ/ছ'টার দিকে আর্মি এসে তাদেরকে জেলখানার ভেতরের গাছের কাছে দাঁড় করিয়ে পিঠে গুলি করে। পাশেই গর্ত করা ছিল। গুলি করার পর লুটিয়ে পড়লে, অর্ধমৃত অবস্থায় তার পা ধরে ওই গর্তে ছুঁড়ে ফেলে দেওয়া হত। কেউ কেউ আধমরা অবস্থায় ছটফট করে কাতরাতে কাতরাতে মারা যেতেন। আমাকেও তিন চার বার নিয়ে যাওয়া হয়। কিন্তু সৌভাগ্যবশত তাদের গুলি আমার ঘাড়ের ওপর দিয়ে চলে যাওয়ার তারা আমাকে দ্বিতীয়বার গুলি করেনি। যাদের গুলি করে হত্যা করা হয়, তাদের মধ্যে পাথরঘাটার মজিবর রহমান ও তাঁর ছেলেকে আমি চিনতাম। আমি দু'মাস সেখানে বন্দী ছিলাম। দু'মাসে প্রায় এক শ' জনকে হত্যা করতে দেখেছি আমি। অত্যাচারের ফলে আমি খুবই অসুস্থ হয়ে পড়ি। হাড়গোড় সব ভেঙে যায়। পায়খানা ও প্রস্রাবের সাথে রক্ত যেত। কখনও স্বাভাবিক জীবনে ফিরে আসতে পারব সেটা কল্পনাই করতে পারিনি।

নারী নির্যাতন প্রসঙ্গে তিনি বলেন, জেলখানার ভেতরে মেয়েদেরকে আলাদা অংশে রাখা হত। সরাসরি নারী নির্যাতন না দেখলেও সেখান থেকে বহু মহিলাকে কাপড় ঠিক করতে করতে বেরিয়ে আসতে দেখেছি। মহিলাদেরকে আর্মি টানতে টানতে ভেতরে নিয়ে যেত। আমি ঐসব মেয়েদের আর্তচিৎকার শুনতে পেতাম। সেখানে বিশ জনের মত মহিলা বন্দী ছিলেন বলে মনে হয়। তবে কোন মহিলাকে আমি গুলি করে হত্যা করতে দেখিনি। পটুয়াখালী জেলখানায় তখন মেজর নাদের পারভেজ ও ক্যাপ্টেন মুনির হোসেন ছিল। শাহাদৎ হোসেন নামে একজন হাবিলদারও ছিল।

আগস্ট মাসে স্বাভাবিক অবস্থা ফিরিয়ে আনার জন্য বেছে বেছে চার পাঁচ জন বন্দীকে মুক্তি দিলে আমিও তাদের সাথে মুক্তি পাই। জেল থেকে ছাড়া পেয়ে প্রাণের ভয়ে পরিবারের সাথে বঙ্গোপসাগরের কূল দিয়ে ভারতের বাসন্তী ক্যাম্পে গিয়ে উঠি। সেখান থেকে সল্ট লেকের ক্যাম্পে গেলেও চিকিৎসার জন্য আমাকে হাসপাতাল থাকতে হয় অনেকদিন। এরপর দেশ স্বাধীন হলে আমি বাড়িতে ফিরে আসি। পটুয়াখালীতে পাকি বাহিনী আনুমানিক এক হাজার পাঁচ শ' নিরীহ লোককে হত্যা করেছে বলে আমার ধারণা।

www.pathagar.com

৪. সুভাষ চন্দ্র রায় বলেন, তখন খুব কঠিন অবস্থার মধ্যে দিন কাটিয়েছি। যখন আকাশ পথে হামলা হল তখন আমরা নদী পার হয়ে লাউকাঠিতে চলে গিয়েছিলাম। ওখান থেকে শুনেছি যে, আমার বয়সী ছেলেদেরকে আর্মি ধরে নিয়ে গুলি করে হত্যা করছে। এই কথা শোনার পর আমি আর শহরে ফিরে আসিনি।

পরে আমি বাকেরগঞ্জে গাড়ড়িয়া গ্রামে আমার এক আত্মীয়ের বাড়িতে আশ্রয় নিই। একদিন সকালে আর্মি এসে গাড়ড়িয়া গ্রামটি তছ্নছ্ করে দেয়। আর্মি সেখানকার ঘরবাড়ি জ্বালিয়ে দেয় এবং গুলি করে বেয়নেট দিয়ে খুঁচিয়ে একুশ জনকে হত্যা করে, পুকুরে ফেলে দেয়। সেখানে হালদার ও কবিরাজ বাড়ির লোকজনও মারা যায়। আর্মির গুলিতে চার পাঁচটা গরুও সেদিন মারা যায়।

এই ঘটনার পর আমি সেখান থেকে চলে যাই। আমি সেপ্টেম্বর পর্যন্ত পটুয়াখালীর বাইরে ছিলাম। সেপ্টেম্বর মাসে পাকিস্তান সরকার একটি সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা করে। আমার বাবা তখন কাপড়ের ব্যবসা করতেন। বাবা শহর থেকে আসার পর পাকি আর্মি জিজ্ঞাসা করে, আপনার ছেলে কোথায়? যদিও আমরা চার ভাই ছিলাম, কিন্তু তারা বিশেষভাবে আমাকেই খুঁজছিল। কারণ আমি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সে বার এমএ পরীক্ষা দিয়েছিলাম। ওরা বারবার আমার জন্য বাবাকে চাপাচাপি করতে থাকে। বাবা তখন বাধ্য হয়ে আমাকে চলে আসতে বলেন। মা, ছোট ভাইবোন ও বাবার জীবনের দিকে চেয়ে আমি পটুয়াখালীতে ফিরে আসি। ফিরে আসার পর দশ দিন কোন সমস্যা হয়নি। আমরা ভালই ছিলাম। দশ দিন পর আমাদের এলাকায় সোনালী ব্যাংকের কাছে একটি বোমা বিস্ফোরিত হলে, সেই রাতেই আমাকেসহ আমার তিন ভাই ও বাবাকে পাকি আর্মি ধরে নিয়ে জেলে আটকে রাখে। আনোয়ার হোসেন নামে একজন আমাদের সাথে জেলে ছিলেন। তাঁকে আমি দাদা বলে ডাকতাম। রাত তিনটায় ঘুমন্ত অবস্থা থেকে আমাদের জোর করে ধরে নিয়ে যায়। আমাদেরকে সেখানে লাইন করে বসিয়ে রাখে। দেড় থেকে দুই শ' জন বন্দী ছিল সেখানে। জেলার সাহেব আমাদের উদ্দেশ্যে বলল, ওদের বসিয়ে রাখো, গুলি করো না।

আমরা যখন জেলখানায় যাচ্ছিলাম, তখন ইব্রাহিম খাঁ নামে এক বিহারির সাথে রাস্তায় আমাদের দেখা হয়। আমার বাবা তাকে বলেন যে, আমাদের ধরে নিয়ে যাচ্ছে দাদা। এই ইব্রাহিম শান্তি কমিটির সদস্য ছিল। সে জেলখানায় গিয়ে সেদিনের মতো আমাদের বাঁচায়। ওই দিন তারা কোন লোককে হত্যা করেনি। তবে বেয়নেট, রাইফেলের বাঁট দিয়ে শারীরিকভাবে অনেক নির্যাতন করে। আমাদেরকে ওরা ভিন্ন ভিন্ন ঘরে রাখে। এইভাবে কিছুদিন রাখার পর, পাতাবুনিয়ায় মুক্তিযোদ্ধাদের সাথে পাকি সেনার বড় একটি সংঘর্ষ হয়। সেখানে পরাজিত হয়ে পাকি ক্যাপ্টেন মুনির হোসেন জেলখানায় বন্দীদের ওপর নির্যাতন শুরু করে। আমাকেও তারা বুট দিয়ে

www.pathagar.com

লাথি মারে। বেয়নেট দিয়ে কানের পাশে খোঁচা মারে। সেই দাগ এখনও রয়েছে। আমি কোন মতে বেঁচে যাই। ভগবান আমাকে বাঁচিয়েছেন। এর মধ্যে আমার বাবা ও ভাইদেরকে ওরা ছেড়ে দেয়।

আমাকে রক্তাক্ত অবস্থায় জেলখানার ভেতরের হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। জেলখানার হাসপাতালে চিকিৎসাহীন অবস্থায় দশ দিন থাকি। আমার তখন জ্ঞান ছিল না। জ্ঞান ফিরলে ডেপুটি জেলার আমাকে সান্ত্বনা দিয়ে বলেন, এত দুঃখ কেন, মনে ক্লান্তি কেন, স্বাধীনতার জন্য যুদ্ধ করছেন, ঘাবড়ে গেলে হয় নাকি? তারপর সেই বাঙালি ডেপুটি জেলার (তাঁর নাম মনে নেই) বললেন, উদয়ের পথে শুনি কার বাণী, ভয় নাই ওরে ভয় নাই...। তাঁর কথায় আমি কিছুটা মনোবল ফিরে পেলাম। ভাবলাম, জেলখানায় আমাদের পক্ষের কিছু লোকও তাহলে আছে। হাসপাতালে আমার মতো আহত আরও বিশ জন ছিল। জেনারেল ইয়াহিয়া খান সেই সময় একটা ফরমান জারি করল যে, যারা নির্দোষ (তাদের দৃষ্টিতে) তাদেরকে ছেড়ে দাও। তখন বুদ্ধি করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে, আমার ভাইভা পরীক্ষার জন্য একটা চিঠি ইস্যু করানো হয়। যদিও আমার ভাইভা পরীক্ষা আগেই শেষ হয়ে গিয়েছিল। আমার বাবা ভাইভা পরীক্ষার মিথ্যা টেলিগ্রাম জেলখানায় দেখিয়ে আমাকে ছাড়িয়ে নিয়ে গেলেন।

জেলখানায় অবস্থানকালে আমি বেশ কিছু পাকি সেনার মুখোমুখি হই। এদের মধ্যে গুল বাদশা, ক্যাপ্টেন মুনির, মেজর নাদের পারভেজ, মেজর ইয়ামিন প্রমুখ উল্লেখযোগ্য। এদের মধ্যে গুলবাদশা ছিল পশতু, সে একটু দয়ালু প্রকৃতির ছিল। জেলার দায়িত্বে ছিল নাদের পারভেজ। এই নাদের পারভেজের সময়ই আমরা ধরা পড়ি। খুব নিষ্ঠুর লোক ছিল সে। আমি ছাড়া পাই মেজর ইয়ামিনের সময়। নাদের পারভেজ চলে যাওয়ার পর ইয়ামিন এখানে আসে। ইয়ামিন নাদের পারভেজের চেয়ে একটু কম নির্মম ছিল। ক্যাপ্টেন মুনির, নাদের পারভেজ এরা এখানে খুবই অত্যাচার করেছে।

নারী নির্যাতন সম্পর্কে শুনেছি যে, জেলখানায় পাকিস্তানি সেনার মনোরঞ্জনের জন্য বিভিন্ন জায়গা থেকে মেয়েদের ধরে আনা হত। আমি প্রায় পঁয়তাল্লিশ দিন জেলখানায় বন্দী ছিলাম। আমাদের সেলের পেছনে পাঁচ ছয় জন মহিলা বন্দী ছিলেন। তাদেরকে দেখার কোন সুযোগ ছিল না। তবে জেলখানার পশ্চিম পাশ থেকে মেয়েদের আর্তচিৎকার শুনতাম। সেই সব নির্যাতিত মেয়েদের নাম এখন আর মনে পড়ে না। তবে আমাদের এলাকায় নারী নির্যাতনের বহু ঘটনা আছে।

মেজর নাদের পারভেজ, মেজর ইয়ামিন, ক্যাপ্টেন মুনির হোসেন, গুল বাদশা, হাবিলদার শাহাদৎ হোসেন প্রমুখ পাকিস্তানি আর্মি ও তাদের সহযোগীরা পটুয়াখালী জেলায় একাত্তর সালে সংঘটিত সকল গণহত্যা, জাতিগত নিধন, ধর্ষণ, অগ্নি সংযোগ ও লুটতরাজের জন্য দায়ী।

www.pathagar.com

আসামী ঃ মেজর নাদের পারভেজ, ক্যাপ্টেন শাফায়াত, হাবিলদার ইকবাল।

অপরাধের ধরনঃ গণহত্যা, জাতিগত নিধন, ধর্ষণ, লুটপাট, অগ্নিসংযোগ।

সাক্ষী ঃ এটিএম রফিকুল ইসলাম, কেতাব জান বিবি, মোঃ ইমামুদ্দিন, পরীবানু, রোকেয়া বেগম, পুষ্পরাণী নাথ, গোলাম মোস্তফা কাদের , ফারুকুল ইসলাম ব্যান্ডার।

ঘটনাকালঃ একাত্তরের চৌদ্দই মে থেকে স্বাধীনতার পূর্ব পর্যন্ত।

ঘটনাস্থল ঃ বরগুনা।

সূত্রঃ যুদ্ধাপরাধ গণহত্যা ও বিচারের অন্বেষণ এবং WCFFC গবেষণা।

একাত্তরের চৌদ্দই মে পাকি বাহিনী বরগুনা শহর দখল করে নেয়। পনেরোই মে তারা পাথরঘাটার বিষখালী নদীর তীরে গণহত্যা চালায়। নাদের পারভেজের নেতৃত্বে হানাদার বাহিনী শত শত লোককে গুলি করে বিষখালী নদীতে ভাসিয়ে দেয়। বিষখালী তখন রক্তের নদীতে পরিণত হয়। পাকি বাহিনী পাথরঘাটার বিশিষ্ট ব্যবসায়ী লক্ষ্মণ দাস, তাঁর ছেলে কৃষ্ণ দাস, অরুণ দাস, স্বপন ও তপন দাসকে ধরে বরগুনা নিয়ে আসে। হানাদার ও রাজাকার বাহিনী গোপন ষড়যন্ত্র করে শহরে ধূম্রজাল সৃষ্টি করে; 'একমাত্র বর্ণ হিন্দু ছাড়া কাউকে কিছু বলা হবে না' ঘোষণা দিয়ে পাকি বাহিনী পটুয়াখালী চলে যায়। আশ্বাস পেয়ে অনেকেই তখন শহরে আসেন। বিশেষ করে গরীব হিন্দু ও সাধারণ লোকজন তখন শহরে ফিরে আসেন। এমতাবস্থায় ছাব্বিশে মে মঙ্গলবার ক্যাপ্টেন শাফায়াতের নেতৃত্বে চার জন পাকি সেনা স্পিড বোট নিয়ে গোপনে বরগুনা আসে। ওই রাতেই শান্তি কমিটি ও রাজাকারদের নিয়ে সে বৈঠক করে এবং পরদিন ভোর রাত থেকেই তারা যৌথভাবে অপারেশন শুরু করে। স্বাধীনতার সমর্থক ও হিন্দুদের ধরে আনতে থাকে সিএন্ডবি ডাকবাংলোয়, পরে নিয়ে যায় জেলখানায়। সেদিন দুপুরে বৃষ্টি নামলে সবাই পালানোর চেষ্টা করেন। শান্তি কমিটির লোকেরাও এই সুযোগের অপেক্ষায় ছিল। তারা বৃষ্টির মধ্যে ঘেরাও করে, তাঁদেরকে গরু-ছাগলের মতো বেঁধে জেলখানায় নিয়ে আসে।

সেদিন বরগুনা জেলখানায় আটক নারী পুরুষের আর্তচিৎকারে কারাগার কেঁপে উঠে। আঠাশ মে ডিএমএলএ মেজর নাদের পারভেজ বরগুনায় আসে। তার নির্দেশে পাকি বাহিনী উনত্রিশ ও ত্রিশ মে বরগুনায় নৃশংস ও জঘন্যতম জেল হত্যাকাণ্ড ঘটায়। সেদিন বরগুনা জেলা স্কুলে যখন প্রথম ক্লাশের ঘন্টা বাজানো, হয় তখনই জেলখানায় ভয়ঙ্কর গুলি বর্ষণ শুরু হয় গুলির শব্দে কেঁপে ওঠে পুরো বরগুনা শহর। লোকজন পথে ঘাটে যে অবস্থায় ছিল, 'আল্লা আল্লা' বলে থমকে দাঁড়িয়ে যায়। এভাবে বেশ

www.pathagar.com

কয়েকবার গুলি বর্ষণ করে হানাদাররা চলে যায়। হতাহতদের আর্তচিৎকার, মরণ গোঙানি থেমে গেলে শান্তি কমিটির লোকজন এসে গুলিতে অর্ধমৃতদের জেলখানার পশ্চিম দক্ষিণ পাশে নির্মিত, গণকবরে মাটিচাপা দেয়। এভাবে প্রথম দিন ৫৫ জন, পরের দিন ৩৬ জনকে গুলি করে হত্যা করা হয়। জেলখানায় পাকি বাহিনী ও রাজাকাররা রাতের বেলা গণধর্ষণ চালাত। এর আগে ধরে এনেছিল ব্যান্ডার বাড়ির শানু, নাসির ও ফারুক তিন ভাইকে। পাঁচ বার গুলি খেয়ে অলৌকিকভাবে বেঁচে যাওয়া ফারুক এ ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী। অন্য একজন প্রত্যক্ষদর্শী হচ্ছেন, পাথরঘাটা থানার তৎকালীন ম্যাজিস্ট্রেট বর্তমানে উপসচিব বজলুর রহমান সিকদার।

১. প্রত্যক্ষদর্শী ফারুকুল ইসলাম ব্যাণ্ডার বলেন, চার জন পাকিস্তানি আর্মি প্রথম বরগুনায় এসে এখানকার অবস্থা সম্পর্কে খোঁজখবর নিয়ে পটুয়াখালী চলে যায়। পটুয়াখালী ছিল আর্মির হেডকোয়ার্টার। পটুয়াখালীর সাথে তখন যোগাযোগ রক্ষা করা হত ওয়্যারলেসের মাধ্যমে। এই ওয়্যারলেস টাওয়ার ধ্বংস করতে গিয়ে ফারুকুল ইসলাম, তাঁর বড় দু'ভাই শানু ও নাসির এবং আরও একজনসহ মোট চার জন বিহারি ওসি আনোয়ার মিয়ার হাতে গ্রেফতার হন। এরপর তাঁদেরকে বরগুনা জেলখানায় নিয়ে বন্দী করে রাখা হয়। সেখানে আরও সোয়া শ' থেকে দু'শ' মহিলা ও দু'শ' পুরুষ বন্দী ছিল বলে ফারুকুল ইসলাম জানান।

তিনি বলেন, যেদিন আমাকে বন্দী করা হয় সেদিন রাত আটটার সময় চার জন পাকিস্তানি আর্মি জেলার মধু মিয়ার কাছে এসে, মহিলা সেলের চাবি চায়। জেলার এসডিও সাহেবের অনুমতি ছাড়া চাবি দিতে অস্বীকৃতি জানালে তারা সে সময় চলে যায়। তারা আবার দশটার সময় এসে চাবি চায়। জেলার সে বারও চাবি না দিয়ে তাদেরকে ফিরিয়ে দেন। এরপর তারা রাত বারোটার সময় এসে জেলরক্ষী আবু নেসার জমাদ্দার, মজুমদার ও জেলারসহ চার জনকে বন্দুকের মুখে দাঁড় করিয়ে চাবি ছিনিয়ে নেয়। মেজর নাদের পারভেজের হুকুমে একজন পাকি সৈন্য মহিলা সেলের তালা খুলে ভেতরে প্রবেশ করে। চার জন মহিলাকে জোর করে ধরে নিয়ে যায়। সামাজিক হয়রানির কারণে এদের নাম বলতে চাই না। তবে যে, ওই চার জনের একজন ছিলেন পুতুল রানি রায়, যার সাক্ষাৎকার প্রকাশ করা হয়েছে জানা যায়। ওই হতভাগ্য মহিলাদেরকে পাকি বাহিনী সিএন্ডবি'র ডাকবাংলোয় নিয়ে ধর্ষণ করত এবং পরদিন ভোরে লাল কাপড় পরিয়ে জেলখানায় পাঠিয়ে দিত। ধর্ষণের ফলে মহিলাদের শরীর থেকে যে রক্ত ঝরত, তাতে জেলখানার রাস্তা লাল হয়ে যেত। এভাবে পর পর চার দিন বর্বর পাকি হানাদাররা তাদের পছন্দ মতো মহিলাদের ধরে নিয়ে ধর্ষণ করেছে। একদিন একটি কিশোরীকে নিয়ে যাওয়ার সময় মেয়েটি জেলরক্ষী মজুমদারকে বলে যে, বাবা আমাকে বাঁচাও। মজুমদার দৌড়ে গিয়ে পাকি সেনার কাছ থেকে মেয়েটিকে ছিনিয়ে নিয়ে জড়িয়ে ধরে রাখেন। তখন পাকি বাহিনী

www.pathagar.com

বেতের লাঠি দিয়ে তাঁকে পেটাতে পেটাতে লাঠি ছিন্নভিন্ন করে ফেলে। তারপরও মজুমদার মেয়েটাকে নিয়ে যেতে দেননি।

একদিন মেজর আসবে বলে পটুয়াখালী থেকে একটা মেসেজ এল। পরের দিন সকাল দশটা সাড়ে দশটার দিকে মেজর নাদের পারভেজকে জেলখানায় মাতাল অবস্থায় ঢুকল। সে তখন ঢলে ঢলে পড়ছিল। চারদিকে নিস্তব্ধতা, কোন সাড়াশব্দ নেই। এর মধ্যেই হঠাৎ ছুটোছুটি ও বুটের শব্দ শুনতে পেলাম। আনুমানিক দেড় দুই শ' পাকি আর্মি এসে জেলখানার ভেতরে পজিশন নিল। প্রথমে মহিলাদের ডেকে বলল, তোমরা বাঁচতে চাও না মরতে চাও? মহিলারা বলল, আমরা স্বামী ও ছেলেমেয়েসহ বাঁচতে চাই। তারপর মহিলাদের ছেড়ে দিয়ে বলা হল, তোমাদের স্বামীদেরকেও পরে ছেড়ে দেওয়া হবে। এরপর মেজর এসে পুরুষদের গণপিটুনি দেওয়ার আদেশ দিল। আঠাশ তারিখে মেয়েদের ছেড়ে দেওয়ার একদিন পর অর্থাৎ উনত্রিশ তারিখে জেলখানার অভ্যন্তরের চৌরাস্তায় দাঁড়িয়ে মেজর গুলি করার নির্দেশ দিল। তারপর পুরুষদের লাইনে দাঁড় করিয়ে গুলি করে হত্যা পর্ব শুরু হল। এভাবে আটত্রিশ জনকে আমি গুলি করে হত্যা করতে দেখেছি।

ওই আটত্রিশ জনকে হত্যা করার পর আমাদের তিন ভাইকে মেজর নাদের পারভেজের সামনে নিয়ে যাওয়া হল। আমার বড় ভাই শানু উর্দুতে কথা বলতে পারতেন। মেজর কিছুক্ষণ কথা বলার পর তাঁর হাত ধরে অন্য একজনকে নির্দেশ দিয়ে বলল, 'একে রাখ; আর এই দুইজনকে গুলি কর। তারপর আমাদের দুইজনকে নিয়ে প্রথমে আমার ভাই নাসিরকে গুলি করল। তার বুকের ডান পাশে গুলি লাগলে নাড়িভূঁড়ি সব বের হয়ে গেল। গুলি করার পর উনি আমার পায়ের ওপর ঢলে পড়লেন। এরপরই আমাকে গুলি করা হল। আমার পায়ে শিকল বেড়ি পরানো ছিল। আমার বগলের নিচ দিয়ে গুলি চলে গেল। বারুদের ছিটেফোঁটা গায়ে এসে লাগলেও রক্ত বের হয়নি। তারপর আমি পড়ে গেলে পিঠে দুটো গুলি করা হল। সৌভাগ্যবশত সেই গুলিও আমাকে বিদ্ধ করেনি। পাকি বাহিনী যুবকদের বুকে এবং বুড়োদের মাথায় গুলি করছিল। যাদের গুলি করা হয়, তারা সবাই সাথে সাথে মারা যাননি। কেউ কেউ প্রায় আধঘন্টা যাবত ছটফট করেছেন, লাফিয়ে উঠেছেন। তখন ওরা বেয়নেট চার্জ করেছে। আমার বুকের ওপর দাঁড়িয়েও কয়েক জনকে বেয়নেট চার্জ করেছে তারা।

ওরা চলে যাওয়ার পর আমার ভাই নাসির হাতড়াতে হাতড়াতে আমার পায়ের বেড়ি ছুঁয়ে আমাকে। ফারুক তুই বেঁচে আছিস? আমি তাঁর বেরিয়ে যাওয়া নাড়িভুড়িগুলো হাত দিয়ে পেটের ভেতরে ঢুকিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করি। আমার গায়ে গুলি লেগেছে কি না তাও তিনি জিজ্ঞেস করছিলেন। তখন আমি বলি যে, আমার গায়ে গুলি লাগেনি। তারপর তিনি বলেন, 'তুই তো বেঁচে আছিস, তোর কাছে আমার দাবি তুই

www.pathagar.com

মাকে দেখিস।' তখন আকাশ মেঘাচ্ছন্ন ছিল। টিপটিপ বৃষ্টি পড়ছিল। আমার ভাই এ সময় পানি খেতে চেয়েছিলেন। কিন্তু আমি তখন ঊনচল্লিশটা লাশের মধ্যে পড়ে আছি। পানি পাব কোথায়? সেখান থেকে উঠে যে কোন খান থেকে একটু পানি আনব, সে শক্তিও ছিল না। প্রায় পঁয়তাল্লিশ মিনিট বেঁচে থাকার পর একটা ঝাঁকি দিয়ে তিনি মারা গেলেন। আমার আরেক ভাই শানুকে মেজর পটুয়াখালী নিয়ে কী করেছিল সেটা আমরা জানতে পরিনি। পরে তাঁর আর কোন খোঁজ পাইনি আমরা।

আর্মি হত্যাকাণ্ড চালিয়ে চলে যাওয়ার ঘন্টাখানেক পর জেলখানায় একজন বিহারি, চান্দুখালির দুলাল মেম্বার, রাজাকার ইমামুদ্দীন ও আরেকজন রাজাকার ভেতরে লাশ টানতে এসে দেখে যে, আমি বসে আছি। আমি বলি, আমার গায়ে গুলি লাগেনি, ভাই নাসির কিছুক্ষণ আগে মারা গেছে। মেজর গুলির অর্ডার দিয়েই হেডকোয়ার্টারে চলে গেছে। তখন তারা ক্যাপ্টেনকে আমার অবস্থার কথা জানানোর সাথে সাথে চল্লিশ পঞ্চাশ জন আর্মি বন্দুক তাক করে চতুর্দিক দিয়ে ঘিরে, আমাকে ক্যাপ্টেনের কাছে নিয়ে যায়। ক্যাপ্টেন বলে, ওর বডি চেক কর, ওর কাছে কোন তাবিজ কবজ আছে কি না দেখ। বডি চেক করে তারা সে ধরনের কিছুই পেল না। তারপর দু'জন সেপাই আমাকে গোসল করিয়ে আবার লকআপে আটকে রাখল।

পরদিন অর্থাৎ ত্রিশে মে বেলা বারোটার সময় ক্যাপ্টেন সিদ্ধান্ত নিল যে, নাপিত ও কামার বাদে সবাইকে মেরে ফেলা হবে। প্রথমে বয়স্ক একজনকে ডাকা হল, কারা কারা কামার ও নাপিত সেটা শনাক্ত করার জন্য। আমি যে ছোট ঘরটায় ছিলাম, সেটার পূর্ব পাশের জানালা দিয়ে সবকিছু দেখতে পাচ্ছিলাম। প্রথমে জগদীশ নামে একটা ছেলেকে আনা হল। সে আমার ক্লাসমেট ছিল। জগদীশের ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করলে জানানো হল যে, ওর বাবার নাম আনন্দ শীল। তার বাবা ও সে, দু'জনই নাপিত। জিজ্ঞাসাবাদের পর ক্যাপ্টেন তাকে একপাশে গিয়ে দাঁড়াতে বলল। তাকে গুলি করার উদ্দেশ্য ছিল না। কিন্তু জগদীশ ভয় পেয়ে বলতে লাগল, 'স্যার, আমাকে গুলি করবেন না?' একই কথা বারবার বলতে থাকলে ক্যাপ্টেন রেগে গিয়ে গুলি করার নির্দেশ দিলে তাকে গুলি করা হল। গুলি তার বুকে লাগল। গুলি লাগার পরও সে উঠে ক্যাপ্টেনের দিকে দৌড়ে গিয়ে বলল, স্যার আমি বাঁচব, আমাকে আর গুলি করবেন না। তখন সৈন্যরা টেলি গান দিয়ে বাড়ি মেরে ফেলে দিয়ে পুনরায় গুলি করল। আমি পূর্ব পাশের জানালা ছেড়ে উত্তর দিকের গেটের কাছে গিয়ে তাদের হত্যার দৃশ্য দেখতে লাগলাম। এভাবে সেদিন সতেরো জনকে হত্যা করতে দেখেছিলাম আমি। এরপর আমাকে গুলি করার জন্য আনা হলে আমি ক্যাপ্টেনের কাছে গিয়ে বললাম যে, গতকাল আমাকে তিনটা গুলি করা হয়েছে। আমার দু'ভাইকেও হত্যা করা হয়েছে। আমাকে আর গুলি করবেন না। তখন বিহারি ওসি বলল, 'স্যার ওকে যদি রাখেন তাহলে আমাকে মেরে ফেলেন।' তার এ কথা শুনার পর ক্যাপ্টেন আমাকে গুলি করার নির্দেশ দিল।

www.pathagar.com

তখন হাবিলদার ইকবাল আমাকে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দিয়ে পিছন দিক থেকে মাথা লক্ষ্য করে গুলি করে। গুলিটা ডান দিকে কানের গোড়া দিয়ে চলে যায়। জায়গাটা সাথে সাথে ফুলে ওঠে। তখন ওসি বলে, 'Shoot again'। এরপর আমাকে আরেকটা গুলি করা হলে, সে গুলিটাও গায়ে না লেগে বাম পাশ দিয়ে চলে যায়। দু'টা গুলির একটিও গায়ে না লাগায় ওসি উত্তেজিত হয়ে রিভলবার বের করে আমার একেবারে কাছে চলে আসে। হাবিলদার ইকবাল আমার কাছ থেকে আনুমানিক বিশ ফিট দূরে ছিল। তারপর হাবিলদার ইকবাল হঠাৎ ঘুরে ওসির দিকে বন্দুক তাক করে গালিগালাজ করে। এরপর আমাকে উঠিয়ে ক্যাপ্টেনের কাছে নিয়ে গিয়ে বলে, স্যার আমি তেরো হাজার লোক মেরে বরগুনায় এসেছি। আমার হাত থেকে আজ পর্যন্ত কেউ রেহাই পায়নি। এই ছেলের গায়ে আমি দুইদিনে পাঁচটা গুলি করেছি, একটা গুলিও ওর গায়ে লাগে না। ওকে আল্লাহ্ বাঁচিয়েছে। ওকে আমি গুলি করতে পারব না এবং অন্য কাউকে গুলিও করতে দেব না। এরপর ওসি মেজরের কাছে ফোন করে বলে, এক মুক্তিযোদ্ধাকে পাঁচবার গুলি করার পরও তার গায়ে গুলি লাগেনি। যদি ওকে মারা না হয়, তাহলে আপনি নিজে আমাকে মেরে ফেলেন। ওসি জানত আমি বেঁচে গেলে আমার দু'ভাইয়ের হত্যার প্রতিশোধ নেব। সেই ভয়ে ওসি মেজরকে ওই রকম বলছিল। তারপর মেজর এসে সবকিছু শুনে আমাকে রিলিজ অর্ডার দেয়। গুলি করার প্রায় সতেরো দিন পর আমি ছাড়া পাই।

দীর্ঘদিন বরগুনা জেলখানায় বন্দী থাকার পর ভাগ্যক্রমে ছাড়া পেয়ে ফারুকুল ইসলাম মানসিকভাবে খুবই দুর্বল হয়ে পড়েন। পাকি মিলিটারি প্রায়ই তার বাড়িতে গিয়ে মেয়েদের ধরে দিতে বলত; কোথায় কোথায় মেয়ে পাওয়া যায়, সে খবর সংগ্রহ করে দিতে বলত। এসব কারণে তিনি বরগুনা থেকে পালিয়ে যান। জেলখানায় যাদের হত্যা করা হয়, তাদের জেলখানার পাশে কবর দেওয়া হয়েছিল বলে তিনি জানান।

২. গোলাম মোস্তফা কাদের বলেন, একাত্তর সনের ঊনত্রিশ ও ত্রিশে মে বরগুনায় জেল হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হয়। প্রতি বছরই বরগুনাবাসী এই দু'টি দিনকে শ্রদ্ধার সাথে পালন করে আসছে। চৌদ্দই মে সর্বপ্রথম বরগুনায় পাকি আর্মি আসে। এদিন পাকি বাহিনী বরগুনা সদর থানার চেয়ারম্যান সিদ্দিকুর রহমান পুনু মিয়াকে ধরে নিয়ে যায় এবং তাঁর বাড়িতে লুটতরাজ চালায়। পরে তাঁকে হত্যা করে আর্মি। এর পরের দিন পাকি বাহিনী পাথরঘাটা বিশখালী নদীর তীরে শত শত লোককে ধরে এনে গুলি করে হত্যা করে। সেখানে নারী পুরুষদেরকে সারিবদ্ধভাবে দাঁড় করিয়ে গুলি করে হত্যা করে পাকি বাহিনী। পহেলা মে চার জন পাকি সেনা স্পিডবোটে বরগুনা আসে। এরা দেশীয় সহযোগীদের নিয়ে নাথপট্টি এলাকা ঘেরাও করে, শত শত নারী পুরুষ ও শিশুকে দড়ি দিয়ে বেঁধে গরুর মতো টানতে টানতে জেলখানায় নিয়ে আটকে রাখে।

www.pathagar.com

সতেরোই মে রাতে জেলখানা থেকে বর্তমান গণপূর্ত বিভাগের ডাকবাংলোতে নিয়ে আটক যুবতীদের ধর্ষণ করে, পাকি আর্মি ও তাদের সহযোগীরা। এভাবে ধারাবাহিকভাবে চার দিন ধরে জেলখানায় বন্দী মহিলাদের মধ্য থেকে পাকি সৈন্যরা তাদের পছন্দমত যুবতী ও মহিলাদেরকে ধরে নিয়ে ধর্ষণ করে।

উনত্রিশ ও ত্রিশে মে পাকি বাহিনী নির্বিচারে গুলি করে মোট ছিয়াত্তর জনকে হত্যা করে। বরগুনায় এই ছিয়াত্তর জনের গণকবর আছে এবং স্মৃতিস্তম্ভে তাদের নাম খোদাই করা রয়েছে। সেদিন গুলিবর্ষণ এবং আহতদের আর্তচিৎকারে বরগুনা জেলখানার এক দুই মাইল দূরের মানুষ পর্যন্ত হতভম্ব হয়ে গিয়েছিল। এই হত্যাকাণ্ডের নেতৃত্ব দেয়, পটুয়াখালী জেলার তৎকালীন সামরিক আইন প্রশাসক মেজর নাদের পারভেজ। কেষ্ট ডাক্তার নামে একজন গুলি খেয়ে মরার মতো পড়েছিলেন। তাঁকে যখন গণকবরে ফেলা হয়, তখন তিনি হামাগুড়ি দিয়ে রাস্তার পাশে চলে যান। কিন্তু এখানকার কুখ্যাত রাজাকার শামসু এবং ইমামুদ্দিন তাঁকে দেখে কোদাল দিয়ে পিটিয়ে হত্যা করে। অনেকেই এই ঘটনা প্রত্যক্ষ করেন। ডাকবাংলো ছিল পাকি বাহিনীর প্রধান ক্যাম্প ও নির্যাতন কেন্দ্র। আশেপাশের এলাকা থেকে লোকজনকে ধরে এনে তথ্য আদায় করার চেষ্টা করা হত এখানে। পাকি বাহিনী বরগুনায় কেবল হত্যা ও ধর্ষণ করেই ক্ষান্ত হয়নি। ব্যাপক লুটপাটও চালায় তারা।

স্বাধীনতার পরপরই এখানকার গণকবর খুঁড়ে, কাদের লাশ সেখানে ছিল, সেটা চিহ্নিত করার চেষ্টা করা হয়। পরে শহীদদের হাড়গোড় দাফন করা হয়। বরগুনা শহরে একটা, পাথরঘাটায় একটা ও আমতলীতে একটা গণকবর আছে। আমতলী থানার সর্বদক্ষিণে লালপাড়া নামক স্থানে মুক্তি বাহিনীর সাথে পাকি বাহিনীর গুলি বিনিময় হয়। সেখানেও মুক্তিযোদ্ধাদের গণকবর আছে।

৩. পুষ্পরাণী নাথ বলেন, পাকিস্তানি সেনার সাথে রাজাকাররা মিলে গ্রাম ঘেরাও করে বিভিন্ন বাড়ি থেকে লোকজনকে ধরে নিয়ে যাচ্ছিল। বুধবার বেলা তিন চারটার দিকে আমার স্বামী মাছের খাবার দিয়ে পুকুর পাড়ে বসেছিলেন। আমার শাশুড়িও স্বামীর সাথে ছিলেন। আমি দুই মেয়েকে নিয়ে ঘরে অবস্থান করছিলাম। সে সময় রাজাকার ইমামুদ্দিন দক্ষিণ পাশের খোলা মাঠের দিক থেকে হঠাৎ দৌড়ে আসে। ওই দিকটায় তখন বেড়া দেওয়া ছিল। ইমামুদ্দিন বেড়াটা লাথি মেরে ভেঙে বাঘের মতো বড় বড় চোখ করে উত্তেজিত অবস্থায় পুকুর পাড়ে আমার স্বামীর কাছে হাজির হল। আমার শাশুড়ি ইমামুদ্দিনের ভয়ঙ্কর দৃষ্টি দেখে সেখান থেকে সরে আসেন। আমার স্বামী তখনও বুঝতে পারেননি যে, তাকে সে ধরে নিয়ে যেতে এসেছে। তিনি ভেবেছিলেন, হয়তো কোন বুদ্ধি পরামর্শ দিতে এসেছে। কিন্তু ইমামুদ্দিন এসেই খপ করে আমার স্বামীর হাত ধরে বলে, এই শালা এখন যাবি কই? একথা শোনার পর আমার স্বামী

www.pathagar.com

অপমানে এমনভাবে মাথা নুইয়ে নেন যে, মনে হচ্ছিল তিনি বুঝি তখনই মারা গেছেন। এরপর তিনি আর একটা শব্দও মুখে উচ্চারণ করেননি। ইমামুদ্দিন যা বলে তিনি তাই করেন। আমি ঘরের দরজায় দাঁড়িয়ে সবকিছু দেখতে পাচ্ছিলাম। তারপর ইমামুদ্দিন তাঁকে পুকুর পাড় থেকে ধরে টানতে টানতে বাড়ির দরজার কাছে নিয়ে, এসে তার হাতের ঘড়ি ও আংটি ছিনিয়ে নেয়। বড় মেয়ে তারার কানের, হাতের ও গলার গহনা খুলে দিতে বললে সে ভয়ে কাঁপতে থাকে। তখন ইমামুদ্দিন আমার স্বামীর পিঠে একটা থাপ্পড় দিয়ে বলে, এই শালা তুই খুলে দে। তিনি সাথে সাথে মেয়ের গায়ের গহনা খুলে তার হাতে দিয়ে দেন। এরপর আমার দিকে তাকিয়ে ধমক দিয়ে সব গহনা খুলে দিতে বললে, আমি ভয়ে কাঁপতে থাকি। এ ধরনের দৃশ্য তো কখনও দেখিনি! কী করব বুঝে উঠতে পারছিলাম না। গায়ের সব সোনার গহনা খুলে তার হাতে দিয়ে দিলাম।

এরপর বাড়ি থেকে স্বামীসহ আমাদেরকেও তারা ধরে নিয়ে যায়। জেলখানায় বাচ্চাদেরসহ আমাকে একটা সেলে ঢোকায়। তখন সেখানে এক শ' থেকে এক শ' পঞ্চাশ জন মহিলা বন্দী ছিল বলে আমার ধারণা। জেলের ভেতরে দাঁড়ানোর মতো জায়গা ছিল না। পরদিন আমার শাশুড়িকেও গ্রাম থেকে ধরে আনে। আমার স্বামীকে অন্য সেলে বন্দী করে রাখে। স্বামীর সাথে আর কথা হয়নি আমার। দূর থেকে জানালা দিয়ে দেখতাম, পাকিস্তানি সৈন্যরা পাহারা দিয়ে তাদের কলপাড়ে নিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু কারও সাথে কথা বলার কোন উপায়ই ছিল না। সেখানে তিনদিন বন্দী থেকে পাকি বাহিনীর বিকৃত লালসার যে চিত্র দেখেছি, তা কোনদিনই ভুলতে পারব না।

মিলিটারি এসে বন্দী মহিলাদেরকে জোর করে ডাকবাংলোয় ধরে নিয়ে যেত। আমাদের পাশের বাড়িরই সাত আট মাসের অন্তঃসত্ত্বা এক মহিলা ও তার ননদকে ধরে নিয়ে গিয়েছিল। ভাস্কর কর্মকারের স্ত্রী ও মেয়ে, স্বর্ণ কর্মকারের মেয়ে পুতুলকেও (পুতুল রাণী রায়) পাকি হায়েনাদের নির্মম পাশবিক অত্যাচারের শিকার হতে হয়। তারা মহিলাদের ডাকবাংলোয় নিয়ে গিয়ে সারারাত নির্যাতন করে, ভোরবেলায় লাল কাপড় পরিয়ে পাঠিয়ে দিত। বর্বর পাকি সৈন্যদের পাশবিক নির্যাতনের চিহ্ন সেইসব হতভাগ্য নারীদের শরীরে এতটাই স্পষ্ট থাকত যে, তাদেরকে কিছু জিজ্ঞাসা করার মতো অবস্থা থাকত না। আমি অনেকের মধ্যে মাথা গুঁজে পাকি বাহিনীর দৃষ্টির আড়ালে থাকার চেষ্টা করতাম। কারণ কেউ তাদের চোখে পড়লে রক্ষা পাওয়ার আর কোন উপায় ছিল না। দেশ স্বাধীন হওয়ার পর গণকবর থেকে লাশ তোলা হলে তার মেয়ের বোনা কুশি কাটার গেঞ্জি আর একটা টেট্রনের শার্ট দেখে, পুষ্প রাণী তার স্বামীর লাশ শনাক্ত করেন। এ প্রসঙ্গে তিনি বলেন যে, আমার স্বামীর লাশটা গর্তের মধ্যে বসা অবস্থায় ছিল।

www.pathagar.com

৪. রোকেয়া বেগম বলেন, বরগুনার জেলহত্যা ঘটনায় আমি আমার স্বামীকে হারাই। স্বামীকে হারিয়ে নিদারুণ দুর্দশার মধ্যে দিয়ে আমি আমার সন্তানকে বড় করেছি। সেইসব দিনের স্মৃতি মনে হলে কষ্টে আমার বুক ভেঙে যায়। একাত্তরে আমার বয়স কম ছিল। আড়াই বছরের একটা ছেলে তখন আমার কোলে। পাথরঘাটা থানার পাঁচ নম্বর ইউনিয়নে আমাদের বাড়ি ছিল। শ্রাবণ মাসের বিশ বাইশ তারিখে বিকেলে মিলিটারি রাজাকারদের সহায়তায় আমার স্বামী ও মামাকে বাড়ি থেকে ধরে আনে। আমাদেরকেও জেলখানায় নিয়ে বন্দী করা হয়। আমাকে যেখানে রাখা হয়, সেখানে আরও চার পাঁচ শ' মহিলা ছিল। মহিলাদের ওপর পাকি বাহিনীর পৈশাচিক নির্যাতনের বর্ণনা দিতে গিয়ে তিনি বলেন, পাকিস্তানি মিলিটারি, একসাথে ভেতরে ঢুকে যাকে সামনে পেয়েছে তাকে নির্যাতন করেছে। মেয়েদের জড়াজড়ি, ধরাধরি করে নিয়ে যেত। শাড়ি টেনে খুলে ফেলত। মহিলারা কত কান্নাকাটি করেছে। তাদের হাতে পায়ে ধরেছে, তবুও রেহাই পায়নি। তারা আমাদেরকে কোন সম্মান দেয়নি। প্রায় এক শ' মহিলাকে সেখানে বর্বর পাকি সৈন্যরা লাঞ্ছিত করেছিল।

৫. পরীবানু বলেন, নারীপুরুষ মিলে প্রায় চার পাঁচ শ' লোক তখন জেলখানায় বন্দী ছিল। সেই সময় নারী নির্যাতনের যে দৃশ্য আমি দেখেছি, তা অবর্ণনীয়। আর্মি মহিলাদের কীভাবে নির্যাতন করেছে সেটা তো আপনারা বুঝতেই পারেন। এসব কথা কি মুখে বলা যায় ? আমি নিজে প্রায় এক শ'রও বেশি মহিলাকে নির্যাতন করতে দেখেছি। আমার পাশে বসা মহিলাদের হাত ধরে টেনে নিয়ে যেত। আমার সাথে চারটা বাচ্চা থাকায় কিছু করতে পারেনি।

প্রায় চারদিন বন্দী থাকার পর অনান্য মহিলাদের সাথে পরীবানুও জেলখানা থেকে ছাড়া পান। কিন্তু তার স্বামী কাঞ্চন আলী হাওলাদার সেখানে বন্দী ছিলেন। তিনি ছাড়া পাওয়ার চার পাঁচ দিন পর, টাউন হলের কাছে জেটিতে নিয়ে গিয়ে তাঁর স্বামীকে পাকি সেনার হত্যা করে। লোকজনের মুখ থেকে পরীবানু জানতে পারেন যে, তার স্বামীকে গুলি করে হত্যা করা হয়েছে। তবে তিনি স্বামীর লাশ আর খুঁজে পাননি। সে দুঃসহ কষ্টের স্মৃতি আজও তাঁকে তাড়িত করে। বহু কষ্ট স্বীকার করে তিনি চার সন্তানকে বড় করেছেন।

৬. কেতাব জান বিবি বলেন, নাথপট্টিতে পাকি আর্মি ব্যাপক নারী নির্যাতন চালায়। দক্ষিণ গাঙের ওপারে বহু মেয়েকে তারা নৌকায় তুলে নিয়ে যায়। তাদের উপর নির্যাতন চালিয়ে পরে ছেড়ে দেওয়া হয়। তাকেও ধরে নিয়ে গিয়েছিল কি না জানতে চাইলে তিনি উত্তেজিত হয়ে বলেন, যখনই পাকি বাহিনী আসত তখনই আমি পালিয়ে যেতাম। আমাকে কখনই ধরতে পারেনি। তবে তিনিও পাকি বাহিনীর পাশবিক নির্যাতনের শিকার হয়েছিলেন বলে স্থানীয় লোকেরা জানান। লোকলজ্জায় সে কথা তিনি আজ আর বলতে চান না।

বরগুনায় সংঘটিত সকল যুদ্ধাপরাধের জন্য মেজর নাদের পারভেজ, ক্যাপ্টেন শাফায়াত, হাবিলদার ইকবাল প্রমুখ পাকিস্তানি আর্মি ও তাদের সহযোগীরা দায়ী।

www.pathagar.com

আসামী ঃ ক্যাপ্টেন মুনির, সুবেদার সিদ্দিক।

অপরাধের ধরনঃ গণহত্যা, জাতিগত নিধন, ধর্ষণ, লুটপাট, অগ্নিসংযোগ।

ঘটনাকালঃ একাত্তরের চৌদ্দই মে থেকে স্বাধীনতার পূর্ব পর্যন্ত।

ঘটনাস্থল ঃ ভোলা

সূত্রঃ যুদ্ধাপরাধ গণহত্যা ও বিচারের অন্বেষণ এবং WCFFC গবেষণা।

ক্যাপ্টেন মুনির, সুবেদার সিদ্দিক ও তাদের সহযোগী পাকি আর্মি নদীবহুল ভোলা জেলা ও তার আশপাশের এলাকায় একাত্তরে ব্যাপক গণহত্যা, ধর্ষণ, জাতিগত নিধন, লুটপাট ও অগ্নিসংযোগ ঘটায়। এখানে হাজার হাজার নিরীহ বাঙালি নারী-পুরুষ-শিশুকে তারা হত্যা করে। ব্যাপক ধর্ষণযজ্ঞ চালায় স্থানীয় মা-বোনদের ওপর।

ভোলার ওয়াপদা কলোনিঃ বরিশাল জেলার ভোলার ওয়াপদা কলোনি ছিল পাকি সেনার নির্যাতন কেন্দ্র। এই কেন্দ্রে এমন কোন রাত ছিল না যে, দশ পনেরো জন বাঙালিকে পাকি সেনারা হত্যা করেনি। এই কলোনির রেস্ট হাউজ ছিল পাশবিকতার কেন্দ্রস্থল। এখানে রাতের পর রাত ক্যাপ্টেন মুনির হোসেন এবং সুবেদার সিদ্দিক অসংখ্য নারীকে ধর্ষণ শেষে হত্যা করেছে। ক্যাপ্টেন মুনির লুটপাট করে নগদ টাকা ও সোনাদানা নিজে হাতিয়ে নিয়েছে, আর তার সহযোগীরা দিয়েছে অন্যান্য জিনিস। আর এ কাজে সহযোগিতা করেছে শান্তি কমিটি।

আসামীঃ ক্যাপ্টেন আজমত, কাপ্টেন আজমল খান।

অপরাধের ধরন ঃ গণহত্যা, জাতিগত নিধন, ধর্ষণ, লুটপাট, অগ্নিসংযোগ।

সাক্ষী ঃ মোস্তফা কামাল খান, শামসুল ইসলাম চাঁদ, হেমায়েত উদ্দিন হিমু (যুগান্তর প্রতিনিধি), মানিক রায় (জনকণ্ঠ প্রতিনিধি)।

ঘটনাকালঃ পঁচিশ এপ্রিল থেকে সাত ডিসেম্বর একাত্তর পর্যন্ত।

ঘটনাস্থল ঃ ঝালকাঠি, নলছিটি, কাঠালিয়া ও রাজাপুরের আশপাশের এলাকা।

সূত্রঃ যুদ্ধাপরাধ গণহত্যা ও বিচারের অন্বেষণ এবং WCFFC গবেষণা।

পাকিস্তানি আর্মি ঝালকাঠিতে আসে একাত্তরের পঁচিশে এপ্রিল। ক্যাপ্টেন আজমত ও ক্যাপ্টেন আজমল খানের নেতৃত্বে পাকি বাহিনী ঝালকাঠি, নলছিটি, কাঁঠালিয়া ও রাজাপুরের বিভিন্ন অঞ্চলের নিরীহ হিন্দু সম্প্রদায়ের লোকজন ও মুক্তিকামী

www.pathagar.com

বাঙালিদের ধরে এনে হত্যা করে। নদীর তীরে গুলি করে এসব হতভাগ্যের লাশ পানিতে ভাসিয়ে দেয় তারা। পঁচিশ এপ্রিল থেকে সাত ডিসেম্বর পর্যন্ত ঝালকাঠিতে পাকি বাহিনী পনেরো হাজারের বেশি মানুষকে হত্যা করে। এই হত্যাযজ্ঞে তাদের সাহায্য করে ওসি সেকান্দার, সিআই মাহ আলম, স্থানীয় রাজাকার ও শান্তি কমিটির নেতারা।

পাকি আর্মি ঝালকাঠি তেলের ডিপোর মোড় থেকে গুলি করতে করতে শহরে ঢোকে। এরপর শহরে আগুন লাগিয়ে দিলে ঝালকাঠি শহর পুড়ে নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। কিছুদিন পর পাকি বাহিনী ঝালকাঠির বর্তমান উপজেলা পরিষদ বিল্ডিং-এ ক্যাম্প স্থাপন করে। ক্যাম্পের দায়িত্বে নিয়োজিত ছিল আজমত নামে একজন পাকি আর্মি অফিসার। তবে সে শীতের আগে বদলি হয়ে অন্যত্র চলে যায়।

মুক্তিযোদ্ধা সজীব বোসের বোন রমাবতী বোস ছিলেন ঝালকাঠি কলেজের ছাত্রী। তাঁকে ধরে নিয়ে গিয়ে পাকি বাহিনী তাঁর ওপর ভয়ঙ্কর পাশবিক নির্যাতন চালায়। পরে নদীর তীরে তাঁর লাশ পাওয়া যায়। হিসানন্দকাঠির শেফালী রাণীর ছেলেকে তার সামনে আছড়ে মেরে ফেলে তারা। তারপরও তাদের কুপ্রস্তাবে রাজি না হওয়ায় বেয়নেট দিয়ে খুঁচিয়ে শেফালিকে তারা হত্যা করে।

একুশে মে পাকি বাহিনী রজানাথপুরে আক্রমণ চালিয়ে বেপরোয়া গুলিবর্ষণ ও অগ্নিসংযোগ করে। এ দিন আবদুল মাঝি, আহম্মদ মাঝি, আঃ হালিম মাঝি, এনাজউদ্দিন মাঝি, তককি মাঝিসহ অনেকে নিহত হন। তেইশে মে রমানাথপুরে দ্বিতীয়বারের আক্রমণে পাকি বাহিনী নামাজ আদায়রত মুসল্লিদের ধরে নিয়ে পুকুর পাড়ে বসিয়ে গুলি করে হত্যা করে। আঃ মান্নান, আঃ সালাম, আঃ হাসেম মাঝি, আঃ লতিফ মাঝি, আঃ রাজ্জাক খান, আঃ জাব্বারসহ মোট সতেরো জনকে তারা এদিন গুলি করে হত্যা করে। এর মধ্যে আঃ রাজ্জাক খান ও নুরুল ইসলাম শরীফ ভাগ্যক্রমে প্রাণে বেঁচে যান।

নলছিটি থানার বিরাট গ্রাম থেকে বরিশাল বারের অ্যাডভোকেট জিতেন্দ্রলাল দত্ত, তাঁর ছেলে সাংবাদিক মিহিরলাল, সুধীরলাল দত্তসহ হিন্দু সম্প্রদায়ভুক্ত অনেককে ঝালকাঠি পাঠানো হয়। তেসরা জুন এঁদের এগারো জনকে পৌরসভার সামনের বধ্যভূমিতে নিয়ে গুলি করে হত্যা করা হয়। পয়লা জুন এই অঞ্চল থেকে বহুসংখ্যক যুবতী মেয়েকে পাকিবাহিনী ধরে নিয়ে যায়। পরে তাঁদের আর কোন খোঁজ পাওয়া যায়নি। এদিন এগারো জন কিশোরকেও হত্যা করা হয়। চৌঠা জুন পাঁজিপুঁথিপাড়া, বারোই জুন ভিমরুলী, ষোল ও ছাব্বিশে জুন বৈশাইন খান এলাকায় কয়েক শ' মানুষকে হত্যা করে তারা। বিভিন্ন স্থান থেকে ধরে আনা মানুষের মধ্য থেকে যুবতী ও তরুণদের বাছাই করে সিও অফিসের বন্দীশালায় বিবস্ত্র অবস্থায় আটকে রাখা

www.pathagar.com

হত। পাকি বাহিনীর পর্যায়ক্রমিক নির্যাতন ও অনাহারে যখন তাঁরা অচেতন হয়ে পড়তেন, তখন তাঁদেরকে বধ্যভূমিতে পাঠিয়ে দেওয়া হত। পৌরসভার পাকা ব্রিজের নিচেও অনেককে হত্যা করে ফেলে রাখা হয়েছিল। শহরের সীতারাম দাস, বাজার করতে যাওয়ার পথে তাঁকে ধরে নিয়ে অকথ্য নির্যাতনের পর হত্যা করে এই ব্রিজের নিচে ফেলে দেয়া হয়।

সুতাবাড়িয়া গ্রামের কালীপ্রসন্ন সমাদ্দারের স্ত্রী পারুল বালার হত্যার দৃশ্য দেখার পর তাঁর সন্তান, অমল চন্দ্র সমাদ্দার আজও মানসিক রোগী হয়ে দিনযাপন করছেন। মারাত্মকভাবে পাঁজরে গুলি লেগে বেঁচে আছেন রনজিৎ দাস। এক হাত পঙ্গু হয়ে গেছে নিমাই পালের। উল্লিখিত সকল গণহত্যা, ধর্ষণ, অগ্নিসংযোগ ও ধ্বংসাত্মক কর্মকাণ্ডের জন্য ক্যাপ্টেন আজমত, ক্যাপ্টেন আজমল ও তাদের অধীনস্থ পাকি বাহিনী ও দোসররা দায়ী।

www.pathagar.com

রাজশাহী বিভাগ

আসামী ঃ লে. কর্নেল আব্দুলাহ খান, লে. কর্নেল সাফায়েত (বেলুচ), মেজর রাজা, মেজর শেরওয়ানী, মেজর আখতার শাহ, মেজর হাজী আব্দুল মজিদ, মেজর আসলাম (২৫ পাঞ্জাব), ক্যাপ্টেন রাজা ইসহাক, ক্যাপ্টেন ইলিয়াস, আসলাম (র‍্যাঙ্ক অজ্ঞাত), সাধারণ সৈনিক মোঃ আলী খান।

অপরাধের ধরনঃ গণহত্যা, জাতিগত নিধন, ধর্ষণ, লুটপাট, অগ্নিসংযোগ।

সাক্ষী ঃ গুরু প্রসাদ দাস, মাহতাব উদ্দীন, মোঃ আবুল হাসান খন্দকার, মোহাম্মদ ইসলাম আলী, হালিমা বেওয়া, আমিনুল হক, অনন্ত বালা, যমুনা, মাহতাব উদ্দীন, মালেকা বেওয়া, শ্রী সুন্দরী, মোঃ নূরুন্নবী, সেকেন্দার আলী মণ্ডল, মরিয়ম বেওয়া, মীনা পাণ্ডে, গলেজান বেওয়া (শহীদ আব্দুর রহমানের মা), কমেলা বেওয়া, তমাল কান্তি চৌধুরী, অধ্যাপক প্রফুল্ল চন্দ্র সরকার, সুনীল কুণ্ডু, বীণা দত্ত, শ্বেতব রানী কুন্ডু, মোঃ আবুল হাসান খন্দকার, তরুবালা, স্বপন কুমার বিশ্বাস, সান্ত্বরা খানম, চম্পা সমাদ্দার, মোহাম্মদ ইসলাম আলী, রহমত, সাবেরা হক, হোসনে জাহান, ড. সুজিত সরকার।

ঘটনাকালঃ একাত্তরের পঁচিশ মার্চ থেকে স্বাধীনতার পূর্ব পর্যন্ত।

ঘটনাস্থল ঃ রাজশাহী জেলা।

সূত্রঃ যুদ্ধাপরাধ গণহত্যা ও বিচারের অন্বেষণ এবং WCFFC গবেষণা।

একাত্তরের পঁচিশ মার্চ থেকে পাকিস্তানি আর্মি উপরোক্ত সদস্যবৃন্দ ও তাদের সহযোগীদের রাজশাহী জেলায় ব্যাপক গণহত্যা, ধর্ষণযজ্ঞ, জাতিগত নিধন ও ধ্বংসাত্মক কর্মকাণ্ড চালায়। মূলত এসব সামরিক কর্মকর্তা ও সদস্যদের সরাসরি অংশগ্রহণে এই সব ধ্বংসাত্মক কর্মকাণ্ড পরিচালিত হয়। পাকিস্তানি সেনাবাহিনী ও তাদের দোসরদের ব্যাপক হত্যা ও ধ্বংসযজ্ঞের জরিপ চালানোর জন্য ১৯৭২ সনে রাজশাহীর সাত জন শিক্ষক ও পঞ্চাশ জন ছাত্র সমন্বয়ে গঠিত দলের 'চলো গ্রাম ঘুরে' নামক কর্মসূচীর মাধ্যমে সপ্তাহব্যাপী এক জরিপ চালানো হয়। এতে পাকিস্তানি সেনার ব্যাপক ধ্বংসযজ্ঞের পরিচয় পাওয়া যায়। তা ছাড়া আমাদের নিবিড় গবেষণায় রাজশাহী জেলায় পাকি বাহিনীর ব্যাপক নির্যাতন ও গণহত্যার বিষয়টিও উঠে এসেছে। এ প্রসঙ্গে কয়েকজন প্রত্যক্ষদর্শী ও ক্ষতিগ্রস্তের সাক্ষ্য এখানে তুলে ধরা হল।

www.pathagar.com

১. সোয়ালোজ প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক আমিনুল হক বলেন, পাকি বাহিনী তেরোই এপ্রিল চারঘাট গ্রামটি ঘিরে ফেলে। গ্রামের শত শত নিরীহ মানুষ বেরনোর পথ না পেয়ে পদ্মার পাড়ে গিয়ে আশ্রয় নেন। এ সময় আর্মি পুলিশ একাডেমি, ক্যাডেট কলেজ ও চারঘাট মোড়ের প্রায় এক হাজার লোককে ধরে এক জায়গায় জড়ো করে। এদের মধ্যে পুলিশ একাডেমির কিছু সদস্য, চাকরিজীবী, থানাপাড়ার অধিবাসী ও গ্রাম থেকে আসা লোকজন ছিল। এই দল থেকে পুরুষদের পৃথক করে পাকি আর্মি মেশিন গানের ব্রাশ ফায়ারে সবাইকে হত্যা করে। সেদিন আর্মি প্রায় তিন শ' লোককে নৃশংসভাবে হত্যা করেছিল। এদের মধ্যে কিছু জীবিত লোক লাশের নিচে চাপা পড়ে যান। আর্মি কিছুদূর যাওয়ার পর, তাঁরা লাশ সরিয়ে দৌড়ে পালাতে গেলে তারা দেখে ফেলে এবং পুনরায় গুলি করা শুরু করে। এতে অনেকেই দ্বিতীয়বার গুলিবিদ্ধ হন। এরপর তারা সেখানে পড়ে থাকা জীবিত, মৃত সকলকে এক জায়গায় স্তূপ করে ত্রিপলে ঢেকে, পেট্রোল ঢেলে আগুন লাগিয়ে দেয়। এরপরও তাঁদের মধ্যে কেউ কেউ ভাগ্যক্রমে বেঁচে আসতে পেরেছিলেন। তাদের অনেকের মাথার চুল পুড়ে যায়। অনেকের হাত পুড়ে যায়, কারও দেহের ওপর অংশ থেকে পা পর্যন্ত পুড়ে যায়। বেলাল নামের একজন এখনও বেঁচে আছেন। সেদিন তার দেহ মারাত্মকভাবে পুড়ে গিয়েছিল।

আমাদের এখানে নারী নির্যাতনের ঘটনা শুরু হয় আগস্ট মাস থেকে। পাকিস্তানি সৈন্যরাই এসব নির্যাতনের ঘটনা ঘটায়। নারী নির্যাতনের একটি ঘটনা আমি জানি। আমাদের এখানকার হেমন্ত বাবুর স্ত্রীকে পাকি আর্মির পাশবিক নির্যাতনের সময় মহসীন নামে থানাপাড়ার এক লোক দেখে ফেললে প্রতিবাদ জানায়। আর্মি এতে ক্ষিপ্ত হয়ে হেমন্ত বাবুর বাড়িতেই মহসীনকে বেয়নেট চার্জ করে, নৃশংসভাবে হত্যা করে।

২. শেখের চকের মাহতাব উদ্দীন বলেন, একাত্তরে রাজশাহীতে ব্যাপক নারী নির্যাতনের ঘটেছে। চৌদ্দই এপ্রিল রাজশাহী মহানগরীর রানী বাজার এলাকায় এক বাড়িতে ঢুকে পাকিস্তানি আর্মি ওই বাড়ির তিন জন পুরুষকে নির্মমভাবে হত্যা করে, বাড়ির দুই মহিলাকে ধর্ষণ করে। ওই দুই মহিলা নির্মম পাশবিক নির্যাতনের পর অজ্ঞান হয়ে যান। পরে তাঁরা জ্ঞান ফিরে পেলে শহীদদের লাশ নিজেরাই উঠোনে মাটিচাপা দেন। মহিলা দু'জন সম্পর্কে শাশুড়ি পুত্রবধূ ছিলেন। পুত্রবধূ বেঁচে আছেন, বর্তমানে সাগরপাড়া এলাকায় থাকেন। পরিচয় প্রকাশ না করার শর্তে তারা আমার কাছে এই ঘটনাটি প্রকাশ করেন। সে কারণে তাদের ঘটনা আমি সর্বত্র বললেও নাম প্রকাশ করি না। আমার জানা মতে, এই এলাকায় সাত জন নারী নির্যাতিত হয়েছেন। কিন্তু কেউই এখন সেটা স্বীকার করতে চান না। শেখের চক মহল্লায় পাকি বাহিনী তেরো ও চৌদ্দ এপ্রিল বিক্ষিপ্তভাবে বহু লোককে নদীর ধারে নিয়ে গিয়ে হত্যা করে। ঢাকা থেকে রিইনফোর্সমেন্ট হওয়ার পর বিপুল সংখ্যক পাকি আর্মি রাজশাহী শহর ছেয়ে ফেলে। তখন আমরা এখান থেকে চলে যাই। শহরে ঢোকার প্রথম

www.pathagar.com

দিনেই তারা সমগ্র রাজশাহী শহর জুড়ে ব্যাপক ভাঙচুর ও অগ্নিসংযোগ করে। সাহেব বাজার ও তালাইমারি রানী নগরের বিস্তীর্ণ এলাকা পুড়িয়ে দেয়। আমার বড় ভাইয়ের স্টুডিয়োতেও তারা অগ্নিসংযোগ করেছিল।

তখনকার দুই পাকি সেনার নাম আমার এখনও মনে আছে। এদের একজন মেজর রাজা। সে ধরা পড়েছিল বর্তমান নাটোর জেলার গোপালপুরে। আরেকজনের নাম ছিল আসলাম। সে গোয়েন্দা বিভাগের লোক ছিল। রাজশাহী শহরে সে হিরো হিসেবে কুখ্যাত হয়েছিল। এ সময় তারা দু'জন বহু লোককে ধরে নিয়ে হত্যা করে।

৩. মিলিক বাঘা গ্রামের নূরুন্নবী বলেন, আমরা মুলাটোলি রাজাপুর থেকে ফিরে আসার পরে ঊনত্রিশে মার্চ একটি নৃশংস ও হৃদয়বিদারক দৃশ্য দেখতে পাই। বনপাড়ার ধানাইদহ নামের একটি জায়গায় শুকিয়ে যাওয়া শুকনো এক পুকুরে ত্রিশ-চল্লিশ জন মহিলা ও পঞ্চাশ-ষাট জন পুরুষ প্রাণ ভয়ে আশ্রয় নিয়েছিলেন। পাকিস্তানি আর্মি ওই পুকুরের মধ্যেই তাদেরকে ব্রাশ ফায়ার করে হত্যা করে। সেখানে একজন মহিলা প্রাণের ভয়ে বাড়ি থেকে দৌড়ে পুকুরে নামতে গিয়ে পড়ে যান। মেয়েটা তখন গর্ভবতী ছিলেন। গুলির শব্দে মেয়েটির গর্ভপাত হয়ে যায়। বাচ্চা অথবা মা কারও শরীরেই গুলি লাগেনি, কিন্তু দু'জনেই মারা যায়।

নারী নির্যাতনের ঘটনাও এখানে ঘটেছে। আমার বাড়িটি যেদিন পোড়ানো হয়, সেদিন আমার মেয়েরা আমাদের কাজের মেয়ের বাড়িতে গিয়ে আশ্রয় নিয়েছিলেন। সেখানে প্রাক্তন প্রতিমন্ত্রী ডা. আলাউদ্দিনের স্ত্রীও ছিলেন। পাকি সেনারা ওই বাড়িটি ঘেরাও করলে মেয়েরা চৌকির নিচে লুকিয়ে পড়েন। এ সময় হারেজান নামে আমাদের সেই কাজের মেয়েটা দরজা আড়াল করে দাঁড়িয়ে বয়স্ক মানুষের মতো গম্ভীরভাবে বলেছিল, এখানে আমার ছেলেমেয়ে কেউ নেই আমি একাই আছি। এভাবে মিথ্যা কথা বলে সে আমাদের মেয়েদেরকে সেদিন পাকি আর্মির হাত থেকে রক্ষা করেছিল। তারপরও কিছু ঘটনা এখানে ঘটেছে। শুনেছি, পাকি আর্মি জোর করে অনেকের ঘরে ঢুকে পাশবিক নির্যাতন চালিয়েছে। এ সময় রাজাকার, বিহারি ও আলবদররা পাকি আর্মির সাথে থাকত। তবে সেগুলো মনের মধ্যেই রেখে দিয়েছে সবাই, 'মনের বিষ মনে মরা' সম্মানের ভয়েই তারা সেই সব ঘটনা আর প্রকাশ করেনি।

৪. মিলিক বাঘা গ্রামের সেকেন্দার আলী মণ্ডল বলেন, ভাদ্র মাসে যুদ্ধ শুরু হয়। আমি তখন বাঘাতেই ছিলাম। তবে বাঘায় নির্ভয়ে থাকা যেত না। আমরা পালিয়ে পালিয়ে থাকতাম। একদিন খুব ভোরে আর্মি গ্রাম ঘিরে ফেললে আমরা পালানোর প্রস্তুতি নিচ্ছিলাম। এর মধ্যেই দেখি যে আর্মি আমাদের বাড়িতে ঢুকে পড়েছে। তারা চতুর্দিক ঘিরে ফেলে ফায়ার শুরু করে দেয়। আমরা পালানোর কোন সুযোগই পাইনি। এক সময় ওরা আমাকেসহ আরও পাঁচ জনকে ধরে ফেলে। আমি তো খুবই ভয় পেয়ে গিয়েছিলাম। মনে হয়েছিল, ওরা সেখানেই আমাদেরকে মেরে ফেলবে।

www.pathagar.com

কিন্তু মারল না। শুধু ওদের কিছু জিনিস ও গুলির বাক্স বইয়ে লালপুর থানায় নিয়ে গেল। গিয়ে দেখি আরও অনেক লোককে সেখানে বন্দী করে রেখেছে। তখন ভাবলাম, এখান থেকে পালাতে হবে। তারপর অনেক বুদ্ধি খাটিয়ে প্রস্রাব করার নাম করে সেখান থেকে বেরিয়ে দৌড় দেই। অনেক খানি পথ জঙ্গল পেরিয়ে যখন বাঘায় এসে পৌঁছাই, তখন রাত আটটা বেজে গেছে। আমি চলে আসার পর সেখানে থাকা বারো জন নিরীহ বাঙালিকে তারা সারদা মাঠে নিয়ে হত্যা করে। তাদের লাশগুলো সেখানেই কোন রকমে মাটি দেওয়া হয়। তখন তো লাশ নিয়ে আসার কোন উপায় ছিল না। বাঘাতে এসেও দেখলাম অনেক গোলাগুলি হয়েছে। পাকি আর্মি এলাকায় অনেক নারী নির্যাতনও করেছে। এখানে সুরজান নামে এক মেয়েকে নির্মমভাবে পাশবিক নির্যাতন করে। ওর স্বামীর নাম বিস্‌ছাদ আলী।

৫. পুঠিয়া থানার কৃষ্ণপুর গ্রামের তমাল কান্তি চৌধুরী বলেন, এটা ছিল মূলত হিন্দু এলাকা। হিন্দুদের ওপর অত্যাচারও হয়েছে বেশি। এলাকার প্রতিটি মন্দিরের ব্যাপক ক্ষতিসাধন করা হয়। গোবিন্দ মন্দিরে হিন্দু নারীসহ মুসলিম নারীদেরকেও নির্যাতন করা হয়। আর্মি এখানকার মন্দিরের বিগ্রহগুলো ভেঙে ফেলে। একাত্তরে পাকি আর্মির হাতে এখানকার যারা মারা গেছেন, তাদের মধ্যে ফাকি, অলোক দত্ত, দেবু পাল, মোল্লার ছেলে, ভূপেন, কানুসহ আরও অনেকেই ছিলেন। তাদের সবার নাম এখন মনে করতে পারছি না। অনেকেই নির্যাতিত হয়ে বেঁচে আছেন। একজন নির্যাতিতা মহিলা আছেন, তিনি প্রায়শই কাঁদেন। অন্য মহিলারা সংসার ও ছেলেমেয়ে নিয়ে সেই দুঃষহ স্মৃতি ভুলে থাকার চেষ্টা করছেন।

৬. অধ্যাপক প্রফুল্ল চন্দ্র সরকার বলেন, পাকিস্তানি আর্মি যেদিন যোগীশো গ্রামে হামলা করে, সেদিন আমি গ্রামেই ছিলাম। তখন খুব ভোর। গ্রামের লোকজন সবে ঘুম থেকে উঠছে। এমন সময় আর্মি গ্রামে এসে ঢুকল। ছয়টি ট্রাকে করে তারা এখানে এসেছিল। আমার বাড়ির কাছেই একটি প্রাইমারি স্কুল ছিল। ওরা সেখানে এসেই প্রথম নামল। তারপর আমাদের গ্রামের আব্দুল আজিজ সরকারকে ধরে নিয়ে গিয়ে বলল, 'তুমি গ্রামের লোকজনকে গিয়ে বল যে, এখানে শান্তি কমিটির মিটিং হবে, কাউকে হত্যা করা হবে না।' অবশ্য এই কথাটি গ্রামের মধ্যে আগেই প্রচার হয়ে গিয়েছিল। এই গ্রামে হাজী সাহেব নামে একজন জনপ্রিয় লোক ছিলেন। তিনি তাঁর ছোট ভাই আব্দুল কাদের পোস্টমাস্টারকে বলেছিলেন, 'আর্মির গ্রামে পৌঁছার আগেই তুমি গ্রামে গিয়ে সবাইকে জানিয়ে দাও যে, কোন হিন্দু যেন গ্রামে না থাকে। কারণ তারা এখানে সেখানে পৌঁছানোর সাথে সাথেই তাদেরকে হত্যা করবে।

কিন্তু কাদের মাস্টার গ্রামে এসে ভুল তথ্য দেয়। সে ছিল রাজাকার। সে গ্রামে এসে বলে যে, তোমরা এখানে থাক, হাজী সাহেব আসছেন। তিনি এলে শান্তি কমিটির মিটিং হবে। তোমাদের কোন ভয় নেই। হাজী সাহেবের ওপর আমাদের এলাকার হিন্দু মুসলমান সবারই খুব আস্থা ছিল। গ্রামবাসী এ ব্যাপারে নিশ্চিন্ত ছিল যে, তাঁর

www.pathagar.com

দ্বারা কোন মানুষের ক্ষতি হবে না। সেই বিশ্বাসে গ্রামের সমস্ত লোক স্কুল মাঠে একত্রিত হয়েছিল। উপস্থিত লোকদের মধ্যে প্রথমে বাছাই প্রক্রিয়া শুরু হল। তারা উপস্থিত লোকদের মধ্যে থেকে বিয়াল্লিশ জন হিন্দুকে আলাদা করে সারিবদ্ধভাবে দাঁড় করাল। তারপর নির্মমভাবে বেত্রাঘাত করতে শুরু করল। আকস্মিক এই ঘটনায় উপস্থিত লোকজন হতবিহ্বল হয়ে পড়েন। তারা আর্তনাদ করতে থাকেন। তখন স্কুলের হেডমাস্টার যতীন্দ্রনাথ সাহা পাকিস্তানি আর্মিকে বলেন, আমরা তো দেশের শত্রু নই। এভাবে বেত্রাঘাত করার চেয়ে আমাদেরকে মেরে ফেলেন। এই অত্যাচার অসহনীয়। এই কথা বলার পরপরই তারা প্রত্যেকের মাথার খুলিতে গুলি চালায় এর সবাইকে মের ফেলে।

খুব পরিষ্কার আবহাওয়া ছিল সেদিন। যোগীশো গ্রামের নিরীহ লোকগুলোকে হত্যা করে সেখান থেকে আর্মি সরে যাওয়ার পর তুমুল বৃষ্টি নেমেছিল। তারপর সারা দিন গ্রামের থমথমে পরিবেশের মতোই মেঘলা ছিল আকাশ। স্কুল মাঠের চতুর্দিকে ছড়িয়ে ছিটিয়ে ছিল সাদা সাদা মগজের অংশ। লাশগুলোকে গণকবরে চাপা দেওয়া হয় কোন রকমে। আমি তখন পার্শ্ববর্তী জঙ্গলে লুকিয়ে ছিলাম। মনে পড়ে, আমি একটি কলা গাছের নিচে দাঁড়িয়ে ছিলাম। আমার গায়ে ছিল সাদা গেঞ্জি। দূর থেকে সাদা গেঞ্জি দেখে ওরা আমার অবস্থান বুঝে ফেলতে পারে ভেবে গেঞ্জি খুলে কলা গাছের সবুজ পাতা দিয়ে নিজেকে ঢেকে রেখেছিলাম। আমার সাথে ছিলেন আমার বাবা-মা ও ছোট ভাই। আমরা সেদিন পালাতে পেরেছিলাম শুধু মাত্র সেই মেম্বারের কথায়। তবে যাওয়ার পথে আমার বাবাকে গ্রামের দু'টি ছেলে ধরে বলেছিল, আপনাকে মিটিং-এ উপস্থিত থাকার জন্য বলেছে। আপনি যদি সেখানে না যান, তবে ওরা আপনার বাড়ি ঘর পুড়িয়ে দেবে। ঘটনা ওখানেই শেষ নয়। এতগুলো লোককে হত্যা করেও থেমে যায়নি পাকি আর্মি। তারা এলাকায় ফিরে এসে নারী নির্যাতনের মতো নির্মম ও নৃশংস ঘটনা ঘটায়। এরপর তারা রাজাকার ও তাদের অন্যান্য সহযোগীদের বলে যে, এলাকায় যত সুন্দরী মেয়ে আছে, তাদেরকে আমরা বিয়ে করব।

সেদিন আমাদের চলে যাওয়ার পর আরও অনেকেই গ্রাম ছেড়ে চলে গিয়েছিল। শুনেছি গ্রামে কোন লোক ছিল না। মাত্র দু'তিন ঘর মানুষ ছিল। তার মধ্যে আমার জ্যাঠাত বড়দাও ছিলেন। তিনি ছিলেন কাব্যতীর্থ। রাজশাহী সরকারি কলেজের কাব্যতীর্থ শেষ ব্যাচের ছাত্র। আমার এই বড়দাকে ওরা ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করতে বাধ্য করেছিল। তিনি ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করার পর কোরআন শরীফ পড়তেন, এমন কী নিজে একটি মসজিদও তৈরি করেছিলেন গ্রামে। অবশ্য দেশ স্বাধীন হওয়ার পর তিনি আবার নিজ ধর্মে ফিরে আসেন। এইভাবে কয়েক ঘর কর্মকার যারা সেসময় গ্রামে ছিলেন, তারা ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে জীবন বাঁচিয়েছেন। গ্রামে থাকা হিন্দুরা ইসলাম ধর্ম গ্রহণ না করলে পাকি আর্মি তাদেরকে হত্যা করত। সেদিন যে বিয়াল্লিশ জনকে হত্যা করা হয়, তাদের সবাইকে ইসলামি মতে গণকবরে দাফন করা হয়েছিল।

www.pathagar.com

এই এলাকায় যত মন্দির ছিল, পাকি আর্মি তার সবগুলোই ধুলিস্যাৎ করে দেয়। একটা মন্দিরও তারা অক্ষত রাখেনি। মাটির দেয়াল ও টিনের চালা দিয়ে তৈরি প্রত্যেকটা মন্দির তারা ভেঙে ফেলে। একটা নাটমন্দির ছিল, সেখানে নাটক, থিয়েটার, যাত্রা গানসহ বিভিন্ন উৎসবের সময় হিন্দু মুসলমান মিলে আনন্দ করত। এ কারণে হিন্দু মুসলমানদের মধ্যে সম্প্রীতিও খুব ভাল ছিল। সেই নাটমন্দিরটিও তারা ভেঙে ফেলে। মন্দিরগুলো ভেঙে ফেলার পর এলাকার মুসলমান রিফিউজিরা সেখানে ভিটা বাড়ি তৈরি করে।

৮. পুঠিয়ার সুনীল কুণ্ডু সেই ভয়াবহ দিনের স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে বলেন, সারা দেশে তখন যুদ্ধ শুরু হয়েছে। আমরা পুঠিয়া থেকেও সে সব সংবাদ পাচ্ছিলাম। এক রকম ভয়ে ভয়েই দিনগুলো পার করছিলাম। সেই ভয়কে সত্যি করে একদিন খুব ভোরে পাকিস্তানি আর্মি আমাদের গ্রামে হামলা করল। তখন রাত চারটা। ওই সময়ই ওরা আমাদের বাড়ি ঘিরে ফেলল। আমরা তখন ঘুমিয়ে ছিলাম। হঠাৎ হৈচৈ ও আর্মির ভারি বুটের শব্দে জেগে উঠলাম। জানালা খুলে আশেপাশের পরিস্থিতি বোঝার চেষ্টা করলাম। তখন দেখি যে, আমাদের পাশের বাসার এক লোক পাখি মারা বন্দুক দিয়ে পাকিস্তানি আর্মির গুলি করার চেষ্টা করছে। কিন্তু কিছুক্ষণ পরই আর্মি সেটা টের পেয়ে গেল। তখন তারা সেই লোকটাকে ঘর থেকে টেনে বের করে আনে। সেই সময় তারা এলাকায় আরও কিছু ধরপাকড় করেছিল। সেইসাথে চিৎকার করে বলতেছিল, 'তোমাদের মৃত্যু ঘনিয়ে এসেছে, তোমরা সবাই বের হও।

তারা জোর করে আমাদের ঘরে ঢুকে পড়ে। আমার বাবা ও ভাইকে ওরা ধরে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করতে থাকলে মা আর বৌদি তাতে বাধা দেন। এ সময় ওরা বৌদিকে নির্যাতনের চেষ্টা চালায়। ওরা যখন বৌদিকে ধর্ষণ করার চেষ্টা করছিল। আমি তখন সেটা দেখতে পাচ্ছিলাম। কিন্তু অনেক ছোট বলে আমার কিছুই করার ছিল না। সেই দৃশ্য এখনও আমার চোখের সামনে ভাসে। আতংকিত কিশোর আমি, একটু দূর থেকে তাকিয়ে দেখছি সেই অদৃশ্যপূর্ব নির্যাতনের ঘটনা। আমি ভয়ে কাঁপছি, আমার মা কাঁদছে, এমন সময় হুইসেল বেজে উঠল। পাষণ্ডরা তাদের অপকর্ম ফেলে ছুটতে ছুটতে বাইরে চলে গেল। যাওয়ার সময় আমার বাবা ও ভাইকে এ করকম টানতে টানতে নিয়ে যায়। আমাকেও ওরা সাথে ধরে নেয়। তারপর পেট্রোল ঢেলে আমাদের বাড়িতে আগুন লাগিয়ে দেয়।

এই রকম পরিস্থিতি সৃষ্টি করার পর ওরা বেশ কিছু লোককে বন্দী করে সামনের দিকে নিয়ে যায়। মনে হয়, আমি ছোট ছিলাম বলে ওরা আমাকে কী মনে করে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দেয়। আমি পড়ে যাওয়ার পর ওরা আমাকে সেখানেই রেখে একটু সামনে গিয়ে দাঁড়িয়ে যায়। আমি তখন প্রচণ্ড ভয় পেয়ে গিয়েছিলাম। কী করব বুঝে উঠতে পারছিলাম না। উঠে দাঁড়িয়ে দেখলাম, ওরা আমার বাবা, ভাই ও আমাদের পাশের বড়ির সেই লোকটাকে গুলি করে হত্যা করল। সেখানে বন্দী অবস্থায় গ্রামের আরো অনেক লোকজন ছিল।

www.pathagar.com

৯. বোয়ালিয়ার আবুল হাসান খন্দকার বলেন, রাজশাহীতে প্রথম হামলা হয় একাত্তরের সাতাশে মার্চ। তার সম্ভবত দু'এক দিন আগেই ওরা এখানে এসেছিল। বাঙালি অফিসার লে. কর্নেল রকিব এখান থেকে চলে যাওয়ার পর তার স্থানে লে. কর্নেল আব্দুল্লাহ্ খান আসে। আমি তখন শহরেই ছিলাম। এখানে আরও একজন আর্মি অফিসারের নাম আমার মনে পড়ে, সে হল মেজর হাজী আব্দুল মজিদ (৬ নং উইং কমান্ডার)। এদের সবার ইউনিট ছিল সেক্টর হেডকোয়ার্টার ইস্ট পাকিস্তান রাইফেলস। এ ছাড়াও রাজশাহীতে ছিল পঁচিশ পাঞ্জাব ও বত্রিশ বেলুচ।

শহরে প্রথম আক্রমণ হয় ছাব্বিশ তারিখ দিবাগত রাতে। আমার তখন টেলিফোনের ডিউটি ছিল। ডিউটির সময় হঠাৎ করে বিদ্যুৎ চলে যায়। আমরা তো প্রথমে বুঝতে পারছিলাম না হঠাৎ করে এমন হল কেন? আমি তখনও ঠিক মতো ধারণা করতে পারিনি যে, এই রকম কিছু একটা হবে। বাইরে বেরিয়ে দেখি চারদিকে অন্ধকার। ওখান থেকে তৎকালীন রেডিয়ো পাকিস্তান রাজশাহীর গেট দেখা যাচ্ছিল। আমি সেদিকে এগিয়ে গেলাম। সেখানে গিয়ে দেখি বেলুচ রেজিমেন্টের পাকিস্তানি আর্মি ডিউটি করছে। ওদের সবার নাম মনে নাই। তবে একজনের কথা বলতে পারি। সে ছিল সাধারণ সৈন্য তার নাম মোঃ আলী খান। সে আমাকে উর্দুতে জিজ্ঞেস করল, আপনি কে? আমি আমার পরিচয় দিলাম। সে তখন বলল, আপনি এখান থেকে চলে যান। আমি তখন কলাবাগানে আব্দুর রউফ নামে একজনের বাসায় গিয়ে আশ্রয় নেই। সাতাশ তারিখ এভাবেই চলে গেল। আঠাশ তারিখে আমি আমার বন্ধুদের নিয়ে সেখান থেকে বের হয়ে এলাম।

আমার চোখের সামনে রানীনগর তালাইমারি এলাকা যেভাবে পুড়ে যেতে দেখেছি, তা বর্ণনা করার মতো নয়। অনেক সাধারণ মানুষ তখন নিহত হয়েছেন, অনেক নারী নির্যাতিত হয়েছেন। একজন মহিলাকে আমি চিনি। তার নাম রাবেয়া। সেদিন পাকিস্তানি আর্মির চেকিং চলছিল। অর্থাৎ বাড়ি বাড়ি ঘুরে তারা মুক্তিযোদ্ধা খুঁজছিল। তিন জন পাকিস্তানি সাধারণ সৈন্য রাবেয়ার বাড়িতে প্রবেশ করে। ওদের সাথে কয়েকজন বিহারিও ছিল। বাড়িটা ছিল রানীনগরে। তারা লুটপাটও করতে চেয়েছিল। রাবেয়া বাড়িতে একা ছিলেন। তার স্বামী বাড়িতে ছিলেন না। সেই সুযোগে পাকিস্তানি সৈন্যরা তার ওপর পাশবিক নির্যাতন চালায়। তবে পরে সেটাকে নিছক একটি দুর্ঘটনা হিসাবে তাঁর স্বামী মেনে নেন। এখানকার অনেকের ওপরেই সে সময় এ রকম পাশবিক নির্যাতন চালানো হয়েছে।

সান্তুরা খানম বলেন, আমি তখন তিন ছেলের মা। পাকি বাহিনী রাজশাহী দখলের পর ঘাঁটি গেড়ে বসে বিশ্ববিদ্যালয়ের গেস্ট হাউজে। এপ্রিলের শেষ দিকে চারঘাট থানার আলাইপুর গ্রামে সান্তুরা খানম সপরিবারে অবস্থান করছিলেন। কিন্তু জুলাইয়ের শুরুতে আবার রাজশাহীতে ফিরে আসেন। রেডিয়োতে বারবার কাজে যোগ দেওয়ার কথা শুনেই তাঁরা ফিরে আসেন। তাঁদের রাজশাহী শহরের বাড়িটা

www.pathagar.com

তখন পুড়ে ছাই হয়ে গেছে। পঁচিশ নভেম্বর সান্ত্বরা খানম ও তার পরিবার ঘোড়ামারায় বাবার বাড়িতে ছিলেন। রাত সাড়ে আটটার দিকে তৎকালীন রেজিস্ট্রারের অবাঙালি স্টেনো তৈয়ব আলী মীর আবদুল কাইয়ুমকে নাম ধরে ডেকে বলেন, একজন পাকিস্তানি ক্যাপ্টেন গলির মোড়ে দাঁড়িয়ে আছে, একটু আসুন। শরীর খারাপ থাকায় আগামীকাল দেখা করবেন বলার পরও দু'মিনিটের জন্য আসতে বলে লোকটি। লুঙ্গির ওপর শার্ট চাপিয়ে আইডি কার্ড হাতে নিয়ে বেরিয়ে যান কাইয়ুম সাহেব। এমতাবস্থায় হতভম্ব হয়ে বাবা ও ভাইকে ডাকাডাকি করছিলেন সান্ত্বরা খানম। এ সময় তৈয়ব আলী ফিরে এসে জানায় যে, পাকি আর্মি কথা বলতে বলতে তাঁকে গাড়িতে তুলে নিয়ে গেছে। এরপর স্বামীর আর কোন খবর পাননি তিনি। সান্ত্বরা খানমের গর্ভে তখন সাত মাসের সন্তান। স্বাধীনতার পর ত্রিশ ডিসেম্বর বোয়ালিয়া ক্লাবের কাছে পদ্মার চরের বাবলা বনে একটি গণকবর পাওয়া যায়। সেখানে এক দড়িতে চৌদ্দ জনের লাশ বাঁধা ছিল। এই চৌদ্দ জন শহীদের মধ্যে ছিলেন মীর আবদুল কাইয়ুম। শীতের দিন বালুর চাপে তাঁর লাশ প্রায় অবিকৃত অবস্থায় পাওয়া গিয়েছিল।

চম্পা সমাদ্দারের স্বামী সুখরঞ্জন সমাদ্দার ছিলেন সংস্কৃত বিভাগের সহকারী অধ্যাপক। চৌদ্দই এপ্রিল সকাল সাড়ে ন'টায় চম্পা সমাদ্দারের ফ্লাটে এসে ঢোকে পাকি আর্মি। ছোট ছোট তিন ছেলে মেয়ে নিয়ে তিনি ভেতরেই অবস্থান করছিলেন। আর্মি লাথি মেরে দরজা ভেঙে ফেলে এবং ঘরে ঢুকে ইপিআরদের খোঁজ করতে থাকে। সমস্ত ঘরেই তল্লাশি চালায় তারা। বেডরুমের এক কোণে দাঁড়িয়ে ছিলেন সন্ত্রস্ত চম্পা । একজন আর্মি তাঁর ছেলেকে কোলে নিয়ে আদর করে ও অন্য একজন সুখরঞ্জন সমাদ্দারকে নানা রকম প্রশ্ন করতে শুরু করে। জিজ্ঞাসাবাদের পর বেরিয়ে যাওয়ার সময় সুখরঞ্জন সমাদ্দার তাদেরকে দরজা পর্যন্ত এগিয়ে দেন। পাকি আর্মি জিপে ওঠার সময় মনোবিজ্ঞান বিভাগের প্রধান ড. মতিউর রহমান বলেন, 'ইয়ে হিন্দু হ্যায়'। তখন দু'জন পাকি আর্মি নেমে এসে সুখরঞ্জন সমাদ্দারকে হাত ধরে নিয়ে যায়। সে সময় পাকি সেনাদের সাথে মতিউর রহমান ছাড়াও ভূগোল বিভাগের সিদ্দিক প্যাটেল ছিল বলে চম্পা সমাদ্দার জানান। পরে তিনি অনেকের কাছে ছুটে যান। বিকেল সাড়ে চারটার দিকে প্যাটেল ফিরে এলে তাকেও জিজ্ঞাসা করেন। মতিউর রহমানকে স্বামীর ব্যাপারে প্রশ্ন করায় সে বলেছিল, 'ভয় নাই, তাকে গেস্ট হাউজে নেওয়া হয়েছে'। চম্পা সমাদ্দার ছুটে যান ভিসি ড. সাজ্জাদ হোসেইনের কাছে। কিন্তু সেখানেও কোন খোঁজ পাননি। স্বাধীনতার পর চম্পা সমাদ্দারের বাড়িতে দুধ দিতেন যে বসন্ত গোয়ালা তিনি জানান, কীভাবে কোথায় হত্যা করা হয়েছিল সমাদ্দার বাবুকে। বিনোদপুর বাজারের পেছনে দীঘির ধারে তাঁর লাশ দেখতে পান বসন্ত ঘোষ। তখন তাঁকে তুলে এনে তাদের বাড়ির বারান্দায় রাখেন। কিন্তু বাড়িতে এ খবর পৌঁছে দিতে না পেরে কাজলার এক ঝোঁপের আড়ালে তাঁকে মাটিচাপা দিয়ে রাখেন বসন্ত ঘোষ ও তার সহযোগীরা। দেশ স্বাধীন হওয়ার পর

www.pathagar.com

তাঁরা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষকে এ কথা জানালে কর্তৃপক্ষ তাঁর লাশ তুলে এনে ক্যাম্পাসে সমাহিত করেন।

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মচারী ইসলাম আলীর কাছ থেকে জানা যায়, একাত্তর সনের সেপ্টেম্বর মাসে মতিহার থানার সেনপুর গ্রামটি পাকিস্তানি সেনাবাহিনী এলাকার শান্তি কমিটির চেয়ারম্যান মোসলেম উদ্দীনের সহায়তায় ঘিরে ফেলে। ইসলাম এবং তাঁর বাবা ইদ্রিস আলীকে এ সময় ধরা হয়। চোখ বেঁধে আরও তিনজনের সাথে গাড়িতে তুলে তাঁদের বিশ্ববিদ্যালয়ের জোহা হলে নিয়ে যাওয়া হয়। নির্যাতনের সময় তাঁদেরকে মুক্তিযোদ্ধাদের সম্পর্কে প্রশ্নও করা হয়। ইদ্রিস আলী ছিলেন দৃঢ়চিত্তের মানুষ। তিনি বলেছিলেন, 'জীবন থাকতে গ্রামের কারও নাম বলব না। কারণ এরা আমাকে মারবে তারপর ওই মুক্তিযোদ্ধাদেরকেও মারবে, তারচেয়ে চুপ করে থাকব'–কথাগুলো বলেন তাঁর বেঁচে যাওয়া সন্তান ইসলাম আলী। দু'জনই ভয়াবহ নির্যাতনের শিকার হন। জোহা হলের একেক ঘরে দশ জন করে বন্দী রাখা হত। ইসলাম আলী জানান, এর মধ্যে প্রায় প্রতি সন্ধ্যায় নাম ধরে কয়েকজনকে বের করে নিয়ে যেত পাকি সেনারা, তারপর তাঁদের আর খোঁজ পাওয়া যেত না। ধরে আনার আট দশ দিন পর একদিন মাগরিবের সময় বের করে নিয়ে যাওয়া হয় ইদ্রিস আলীকে। তাঁকে এ সময় ওজু করতে বলা হয়। এরপর আর খোঁজ পাওয়া যায়নি তাঁর। ইসলাম আলী জানান, দিনের পর দিন তালাবদ্ধ রুমে আলোবাতাসহীন অবস্থায় তাঁদের রাখা হয়েছে। দিনের শেষে সামান্য পরিমাণ খেতে দিত। আর যেদিন নির্যাতন করত সেদিন কোন কিছু খেতে দিত না। ফ্যানের সাথে দড়িতে ঝুলিয়ে মারা হত। এ ছাড়াও কোমরের নিচে বাঁশ রেখে ডলা দিয়ে নির্যাতন করত বলে জানান ইসলাম। রাতের অন্ধকার ভেদ করে তাঁরা শুনতে পেতেন মেয়েদের আর্তনাদ। স্বাধীনতার পর জোহা হল থেকে পঙ্গু অবস্থায় তাঁকে উদ্ধার করা হয়। ইসলাম আলী সে সময়ের পাকি সেনাদের মধ্যে ক্যাপ্টেন ইলিয়াসের নাম মনে করতে পেরেছেন।

হোসনে জাহানের কাছ থেকে জানা যায়, তাঁর স্বামী সাইদুর রহমান ছিলেন তৎকালীন ইন্ডাস্ট্রিয়াল ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক অব পাকিস্তানের সিনিয়র অফিসার। হোসনে জাহান তাঁর স্বামীসহ বাবার বাড়িতে অবস্থান করছিলেন। ভোর চারটার দিকে গোলাগুলি ও বোম্বিংয়ের শব্দে ঘুম ভেঙে যায় তাঁদের। একটু পরেই হুড়মুড় করে পাকি সেনারা বাড়িতে ঢুকে পড়ে। তারা প্রথমে হোসনে জাহানের মেজভাই মনিরুজ্জামানের খোঁজ করে। সেদিন তিনি বাড়িতে ছিলেন না। রাত একটার দিকে সংগঠনের অন্যরা তাঁকে নিয়ে যান। পাকি আর্মি বুটের আঘাতে দরজা ভেঙে বাড়িতে ঢোকে। বাড়িতে পুরুষ বলতে সাইদুর রহমান ও হোসনে জাহানের ছোট ভাই হাসানুজ্জামান খোকা ছাড়া আর কেউ ছিলেন না। খোকাকেও ধরে নিয়ে যায় তারা। স্টেটমেন্ট নিয়ে তাঁদেরকে পাঠিয়ে দেওয়া হবে বলে জানায় তারা। কিন্তু আর ফিরে আসেননি তাঁরা। হোসনে জাহান ছোট ছোট দুই ছেলেকে নিয়ে শহরতলীর দিকে

www.pathagar.com

অন্য জায়গায় গিয়ে ওঠেন। দিন পনেরো পরে আবার বাড়িতে ফিরে স্বামীর খোঁজ শুরু করেন। কারফিউর মধ্যে একা গিয়ে অনেককে জিজ্ঞেস করেন। পাকি বাহিনীর এক পাঞ্জাবি কর্নেলকে পর্যন্ত তিনি স্বামীর খোঁজ দিতে বলেন। পা জড়িয়ে ধরে বলেন, 'অন্তত আমাকে তাঁর অবস্থান জানান। কাগজপত্র ঘেঁটে মিথ্যে সান্ত্বনা দেওয়ার ভঙ্গিতে তিনি বলেন, তাকে ট্রেস করা যাচ্ছে না। পাকি আর্মির অনেক ক্যাম্পে গিয়ে খোঁজ করেছেন তিনি। বাড়িতে সবাই নিষেধ করলেও তিনি সেটা শোনেন নি। ভেবেছিলেন, গুলি লেগে মারা গেলেই বরং তিনি বেঁচে যাবেন। হোসনে জাহান বাহাত্তর সাল সন থেকে শিল্প ব্যাংকে কর্মরত আছেন।

ড. সুজিত সরকার বলেন, যুদ্ধ শুরু হয়ে গেছে তখন। আমরা হোস্টেলে আছি। সিংড়া থানার কুম গ্রামের আমরা পাঁচ ছয় জন ওই স্কুলে পড়তাম। বন্দী অবস্থায় হাঁফিয়ে উঠে তিনি ও জন রায় (বর্তমানে ক্যাথলিক চার্চ মিশনের পাদ্রী) হোস্টেল থেকে পালিয়ে যান। জুনের প্রথমে বাড়িতে এসে দেখেন, বাবা মা ঠাকুর মা কেউ নেই। তখন গ্রামের অনেকেই তাঁকে সাহায্য করেন। মাস খানেক পর ভারতে গেলে পরিবারের সবার সাথে সাক্ষাৎ হয় তাঁর। ক্যাম্পে মুক্তিযোদ্ধাদের কার কি প্রয়োজন, তার খোঁজখবর নিতে শুরু করেন তিনি। পরে ইনফরমার হিসেবে তথ্য সংগ্রহ করতে ধীরেন নামের একটি ছেলের সাথে দেশে আসেন। এ সময় তিনি নিজেদের গ্রামের বাড়িতে বসবাস করতে শুরু করেন। একদিন রাজাকাররা তাঁদের পুকুরে মাছ ধরতে এলে তিনি নিষেধ করায় তারা তাঁকে মারতে শুরু করে। গ্রামের লোকের নিষেধ সত্ত্বেও রাজাকাররা তাঁকে সিংড়া থানার হেডকোয়ার্টারে নিয়ে যায়। যেটা বর্তমানে রেজিস্ট্রি অফিস, সেটা তখন হানাদারদের কনসেনট্রেশন ক্যাম্প ছিল। ক্যাম্পের মাঠের ঘাস, বিচালি পরিষ্কার করা, পানি আনাসহ নানা কাজের পাশাপাশি তারা মারধরও করত তাঁকে। তাঁর জন্য খাবার বরাদ্দ ছিল কেবল এক বেলার জন্য। সেই ক্যাম্পের একটি ঘরে অনেকগুলো মেয়েকে আটক রেখে পাশবিক নির্যাতন করা হত। একদিন সুজিত সরকার প্রচণ্ড নির্যাতনে জ্ঞান হারিয়ে ফেলেন। জ্ঞান ফেরার পর নিজেকে তিনি ওই মেয়েদের ঘরে দেখতে পান। শুধু পেটিকোট পরা উদ্‌ভ্রান্ত মেয়েরা তাঁর শুশ্রূষা করেছিলেন। সুজিত তাঁদের নাম ধাম জিজ্ঞেস করলে অনেকেই নাম বলতে চাননি। তবে হাসিনা ও পারুল নাম দু'টি জানতে পেরেছিলেন, যেটা এখনও তিনি স্মরণ করতে পারেন। সেদিন থেকে মেয়েদের সাথে একটু যোগাযোগ হয় তাঁর। তবে সব সময় তাঁকে সেখানে রাখা হত না বলে খুব কম সময়ের জন্য দেখা হত তাঁদের সাথে। ড. সুজিত দেখেছেন, প্রায় দিন পাকি আর্মি এসে এসব মেয়েদের মধ্যে যারা শারীরিকভাবে সুস্থ এবং দেখতে ভাল ছিল, তাদের চিহ্নিত করে যেত। সন্ধ্যার দিকে রাজাকাররা চিহ্নিত করা ওই মেয়েগুলোকে পাকি বাহিনীর ক্যাম্পে নিয়ে যেত। এসব রাজাকারের মধ্যে মজিবর রহমান এবং শালমারা গ্রামের জলিলের নাম মনে করতে পেরেছেন তিনি।

প্রথম দিকে তিনি একুশ জন মেয়ে দেখেছিলেন। পরে সংখ্যা কমে যাচ্ছে দেখে তিনি মেয়েদেরকে জিজ্ঞাসা করেন, "আপা, বাকি মেয়েরা কোথায়?" তাঁদের কাছ থেকে তিনি জানতে পারেন, যাঁরা অসুস্থ হয়ে পড়ে, তাদেরকে মেরে ফেলা হয়। ড. সুজিত

www.pathagar.com

নিজে এসব মেয়েকে চোখের সামনে অসুস্থ হয়ে যেতে দেখেছেন। তাঁদের শরীরে ঘা হয়ে যাচ্ছিল, যৌনাঙ্গ দিয়ে রক্তপাত হত। তারপরও রেহাই পেতেন না তাঁরা। দু'একজন উন্মাদ হয়ে ভুল বকতেন। একদিন রাজাকাররা ঘরের ভেতরে মেয়েদের ধর্ষণ করার সময় সুজিতকেও ধরে নিয়ে ধর্ষণে বাধ্য করার চেষ্টা করে। তারা মেয়েদের যৌনাঙ্গে তাঁর মুখ চেপে ধরে ঘষে দেয়। তিনি পানি চাইলে প্রস্রাব করে তাঁর মুখে ঢেলে দেয়। হানাদারদের সেই বীভৎস উল্লাসের কথা ভেবে এখনও কুঁকড়ে যান ড. সুজিত।

নভেম্বরে ছাড়া পান তিনি। এখনও সারা শরীরে অত্যাচারের চিহ্ন রয়েছে তাঁর। ড. সুজিত সরকার জানান, পাকি আর্মির একজন তাঁকে কাগজপত্র লিখে গ্রামের লোকের কাছে হস্তান্তর করেছিল। তিনি যেদিন ওই ক্যাম্প ছেড়ে চলে আসেন সেদিন মেয়েগুলো তাঁকে হাত নেড়ে বলেছিল, 'তুমি যাও ভাই, দেশের জন্য তোমাকে অনেক সইতে হল'। ড. সুজিত জানান, সেদিন ওই মেয়েগুলোর চোখে মুখে যে মর্মান্তিক অসহায়ত্ব ফুটে উঠেছিল, তা আজও চোখ বুঁজলে দেখতে পান তিনি।

এভাবেই পাকিস্তানি আর্মির লে. কর্নেল আব্দুলাহ খান, লে. কর্নেল সাফায়েত (বেলুচ), মেজর রাজা, মেজর শেরওয়ানী, মেজর আখতার শাহ, মেজর হাজী আব্দুল মজিদ, মেজর আসলাম (২৫ পাঞ্জাব), ক্যাপ্টেন রাজা ইসহাক, ক্যাপ্টেন ইলিয়াস, আসলাম (র‌্যাঙ্ক অজ্ঞাত), সৈনিক মোঃ আলী খান ও তাদের সহযোগীরা রাজশাহী জেলার বিভিন্ন এলাকায় গণহত্যা, জাতিগত নিধন ও ধর্ষণযজ্ঞে মেতে ওঠে। এই এলাকায় সংঘটিত সকল অপরাধের জন্য তারা সরাসরি দায়ী।

আসামী ঃ ক্যাপ্টেন কার্নি, সমুন্দর খান (র‌্যাঙ্ক অজ্ঞাত)।

অপরাধের ধরনঃ গণহত্যা, জাতিগত নিধন, ধর্ষণ, লুটপাট, অগ্নিসংযোগ।

সাক্ষী ঃ মাকসুদা বেগম, ইলিয়াস হোসেন, আব্দুল মজিদ মণ্ডল, রঙিনীবালা দাসী, আলেয়া বেগম, সুইপার লসমী, শেফালী বালা দাসী, মালেকা খাতুন, সরদার আব্দুল্লাহেল বাকী, সাঈদ আরেফিন, শেখ হাসান আলী।

ঘটনাকালঃ একাত্তরের পঁচিশ মার্চ থেকে স্বাধীনতার পূর্ব পর্যন্ত।

ঘটনাস্থল ঃ লালমনির হাট

সূত্রঃ যুদ্ধাপরাধ গণহত্যা ও বিচারের অন্বেষণ এবং WCFFC গবেষণা।

পাকিস্তানি ক্যাপ্টেন কার্নি, সমুন্দর খান এবং তাদের উর্ধ্বতন ও অধস্তন পাকি সেনা সদস্যরা একাত্তরে লালমনিরহাট জেলা শহরসহ এখানকার বিভিন্ন এলাকায় ব্যাপক ধ্বংসাত্মক কর্মকাণ্ড চালায়। বিহারি অধ্যুষিত লালমনিরহাট শহর ও আশেপাশের

www.pathagar.com

এলাকায় পাকি বাহিনী ব্যাপক গণহত্যা, লুটতরাজ, অগ্নিসংযোগ ও নারী নির্যাতন চালায়। পাকি বাহিনীর সহযোগী স্থানীয় বিহারিরা এসব গণহত্যা, নারী নির্যাতন ও ধ্বংসাত্মক কর্মকাণ্ডে তাদেরকে সহযোগিতা করে। আমাদের গবেষণায় ও কয়েকজন প্রত্যক্ষদর্শীর জবানবন্দীতে সে বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। কয়েকজন প্রত্যক্ষদর্শী ও সরাসরি ক্ষতিগ্রস্ত নরনারীর জবানবন্দী এখানে তুলে ধরা হল।

মাকসুদা বেগম বলেন, একাত্তর সনে আমি রেলওয়ে কলোনিতে ছিলাম। আমার স্বামী সেদিন সকালে অফিসে যান। সেদিন তাঁদেরকে দিয়ে দু'বেলা অফিস করানো হয়। রাত বারোটার সময় অফিস থেকে ফিরে এসে তিনি বড় ছেলে আবুল হাসেমকে নিয়ে খেতে বসেন। সারা দিনের পর দু'এক লোকমা ভাত মুখে দিয়েছেন কি দেননি, এমন সময় পাকি আর্মি আমাদের বাড়ির চতুর্দিক ঘিরে ফেলে। পালানোর কোন পথ ছিল না। তখন আমার স্বামী ও ছেলে ঘরের মধ্যে দা, বটি, শাবল যা ছিল, তা নিয়ে আত্মরক্ষার চেষ্টা করেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাদের সাথে পেরে ওঠা সম্ভব হয়নি। দরজা ভেঙে তারা ঘরের ঢুকে পড়ে। ঘরে ঢুকে তারা আমার স্বামীকে বেঁধে রেখে ছেলেকে টেনে হিঁচড়ে বাইরে নিয়ে রামদা দিয়ে গরুর মতো জবাই করে হত্যা করে। সেদিন আমার স্বামীসহ আরও আট দশ জনকে একই স্থানে জবাই করে হত্যা করে। এই লাশগুলো হানাদাররা কী করেছিল, তা আমরা জানতে পারিনি।

মাকসুদা বেগম আরও বলেন, আমাদের এলাকা থেকে কত মহিলাকে হানাদাররা ধরে নিয়ে পাশবিক নির্যাতন করেছিল, তার কোন হিসাব নেই। পাকি আর্মি বিহারিদের কাছ থেকে এসব মেয়েদের তথ্য সংগ্রহ করত। আমাদের এলাকায় রহমান সাহেব নামে একজন ডাক্তার ছিলেন। ছেলেসহ তাকে হত্যা করার পর হানাদাররা তাঁর স্ত্রী ও চার যুবতী মেয়েকে একটা ঘরে আটকে রেখে তিন মাস ধরে তাদের ওপর পাশবিক নির্যাতন চালায়। যন্ত্রণা সহ্য করতে না পেরে এক রাতে জীবনের ঝুঁকি নিয়ে ওই মহিলা তাঁর চার মেয়েকে নিয়ে অনেক কষ্টে সেখান থেকে পালিয়ে যান। এ রকম আরও অনেকের ওপর হানাদাররা পাশবিক নির্যাতন চালিয়েছিল, যাঁরা পরবর্তীতে এলাকা ছেড়ে চলে যান।

ইলিয়াস হোসেন বলেন, পাকি আর্মি লালমনিরহাটে ঢোকার পর বিহারিরা তাদের সাথে যোগ দিয়ে হত্যা, লুটতরাজ, অগ্নিসংযোগ ও নারী নির্যাতন শুরু করে। লালমনিরহাট তখন ভুতুড়ে শহরে পরিণত হয়। চৌঠা এপ্রিল পাকি বাহিনীর সদস্যরা যখন হেলিকপ্টার থেকে এয়ারপোর্টে নামে, তখন সোহরাওয়ার্দী মাঠে বিহারি মহিলারা তাদেরকে অভ্যর্থনা জানিয়ে শরবত পান করায়। লালমনিরহাটে যেসব হত্যাকাণ্ড ও নির্যাতন সংঘটিত হয় তার সবগুলোতেই বিহারিদের সহায়তা ছিল। পাঁচই এপ্রিল তারা আমাকে খুঁজতে এসে না পেয়ে আমার বাবা এখলাস উদ্দীনকে হত্যা করে। আমি পরে জানতে পারি, আমার বাবাকে তারা নির্মমভাবে হত্যা করেছে।

www.pathagar.com

এখানে যে সব নারী নির্যাতনের ঘটনা ঘটে, সেগুলো আমি দেখিনি। পরে এসে শুনেছি। আমাদের এক সহযোদ্ধার বাবা ও ভাইকে হত্যা করে তাঁর বোনদের ধরে নিয়ে হানাদাররা তাদের ওপর পাশবিক নির্যাতন চালায়। পরে লোকলজ্জার ভয়ে তাঁরা আর লালমনিরহাটে ফিরে আসেন নি। হাফেজ কমরুদ্দীন নামে আমাদের গ্রামের এক সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির পরিবারের মহিলাদের আটকে রেখে হানাদাররা ধর্ষণ করেছিল। পরে তাঁদের একজনকে আমাদেরই এক বন্ধু বিয়ে করে সামাজিক মর্যাদা দেয়। সমুন্দর খান নামে এক পাকিস্তানি আর্মি এখানকার অনেক নারী নির্যাতন ও হত্যাকাণ্ডের সাথে সরাসরি যুক্ত ছিল।

আব্দুল মজিদ মণ্ডল বলেন, চার এপ্রিল পাকি বাহিনীর একটা ট্রুপ লালমনিরহাটে প্রবেশ করে। ঢাকা থেকে হেলিকপ্টারে করে পাকি বাহিনীর বেশ কিছু সৈন্য স্থানীয় এয়ারপোর্টে এসে ল্যান্ড করে। ওই রাতে তারা লালমনিরহাটের বিভিন্ন এলাকায় আগুন লাগিয়ে দেয় ও হত্যাযজ্ঞে মেতে ওঠে। তারা রেলওয়ের বেশ কিছু কর্মকর্তা কর্মচারীকে ওভারব্রিজের কাছে নিয়ে লাইনে দাঁড় করিয়ে গুলি করে হত্যা করে। অনেককে বাড়িতে গিয়ে হত্যা করে। অনেকের হাত, পা, গলা কেটে দেওয়া হয়। তারা অনেক নিরীহ মানুষের জিহ্বাও কেটে দেয়।

লালমনিরহাটে তিনটি বধ্যভূমির কথা বলা হয়েছে। কিন্তু এ ছাড়াও অনেক বধ্যভূমি রয়েছে, যেগুলো এখনও শনাক্ত করা হয়নি। রেলওয়ের ইঞ্জিনগুলো যেখানে আছে ,সেখানে এক হাজার লোককে হত্যা করা হয়েছে বলে জনশ্রুতি আছে। পাকি হানাদাররা এখানে প্রায় তিন শ' মহিলার ওপর পাশবিক নির্যাতন চালায়। এর মধ্যে দু'জন নির্যাতিত মহিলাকে বিবস্ত্র অবস্থায় আমি পড়ে, থাকতে দেখেছি।

যুদ্ধের শেষ পর্যায়ে নয়ই নভেম্বর তারা বড়বাড়ির হাট নামক স্থানে প্রায় এক শ' লোককে হত্যা করে। এদের মধ্যে এই এলাকার বর্তমান বিএনপি নেতা আসাদুল হাবিব দুলুর বাবা এবং কারমাইকেল কলেজের তৎকালীন তুখোড় ছাত্র নেতা ও ছাত্র সংসদের ভিপি মোক্তার এলাহীও ছিলেন। যাঁদের লাশ শনাক্ত করা সম্ভব হয়েছিল, তাঁদের আত্মীয়-স্বজন সেগুলো দাফন করে। বাকিদের ওখানেই মাটিচাপা দেওয়া হয়।

এই এলাকায় যেসব পাকিস্তানি বর্বরতা চালায়, তাদের মধ্যে ক্যাপ্টেন কার্নির নাম আমার মনে পড়ে। এখানকার রাজাকারদের মধ্যে অনেকেই মারা গেছে। জীবিতদের মধ্যে হাফিজ কমরুদ্দীন, আলাউদ্দীন, আজগর মহাজনের নাম আমার মনে পড়ে। এই এলাকায় পাকি হানাদাররা গুলি করে যেমন মানুষ হত্যা করেছে তেমনি হাত পা কেটে, চোখ উপড়ে ফেলে ও নির্যাতন চালিয়েও নিরীহ বাঙালিদেরকে হত্যা করেছে।

রঙিনীবালা দাসী বলেন, একাত্তরে আমি এই রেলওয়ে কলোনিতে ছিলাম। পাকি হানাদাররা এই এলাকায় ঢোকার পর বিভিন্ন বাড়িতে গিয়ে জবাই করে মানুষ হত্যা করতে শুরু করে। একদিন আমাদের পাশের বাড়িতে অতর্কিতে হামলা চালিয়ে

www.pathagar.com

কয়েকজনকে এভাবে জবাই করে ফেলে রেখে যায়। এই খবর শুনে আমি তাদের বাড়িতে যাই। এর মধ্যে হানাদাররা আমার বাড়িতে ঢুকে আমার ছেলে ও মেয়ে দুটোকে জবাই করে হত্যা করে। তারা আমার স্বামীকে বাড়ি থেকে ধরে নিয়ে যায়। আমি সেখানে উপস্থিত থাকলে তারা আমাকেও জবাই করে হত্যা করত। আমার মেয়ের নাম ছিল মিনু, বয়স সাত বছর ও ছেলের নাম ছিল বিনয়, বয়স এগারো বছর। তাদেরকে জবাই করার পর লাশগুলো টেনেহিঁচড়ে নিয়ে মাটিচাপা দেয়। আমি বাড়িতে এসে শুধু আমার সন্তানের রক্ত দেখতে পেয়েছিলাম। তারা আমার স্বামীকে ধরে মসজিদে নিয়ে জোর করে মুসলমান বানিয়ে নামাজ পড়তে বাধ্য করায়। তারপর তাঁকে ছেড়ে দেয়। বাড়িতে এসে তিনি ছেলেমেয়ে হারানোর শোক এবং অত্যাচার অপমান সহ্য করতে না পেরে পাগল হয়ে যান। এভাবে কয়েক মাস থাকার পর তিনি মৃত্যুবরণ করেন।

সুইপার লছমী বলেন, একাত্তরে সনে আমি লালমনিরহাট স্টোর পাড়ার বাসিন্দা ছিলাম। একদিন সকাল সাতটায় ডিউটিতে যাওয়ার জন্য বাড়ি থেকে বের হয়ে দেখি, সবাই পালাচ্ছে। আমার ছেলেমেয়েরা তখন বাড়িতে ছিল। আমি মনে করলাম, এলাকার সবাই যখন পালিয়ে যাচ্ছে, তখন আমিও ছেলেমেয়ে নিয়ে এখান থেকে পালিয়ে যাই। একথা ভেবে আমি যখন বাড়ি ফিরে আসছি, তখন অনেকগুলো গুলির শব্দ শুনতে পেলাম। কিছুদূর এগিয়ে গিয়ে দেখি, পাঞ্জাবি সৈন্যরা পজিশন নিয়ে লাইন করে বসে আছে। এই অবস্থা দেখে আমি আর বাসায় যেতে পারলাম না। পাশের একটা ড্রেনে ঢুকে হামাগুড়ি দিয়ে কিছুদূর এগিয়ে গেলাম। কিন্তু সেখানেও গুলি হচ্ছিল। তখন বাড়িতে রেখে আসা আমার ছেলেমেয়েদের জন্য খুব চিন্তা হচ্ছিল। এরপর সেখান থেকে কোন রকমে পালিয়ে আমি রেলওয়ে হাসপাতালে ঢুকে পড়লাম। হাসপাতালে ঢুকে দেখি, সেখানে ডা. রহমান ও অন্য একজন ডাক্তার তাঁদের চেম্বারে বসে আছেন। তাঁদেরকে দেখে আমি বলি যে, স্যার, আপনারা চেম্বারে বসে আছেন, এদিকে তো আর্মি শহরে ঢুকে গোলাগুলি শুরু করেছে।' তাঁরা আমার কথা বিশ্বাস করলেন না। এর কিছুক্ষণের মধ্যেই আর্মি গুলি করতে করতে হাসপাতালে ঢুকে পড়ে এবং ডাক্তারদের ডাকে। তখন ডাক্তার রহমান চেম্বার থেকে বাইরে বের হওয়ার সাথে সাথে আর্মি তাঁর ওপর গুলি চালায়। গুলিবিদ্ধ হওয়ায় সাথে সাথে তিনি মাটিতে পড়ে যান এবং 'পানি পানি' বলে কাতরাতে থাকেন। এরপর সেনারা তাঁর ওপর আবার গুলি চালায়। এ সময় তিনি নিস্তেজ হয়ে পড়েন। পরে হাসপাতালে যেসব রোগী ভর্তি ছিল, তাঁদেরকে এবং হাসপাতালের কর্মচারীদেরকে লাইনে দাঁড় করিয়ে এক সাথে গুলি করে হত্যা করা হয়। আমি সিঁড়ির নিচে লুকিয়ে এসব ঘটনা দেখতে পাচ্ছিলাম। হানাদাররা হাসপাতাল থেকে বেরিয়ে যেখানে যাকে পাচ্ছিল, সেখানেই গুলি করে হত্যা করছিল। স্থানীয় বিহারিরা তাদেরকে এসব কাজে সহায়তা দেয়। তিন দিন ধরে তারা এ রকম হত্যাকাণ্ড চালায়।

www.pathagar.com

সেখান থেকে কোনরকমে বেঁচে আসার পর আমরা মহেন্দর নগরে চলে যাই। সেখানে অবস্থানকালে পাকি হানাদাররা ওই এলাকায় যেসব হত্যাকাণ্ড ঘটাতো, সেগুলো মাটিচাপা দেওয়ানের জন্য আমাদেরকে জোর করে ধরে নিয়ে যেত। সে সময় আমাদেরকে কয়েকটি ভ্যান দিয়েছিল তারা। সেই ভ্যানে করে আমরা লাশ নিয়ে মাটিচাপা দিতাম। লাশগুলো ভ্যানে তোলার সময় আমরা প্রায়ই দেখতাম যে, অনেকে তখনও বেঁচে আছেন। এ রকম অর্ধমৃত প্রায় দেড় শ' লোককে আমি বাঁচিয়েছিলাম। রেলওয়ে ওয়্যারলেস কলোনিতে যে গণকবরটি আছে, সেখানে তিন থেকে চার শ' লোককে আমরা কয়েকজন সুইপার মিলে মাটিচাপা দিই। এঁদের অধিকাংশই ছিলেন রেলওয়ের কর্মচারী।

শেফালী বালা দাসী তাঁর জবানবন্দীতে বলেন, একাত্তর সনে আমি এই কলোনিতেই ছিলাম। সাহেব পাড়ার এই কলোনির অধিকাংশ লোক ছিল বিহারি। এদের বেশিরভাগই পাকি হানাদারদের দোসর ছিল। হানাদারদের প্রবেশের আগেই বিহারি ছেলেরা এই এলাকায় অনেক হত্যাকাণ্ড ঘটায়। একদিন তারা আমাদের পাশের এক বাড়িতে ঢুকে অত্যাচার শুরু করে। তখন আমার মা ভয়ে পেছনের দরজা দিয়ে আমাদের পাশের বাড়ির এক বিহারি ভদ্রলোকের বাড়িতে যান। ওই ভদ্রলোকের মেয়ে আমার বান্ধবী ছিল। তিনি তাদের বাড়িতে যান বিহারি ছেলেদের হাত থেকে আমাদের রক্ষা করার জন্য সাহায্য চাইতে। এরই মধ্যে তারা আমাদের বাড়িতে ঢুকে আমার এক ভাই ও এক বোনকে ধরে নিয়ে জবাই করে হত্যা করে। এভাবে তারা পরপর তিনটি বাড়িতে হামলা চালিয়ে সবাইকে হত্যা করে লাশগুলো ফেলে রেখে চলে যায়।

আমি যখন ঘরে লাশগুলো দেখছিলাম, তখন তারা আমাকে চোখ বেঁধে বিহারিদের উর্দু স্কুলে নিয়ে আটকে রাখে। তারা আমার ওপর কোন পাশবিক নির্যাতন করেনি। পরে আমার সেই বিহারি বান্ধবীর ভাই খোঁজ নিয়ে আমাকে সেখান থেকে উদ্ধার করে আনে। কিন্তু আমার ওপর যে, তারা কোন পাশবিক নির্যাতন করেনি, এলাকার লোক পরে সেটা বিশ্বাস করেনি। এরপর থেকে তারা আমাকে খারাপ দৃষ্টিতে দেখতে শুরু করে। লজ্জায় আমি বাড়ি থেকে বের হতে পারতাম না। আমার ছেলেরা এখন বড় হয়েছে। স্বাধীনতার এই ত্রিশ বছর পরেও তারা আমার ছেলেদেরকে বলে তোমার মাকে পাকি আর্মি ধর্ষণ করেছিল। পাকি আর্মি আমার ওপর পাশবিক নির্যাতন না চালালেও তারা যে আমাকে ধরে নিয়ে গিয়েছিল, সেটাই আমার জন্য কলঙ্ক হয়ে দেখা দেয়। সেই কলঙ্কের বোঝা আজও আমাকে বয়ে বেড়াতে হচ্ছে।

মালেকা খাতুন বলেন, একাত্তর সনে আমার স্বামী ও ছেলেকে পাকি বাহিনী নির্মমভাবে হত্যা করে। সেদিন আমি বাড়িতেই ছিলাম। আমার স্বামী ও ছেলে বাড়ি থেকে বেরিয়ে পাশের এক দোকানে বসে চা খাচ্ছিলেন। এন সময় পাকি হানাদাররা তাঁদেরকে সেখান থেকে ধরে নিয়ে যায়। স্থানীয় লোকজন আমাকে তাঁদের ধরে নিয়ে

www.pathagar.com

যাওয়ার সংবাদ দেন। আমি তখন কান্নাকাটি করতে থাকি। ধরে নিয়ে যাওয়ার পর তাঁদের আর কোন খোঁজ পাইনি। পরে লোকমুখে শুনেছিলাম, তাঁদেরকে পাকি আর্মি গুলি করে হত্যা করেছে। আমার স্বামী শহীদ আলী আকবর তখন আইডব্লিউটিতে চাকরি করতেন। আমার ছেলের বয়স তখন তেরো বছর, সে একটা বিস্কুট কারখানায় কাজ করত। আমি আমার সন্তান ও স্বামীর লাশ দেখতে পাইনি। তাঁদেরকে কোথায় নিয়ে হত্যা করা হয়, বা কবর দেওয়া হয়, তা আমি আজও জানতে পারিনি। আমার স্বামী ও সন্তানের মতো এলাকার আরও অনেক লোককে সে সময় পাকি আর্মি ধরে নিয়ে হত্যা করে। এ ছাড়াও অনেক মেয়েকে ধরে নিয়ে তাদের ওপর পাশবিক নির্যাতন চালায় তারা।

সরদার আব্দুল্লাহেল বাকী তাঁর জবানবন্দীতে বলেন, আমি তখন লালমনিরহাট রেলওয়ে কলোনিতে থাকতাম। আমার চোখের সামনে এখানকার অনেক ঘটনা ঘটেছে। আমার বাবা শহীদ মকবুল হোসেন তখন রেলওয়ের উচ্চমান সহকারী ছিলেন। একাত্তর সনে পাকি বাহিনীর গুলিতে তিনি নির্মমভাবে নিহত হন। চৌঠা এপ্রিল সন্ধ্যার পর দুটো হেলিকপ্টার লালমনিরহাটের ওপর কয়েকবার চক্কর দিয়ে এয়ারপোর্টে ল্যান্ড করে। হেলিকপ্টার দুটো ল্যান্ড করার কিছুক্ষণের মধ্যেই লালমনিরহাটের বিভিন্ন এলাকায় পাকি বাহিনী আগুন লাগিয়ে দেয়। আগুনের লেলিহান শিখায় পুরো শহর সেদিন রক্তিম আভা ধারণ করেছিল। সে সময় এখানকার অধিকাংশ অধিবাসীই বিহারি ছিল। তারাই পাকি বাহিনীর গণহত্যা ও ধ্বংসযজ্ঞে সহায়তা করে। আমার সাথে আলতাফ নামে চৌদ্দ বছরের একটি ছেলে ছিল। আমি তাকে বাড়ির সংবাদ নেওয়ার জন্য পাঠিয়েছিলাম। আমরা কয়েকজন তখন কুদ্দুস মাস্টারের বাড়িতে অপেক্ষা করছিলাম। কিন্তু ছেলেটি খবর নিয়ে আর ফিরে আসেনি। পরে জানতে পেরেছি, পাকি বাহিনী তাকেও ধরে নিয়ে জবাই করেছিল।

একইভাবে তারা আমাদের গ্রামের রহমান ডাক্তারসহ অফিস এলাকা থেকে পঁয়ত্রিশ থেকে চল্লিশ জন নিরীহ বাঙালিকে ধরে নিয়ে রিকশা স্ট্যান্ডের ব্রিজের নিচে লাইনে দাঁড় করিয়ে গুলি করে হত্যা করে। আমার বাবাকে হত্যা করে মিশন মোড়ে। সাহেব পাড়ার দুটো পরিবারের সবাইকে পাকি বাহিনী হত্যা করে। নিহতদের লাশগুলোকে সুইপার দিয়ে মাটিচাপা দেওয়ানো হত। আমাদের গ্রামের দু'জন মেয়েকে পাকি হানাদাররা ধর্ষণ করে। এর মধ্যে একটি মেয়েকে হানাদাররা জোরপূর্বক পাকিস্তানে ধরে নিয়ে যায়। অন্য মহিলা ছিলেন আমাদের গ্রামের এক ড্রাইভারের স্ত্রী।

এক শ' দশ বছর বয়সী শেখ হাসান আলী একাত্তর সনে লালমনিরহাটের ধ্বংসযজ্ঞের একজন প্রত্যক্ষদর্শী। বয়সের ভারে ন্যুব্জ হাসান আলী আমাদের প্রতিনিধিকে বলেন, একাত্তর সনে আমি এই কলোনিতে ছিলাম। পাকি হানাদাররা যখন রেলওয়ে কলোনি ঘেরাও করে, তখন আমরা সেখান থেকে বের হতে পারিনি।

www.pathagar.com

হানাদাররা আমার দুই ছেলেকে হত্যা করে। এক ছেলের নাম শেখ গোলাম আলী। সে তখন নবম শ্রেণীতে পড়ত। অন্য ছেলের নাম শেখ মুসলিম। সে তখন ষষ্ঠ শ্রেণীতে পড়ত। আমার এক বিবাহিত মেয়েকেও হানাদাররা ধরে নিয়ে যায়। ধরে নিয়ে যাওয়ার ছ'মাস আগে এক কাস্টমস ইন্সপেক্টরের সাথে তার বিয়ে দিয়েছিলাম। তখন সে এখানে নাইওরে এসেছিল। পরে আমরা জানতে পারি, হানাদাররা তাকে এক পাঞ্জাবি সৈনিকের সাথে বিয়ে দিয়ে পাকিস্তানে নিয়ে গেছে। দশ বছর আগে তার একটা চিঠি পেয়েছিলাম। এরপর আর কোন খোঁজ পাইনি।

বৃদ্ধ হাসান আলী আরও জানান, এই এলাকার ষাট থেকে সত্তরজন মেয়েকে হানাদাররা ধরে নিয়ে নির্যাতন করেছে। তাঁদের মধ্যে অনেকে মারা গেছেন, কয়েকজনকে পরবর্তীতে বিয়ে দেওয়া হয়েছে, বাকিরা এলাকা ছেড়ে চলে গেছেন। তিনি আরও বলেন, রেলওয়ে কলোনি থেকে ধরে নিয়ে প্রায় এক হাজার কর্মচারীকে হানাদাররা হত্যা করে। কাউকে কাউকে বয়লারের ইঞ্জিনের ভেতর ঢুকিয়ে পুড়িয়ে মারে। এই এলাকায় তখন মানুষ পোড়ার গন্ধ পাওয়া যেত।

ক্যাপ্টেন কার্নি, সমুন্দর খান ও তাদের সহযোগীরা লালমনিরহাটে উল্লিখিত সকল হত্যাকাণ্ড, ধর্ষণযজ্ঞ, অগ্নিসংযোগ, লুটপাট ও জাতিগত নিধনের জন্য দায়ী।

আসামী ঃ মেজর আবুল কালাম মেলাল, মেজর শাহেদ, ক্যাপ্টেন আজিজ।

অপরাধের ধরনঃ গণহত্যা, জাতিগত নিধন, ধর্ষণ, লুটপাট, অগ্নিসংযোগ।

সাক্ষী ঃ মোঃ গোলাম রসুল, মাহবুব আলম, মোঃ দেলোয়ার হোসেন দুলাল, চানমনি সখিনা, মোঃ নবাব আলী, মোহনলাল সাহা।

ঘটনাকালঃ একাত্তরের পঁচিশ মার্চ থেকে স্বাধীনতার পূর্ব পর্যন্ত।

ঘটনাস্থল ঃ ঠাকুরগাঁও জেলা।

সূত্রঃ যুদ্ধাপরাধ গণহত্যা ও বিচারের অন্বেষণ এবং WCFFC গবেষণা।

পাকিস্তানি মেজর আবুল কালাম মেলাল, মেজর শাহেদ, ক্যাপ্টেন আজিজসহ অন্যান্য পাকিস্তানি আর্মি ও তাদের সহযোগীরা স্বাধীনতা যুদ্ধের ন'মাসে ঠাকুরগাঁও জেলায় ব্যাপক গণহত্যা, নারী নির্যাতন, লুটপাট ও ধ্বংসযজ্ঞ চালায়। খুনিয়া দীঘি, নোল দীঘি প্রভৃতি এলাকায় পাকি বাহিনী যে গণহত্যা ও নারী নির্যাতন চালায়, তাতে প্রত্যক্ষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত কয়েকজনের সাক্ষাৎকার এখানে উল্লেখ করা হল।

ভাকুরা গ্রামের মাহবুব আলম পাকিবাহিনীর নারী নির্যাতন ও ধ্বংসযজ্ঞের বর্ণনা দিতে গিয়ে বলেন, পাকিস্তানি বাহিনী যখন আমাদের ভাকুরা গ্রামে ঢুকে হত্যা ও নির্যাতন শুরু করে, তখন গ্রামের লোকজন দিগ্বিদিক জ্ঞান হারিয়ে ছুটতে থাকে। আমি তখন

www.pathagar.com

দৌড়ে গিয়ে একটা দোতলা বাড়ির মধ্যে গিয়ে লুকাই। তখন দেখি, সেই বাড়িতে একটা মেয়ের ওপর পাকিস্তানি সৈন্যরা পাশবিক নির্যাতন চালাচ্ছে। মেয়েটি তখন বাঁচার জন্য চিৎকার করছিল। তিন জন পাকিস্তানি সৈন্য মেয়েটাকে পরপর ধর্ষণ করে। পাঁচ মাসের অন্তঃসত্ত্বা, পিতৃহীন ওই মেয়েটির নাম ছিল রত্না বেগম। পাকিস্তানি হানাদাররা এতটাই নির্মম ছিল যে, তারা অন্তঃসত্ত্বা নারীদেরকেও পাশবিক নির্যাতন থেকে রেহাই দিত না। মেয়েটিকে হানাদাররা যুদ্ধ শুরু হওয়ার মাস দুয়েক পর নির্যাতন করেছিল। হানাদারদের নির্যাতনের চার মাস পর রত্না বেগম মারা যায়। ওই দিন পাকি বাহিনী আমাদের গ্রাম থেকে তিনজনকে ধরে নিয়ে যায়। এঁরা হলেন খোকা, আজিজুল ও কেরামত।

দেলোয়ার হোসেন দুলাল পাকি বাহিনীর হাতে তাঁর পিতা আব্দুর রশিদের নিহত হওয়ার বিষয়ে বলেন, তখন আমি ষষ্ঠ শ্রেণীর ছাত্র। পাকি সেনারা রাজাকার আলবদরদের সাথে নিয়ে বাড়িতে এসে আমাকে ধরে নিয়ে যায়। তখন ছিল অগ্রহায়ণ মাস। দেশ স্বাধীন হওয়ার কয়েকদিন আগের ঘটনা। রানীশংকৈল গ্রামের রাজাকার তাজু এসে বলে, তোমাকে আমাদের সাথে যেতে হবে। তোমার আব্বাকে নিতে এসেছিলাম। তিনি যেহেতু বাড়িতে নেই, তাই তোমাকে আমাদের সাথে যেতে হবে। তারা আরও বলে, তোমার আম্মাকেও আমাদের সাথে যেতে হবে। আমার ছোট ভাইটি তখন মায়ের কোলে ছিল। তাকেসহ মাকে তারা জিপে তুলে নেয়। আর আমাকে হাত-পা বেঁধে সাইকেলে করে রাজাকারদের ক্যাম্পে নিয়ে যায়।

পরে তারা আরো এক জনকে ধরে। তারা আমাদের বাঁধন খুলে দিয়ে হ্যান্ডক্যাফ পরায়। সেখান থেকে আমাদের হাঁটিয়ে রানীশংকৈলে নিয়ে যাওয়া হয়। তখন দুপুর দুটো। এরপর আমাদেরকে থানায় নিয়ে আটকে রাখা হয়। সেখানে সন্ধ্যা ছ'টার দিকে আমার বাবাকে সেলে বন্দী অবস্থায় দেখতে পাই। আমার বাবা বাড়িতে এসে আমাদেরকে না দেখে নিজেই থানায় গিয়ে ধরা দেন। আমাকে থানায় দেখে তিনি কান্নায় ভেঙে পড়েন। এরপর বাবাকেও থানায় বন্দী করা হয়।

সন্ধ্যা ছ'টার সময় হানাদাররা থানার মধ্যে কোর্ট বসায়। সেখানে একজন পাকি কর্নেল, থানার ওসি ও আরও কয়েকজন সাঙ্গপাঙ্গ উপস্থিত ছিল। তারপর তারা আমার বাবাকে সেল থেকে বের করে জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করে। বাবা তাদের প্রশ্নের উত্তরে বলেন, আমার ভাই এখন ভারতে আছে। তখন তারা বলে, আপনার ভাইয়ের জন্য আপনাকে ধরা হয়েছে। তখন আমি কর্নেলকে বললাম, আমার বাবা তো কোন দোষ করেন নি। তাঁকে কেন আটকে রাখা হবে? তখন কর্নেল বলে, তোমার বাবাকে কয়েকদিন পরে ছেড়ে দেওয়া হবে। তারপর তারা মা ও ভাইসহ আমাকে জিপে করে বাড়ি পৌঁছে দেয়। আমাদেরকে তারা সোমবারে ধরে নিয়ে গিয়েছিল। আর শনিবার দুপুর দু'টোর সময় আমরা জানতে পারি, বাবাকে শুক্রবার দিবাগত রাত দুটোয় তারা হত্যা করেছে।

www.pathagar.com

বাঁশবাড়ি গ্রামের গোলাম রসুল সে সময় পিস কমিটির সেক্রেটারি ছিলেন। খুনিয়া দীঘি ও নোল দীঘিতে পাকি বাহিনীর গণহত্যার একজন প্রত্যক্ষদর্শী তিনি। পাকি বাহিনীর গণহত্যা প্রসঙ্গে তিনি বলেন, এখানে প্রায় এক হাজার লোককে পাকি বাহিনী হত্যা করে। এঁদের মধ্যে একজনের নাম আমার মনে আছে। তিনি হলেন আব্দুর রহমান। গোলাম রসুল আরো বলেন, বাঙালিদের ধরে এনে সেলে আটকে রাখা হত। তারপর আর্মি অফিসাররা তাঁদের বিচার করত। বিচারে যাঁদের শাস্তি হত, তাঁদেরকেই এখানে হত্যা করা হত। তিনি হত্যাকাণ্ডে জড়িত কয়েকজন আর্মি অফিসারের নাম বলেন। এরা হল মেজর আবুল কালাম মেলাল, মেজর শাহেদ ও ক্যাপ্টেন আজিজ।

বিষ্ণুপুর গ্রামের চানমনি সখিনা একাত্তরে পাকিস্তানি আর্মি কর্তৃক ধর্ষিতা হয়েছিলেন। তিনি এ ব্যাপারে কোন কিছু বলতে সম্মত হচ্ছিলেন না। বিরক্ত বোধ করছিলেন। অনেক অনুরোধের পর তিনি বলেন, ত্রিশ বছর পর আমার নির্যাতনের কথা শুনে কী হবে? আমার বঞ্চনা ও অপমানের কি সত্যিই কোন প্রতিকার হবে? এই প্রশ্ন রেখে তিনি বলেন, একাত্তরে সনে আমি দু'সন্তানের জননী ছিলাম। আমার তৎকালীন স্বামীকে পাকি আর্মি ধরে নিয়ে যায়। সেখানে আর্মি তাঁর সামনে আমাদের গ্রামের রহমতুল্লাহ ও তাঁর দুই ছেলেকে গুলি করে হত্যা করে। এতে আমার স্বামী সেখানে হার্টফেল করেন। স্বামীর মৃত্যুর পর পাকিস্তানি আর্মি আমাকে ধরে নিয়ে আটকে রেখে ধর্ষণ করে। তারা এ সময় আমাকে গ্রামের অন্যান্য যুবতী মেয়েদের সন্ধান দিতে বলত। মেয়েদের সন্ধান না দিলে আমাকে হত্যা করার হুমকি দিত। তাদের অসহ্য নির্যাতনের কারণে আমি দু'জন মেয়ের সন্ধান দিতে বাধ্য হয়েছিলাম। এদের নাম মোখলেসা ও বুধি। এঁদের দু'জনকে পরে ধরে এনে পাকিস্তানি সেনারা পাশবিক নির্যাতন করে। তারা আমাকে পনেরো ষোলো দিন সেখানে আটকে রেখেছিল। এরপর বৃদ্ধ আয়েন উদ্দীন সেখান থেকে আমাকে উদ্ধার করে এনে বিয়ে করেন। বিয়ে করে তিনি আমার সম্মান বাঁচান। আমি পাকিস্তানি আর্মির এই পাশবিক নির্যাতনের বিচার চাই।

নবাব আলীর পিতা সৈয়দ আব্দুর রশিদকে পাকি বাহিনী ধরে নিয়ে হত্যা করে। এ প্রসঙ্গে তিনি বলেন, একাত্তরে সনে আমি গ্রামে ছিলাম। আমি তখন দশম শ্রেণীর ছাত্র। আমার চাচা তখন থানা আওয়ামী লীগের সেক্রেটারি ছিলেন। এপ্রিল মাসে পাকি আর্মি প্রথম আমাদের গ্রামে ঢোকে। একজন আর্মি অফিসার আমাদের বাড়ির কাছে এসে আমাদের ডেকে মাধবপুর স্কুলের মাঠে নিয়ে যায়। আমাদের মধ্যে কয়েকজন বয়স্ক ব্যক্তি ও বেশ কিছু ছোট ছেলেমেয়ে ছিল। খাকি পোশাক পরা দশ বারো জন আর্মি অফিসার আমাদেরকে নিয়ে মিটিং করে 'পাকিস্তান জিন্দাবাদ' স্লোগান দিতে বলে। এরপর পরিস্থিতি আরও খারাপ হলে বাবা আমাকে ভারতে নানার বাড়িতে পাঠিয়ে দেন। সেখানে কিছুদিন থাকার পর আমি দেশে ফিরে আসি। বাড়িতে আসার পর অন্য আরেকজন মেজর ক্যাম্প থেকে আমাকে ডেকে পাঠায়। এ

www.pathagar.com

সময় বাবা আমাকে ফের ভারতে চলে যেতে বলেন। তখন আমি মাধবপুরের চেয়ারম্যানের জামাইকে সাথে নিয়ে ভারতে চলে যাই।

এরপর বাড়িতে এসে শুনতে পাই বাবাকে পাকিস্তানি আর্মি হত্যা করেছে। তখনও আমার বাবাকে কবর দেওয়া হয়নি। আমার বাবাকে তারা যেভাবে হত্যা করে ছিল, তাঁর লাশ সেভাবেই পড়েছিল। বাবাকে পেছন দিক থেকে গুলি করা হয়েছিল। গুলিটা পেছন দিক থেকে ঢুকে বুকের সামনে দিয়ে বেরিয়ে গিয়েছিল। হাতের আঙুল দিয়ে তাঁর বুকটা চেপে ধরা ছিল। বাবার কলমটা তখনও পকেটে আর, চশমাটা ছিল আব্দুর রহিম চেয়ারম্যানের বাড়িতে। সেখান থেকে তারা চশমাটা আমাদের বাড়িতে পাঠিয়ে দিয়েছিল। এরপর আমরা কয়েকজন মিলে বাবার লাশ নিয়ে আসি। সেখানে আরও পঁচিশ ত্রিশ জনের লাশ পড়েছিল। এর মধ্যে সতেরোটি লাশ ছিল মাধবপুরের। বাকি লাশগুলো ছিল ইনতাজ চেয়ারম্যান, রহমান ও সোবহান প্রমুখ ব্যক্তিবর্গের। এখানে অনেকের লাশ গলিত অবস্থায় ছিল। ফলে মৃত ব্যক্তির আত্মীয় স্বজনরা লাশগুলোকে সেখানকার একটা জায়গায় কবর দিয়েছিল। এই জায়গাটির নাম নোলদীঘি। জায়গাটি খুনিয়া দীঘির তিন কিলোমিটার পশ্চিমে। খুনিয়া দীঘিতেই পাকিস্তানি বাহিনী সবচেয়ে বেশি হত্যাকাণ্ড ঘটায়। স্বাধীনতার পর আমরা খুনিয়া দীঘিতে গিয়ে দেখেছিলাম, সেখানকার পানি তখনও রক্তে লাল হয়ে আছে। সেখানে মানুষের মাথাগুলো এক দিকে আর হাড়গুলো অন্য দিকে পড়েছিল। সেখানকার দৃশ্য এত ভয়ানক ছিল যে, তা ভাষায় বর্ণনা করা সম্ভব নয়। সেখানে অনেক মেয়েকে নির্যাতন করা হয় বলে আমরা শুনেছি।

মোহনলাল সাহা বলেন, একাত্তরে আমার বয়স ছিল বিশ বছর। যুদ্ধের তাণ্ডব বেড়ে গেলে সহায় সম্পদ সবকিছু ফেলে আমি পরিবার পরিজন নিয়ে ভারতে চলে যাই। যুদ্ধ শেষে দেশে ফিরে এসে সহায় সম্পদের কোন কিছুই আর ফিরে পাইনি। সবকিছু লুট করে নিয়ে বাড়িঘরে আগুন লাগিয়ে পুড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল। পুরো গ্রামে বাড়িঘর বলতে কিছুই আর অবশিষ্ট ছিল না। গ্রাম তখন বিরান ভূমিতে পরিণত হয়েছিল। এ সময় খুনিয়া দীঘিতে গিয়ে মানুষের অনেক কাটা মাথা পড়ে থাকতে দেখেছি। সেগুলো তখনও শেয়াল কুকুরে খুবলে খুবলে খেয়েছে। পাকি বাহিনী আমাদের গ্রামের হিন্দুদের ওপর বেশি অত্যাচার করেছিল। আমার জানা মতে, অন্ত ত তিনজন হিন্দুকে ওরা ওখানে হত্যা করেছে। এঁদের নাম গরবল, মহেনলাল ও মহেন রায়।

এ ছাড়া নবাবগঞ্জ থানার চড়ার হাট ও আন্দোল গ্রামে এক শ' সাতান্ন জনকে পাকি বাহিনী হত্যা করে। নয়ই অক্টোবর পাকি সেনারা অস্ত্রের মুখে গ্রামের পুরুষদের দলার গলগা নামক স্থানের একটা কালভার্ট মেরামতের কথা বলে একত্রিত করে। এক লাইনে দাঁড়াতে বলার সঙ্গে সঙ্গে তাঁরা বুঝে ফেলে কী ঘটতে যাচ্ছে। অনেকে আতঙ্কে দৌড় দেন। এরপর নির্বিচারে গুলি করে হত্যা করা হয় তাঁদেরকে।

www.pathagar.com

চড়ারহাট গ্রামের একষট্টি জন ও আন্দোলের বত্রিশ জন এদিন পাকিদের হাতে শহীদ হন। লাশের স্তূপ থেকে স্থানীয় মহিলারা আবদুল মাজেদকে জীবিত অবস্থায় উদ্ধার করেন। তাঁরাই শাড়ি, লুঙ্গি, চাদরে পেঁচিয়ে লাশগুলো দাফন করেন।

পাকিস্তানি আর্মির মেজর আবুল কালাম মেলাল, মেজর শাহেদ, ক্যাপ্টেন আজিজ ও তাদের সহযোগীরা ঠাকুরগাঁও জেলার একাত্তরের সকল গণহত্যা, জাতিগৃত নিধন, ধর্ষণ, লুটপাট, অগ্নিসংযোগের জন্য দায়ী।

আসামী ঃ মেজর নিসার আহমেদ খান শেরওয়ানী, মেজর উইলিয়াম, ক্যাপ্টেন মোখতার।

অপরাধের ধরনঃ গণহত্যা, জাতিগত নিধন, ধর্ষণ, লুটপাট, অগ্নিসংযোগ।

সাক্ষী ঃ মোঃ ওবায়দুল্লাহ মিয়া, লকুবুদ্দিন সরকার, সিস্টার কারমেলা, মীনা রানী প্রামাণিক, জিতেন্দ্রনাথ, গৌরপদ মন্ডল, সাবরি বেগম, বাহার জান, নূরজাহান, ফাতেমা, প্রামাণিক, আবুল কালাম আজাদ, মিসেস আনোয়ারুল আজিম।

ঘটনাকালঃ একাত্তরের পঁচিশ মার্চ থেকে স্বাধীনতার পূর্ব পর্যন্ত।

ঘটনাস্থল ঃ নাটোর জেলা।

সূত্রঃ যুদ্ধাপরাধ গণহত্যা ও বিচারের অন্বেষণ এবং WCFFC গবেষণা।

পাকিস্তানি আর্মি অফিসার মেজর নিসার আহমেদ খান শেরওয়ানী, মেজর উইলিয়াম, ক্যাপ্টেন মোখতার ও তাদের সহযোগীরা নাটোরে কমপক্ষে বারো হাজার নিরীহ বাঙালিকে হত্যা করে। সেই সাথে ব্যাপক ধর্ষণযজ্ঞ, লুটপাট ও অগ্নিসংযোগ চালায়। নাটোরের ফলবাগান, ভাগাড়, নদীর পাড়, গোরস্থান এবং বিভিন্ন মাঠকে পাকি হানাদাররা বধ্যভূমি হিসাবে ব্যবহার করে। এ ছাড়া নাটোর জেলা শহর থেকে আড়াই মাইল পশ্চিমে অবস্থিত ছাতনী গ্রাম, রামপুরা খাল, বনপাড়া মিশন সংলগ্ন এলাকাতে পাকি বাহিনী ব্যাপক নারী নির্যাতন ও হত্যাযজ্ঞ চালায়। এই সব হত্যাকাণ্ড ও ধ্বংসযজ্ঞের প্রত্যক্ষদর্শী ও ক্ষতিগ্রস্তদের কয়েকজনের জবানবন্দী এখানে উল্লেখ করা হল।

ছাতনী গ্রামের ওবায়দুল্লাহ্ মিয়া বলেন, একাত্তর সালের উনিশে জ্যৈষ্ঠ বৃহস্পতিবার পাকি বাহিনী ছাতনী গ্রামে হামলা চালায়। সেদিন পাকি আর্মি নাটোর থেকে বেলঘড়িয়া গ্রামের পূর্ব দিকের রাস্তা দিয়ে উত্তরের পণ্ডিত গ্রামে প্রবেশ করে। সেখান থেকে হরিগাছা, বকুলপুর ও ছাতনী গ্রামে ঢুকে গ্রামের পূর্ব থেকে পশ্চিম দিক পর্যন্ত প্রত্যেকটা বাড়িতে যাকে পায়, তাকেই ধরে আনে। হিংস্র পাকি বাহিনী ভোর বেলা ঘুমন্ত নিরীহ গ্রামবাসীর ওপর হামলা চালায়। তারপর সবাইকে ছাতনী স্লুইস গেটের কাছে এনে জড়ো করে। সেখানে ছাতনী ও ভাবনী গ্রামের লোক ছাড়াও অন্যান্য

www.pathagar.com

জায়গার লোকও ছিল। এদিক দিয়ে তাদের যাতায়াত পথ ছিল। পাকি আর্মির সাথে বিহারি এবং কয়েকজন বাঙালি দালালও ছিল। গ্রাম থেকে ধরে আনা এই নিরীহ লোকগুলোকে পাকি হানাদাররা এসিড ও গান পাউডার ছিটিয়ে নির্মমভাবে হত্যা করে। হত্যাকাণ্ড শেষ করে তারা সকাল আটটার দিকে চলে যায়। আমি জোহরের নামাজের সময় ফিরে এসে স্লুইস গেটের কাছে পুড়ে কালো হয়ে যাওয়া ষাট সত্তরটা লাশ দেখতে পাই। লাশগুলোর শরীর এমনভাবে পোড়া ছিল যে, তাদের শনাক্ত করা সম্ভব হচ্ছিল না। বৃহস্পতিবার লাশগুলো ওই অবস্থাতেই পড়ে ছিল। পরদিন শুক্রবার জুম'আর নামাজের পর লাশগুলো মাটিচাপা দেওয়া হয়। আর যারা আত্মীয়-স্বজনের লাশ শনাক্ত করতে পেরেছিল, তারা সেগুলোকে নিয়ে গিয়েছিল।

নারী নির্যাতন প্রসঙ্গে ওবায়দুল্লাহ মিয়া বলেন, ছাতনী ও ভাবনী গ্রামের হিন্দু মুসলিম উভয় পাড়াতেই পাকি আর্মি ব্যাপক নারী নির্যাতন করে। কিন্তু নির্যাতিত নারীদের কেউই বর্তমানে এখানে নেই। অনেকে মারা গেছেন। অনেকে ভিটেমাটি ছেড়ে অন্য কোথাও চলে গেছেন। সেই দিনগুলো তারা অনেক উৎকণ্ঠা ও ভয়ের মধ্য দিয়ে পার করেছেন। কেউ কারও বাড়ি যেতেন না এবং রাতে কেউ বাইরে থাকতেন না।

পাকি আর্মির হামলায় আহত লকুবুদ্দিন বলেন, তখন আমি দুই ছেলে ও তিন বয়স্ক মেয়ের পিতা। সেদিন আবহাওয়া মেঘলা ছিল। মাঝে মাঝে বৃষ্টি হচ্ছিল। আমি শহরের দিকে যাচ্ছিলাম। এমন সময় পাকি বহিনী আমাকেসহ আঠাশ জনকে ঘেরাও দিয়ে ধরে নিয়ে গেল। গণি দেওয়ানের ছেলে আনোয়ারুলকে দিয়ে পাকি বাহিনী সবার হাত বাঁধায়। তখন বেলা ছয়টা কি সাতটা হবে। এরপর সাদেক বিহারিকে দিয়ে তারা ধরে আনা সবাইকে জবাই করিয়ে হত্যা করে। তারা বাঙালিদের জন্য গুলি খরচ করতে চায়নি। আমার গলায়ও তলোয়ারের পোঁচ দেওয়া হয়। এছাড়াও আমার বুক, পেটসহ শরীরের বিভিন্ন স্থানে বেয়নেটের নয়টা আঘাত করা হয়। তারপরও সৌভাগ্যক্রমে আমি বেঁচে যাই। সবাইকে হত্যা করে চলে যাওয়ার অনেকক্ষণ পর আমি ধীরে ধীরে আমার হাতের বাঁধন খুলে ফেলি। তখন তৃষ্ণায় জান ফেটে যাচ্ছিল। নদীর পাড়ে গিয়ে প্রাণ ভরে পানি খাই। কিন্তু গলার কাটা জায়গা দিয়ে পানি বের হয়ে যাচ্ছিল। পানি খাওয়ার পর সেখানেই অজ্ঞান হয়ে পড়ি। পরে এক মহিলা আমাকে নদীর ওপারে নিয়ে মাথায় পানি দেন এবং চিকিৎসার জন্য মির্জাপুর নিয়ে যান। শরীরে রক্ত না থাকায় ডাক্তার চিকিৎসা করতে পারেননি। কাপড় দিয়ে ক্ষতস্থানটি শুধু বেঁধে দেন। রাতে তেঘড়ি থেকে চার জন রাজাকার এসে আর্মির ভোগের জন্য আমার মেয়েগুলোকে চায়। আমি মেয়েদের সন্ধান না দিলে তারা ক্ষিপ্ত হয়ে বলে, শালা, মরতে বসেছে তাও অহংকার গেল না! কাল বুঝবে শালা! এই রকম নানান আকথা কুকথা বলে তারা চলে যায়। পরদিন গ্রামে মিলিটারি ও বিহারি এলে আমি দৌড়ে দোনাপুর গ্রামে গিয়ে উঠি। কিন্তু সেখানকার মানুষ আমাকে আশ্রয় দেয়নি। একজন বিধবা মহিলা আমাকে চিৎ করে শুইয়ে পান্তা ভাত ও পানি খাওয়ায়। খবর পেয়ে আমাদের এলাকার চেয়ারম্যান, মেম্বাররা এসে

www.pathagar.com

আমাকে নদীর তীরে রেখে আসে। সেই থেকে মানুষের সাহায্য পেয়ে বেঁচে উঠি। এছাড়া পরবর্তীতে সরকারের অনুদান হিসেবে এক বান্ডিল টিন পেয়েছিলাম। ছাতনী গ্রামের নারী নির্যাতন প্রসঙ্গে তিনি বলেন, পাকি আর্মি ধৃত লোকদের জবাই করে হত্যা করার পর গ্রামের ভেতরে প্রবেশ করে। এ সময় তারা বহু মহিলার ওপর পাশবিক নির্যাতন চালায়।

নাটোর সেন্ট জোসেফ স্কুলের প্রধান শিক্ষক গৌরপদ মণ্ডল বলেন, নাটোরের আশেপাশের বিভিন্ন এলাকায় মানুষের বাড়িঘর লুটপাট করে পুড়িয়ে দেওয়া শুরু হলে, তারা বনপাড়া ক্যাথলিক মিশনে গিয়ে আশ্রয় নেন। আশ্রিতরা কনভেন্টের মধ্যেই ছিলেন। এরপর আশ্রয়ের জন্য লোকজন দলে দলে মিশনে আসতে শুরু করলে ফাদার পিনোস আরও তিন জনকে সাথে নিয়ে মেজর শেরওয়ানীর সাথে দেখা করতে যান। মেজরের কাছে গিয়ে তিনি জানতে চান যে, বিতাড়িত লোকজনকে তিনি মিশনে আশ্রয় দিতে পারবেন কি না। তখন শেরওয়ানী বলে, বাঙালিরা বিহারিদের হত্যা করেছে। এখন পাকিস্তানিরা পাল্টা আক্রমণ করছে। এটা repercussion। ঠিক আছে, তাদেরকে আশ্রয় দেন। এরপর থেকে প্রতিদিনই বহু লোক মিশনে আশ্রয় নেওয়ার জন্য আসতে থাকে এবং সেখান থেকে রাতের আঁধারে ভারতে চলে যেতে থাকে।

তেসরা এপ্রিল হঠাৎ বেলা তিনটার দিকে মেজর শেরওয়ানীসহ পাকি বাহিনীর সদস্যরা মিশনে এসে উপস্থিত হয়। পাকিস্তানি সৈন্যরা গোটা মিশন ঘিরে ফেলে এবং এদিক সেদিক দৌড়াদৌড়ি করতে থাকে। এরপর তারা মিশনের ভেতরে ঢুকতে চাইলে ফাদার পিনোস পাকি বাহিনীকে ভেতরে ঢুকতে বাধা দেন। আশ্রিতদের বাঁচানোর জন্য ফাদার বলেন, Please don't kill them. তখন মেজর শেরওয়ানী বলে যে, এখানে কিছু মুক্তি ও আওয়ামী লীগার আছে, তাদের সাথে সে কথা বলতে চায়। তখন ফাদার বলেন, যদি তাদের সাথে কথা বলেন তাহলে ভাল; কিন্তু যদি তাদের হত্যার পরিকল্পনা করে থাকেন তাহলে I will be the first stricker। শেরওয়ানী ফাদারকে কথা দেয় যে, তাদেরকে হত্যা করবে না। এরপর মেজর শেরওয়ানী ফাদারকে নিয়ে কনভেন্টের ভেতরে গিয়ে বিভিন্ন ঘর ঘুরে দেখে এবং তারপর পনেরো থেকে পঞ্চাশ বছর পর্যন্ত পুরুষদের ধরে এনে লাইন করে দাঁড় করায়। পাকি বাহিনীর তিনটি ট্রাক আগে থেকেই মিশনের সামনে দাঁড়ানো ছিল। পাকি বাহিনী ধৃত লোকগুলোকে ট্রাকে তুলে নিয়ে যায়। গৌরপদ মণ্ডল আরও কয়েকজন শিক্ষকসহ বোর্ডিংয়ের দোতলায় দাঁড়িয়ে এসব ঘটনা প্রত্যক্ষ করেন। নারী নির্যাতন প্রসঙ্গে তিনি বলেন, সেরকম নারী নির্যাতন সেদিন ওখানে হয়নি। তবে নববিবাহিত একজন যুবতীসহ আরও কয়েকজন মহিলাকে ট্রাকে তোলা হয়েছিল। এ সময় সিস্টার কারমেলা মেজর শেরওয়ানীর পা ধরে বলেন, Save the women at least। এটা করার পর ধাক্কা দিয়ে মহিলাদের ট্রাক থেকে ফেলে দেওয়া হয়। এদিন মিশন থেকে ধরে নিয়ে যাওয়া পঁচাশি জনকে দত্তপাড়া ব্রিজের নিচে খালের পাড়ে

www.pathagar.com

বসিয়ে গুলি করে হত্যা করা হয়। ওই হত্যাকাণ্ড থেকে মাত্র একজন বেঁচে আসতে পেরেছিলেন।

শহীদ জায়া সাবরি বেগম বলেন, আমার স্বামী সেদিন গোসল করতে গিয়েছিলেন। ফিরে এসে বললেন আম কেটে দাও খাব। সে বছর গাছে অনেক আম হয়েছিল। এর পরপরই খাকি পোশাক পরা আর্মি ঘরে ঢুকে তাকে ধরে নিয়ে যায়। তখন ঘড়িতে কয়টা বেজেছিল তা ঠিক মনে নেই, তবে ঝুরঝুর করে বৃষ্টি পড়ছিল। আল্লাহ্‌র যে কী ইচ্ছা, এই বৃষ্টির মধ্যেই আমরা বাড়ি থেকে পালিয়ে যাই। স্বামীকে সেই যে ধরে নিয়ে গেল, তারপর আর কোন খোঁজ পাইনি। তাকে ধরে নিয়ে জবাই করা হয়েছিল বলে আমরা জানতে পেরেছিলাম। তখনতো স্বামীর রোজগারেই আমাদের সংসার চলত। পরে চারটা ছেলেমেয়ে নিয়ে আমার যে কী দুরাবস্থা হল। এদের নিয়ে কী কষ্ট করে যে চলেছি, মানুষের দ্বারে গিয়ে চেয়ে চিন্তে খেয়েছি, সে কথা আপনাদের বুঝিয়ে বলতে পারব না। এ অবস্থার মধ্যেই ধীরে ধীরে ছেলেরা বড় হয়েছে।

নারী নির্যাতন প্রসঙ্গে সাবরি বেগম বলেন, হ্যাঁ ওই ডাক্তারের বউটাকে কী নির্যাতনটাই না করল আর্মি। গ্রামের পুরুষদের ধরে নিয়ে জবাই করার পর মেয়েদের ওপর নির্যাতন চালায় তারা। বর্তমানে আমার খুব খারাপ অবস্থা। স্বামী বেঁচে থাকলে ভাত কাপড় দিত। ছেলেদের এত কষ্ট করে মানুষ করলাম, কিন্তু তারা এখন খেতে পরতে দেয় না। স্বামী বেঁচে থাকলে আমার আজ এত কষ্ট থাকত না।

বাহারজানের স্বামী আব্দুল্লাহকেও পাকি আর্মি ধরে নিয়ে হত্যা করে। বাহারজান সে প্রসঙ্গে বলেন, যুদ্ধের সময় আমরা ঘরবাড়ি ছেড়ে পালিয়ে পালিয়ে থাকতাম। কখনও পাটের ক্ষেতে, কখনও বেতের ঝোপে, ডোবায়, গর্তের ভেতরে লুকিয়ে থাকতাম। এমনও হয়েছে যে, খেতে বসেছি এমন সময় শুনতে পেলাম আর্মি আসছে, অমনি ভাতের থালা ফেলে ছেলে-মেয়ে নিয়ে দৌড়ে জঙ্গলে গিয়ে লুকিয়েছি। এই রকম আতংকের মধ্যে কেটেছে দিনগুলো। আমরা ঠিকমত খেতে বা ঘুমাতে পারতাম না তখন। তারপর একদিন সত্যিই তারা এল। রাত তখন তিনটা। পাকিস্তানি আর্মি কাউন্সিলের মোড় দিয়ে গ্রামে ঢোকে। তারপর গ্রামের লোকদেরকে ওরা নৃশংসভাবে জবাই করে। আমার স্বামীকে জবাই করেছে, মনি সরকারকে জবাই করেছে। এই রকম আরও অনেককেই তারা সে সময় জবাই করে হত্যা করেছে।

সেদিন যখন আমরা টের পেলাম যে, ওরা গ্রামে ঢুকে পড়েছে, তখন আমরা আগের মতোই জঙ্গলে গিয়ে আশ্রয় নিলাম। কিন্তু আমার স্বামী গেলেন না। আমি জঙ্গল থেকেই স্বামীকে ডেকে বললাম, আপনি পালিয়ে যান। কিন্তু তিনি বললেন, না, আমি পালাবো না, আমার মাথায় টুপি আছে, ওরা আমাকে কিছু বলবে না। আমাকে ওরা কলেমা জিজ্ঞেস করে ছেড়ে দেবে। এই কথা বলে টুপি মাথায় দিয়ে ওদের সামনে গিয়ে দাঁড়াতেই ওরা তাঁকে ধরে ফেলল। যখন আর্মি তাঁকে ধরে নিয়ে যাচ্ছিল, তখন আমি আর লুকিয়ে থাকতে পারলাম না। ছুটে গিয়ে তাদের হাত ধরে বললাম, বাবা

www.pathagar.com

আমার এতগুলো ছেলেমেয়ে আমি কীভাবে মানুষ করব? আমি গরীব মানুষ, আমার স্বামীকে ধরে নিয়ে যেও না। তখন তারা আমাকে বলল, তোমার গয়না খুলে দাও। উল্লেখ্য, আমি বিয়ের সময় কিছু গয়না পেয়েছিলাম, সেগুলো তখন পরা ছিল। সেই গয়নাগুলো তারা নিতে চাইল। আমি সাথে সাথে এক বিহারির হাত ধরে বললাম, বাবা আমার গয়নাগাটি সব নিয়ে যাও না। কিন্তু আমার স্বামীকে নিয়ে যেওনা। কিন্তু ওরা আমার কথা শুনল না।

বাহারজান এই কথা বলতে গিয়ে কেঁদে ফেললেন। ত্রিশ বছর আগের স্মৃতি আবার মনে পড়ে যায় তাঁর। দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, তখন আমার দিকে একজন বড় একটা ছোরা ধরল। সেটা দেখে আমার স্বামী বললেন, তুমি ছেড়ে দাও নয়তো ওরা তোমাকেও মেরে ফেলবে। তখন আমি সেই বিহারির হাত ছেড়ে দিলাম। ছেড়ে দিতেই ওরা আমার স্বামীকে নিয়ে চলে গেল। আমি খুব কান্নাকাটি করছিলাম। আমার তখন নয়টা ছেলেমেয়ে। আমাদের গ্রামের মনি সরকারকেও ওরা ধরে নিয়ে গিয়েছিল। সেই মনি সরকার পর্যন্ত সুপারিশ করে বলেছিল, এই লোকটার অনেকগুলো ছেলেমেয়ে, ওকে মারবেন না। তবুও পাকি আর্মি তাঁকে হত্যা করে।

বাহারজান আরও জানান, পাকিস্তানি আর্মিরা ছাতনী গ্রামের লোকদের ধরে নিয়ে একটি পুকুর পাড়ে জড়ো করে। তারপর সেখানেই সবাইকে নৃশংসভাবে জবাই করে হত্যা করে। সেদিন খুব বৃষ্টি হচ্ছিল। তখন সকাল নয়টা হবে বোধহয়। হা করে থাকা কাটা লাশগুলো এলোমেলোভাবে পড়েছিল। বৃষ্টির পানি ধুয়ে নিয়ে যায় এই শহীদদের রক্ত। সে এক ভয়ংকর দৃশ্য। সে কথা মনে করে আজও শিউরে ওঠেন বাহারজান।

ছাতনী গ্রামের নূরজাহান বলেন, স্বামীকে আমার সামনেই জবাই করে হত্যা করে পাকি আর্মি। শোকে দু:খে পাথর হয়ে যাওয়া নূরজাহান অতি কষ্টে বলেন, ছাতনী গ্রামে যখন পাকিস্তানি সৈন্যরা হামলা করে, তখন আমরা প্রাণের ভয়ে ঘরবাড়ি ছেড়ে পালিয়ে গিয়েছিলাম। তখন কেবল বেলা উঠছে। হঠাৎ জানতে পারলাম, গ্রামে হামলা হয়েছে। সমস্ত গ্রাম তখন জেগে উঠল যেন। ছেলে মেয়ে তিনটাকে নিয়ে আমি গ্রামের অন্য সবার মতো জঙ্গলের দিকে পালাচ্ছিলাম। সাথে আমার স্বামীও ছিল। কিন্তু আমরা জঙ্গল পর্যন্ত যেতে পারলাম না। পথের মধ্যেই আমরা পাকিস্তানি আর্মির সামনে পড়ে গেলাম। ওরা আমাদের ধরে ফেলল।

তারপর আমার স্বামীকে তারা আমার সামনে থেকে জোর করে ধরে নিয়ে গেল। আমার কোন উপায় ছিল না। তাঁকেসহ আর্মি গ্রামের অনেক পুরুষকে ধরে নিয়ে গেল। তারপর সবাইকে জবাই করে হত্যা করল। এরপরের দিনগুলো আমার অনেক কষ্টে কেটেছে। সেই কষ্ট বর্ণনা করার মতো ভাষা আমার জানা নেই। স্বামীর মৃত্যুর পর আমার জীবনটা খুব কষ্টে কেটেছে। খাওয়া নেই দাওয়া নেই। কি যে কষ্ট! ছোট ছেলেমেয়ে নিয়ে মানুষের বাসায় কাজ করেছি। এখনও এভাবেই দিন কাটছে আমার।

www.pathagar.com

পাকি আর্মি কর্তৃক ধর্ষিতা ডা. জসীমের স্ত্রী ফাতেমা বলেন, গ্রাম আক্রান্ত হলে আমার স্বামী ও দেবর মেয়েদের রক্ষা করার জন্য ঘরের শিকল তুলে দিয়ে চলে যায়। কিন্তু তারা কিছু দূর যাওয়ার পরই আমরা ঘরের জানালা দিয়ে দেখতে পেলাম, পাকি আর্মি ও বিহারিরা আমার স্বামী ও দেবরকে পিঠ মোড়া করে বেঁধে নিয়ে গেল। তারপর ওরা গ্রামের আরও অনেক পুরুষকে ধরে নিয়ে যায়।

তাদেরকে কোথায় নিয়ে যাচ্ছে, সেটা তখন আমরা জানতে পারিনি। আমরা খুবই আতংকের মধ্যে ছিলাম তখন। পরে জানতে পারলাম যে, ওরা ধরে নিয়ে যাওয়া সকলকেই জবাই করে হত্যা করেছে। কিন্তু তাতেও ক্ষান্ত হল না নরপশুরা। হত্যাকাণ্ড শেষ করে ওরা আবার গ্রামে ফিরে এল। আমরা যে ঘরের মধ্যে ছিলাম, সেই ঘরের দরজা ভেঙে দশ বারো জন পাকিস্তানি আর্মি ও বিহারি ভেতরে ঢুকে পড়ল। আমরা তখন প্রচণ্ড ভয় পেয়ে গিয়েছিলাম। ওরা ঘরে ঢুকেই বলল, যার কাছে যা কিছু আছে দে'। তারপর তারা আমাদের সোনার আংটি, গহনা ও অন্যান্য জিনিস যা ছিল সব কেড়ে নিল। জিনিসগুলো কেড়ে নিচ্ছিল বিহারিরা, আর আর্মিরা সেটা পর্যবেক্ষণ করছিল। আমরা ঘরের মধ্যে তখন এক দেড় শ' মহিলা। ওরা যখন আমাদের গয়নাগুলো ছিনিয়ে নিচ্ছিল, তখন আমার কয়েকটা গয়না আমি ঘরের কোণে চুপ করে ফেলে দিয়েছিলাম। সেটা ওরা দেখতেও পায় নি। আমার স্বামী ডাক্তারি করত। তার স্টেথোসকোপটাও ওরা নিয়ে যায়।

এরপর ফাতেমা বলেন, আর্মি আমাদেরকে ঘর থেকে বের করে লাইন করে দাঁড় করাল। তারা আমাদের বুকে বন্দুক ধরল, কিন্তু গুলি করল না। এই দৃশ্য দেখে আমাদের বাচ্চারা চিৎকার করে কেঁদে ওঠে। এরপর আর্মি বলল যে তাদের কুপ্রস্তাবে রাজী না হলে বাচ্চাদের পা ধরে ফেড়ে ফেলবে। ভয় দেখিয়ে বলে গুলি করব। তখন ওরা যা বলে তাই করতে বাধ্য হয় মেয়েরা। তারা মেয়েদের একবার করে ঘরের মধ্যে নিয়ে গেছে, আবার কিছুক্ষণ পর বের করে এনেছে। এমনকি বাড়ির বাইরেও মেয়েদের নিয়ে যায়। আমার জাকেও তারা ধরে নিয়ে গিয়েছিল।

ফাতেমা নিজের কথা বলতে চাননি। শুধু বলেন, "আমাকে একজন আর্মিই ধরেছিল...। তবে এসব কথা যদি প্রচার হয়, তাহলে গ্রামে থাকতে আমার সমস্যা হবে। আমার বাচ্চারা বড় হয়েছে। তাদের মান সম্মান আছে। আমার আবার বিয়ে হয়েছে, স্বামী আছে। আমি চাই না, এসব কথা প্রচার হোক।

সিস্টার কারমেলা বলেন, কী বলব অনেক দিনের কথা। আমার ঠিক মতো মনে নেই। তবে এটুকু মনে আছে। আমরা বিপদগ্রস্ত একটা গ্রুপকে আশ্রয় দিয়েছিলাম। একটা টিনের ঘরে ওদের থাকতে দিয়ে বলেছিলাম, তোমরা এখানে চুপচাপ থাক। তারাও নিরাপদ ভেবে এখানে এসেছিল। এটা তো গীর্জা! আমরা এখানে প্রার্থনা করতাম, যেন কারও বিপদ না হয়। কিন্তু কেমন করে যেন ওরা সেটা জেনে গেল। একদিন দুপুরে পাকিস্তানি আর্মি এই চার্চে হামলা করল। আমার সাথে তখন আরও

www.pathagar.com

ছিলেন দু'জন সিস্টার ও ফাদার পিনোস। পাকিস্তানি আর্মি অফিসারের সাথে অনেক সৈন্য ছিল। ওরা একটা ট্রাক নিয়ে এখানে এসেছিল। ট্রাকটা বাইরে দাঁড় করিয়ে রেখেছিল।

ওরা ভিতরে এসে প্রশ্ন করল, যাদের আশ্রয় দিয়েছেন তারা কোথায়? আমরা পুরুষদের সাথে দেখা করলাম চাই। তখন আমরা সবাইকে ডাকলাম। কারণ আমরা পাকিস্তানি আর্মির বিশ্বাস করেছিলাম। ভেবেছিলাম, আশ্রিত লোকদের ওরা কোন ক্ষতি করবে না। কিন্তু নিরীহ লোকগুলোকে ডাকলে তারা খুব ভয় পেয়ে গেল। কয়েকজন এল, বাকিরা আসতে চাইল না। তখন আর্মি ভেতরে গিয়ে ওদের সাথে কথা বলল। ওদের বোঝাল যে, তোমরা আমাদের সাথে চল তোমাদেরকে আবার এখানে ফিরিয়ে দিয়ে যাব। কিন্তু ওরা পাকিস্তানিদের মতলব বুঝে ফেলেছিল।

চার্চের ভেতরে একটা পুকুর আছে, পুকুর পাড়ের ছোট রাস্তা দিয়ে ওদের নিয়ে যাওয়ার সেই দৃশ্য আমি এখনও চোখ বুঁজলে দেখতে পাই। সেই হতভাগ্য লোকগুলো খুবই কান্নাকাটি করছিল। ওদের কাছে টাকা পয়সা সোনাদানা যা ছিল, সেগুলো আমাদের হাতে দিয়ে কেঁদে কেঁদে বলল, এগুলো আমাদের স্ত্রীদের দিয়ে দেবেন। আমরা খুব কষ্ট পাচ্ছিলাম ওদের কথায়। কারণ ওরা বুঝতে পারছিল যে, ওরা আর কখনও ফিরে আসতে পারবে না। আমরা ওদের সেই সোনাদানা, টাকাপয়সা ওদের স্ত্রীদের কাছে ফেরত দিতে গিয়ে কে কার স্ত্রী, সেটা ঠিক করতে পারছিলাম না। কারণ তখন তো কারও নাম জানতাম না আমরা। সে এক করুণ কাহিনী।

ওদেরকে তো ট্রাকে করে নিয়ে গেল। আর যারা এখানে থাকল, তাদের কান্নায় বাতাস ভারী হয়ে উঠল। শুধু মেয়েরা ও বাচ্চারা এখানে ছিল। আমরা ওদের পুরুষদের রক্ষা করতে না পারায় মহিলারা বলল, আমরা এখানে আর থাকব না। আমাদেরকে বাড়ি পাঠিয়ে দেন। আর্মিও যাওয়ার সময় বলে গিয়েছিল মেয়েদেরকে এখানে রাখবেন না। ওদের অন্য কোথাও পাঠিয়ে দেন। তাই আমরা ওদেরকে এখান থেকে চলে যেতে বললাম। ওরা পরের দিনই মিশন ছেড়ে চলে গেল। পাকিস্তানি আর্মি যে লোকগুলোকে নিয়ে গিয়েছিল, তাদেরকে একটা পুকুরের পাড়ে বসিয়ে গুলি করে হত্যা করেছিল। পঁয়তাল্লিশ জন পুরুষের মধ্যে থেকে একজন মাত্র বেঁচে গিয়েছিল। সে গুলি খেয়েও মরার মতো পড়েছিল। আর্মি চলে গেলে সে এক মুসলমান বাড়িতে গিয়ে আশ্রয় নিয়েছিল। পরে সেখান থেকে সে মিশনে আসে। সে সময় তাকে আমরা সাহায্য করেছিলাম। লোকটির নাম এখন মনে পড়ছে না।

এর পরদিন পাকিস্তানি আর্মি আবার আসে। মহিলারা এখান থেকে চলে গেছে শুনে তারা ফিরে যায়। পাকিস্তানি আর্মির সাথে কোন বিহারি বা রাজাকার ছিল কি না, জানতে চাইলে সিস্টার কারমেলা ভাঙা বাংলায় বলেন, আমরা তখন খুব দুঃখিত ছিলাম তাই ওদের সাথে আর কে কে ছিল সেটা ভাল করে খেয়াল করিনি। তিনি

www.pathagar.com

জানালেন, এই মিশনে একবারই হামলা হয়েছিল। তবে এখানে যুদ্ধের সময় বিভিন্ন জায়গা থেকে লোকজন সাহায্যের জন্য আসত। কাউকে পানি খাওয়াতাম, কাউকে চিকিৎসা দিতাম। ঈশ্বরদী যাওয়ার পথে অনেকেই এখানে আসত। একবার একটা রেলগাড়ি রেখে পাকি আর্মি রাস্তা বন্ধ করে দেয়, যাতে কেউ এ পথ দিয়ে না যেতে পারে। তারপর প্লেন থেকে বোমা ফেলে। এতে স্টেশনের কাছে আশ্রয় নেওয়া অনেক রিকশাওয়ালা মারা যায়। আর যারা আহত হন, তাদের অনেকেই আসেন চিকিৎসার জন্য। আমরা আমাদের সাধ্যমত তাদের চিকিৎসা সেবা দিয়েছি। এদের মধ্যে যারা বেশি অসুস্থ ছিল, তাদেরকে গাড়িতে করে নাটোরে পাঠাই। কিন্তু পরে তারা সেখানে মারা যায়। আমরা সে সময় খুব বেশি কিছু জানতে পারতাম না। কারণ কোন খবরাখবর আমাদের কাছে আসত না। আমাদের কথা বলা নিষেধ ছিল। যেদিন পাকিস্তানি আর্মি ঈশ্বরদী দিক থেকে এখানে আসে, সেদিন অনেক বাড়িঘর পুড়িয়ে দেয়। ফাদার পিনোস আশ্রিতদের বললেন, তোমরা পিছনের ঘরে থাক। বোমা বা আঘাত এলে যাতে তারা রক্ষা পায়, সে জন্য তিনি এটা বলেছিলেন। তবে সে সময় এখান থেকে আমরা দূর দূরান্তে আগুনের লেলিহান শিখা দেখতে পেতাম।

আমাদের এখানে আশেপাশে থেকে সাধারণ নিরীহ মানুষরা ক্রুশ নেওয়ার জন্যও আসত। কারণ তারা মনে করত, খ্রিস্টান সেজে থাকলে রক্ষা পাওয়া যাবে। কিন্তু পাকিস্তানিরা এতই পাষণ্ড ছিল যে, তারা কাউকেই ছাড়ত না। আমরা তাদের যতটা পারতাম ক্রুশ দিতাম, সাহায্য করতাম এই ভেবে যে একই ধর্মের না হোক, তারা আমাদের ভাই। তাদের রক্ষা করাই তো আমাদের ধর্ম। আমরা যে এখানে শুধু খ্রিস্টানদের জন্য আছি, এটা কিন্তু ঠিক নয়। আমরা সব ধর্মের লোকের জন্যই এখানে আছি। আমরা সবার সেবা করব। যত লোক সাহায্য পেতে চায়, তত লোককে সাহায্য করব। কিন্তু পাকিস্তানি আর্মির কবল থেকে আমরা নিরীহ বাঙালিদেরকে খুব কমই রক্ষা করতে পেরেছিলাম।

প্রত্যক্ষদর্শী মীনা রানী প্রামাণিক বলেন, আমার স্বামী ধীরেন্দ্রনাথ প্রামাণিক যুদ্ধের প্রথম দিকেই বাড়ি ছেড়ে চলে যান। অবস্থা আরো খারাপ হতে থাকলে আমি আমার পরিবারের আট জন মহিলা ও ছয়জন পুরুষসহ বনপাড়া মিশনে গিয়ে আশ্রয় নিই। মীনা রানী জানান, বাড়ি ছেড়ে এর আগে আমরা যেখানেই আশ্রয় নিয়েছি, সেখানেই পাকিস্তানিদের অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছি। আমাদের সবকিছু লুটপাট হয়ে গিয়েছিল। তখন অনেকেই বলল মিশনে যাও, সেখানে সবাইকে আশ্রয় দেওয়া হচ্ছে। আমার সাথে ছিল সন্ধ্যা নামে আমার এক যুবতী ননদ ও আসন্ন প্রসবা ননদ কল্যাণী। উপায়ান্তর না দেখে শেষে মিশনেই গেলাম আমরা। মিশনে যাওয়ার পর কল্যাণীর মেয়ের জন্ম হয়। তবে মিশনেও হামলার আশঙ্কা ছিল। আমার শ্বশুর গঙ্গাচরণ প্রামাণিক ঠিক করেছিলেন, পরিবার নিয়ে ভারতে চলে যাবেন। ভারতে যাওয়ার আগের দিন বেলা তিনটার দিকে মিশনে হামলা করে খান সেনারা। বেছে বেছে জোয়ান পুরুষদের এক জায়গায় জড়ো করে তারা। মহিলা এবং অন্যদেরকে

www.pathagar.com

গোডাউনে আলাদা করে রাখা হয়। সে সময় আমাদের ভীষণ দুশ্চিন্তা হচ্ছিল সন্ধ্যাকে নিয়ে। তাকে বিছানার ওপর শুইয়ে কাঁথা বালিশ চাপা দিয়ে আমরা তার ওপর বসে পড়ি। পুরুষদের তখন লাইন করে বসানো হয়েছে। সেখানেই গুলি করতে চাচ্ছিল তারা। ফাদার বললেন, এখানে মারতে পারবে না। তখন পাকিস্তানিরা বলে, এদের নিয়ে কাজ দেব। এই বলে সবাইকে ট্রাকে তুলতে শুরু করে। আমার তিন দেবর নৃপেন, রবি, হীরেনসহ শ্বশুর এবং তায়োই নিবারণ বাগচিকে আর্মি ট্রাকে তোলে। ট্রাকে তোলার সময় আমার শ্বশুর খুব কান্নাকাটি করছিলেন। তাঁকে যা বুড়ো বলে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দেয় হানাদাররা।

আমরা কয়েক শ' মানুষ তখন ওই গোডাউন ঘরে বন্দী। এসময় ঘরের দরজায় ফাদার ও তাঁর লোকজন দাঁড়িয়ে থাকেন যাতে মেয়েদেরকে অন্তত না নিয়ে যেতে পারে আর্মি। তারপর নববিবাহিতা এক মেয়েকে ধরে ফেলে খান সেনারা। আমিসহ অনেক মহিলারই গলায় তখন সিস্টারদের দেওয়া ক্রুশ ঝোলানো। সবাইকে ধারার পর সন্ধ্যার দিকে মিশন ত্যাগ করে পাকি আর্মি ও তাদের সাঙ্গপাঙ্গরা।

আবুল কালাম আজাদ বলেন, চৌঠা এপ্রিল মাগরিবের পর ট্রাকের আওয়াজ শোনার একটু পরেই গোলাগুলি শুরু হয়ে যায়। ঘন্টাখানেক পর শব্দ থেমে গেলে আমরা বাড়ির বাইরে আসি। বাইরে এসে মানুষের চাপা গোঙানি আর পানির জন্য হাহাকার করতে শুনি। সেদিন সন্ধ্যার আগে হাফেজ আবদুর রহমান ও কয়েকজন পাকি সেনা এসে কিছু লোক ধরে নিয়ে যায়। তারা মৃত মানুষের স্তূপ দেখিয়ে বলে, এসব লাশ দাফন না করলে আমাদের গ্রামের ক্ষতি হবে। গ্রামের অনেকেই সে রাতে শোলায় আগুন জ্বালিয়ে পথ দেখে ঘটনাস্থলে আসেন। রাত প্রায় ন'টা দশটা হবে তখন। মহিলাদের বলা হল পানি খাওয়াতে। কলসে করে পানি এনে যাঁর মুখেই দেওয়া হচ্ছিল, তিনিই নিস্তেজ হয়ে পড়ে যাচ্ছিলেন। নিস্তেজ হয়ে যাওয়ার পর তাঁদের নিথর দেহগুলো ধানের আঁটি পালা দেওয়ার মত করে এক জায়গায় জড়ো করে রাখতে লাগলাম। এরপর সকালে কোনমতে কয়েক ঝুড়ি মাটি দিয়ে লাশগুলো চাপা দিয়ে দিই। প্রতিদিন সকালেই মাটি দিতে হত। শেয়াল কুকুরের টানাহ্যাঁচড়ায় লাশগুলো বেরিয়ে পড়ত। নিহতদের মধ্যে বনপাড়া মিশনের লোক ছাড়াও অন্য লোক ছিলেন। ছাতিমতলায় এই ঘটনার পরও এখানে দু'দফায় পাকি আর্মি পাঁচ সাতজন করে মানুষ হত্যা করে।

নাটোরের লালপুর থানায় অবস্থিত গোপালপুর উত্তরবঙ্গ চিনিকল চত্বরের পুকুরের সামনে দাঁড় করিয়ে চিনিকলের জেনারেল ম্যানেজার আনোয়ারুল আজিমসহ পঞ্চাশ জন কর্মকর্তা কর্মচারীকে গুলি করে হত্যা করে পাকি সেনারা। ঘটনাস্থলে নিহত হন ছেচল্লিশ জন নিরীহ বাঙালি। এ প্রসঙ্গে মিসেস আজিম বাহাত্তর সালের ছাব্বিশে ফেব্রুয়ারি দৈনিক বাংলায় প্রদত্ত এক সাক্ষাৎকারে বলেন, একাত্তরের পাঁচই মে গোপালপুর উত্তরবঙ্গ চিনিকলে আমার স্বামীসহ ছেচল্লিশজনকে পাকি আর্মি হত্যা

www.pathagar.com

করে। এই হত্যাকাণ্ডের সাথে জড়িত ছিল মেজর শেরওয়ানী, ক্যাপ্টেন মোখতার ও মেজর উইলিয়াম। মিসেস শামসুন্নাহার আজিম বলেন, কেবল আমার স্বামীকে নয়, আরও তিন শ' নিরপরাধ বাঙালিকে হত্যা করে তারা এখানকার পুকুরে ফেলে দেয়।

মেজর নিসার আহমেদ খান শেরওয়ানী, মেজর উইলিয়াম, ক্যাপ্টেন মোখতার ও তাদের সহযোগীরা নাটোর জেলায় সংঘটিত সকল গণহত্যা, ধর্ষণ, লুটপাট, অগ্নিসংযোগ ও ধ্বংসাত্মক কর্মকাণ্ডের জন্য দায়ী।

আসামী ঃ মেজর আখতার, মেজর গুল, মেজর ফতেখান ও সরফরাজ খান।

অপরাধের ধরনঃ গণহত্যা, জাতিগত নিধন, নারী শিশু হত্যা, ধর্ষণ, লুটপাট, অগ্নিসংযোগ।

সাক্ষীঃ হাবিলদার আব্দুল মান্না-বীরবিক্রম, গোবিন্দচন্দ্র দাস, প্রদীপ কুমার আগরওয়ালা, বিনোদ কুমার আগরওয়ালা।

ঘটনাকালঃ চব্বিশে মার্চ একাত্তর থেকে মুক্তিযুদ্ধের পরবর্তী সময় পর্যন্ত।

ঘটনাস্থল ঃ সৈয়দপুর শহর ও তার আশপাশ।

সূত্রঃ যুদ্ধাপরাধ গণহত্যা ও বিচারের অন্বেষণ এবং WCFFC গবেষণা।

মেজর আক্তার পাঞ্জাবি অফিসার ছিলেন। তৃতীয় ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের দায়িত্ব ছিল তার ওপর। একত্রিশে মার্চ গভীর রাতে সৈয়দপুর ক্যান্টনমেন্টস্থ বেঙ্গল রেজিমেন্টের ওপর তার নেতৃত্বে হামলা চালানো হয়। এই হামলায় সেখানকার পাঁচটি কোম্পানির প্রায় সাড়ে সাত শ' সৈনিকের মধ্যে আড়াই শ' নিহত হন। পাকি সৈন্যরা ক্যান্টনমেন্টের পেছন দিক থেকে কোন রকমে ভারতে পালিয়ে যেতে সক্ষম হন। পাকিস্তানি সেনাবাহিনী চব্বিশে মার্চ সৈয়দপুরের বহু রাজনৈতিক কর্মী, নেতা, সমাজকর্মী, ব্যবসায়ীকে গ্রেফতার করে সেনানিবাসে আটকে রাখে। পাকিস্তানি বাহিনী প্রাদেশিক পরিষদ সদস্য ও স্থানীয় আওয়ামী লীগ নেতা ডা. জিকরুল হক, তুলসীরাম আগরওয়ালা, ডা. শামসুল হক, ডা. বদিউজ্জামান, ডা. ইয়াকুব আলী, যমুনা প্রসাদসহ ১৫০ জনকে গ্রেফতার করে, সৈয়দপুর সেনানিবাসে নিয়ে যায়। উনিশ দিন ধরে নির্মম নির্যাতন চালানোর পর এপ্রিলের বারো তারিখে সেনানিবাসের উপশহরে তাঁদেরকে গুলি করে হত্যা করে। পয়লা এপ্রিল হত্যা করা হয় প্রকৌশলী ফজলুর রহমান এবং তাঁর ভাই এমবিবিএস প্রথম বর্ষের ছাত্র রফিকুল ইসলাম, এসএসসি পরীক্ষার্থী ভাগ্নে আনোয়ার হোসেন ও মালী রুহুল আমিনকে। এ ছাড়া এপ্রিলের পনেরো তারিখে শহরের পাড়ায় পাড়ায় হামলা করে উল্লিখিত পাকি আর্মি ও তাদের সহযোগীরা গণহত্যা চালায়। তারা সৈয়দপুর রেলওয়ে কারখানার বাঙালি

www.pathagar.com

শ্রমিকদেরকে ধরে উত্তপ্ত বয়লারে নিক্ষেপ করে হত্যা করে। মেজর আক্তার ও তার সহযোগীরা এই গণহত্যার নেতৃত্ব দেয়।

একাত্তরের তেরোই জুন সৈয়দপুরের বৃহত্তম গণহত্যাটি চালানো হয়। শহরে আটকে পড়া মাড়োয়ারী হিন্দু সম্প্রদায়ের পরিবারকে ভারতে পৌঁছে দেওয়ার নাম করে ট্রেনে তুলে সৈয়দপুর রেল কারখানার শেষ সীমানার গোলাহাট নামক স্থানে নিয়ে চার শ' তেরো জন নরনারী ও শিশুকে নির্মমভাবে হত্যা করা হয়। প্রত্যক্ষদর্শী বিনোদ কুমার জানান, গোলাহাট হত্যাকাণ্ডের পূর্বে রেল স্টেশনে যেসব মহিলা ও কিশোরীদেরকে ধরে আনা হয়েছিল, তাদের প্রত্যেককে ধর্ষণের পর হত্যা করা হয়। এই সকল হত্যাকাণ্ড, ধর্ষণ, লুটতরাজ, অগ্নিসংযোগ ও অরাজকতার জন্য মেজর আখতার, মেজর গুল, মেজর ফতেখান ও সরফরাজ খানই দায়ী। তাদের নেতৃত্বেই সৈয়দপুরে এইসব নৃশংস ঘটনা সংঘটিত হয়। এ সংক্রান্ত ফরেনসিক এভিডেন্সও রয়েছে।

আসামী ঃ ব্রিগেডিয়ার সলিমুল্লাহ

অপরাধের ধরন ঃ গণহত্যা, জাতিগত নিধন, ধর্ষণ, লুটপাট, অগ্নিসংযোগ

সাক্ষী ঃ লে. কর্নেল (অবঃ) এস আই এম নূরন্নবী খানঃ বীর বিক্রমঃ মুক্তিযোদ্ধা।

ঘটনাকালঃ পঁচিশে মার্চ থেকে মুক্তিযুদ্ধের পরবর্তী সময় পর্যন্ত।

ঘটনাস্থল ঃ ছাতক শহর ও তার আশপাশ এলাকা।

সূত্রঃ প্রথম আলো, ১৪ ডিসেম্বর ২০০৩।

ছাতক শহর থেকে পঁয়ত্রিশ মাইল পূর্ব-দক্ষিণে অবস্থিত সিলেট শহর। এই শহরেই ছিল দখলদার পাকি বাহিনীর একটি ব্রিগেডের হেডকোয়ার্টার। ২০২ সংখ্যক এই ব্রিগেডটির কমান্ডার ছিলেন ব্রিগেডিয়ার সলিমুল্লাহ। তার নির্দেশেই ছাতক শহরে নির্মম গণহত্যা, ধর্ষণ, নির্যাতন ও লুণ্ঠন চলে। ছাতক সিমেন্ট ফ্যাক্টরি ও শহরে একত্রিশ পাঞ্জাব রেজিমেন্টের এক কোম্পানি সৈন্য ছিল।

তাদের নেতৃত্বে এবং ব্রিগেডিয়ার সলিমুল্লাহর নির্দেশে ছাতক শহর ও তার আশপাশের এলাকায় হত্যা, ধর্ষণ ও লুটপাট চালানো হয়। ছাতক শহরের কিশোরী, যুবতী থেকে শুরু করে অনেক নারীই তাঁদের সম্ভ্রম হারান। সবচেয়ে বেশি নির্যাতিত হয় ছাতক শহরে বসবাসকারী হিন্দু পরিবারগুলো। বেশিরভাগ হিন্দু শরণার্থী হয়ে ভারতে চলে যান। যারা ভারতে যেতে পারেনি, তারাই হানাদারদের কবলে পড়েন। হত্যা ও ধর্ষণ করেই পাকিস্তানি সৈন্যরা ক্ষান্ত হয়নি। তারা হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে সকলের বাড়িঘরেও লুটপাট চালিয়ে আগুনে পুড়িয়ে দেয়। যে সব নারীকে হত্যা করা হয়, তাদেরকে হত্যার আগে ধর্ষণ করা হয়। ধর্ষণ ব্যতিরেকে কোন নারীকেই তারা

www.pathagar.com

হত্যা করেনি। ছাতক শহর ও তার আশপাশের এলাকার এই সকল হত্যা, ধর্ষণ ও নির্যাতনের জন্য ব্রিগেডিয়ার সলিমুল্লাহ ও তার অনুগত বাহিনী দায়ী।

আসামী ঃ পাঞ্জাব রেজিমেন্টের মেজর মাহমুদ, বেলুচ রেজিমেন্টের মেজর আফজাল, লে. নেওয়াজ রিজভী, ২৯ ক্যাভালরির মেজর তহসীন মির্জা, মেজর শের খান, মেজর খোক্‌কার ।

অপরাধের ধরণঃ গণহত্যা, জাতিগত নিধন, ধর্ষণ, লুটপাট, অগ্নিসংযোগ

সাক্ষী ঃ ভবেশচন্দ্র দেব, ডা. প্রদীপ কুমার কর্মকার, রামকৃষ্ণ রায়,

গৌতম চন্দ্র মোদক (আনসার ভিডিপি কর্মকর্তা, ফুলছড়ি)।

ঘটনাকালঃ সতেরো এপ্রিল একাত্তর থেকে মুক্তিযুদ্ধের শেষ সময় পর্যন্ত।

ঘটনাস্থল ঃ গাইবান্ধা জেলা ও তার আশপাশ এলাকা।

সূত্রঃ যুদ্ধাপরাধ গণহত্যা ও বিচারের অন্বেষণ এবং WCFFC গবেষণা।

গাইবান্ধায় পাকি বাহিনীর হত্যাকাণ্ডের মূল স্থান ছিল হেলাল পার্ক ও কফিল শাহ্‌ গোডাউন নামে একটি পরিত্যক্ত জায়গা। মূলত এটাই ছিল নির্যাতন ক্যাম্প। বিভিন্ন এলাকা থেকে মেয়েদের ধরে আনা হত এখানে। তারপর পাশবিক অত্যাচার চালিয়ে হত্যা করা হত তাঁদের। প্রত্যক্ষদর্শী রফিকুল ইসলাম খোকন জানান, পাকি বাহিনীর এসব হত্যাকাণ্ডের নেতৃত্ব দিত **মেজর খোক্‌কার ও মেজর তহসীন মির্জা**। হেলাল পার্কে প্রতিদিন গুলির আওয়াজ শোনা যেত। মূলত ওই সময় সাধারণ মানুষ ওই এলাকায় যেতে সাহস পেত না। স্বাধীনতার পর তিনি গোডাউনের ভেতরে চাপা দেওয়া মেয়েদের হাত দেখতে পেয়েছেন। এ ছাড়া ছড়ানো ছিটানো ছিল মেয়েদের পোশাক পরিচ্ছদ। ছাদের রডে ঝুলে থাকতে দেখেছেন মেয়েদের শাড়ি, হাত। এভাবে মেয়েরা হয়ত নির্যাতন সহ্য করতে না পেরে আত্মহত্যা করেছেন কিংবা গলায় ফাঁস দিয়ে হত্যা করা হয়েছে তাদের। আরেক প্রত্যক্ষদর্শী খন্দকার মোঃ মুসা জানান, এখনও মানুষের মধ্যে ওই এলাকাটি সম্পর্কে আতঙ্ক রয়েছে। পরিত্যক্ত অবস্থায় পড়ে আছে বিশাল এলাকাটি। এমনকি এর মালিকরাও এর ওপর তেমন কিছু করতে সাহস পাননি।

অন্য প্রত্যক্ষদর্শী মুক্তিযোদ্ধা গৌতম চন্দ্র মোদক বলেছেন, গাইবান্ধা জেলার ফুলছড়িতে পাকিস্তানি আর্মি ভয়ঙ্কর গণহত্যা, ধর্ষণ, নির্যাতন ও তাণ্ডব চালায়। এই সব অপকর্মের অন্যতম হোতা ছিল **মেজর শের খান**।

পাকি আর্মির কাছ থেকে সৌভাগ্যক্রমে বেঁচে যান স্থানীয় কলেজ ছাত্র শাহীন। বন্দী থাকা অবস্থায় তিনি মারাত্মক শরীরিক নির্যাতনের শিকার হয়েছিলেন। তাঁর কাছ

www.pathagar.com

থেকে জানা যায়, গাইবান্ধার ফুলছড়িতে পাকি বাহিনী শত শত নিরীহ বাঙালিকে হত্যা করে। হত্যা করার পর লাশগুলো মাঠে নিয়ে মাটিচাপা দেয়। হেলাল পার্ক বধ্যভূমিতে কত বাঙালিকে যে হত্যা করা হয় তার সঠিক হিসাব কেউ বলতে পারেন না। এই জায়গাতে রেললাইনের পাশে প্রায় তিন-চার শ' শহীদের একটি গণকবর রয়েছে। কফিল শাহ্ গোডাউন চত্বর ছিল পাকি বাহিনীর প্রধান নির্যাতন কেন্দ্র। বিভিন্ন এলাকা থেকে মেয়েদের ধরে এনে ধর্ষণের পর সেখানে হত্যা করা হত। ধর্ষণ শেষে নৃশংসভাবে হত্যা করা হয় পার্শ্ববর্তী গ্রামের ফুলভানু, গিরিবালাসহ বহু মহিলাকে। এছাড়া মেজর শের খান কত নারীর সতীত্ব হরণ করেছে, তার সঠিক পরিসংখ্যান আজও অজানা রয়ে গেছে।

প্রত্যক্ষদর্শী আব্দুর রাজ্জাক জানান, পাকি বাহিনী তাঁর বোনকে জোরপূর্বক কফিল শাহ্ গুদামে ধরে নিয়ে যায়। পাশবিক নির্যাতন চালানোর পর তাঁকে সেখানে নির্মমভাবে হত্যা করে। স্বাধীনতার পর দেখা যায়, গুদামের কক্ষের ইটের ওপর ছড়িয়ে-ছিটিয়ে রয়েছে রক্তের দাগ। কারণ পাকিস্তানি আর্মি অনেককে গুলি না করে ইটের ওপর আছড়ে হত্যা করেছে। গাইবান্ধা জেলার ছোট্ট একটা গ্রাম কাশিয়াবাড়ি। পাকি বাহিনী এই গ্রামের প্রায় সাত শ' লোককে ধরে এনে স্থানীয় স্কুল মাঠে বেয়নেট দিয়ে খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে হত্যা করে।

ভবেশচন্দ্র দেব জানান, গাইবান্ধায় পাকি বাহিনীর প্রথম আক্রমণটা হয়েছিল তাঁদের বাড়িতে। তাঁর কাকা যোগেশকে জীবিত ধরার জন্য তারা দশ হাজার টাকা পুরস্কার ঘোষণা করেছিল। পাকি বাহিনীর হাত থেকে ভবেশ নিজে বেঁচে গেলেও বাঁচাতে পারেননি ছোট ভাই নাদুকে। ভবেশ আরও জানান, গাইবান্ধায় ফিরে এসে কফিল সাহেবের গোডাউনের বধ্যভূমিতে তিনি মেয়েদের অন্তর্বাস ও শাড়ি পড়ে থাকতে দেখেছেন। এ ছাড়া কোনমতে চাপা দেওয়া মাটির নিচ থেকে মেয়েদের হাতও বেরিয়ে থাকতে দেখেছেন তিনি।

ডা. প্রদীপ কুমার কর্মকার বলেন, একাত্তরের চৌদ্দই মে পাকি বাহিনী বাড়ি থেকে তাঁর বাবাকে ধরে নিয়ে যায়। একই সঙ্গে ধরে নিয়ে যায় বিজয় কুমার নামে আরও একজনকে। পঁচিশে মে তাঁর বাবাকে আবার বাড়িতে নিয়ে আসে সম্ভবত টাকা পয়সা বা সোনাদানা হাতিয়ে নেওয়ার জন্য। এরপর আবার তাঁকে স্টেডিয়ামে পাকি বাহিনীর ক্যাম্পে নিয়ে যাওয়া হয়। কিন্তু আর ফিরে আসেননি তিনি। স্বাধীনতার পর নানা স্থানে তাঁর খোঁজ করা হয় তাঁর। স্বাধীনতা সংগ্রামের সময় শান্তি কমিটির চেয়ারম্যান আজিজুর রহমান খন্দকারের কাছে গিয়েও বাবাকে উদ্ধারের চেষ্টা চালিয়েছেন তাঁর পরিবার। দীর্ঘ সাতাশ বছর পর ছাব্বিশে মে তাঁর বাবার অন্তর্ধান দিবস ধরে নিয়ে অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পন্ন করেন তিনি।

রামকৃষ্ণ রায় মাত্র আড়াই বছর আগে জানতে পেরেছেন, পাকি বাহিনীর হাতে তাঁর বাবার নৃশংস মৃত্যুর খবর। স্বাধীনতার তথ্য সংগ্রহ করতে গিয়ে লক্ষ্মীপুরের পাট

www.pathagar.com

ব্যবসায়ী মিসির আলীর সঙ্গে যোগাযোগ হয় তার। তৎকালীন মুসলিম লীগার মিসির আলীসহ একাত্তর সনের বিশে মে পাকি বাহিনী গাইবান্ধা স্টেডিয়াম ক্যাম্পে আরও সাত জনকে আটকে রেখেছিল। স্টেডিয়ামের ড্রেসিং রুমে আটকে রাখা ওই সাত জনের মধ্যে ছিলেন রামকৃষ্ণ রায়ের পিতা ডা. বিজয় কুমার রায়। বিভিন্ন তদ্বির করিয়ে পাকি বাহিনীর হাত থেকে মুক্তি পান মিসির আলী। তিনি বাদে বাকি সাতজনকে রাত সাড়ে এগারোটা নাগাদ গুলি করে হত্যা করা হয় বলে তিনি জানান।

বৃহত্তর গাইবান্ধা জেলায় একাত্তরের পাঞ্জাব রেজিমেন্টের মেজর মাহমুদ, বেলুচ রেজিমেন্টের মেজর আফজাল, লে. নেওয়াজ রিজভী, ২৯ ক্যাভালরির মেজর তহসীন মির্জা, মেজর শের খান ও মেজর খোক্কার উপরক্ত সকল হত্যা, ধর্ষণ ও নির্যাতনের জন্য দায়ী। একাত্তরের সতেরোই এপ্রিল থেকে মুক্তিযুদ্ধ পর্যন্ত গাইবান্ধা জেলায় সংঘটিত সকল অপরাধের সাথে উল্লিখিত আর্মি অফিসার ও তাদের অধীনস্থরা সরাসরি জড়িত।

আসামী ঃ লে. কর্নেল টিক্কা খান, কর্নেল আকবর জং, হাবিলদার খালেক

এবং তার অধীনস্থ পাকিস্তানি আর্মির সদস্যবৃন্দ।

অপরাধের ধরন ঃ গণহত্যা, জাতিগত নিধন, ধর্ষণ, লুটপাট, অগ্নিসংযোগ

সাক্ষী ঃ আব্দুর রহমান, সুবলচন্দ্র পাল, ভাদুরীপাল, সন্তোষ কুমার কর্মকার, পরেশচন্দ্র দত্ত, গাজী আব্দুস সালাম, গাজী শাহ্ আলী সরকার।

ঘটনাকালঃ পঁচিশে এপ্রিল থেকে মুক্তিযুদ্ধের পরবর্তী সময়।

ঘটনাস্থল ঃ সিরাজগঞ্জ জেলার বিভিন্ন এলাকা।

সূত্রঃ যুদ্ধাপরাধ গণহত্যা ও বিচারের অন্বেষণ এবং WCFFC গবেষণা।

এপ্রিলের পঁচিশ তারিখে পাকিস্তানি আর্মি কর্নেল আকবর জং এর নেতৃত্বে সিরাজগঞ্জে প্রবেশ করে। এরপর দীর্ঘ সাত মাস উনিশ দিন পাকিস্তানি কর্নেল আকবর জং-এর নেতৃত্বে সিরাজগঞ্জ জেলার ধীতপুর, পাঙ্গাশী, বিয়াড়াচর, ঘুড়কা, আলোকদিয়া, গান্দাইল, কাজীপুর, হরিণাবাড়ি, কোটচাঁদপুর, মাটিপোড়া, বাগবাটিসহ বিভিন্ন এলাকায় ব্যাপক গণহত্যা, ধর্ষণ, নির্যাতন, অগ্নিসংযোগ ও লুটপাট চালায়। এছাড়া তারা সিরাজগঞ্জ শহরের আটটি ওয়ার্ডের চার হাজার আট শ' তেতাল্লিশটি পরিবারের ওপর ব্যাপক নির্যাতন, ক্ষতিসাধন ও ধ্বংসযজ্ঞ চালায়। পাকিস্তানি বাহিনী এখানকার প্রায় পাঁচ হাজার দোকান ও ঘরবাড়ি সম্পূর্ণ ধ্বংস করে ফেলে। জেলার কাজীপুর থানার এক হাজার দু শ' তিপ্পান্নটি, উল্লাপাড়া থানার সাত হাজার চার শ' চুয়াল্লিশটি, রায়গঞ্জ থানার তিন হাজার ছশ' ছিয়ানব্বইটি, তাড়াশ থানার দু'হাজার অষ্টাশিটি,

www.pathagar.com

বেলকুচি থানার ছ'শ' পঞ্চান্নটি, চৌহালী থানার ন'শ' সাতচল্লিশটি এবং সিরাজগঞ্জ সদর থানার ছ' হাজার চার শ' আটটি বাড়ি ঘর পাকিস্তানি আর্মি মাটির সাথে মিশিয়ে দেয়। সেইসঙ্গে হত্যা করে হাজার হাজার নিরীহ বাঙালি জনসাধারণকে। ধর্ষণে জর্জরিত করে হত্যা করে আরও কয়েক হাজার কিশোরী ও যুবতী নারীকে।

১. বিয়াড়াচর গ্রামের সাক্ষী আব্দুল রহমান বলেন, 'পাকিস্তানি আর্মি আমাদের গ্রামে এসে বিভিন্ন সময় ষাট সত্তরটি বাড়ি আগুন লাগিয়ে পুড়িয়ে দেয়। চার পাঁচশ' নিরীহ লোককে নির্মমভাবে হত্যা করে। ধর্ষণ ও লুটপাট চালিয়ে তারা আমাদের স্বাভাবিক জীবনকে ধ্বংস করে দেয়। এখানে নারী নির্যাতনের অনেক ঘটনা ঘটেছে। কিন্তু আত্মসম্মানের ভয়ে মানুষ এখন আর সেগুলো বলতে চায় না। স্থানীয় চৌকিদারের মেয়েকে পাকিস্তানি আর্মি থানা থেকে এক মাইল দূরে ধরে নিয়ে যায়। মেয়েটি তখন গর্ভবতী ছিল। কিন্তু পাকিস্তানি আর্মির ভয়ঙ্কর পাশবিক নির্যাতন থেকে সেও নিস্তার পায়নি। নির্যাতনের তিন দিনের মধ্যেই মেয়েটি মারা যায়। এটা আমার নিজের চোখে দেখা। আরও তিনজন ধর্ষিতা নারী এখনও জীবিত আছেন। কিন্তু তাদের নাম এখন আমি বলতে চাচ্ছি না। আমাদের এখানকার শত শত নারী পাকিস্তানি আর্মি কর্তৃক পাশবিক নির্যাতনের শিকার হন।'

২. প্রত্যক্ষদর্শী সুবলচন্দ্র পাল বলেন, 'একাত্তর সনে পাকিস্তানি আর্মি আমাদের এখানে পনেরো জনকে গুলি করে হত্যা করে। এঁদের অধিকাংশই আমার আত্মীয় ছিলেন। সেদিন ছিল মঙ্গলবার, সঠিক তারিখটা এখন আমার মনে নেই। আমাদের এখানে বাদশার বাবা, মনু মুন্সিসহ আরও অনেক রাজাকার ছিল। সৎকার না করে যে পাঁচ জনের লাশ আমি সেদিন কুয়োর মধ্যে ফেলেছিলাম, তাঁরা হলেন– মন্টু পাল (৪০), সূর্যকান্ত পাল (৪০), গৌরচন্দ্র কর্মকার (৬৫), যুধিষ্ঠির চন্দ্র পাল (৫৪), মদন চন্দ্র সাহা (৫৫)। নিহত অন্য দশজন হলেন, নিবারণচন্দ্র পাল (৬০), সাধুচন্দ্র পাল, নরেনচন্দ্র তাম্বুলী, সুনীল ঠাকুর (১৮), কুটু তাম্বলী (২২), যতীন হাওলাদার, মঙ্গল খাঁ (৪৫), হুন্ডি খাঁ, খোদা বক্সের ছেলে ও শম্ভু সাহা।'

৩. ভাদুরীচন্দ্র পালও সে রাতে বাগবাটি গ্রামের নিজ বাড়িতে ঘুমিয়ে ছিলেন। পাকিস্তানি আর্মি রাতের অন্ধকারে গ্রামে ঢুকে নিরীহ গ্রামবাসীর ওপর এলোপাথাড়ি গুলিবর্ষণ শুরু করে। এতে ভাদুরীচন্দ্র পালের বাবাসহ চার জন নিহত হন। তিনি বলেন, 'পাকি আর্মি আমাদের বাড়ির দিকে আসতে থাকলে আমি বাবাকে বললাম 'বাবা, তুমি এখানও বসে আছ? এদিকে তো আর্মি এসে গেছে। তোমাকে তো ওরা মেরে ফেলবে।' বাবা বললেন, 'আমি বুড়ো মানুষ, আমাকে মারবে না। তোমরা পালিয়ে যাও।' আমি তখন পালানোর জন্য কিছু জামা কাপড় ব্যাগে ঢোকাচ্ছিলাম। এমন সময় তারা গুলি করতে করতে আমাদের বাড়ির দিকে এল। এ সময় আমি ব্যাগ ফেলে দৌড়ে বাঁশঝাড়ে গিয়ে লুকাই। সেখান থেকে পাকিস্তানি আর্মির ধ্বংসযজ্ঞ প্রত্যক্ষ করা যাচ্ছিল। আমি দেখলাম, তারা আমার বাবাকে ধরে হাত বেঁধে বন্দুক

www.pathagar.com

দিয়ে দুটো বাড়ি মারল। তারপর বাবাকে তাদের ট্রাকের পেছনে নিয়ে গুলি করে হত্যা করল। এ সময় তারা আমাদের বাড়িঘর গাছপালায় আগুন লাগিয়ে দেয়। গাছপালা আগুনে পুড়ে আমার গায়ে ঝরে ঝরে পড়তে লাগল।

এই অবস্থায় সেখানে থাকা নিরাপদ মনে হল না। বাঁশঝাড়ের পাশে শিয়ালের একটা গর্ত দেখতে পেলাম। ভাবলাম শিয়ালের এই গর্তে ঢুকে প্রাণ বাঁচাতে হবে। কিন্তু দু'পা ঢোকাতেই গর্তের মধ্যে আটকে গেলাম। ওই গর্তের ভেতর তখন শিয়াল ছিল। প্রায় দু'ঘন্টার ও বেশি সময় ধরে আমি সেই গর্তের ভেতরে ছিলাম। এমন সময় আর্মির বাঁশির আওয়াজ শুনে বুঝলাম, তারা চলে গেছে। এরপর অনেক কষ্টে গর্ত থেকে বেরিয়ে বাড়ির দিকে গেলাম। আমার শরীরের অনেক জায়গা সে সময় ছুলে গিয়েছিল। বাড়িতে এসে এক হৃদয়বিদারক দৃশ্য দেখলাম তাতে নিজের শরীরের দিকে খেয়াল করার সুযোগ ছিল না। দেখি আমার বাবা, চাচা, ভাই সবাই মাটিতে মৃত অবস্থায় পড়ে আছেন। তারা আমার চাচা ও জ্যাঠার মাথায় গুলি করে। তাঁদের মাথা থেকে ঘিলু বের হয়ে মাটিতে বিক্ষিপ্তভাবে পড়েছিল। আমার ভাইয়েরও মাথায় গুলি করা হয়। এদিন আমার পরিবারের যে চার জন সদস্যকে পাকি আর্মি গুলি করে হত্যা করেছিল তাঁদের নাম হল সূর্যকান্ত পাল, যুধিষ্ঠির পাল, মন্টু চন্দ্র পাল ও গৌরচন্দ্র কর্মকার।

৪. সন্তোষ কুমার কর্মকার পাকিস্তানি আর্মির নিষ্ঠুর হত্যাযজ্ঞের বর্ণনা দিতে গিয়ে বলেন, 'আর্মি কোন এক শীতের ভোরে এই গ্রামে আসে। তখন চারদিক ছিল কুয়াশায় ঢাকা। তারা এখানে গাড়িতে করে এসেছিল। আর্মি এসে গেছে শুনেই আমি ছুটে গিয়ে গ্রামের লোকজনদেরকে জানিয়ে দিলাম। আর্মি আসার খবর শুনে চারদিকে তখন ছুটোছুটি শুরু হয়ে গেছে। হাতের কাছে যে যতটুকু জিনিস পায়, তাই নিয়ে ছুটতে থাকে। এই অবস্থায় জীবনের ভয়ে একজন তার দু'বছরের শিশুকে ফেলে পালিয়ে যায়। শিশুটা মাটিতে পড়ে কাঁদছিল। হয়ত কোন মা তার অন্য সন্তানদের কোলে তুলে নিয়ে যেতে পেরেছেন, কিন্তু সেই শিশুটিকে আর নিয়ে যেতে পারেননি। আমি দেখলাম, এই ছুটোছুটির মধ্যেই একজন ওই শিশুটিকে কোলে তুলে নিল। তখন আর্মিরা গুলি করতে শুরু করেছে। ওরা জঙ্গলের ভেতর থেকে গুলি করছিল। আমরা এ সময় দক্ষিণ দিকে পালাচ্ছিলাম। তাকিয়ে দেখি চারদিকে প্রাণ বাঁচানোর জন্য মানুষ ছুটছে। আর্মি যেদিকে যায়, আমরাও সেভাবে দিক পরিবর্তন করে উল্টোদিকে যাই। এভাবে আর্মি ছোটে, আমরাও ছুটি। ছুটতে ছুটতে আমি বহুদূরে চলে গেলাম। দূর থেকে দেখতে পাই গ্রাম থেকে কুন্ডলী পাকিয়ে ধোঁয়া বের হচ্ছে। তারা সমস্ত গ্রাম জ্বালিয়ে দিয়েছিল। আকাশে যুদ্ধ বিমানও দেখা যাচ্ছিল। দুপুর পর্যন্ত আমরা সবাই আত্মীয়-স্বজনদের খুঁজতে থাকি। পরদিন গ্রামে ফিরে দেখি, আগের সেই গ্রাম আর নেই। পুরো গ্রামই আর্মি জ্বালিয়ে দিয়েছে। বাড়িঘরের কিছুই আর অবশিষ্ট ছিল না। এদিন আমার আত্মীয়দের মধ্যে দু'জন আর্মির গুলিতে

www.pathagar.com

মারা যান। এরকমভাবেই পাকিস্তানি আর্মি নিরীহ জনগণের ওপর নির্বিচারে গণহত্যা চালিয়েছিল।

৫. প্রত্যক্ষদর্শী পরেশ চন্দ্র দত্ত বলেন, সেদিনের ঘটনার পর বাড়ি ফিরে দেখি আর্মি আমাদের গ্রাম আগুন দিয়ে পুড়িয়ে দিয়েছে। দু' একটা বাড়ি তখনও পুড়ছিল। ১৯৭২ সনে মুক্তিবাহিনীর কিছু লোক এ গ্রামের নিহত লোকদের একটা তালিকা তৈরি করেন। ওই তালিকা থেকে জানা যায়, হরিণা ও বাগবাটিতে এক শ' ত্রিশজন লোক পাকিবাহিনীর হাতে প্রাণ হারিয়েছেন।

৬. গাজী আব্দুস সালাম তার গ্রামে পাকি বাহিনীর নৃশংস গণহত্যার বর্ণনা দিতে গিয়ে বলেন, 'আর্মি যখন এই গ্রামে আসে, তখন শ্রাবণ মাস ছিল। তারা সরাসরি এই গ্রামে এসে উপস্থিত হয়নি। প্রথমে সিরাজগঞ্জ থেকে গান্দাইল আসে। সেখানকার সাব রেজিস্ট্রার, পোস্টমাস্টার ও একজন ব্যবসায়ীসহ মোট চার জনকে ধরে সীমান্ত বাজারে নিয়ে গুলি করে হত্যা করে। এঁদের মধ্যে একজন হিন্দু সাব-রেজিস্ট্রার ছিলেন। তাঁকে তাঁর বাড়ির ভেতরে ফেলেই হানাদাররা গুলি করে হত্যা করে। সেদিন তারা কাজীপুরে পাঁচ সাত জনকে হত্যা করে। ওই হত্যাকাণ্ডের মধ্য দিয়েই পাকি বাহিনী এই এলকায় তাদের ধ্বংসাত্মক কর্মকাণ্ডের সূচনা করে। এরপর কাজীপুর থেকেই তারা বিভিন্ন এলাকায় অপারেশন চালাত।

সবচেয়ে মর্মান্তিক ঘটনা ঘটে চৌদ্দই নভেম্বর বরইতলা গ্রামে। সেদিন মুক্তিযোদ্ধারা এই গ্রামে আশ্রয় নিয়েছিলেন। কিন্তু সে খবর রাজাকাররা গোপনে জেনে আর্মির কাছে পৌঁছে দেয়। তখন সিরাজগঞ্জ ও কাজীপুর থেকে আর্মি এসে পুরো বরইতলা গ্রাম ঘিরে ফেলে। সে সময় আমি বরইতলা গ্রামে ছিলাম। ওদিকে মুক্তিযোদ্ধারা লুৎফর রহমান দুদুর নেতৃত্বে বিভিন্ন দিক থেকে একত্রিত হয়ে আর্মির ঘিরে ফেলে। এ অবস্থায় বাকি আর্মি পালিয়ে যেতে থাকে এবং কিছু আর্মি বরইতলা মসজিদে ঢুকে মুসল্লিদের মারধর করে বাইরে এনে গুলি করে হত্যা করে। মসজিদে তখন বিশ পঁচিশজন মুসল্লি ছিলেন। এটা রমজানের শেষের দিকের ঘটনা। মুসল্লিরা তখন 'এতেকাফে' বসেছিলেন।

"বরইতলা গ্রাম থেকে এক কি.মি. উত্তরে ঠাকুরগাঁও গ্রামে তারা সাতাশ জনকে গুলি করে হত্যা করে। সে সময় বরইতলা গ্রামটি আর্মি একেবারে পুড়িয়ে দেয়। এই গ্রামে কোন ঘরবাড়ি অবশিষ্ট ছিল না। বরইতলা ও খামারপাড়া এলাকায় অনেক লুটপাটও হয়। আর্মি এখানে দুই শ' জন লোককে গুলি করে হত্যা করে। আব্দুস সালাম আরও জানান, বরইতলা গ্রামে নির্বিচার হত্যা ও ধ্বংসযজ্ঞ চালানোর পর পাকিস্তানি আর্মি গ্রামের মা-বোনদের ওপর পাশবিক নির্যাতন চালায়। কিন্তু এ ব্যাপারে মুখ খুলতে এখন অনেকেই লজ্জাবোধ করেন।

৭. কাজিপুরের অধিবাসী গাজী শাহ্ আলী সরকার পাকিস্তানি আর্মির ভয়ঙ্কর গণহত্যা ও ধর্ষণের আরও কিছু নৃশংস বর্ণনা তুলে ধরেন। ঘটনাটি সিরাজগঞ্জের নয় পার্শ্ববর্তী

www.pathagar.com

কয়েকটি জেলার। তিনি সৈয়দপুর ক্যান্টনমেন্টের একটি ঘটনা উল্লেখ করে বলেন, তেইশে মার্চ বিকেল চারটায় লে.জে. টিক্কা খান তদানিন্তন বাঙালি ক্যাপ্টেন আনোয়ারের কাছ থেকে সেখানকার অস্ত্রাগারের চাবি নিয়ে নেয়। সে সময় টিক্কা খান তাঁর কাছে বলে, "আমি কোরআন ছুঁয়ে শপথ করছি, আপনারা যাঁরা বাঙালি আছেন, তাঁদের কোন ক্ষতি করব না।" তখন তৃতীয় বেঙ্গল রেজিমেন্টের দুই শ' সাতাশ জন সৈনিক সেখানে ছিলেন। এখানে অবস্থিত তৃতীয় ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট তখন পাঞ্জাব ও বেলুচ রেজিমেন্টের অবাঙালি সৈন্যে ভরা ছিল।

"ক্যাপ্টেন আনোয়ার হোসেন তখন সেখানে অবস্থিত বাঙালি সৈন্যদের ডেকে একটা চাইনিজ রাইফেল, পঞ্চাশ রাউন্ড গুলি ও প্রত্যেককে একটি করে হাত বোমা দিয়ে বলেন, 'তোমরা সাবধানে থেকো, এদের বিশ্বাস করা যাবে না। যে কোন সময় এরা আমাদের ওপর আক্রমণ করতে পারে।' রাত তিনটার সময় আমরা বাঙালিরা যে প্লাটুনে ছিলাম, তাঁরা সেই প্লাটুনে আক্রমণ করে। তিনজন বাঙালি সৈন্য সেদিন তাদের হাতে নিহত হয়েছিলেন।

পরে আমরা সেখান থেকে পালিয়ে গরুর গাড়িতে করে কালিগঞ্জ থানার গোড়ল গ্রামে গিয়ে উঠি। পাকি আর্মি তখন লালমনিরহাটের পশ্চিম দিকে গিয়ে বাড়িঘরে আগুন দিচ্ছিল এবং রাজাকারদের দিয়ে গ্রামের যুবতী মেয়েদের ধরে নিয়ে পাশবিক নির্যাতন চালাচ্ছিল। তাদের অত্যাচারে গ্রামের মানুষজন দিশেহারা হয়ে যান। একদিন আমরা দশ বার জন একখানে দাঁড়িয়ে আছি এমন সময় এক মহিলা বিছানাপত্র নিয়ে দৌড়াতে দৌড়াতে আমাদের সামনে এসে মাটিতে পড়ে যান। তিনি আমাদেরকে বলেন, বিছানাপত্রের ভেতরে আমার সন্তান আছে আপনারা দয়া করে তাকে আমার কোলে তুলে দিন। আমরা বিছানাপত্র ঝেড়ে তার ভেতরে শুধু একটা বালিশ পেলাম, সন্তান পেলাম না। পরে জানতে পারলাম, পাকি হানাদাররা তাঁর বাড়িতে আগুন লাগিয়ে দিলে দিশেহারা হয়ে তিনি একটা বালিশকে তাঁর সদ্যপ্রসূত সন্তান ভেবে জড়িয়ে ধরে দৌড়ে পালিয়ে আসেন। পাকিস্তানি বাহিনী ও তাদের দোসররা আমার জানা মতে, লালমনিরহাটের ওই স্থানে তিন শ' পঞ্চাশ জনকে হত্যা করে। যার মধ্যে সতেরোজনকে তারা পুড়িয়ে মারে।

আটই ডিসেম্বরের পর আমরা রংপুরের জাহাজ কোম্পানিতে অবস্থান নিই। সেখানে খবর এল উপশহর ক্যাম্প ব্যারাকগুলোতে যে সব বাঙ্কার পাকিস্তানি আর্মি খুঁড়ে রেখেছিল, সেখানে নারী নির্যাতনের এক ভয়াবহ দৃশ্য উন্মোচিত হয়েছে। মুক্তিযোদ্ধারা আমাকে বলল, 'আপনি ওখানে গিয়ে দেখে আসেন গার্লস স্কুল, গার্লস কলেজ ও জুনিয়র ট্রেনিং কলেজের মেয়েদেরসহ রংপুরে যেসব মেয়ে ছিলেন, তাঁদের কি ভয়াবহ অবস্থা করা হয়েছে'। তিন শ' তেরো জন মেয়েকে পাকি আর্মি সেখানে ধর্ষণ করে হত্যা করেছিল। আমি দু'তিনটা বাঙ্কারে গিয়ে দেখি তাঁদের যৌনাঙ্গ থেকে নাভি পর্যন্ত বেয়নেট দিয়ে কাটা। স্তনগুলো কাটা, গলার টুটি কাটা এবং উলঙ্গ

www.pathagar.com

অবস্থায় ফেলে রাখা। দশ এগারোজনকে এই অবস্থায় দেখার পর অন্যদের দেখার মত মানসিকতা আমার আর ছিল না। বাঙ্কারগুলোর অবস্থান ছিল রংপুর শহরের জুনিয়র ট্রেনিং কলেজের ঘাঘট নদীর পাড় ও কারমাইকেল কলেজের দক্ষিণ পাশ দিয়ে। সে সময় ওই এলাকার পুরোটাই পাকি বাহিনীর ক্যাম্প ছিল। এরপর কোতোয়ালী থানার পাশে এক মহিলাকে উলঙ্গ অবস্থায় গাছের গায়ে দুই হাতে পেরেকবিদ্ধ দেখতে পাই। তাঁরও স্তন কাটা ছিল। এরকম অবস্থায় আরও দু'জন মহিলাকে দেখতে পেলাম। অন্য এক মহিলাকে দেখলাম যাঁর পিঠের নিচে মৃত সন্তান পড়ে আছে।

পাকিস্তানি আর্মি একাত্তর সালে দেশ জুড়ে এরকমই বর্বর জাতিগত নিধন, গণহত্যা ও নির্মম ধর্ষণযজ্ঞ চালিয়েছে। সিরাজগঞ্জ জেলায় কর্নেল আকবর জং-এর নেতৃত্বে এই সব ঘৃণ্যতম অপরাধ সংঘটিত হয়েছে। এই জেলার সকল গণহত্যা, ধর্ষণযজ্ঞ ও ধ্বংসাত্মক অপরাধ সংঘটনের জন্য কর্নেল আকবর জং প্রধানতম আসামী। তার সাথে সাথে সিরাজগঞ্জে অবস্থানকারী পাকি বাহিনীর সকল সিনিয়ার ও জুনিয়র আর্মি অফিসার এবং সৈন্যরা ও এইসব যুদ্ধাপরাধের সাথে জড়িত।

আসামী ঃ কর্নেল বাদশা, কর্নেল হান্নান, সুবেদার মেজর হানিফ, মেজর জাকি, সিপাহী আব্দুর রহিম

অপরাধের ধরনঃ গণহত্যা, জাতিগত নিধন, ধর্ষণ, লুটপাট, অগ্নিসংযোগ।

সাক্ষী ঃ টিএম মুসা ওরফে পেস্তা, সালামতুল্লাহ সরকার, মোঃ আব্দুল বারি, আব্দুল লতিফ সরকার, মোঃ মোজাফফর রহমান।

ঘটনাকালঃ ছাব্বিশ মার্চ থেকে মুক্তিযুদ্ধের সময় পর্যন্ত।

ঘটনাস্থল ঃ বগুড়া শহর ও জেলার বিভিন্ন এলাকা।

সূত্রঃ যুদ্ধাপরাধ গণহত্যা ও বিচারের অন্বেষণ এবং WCFFC গবেষণা।

কর্নেল বাদশা, কর্নেল হান্নান, সুবেদার মেজর হানিফ, সিপাহী আব্দুর রহিম প্রমুখ পাকিস্তানি আর্মি ও তাদের অন্যান্য সহকর্মী বগুড়া জেলা সদরসহ প্রত্যন্ত অঞ্চলে একাত্তরে ব্যাপক গণহত্যা, জাতিগত নিধন, ধর্ষণ, লুটপাট ও ধ্বংসযজ্ঞ চালায়। এই জেলায় অসংখ্য গণকবর রয়েছে। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য, সার্কিট হাউজ, পুলিশ লাইন, রেলওয়ে মাঠ, ওয়াপদা, ভার্জিনিয়া টোব্যাকো কোম্পানি। এ ছাড়া সান্তাহার, জয়পুরহাট, গাবতলী, সোনাতলা, শিবগঞ্জ, ঘোনা, সুখান পুকুর, প্রভৃতি স্থানেও বহু গণকবর ও বধ্যভূমি রয়েছে। পাকিস্তানি আর্মির নারকীয় তাণ্ডবে গ্রামের পর গ্রাম বিলীন হয়ে গেছে। সুখান পুকুরের একটি গ্রাম ঘিরে একসাথে এক শ' দশজন

www.pathagar.com

নিরপরাধ গ্রামবাসীকে মুহূর্তের মধ্যে ব্রাশ ফায়ারে হত্যা করা হয়। ধর্ষণ করা হয় ওই গ্রামের মা-বোনদেরকে। এছাড়াও মাদলা, গোকুল, ঘোনা গ্রামও তাদের ব্যাপক গণহত্যা ও ধ্বংসযজ্ঞ থেকে রেহাই পায়নি।

বগুড়ার তানোর বন্দরে পাকি বাহিনীর ঘাঁটি ছিল। বিভিন্ন স্থান থেকে বাঙালিদের ধরে এনে এখানে হত্যা করা হত। দুর্গাদহ নদীর ধারে মাচান করে তার ওপর দাঁড় করিয়ে তারা গুলি করত, যাতে লাশগুলো পানিতে পড়ে যায়। বগুড়া রেলওয়ের এসডিও বাংলো ছিল বাঙালিদের জবাই করার কসাইখানা। আনন্দ আশ্রমের সুন্দর সাধু, মঙ্গল সাধু, বৃদ্ধ মণীন্দ্রনাথ সরকারকে রেল স্টেশনের পশ্চিমে ডিগ্রী কলেজ সড়কের পাশে গুলি করে হত্যা করা হয়। ছয়ই ডিসেম্বর রাতে বগুড়ার রামশহরে রাজাকার মতিউর রহমান, জাবেদ আলী ও ওসমান মওলানার সহযোগিতায় পাকি বাহিনী একটি পাড়া ঘিরে ফেলে। সেখানে নির্বিচারে গুলি করে হত্যা করা হয় তিন ভাই মোঃ আবদুস সালাম, মোঃ বেলায়েত হোসেন ও খলিলুর রহমানকে। পরিবারের অন্যান্য সদস্য মোঃ জাহেদুর রহমান, দবির উদ্দিন, মোঃ আজগর আলী, মোঃ হাবিবুর রহমান, মোঃ মজিবুর রহমান, মোঃ বুলু মিয়া, মোঃ হায়দার আলী ও মোঃ মোকসেদ আলীকেও গুলি করে হত্যা করা হয়।

মে মাসের শেষ দিকে জয়পুরহাট থেকে পাগল দেওয়ানে এসে ঘাঁটি স্থাপন করে পাকি বাহিনী। এখানে মাজারের পঁচিশ হাত দূরে বধ্যভূমিতে অসংখ্য মানুষকে হত্যা করা হয়। মাজার সংলগ্ন বাঁধানো কূপটিও ছিল লাশে পরিপূর্ণ।

হিন্দু বসতিপ্রধান কড়ই ও কাদিপুর গ্রামে একাত্তর সালের উনিশে এপ্রিল পাকি বাহিনী আকস্মিকভাবে আক্রমণ করে। কর্মব্যস্ত গ্রামবাসী আতঙ্কে ছুটোছুটি শুরু করেন। রাইফেলের মুখে হানাদাররা গ্রামের সকল বয়সের পুরুষদের ডোমপুকুরের পশ্চিম পাড়ে একত্রিত করে। এদিন কড়ই গ্রামের পালপাড়া ও কাদিপুর মিলে তিন শ' একষট্টি জনকে হত্যা করে হানাদাররা। বগুড়ার ভার্জিনিয়া টোব্যাকো কোম্পানির কারখানা চত্বরে আবিষ্কৃত হয় গণকবর। এই গণহত্যার প্রত্যক্ষদর্শী মিলের মসজিদের মোয়াজ্জিন মাজেদ আলী পনেরোই সেপ্টেম্বর ১৯৯৯ -এ 'প্রথম আলো' কে দেয়া সাক্ষাৎকারে এই তথ্য জানান। তিনি বলেন, বিহারি মালিক ও শ্রমিকরা এই মিলের বয়লারে পুড়িয়ে ও করাতে কেটে বাঙালিদের হত্যা করত। তিনি জানান, ডিসেম্বরে হত্যা করা হয় মসজিদের ইমাম হাফেজ হোসেন আহাম্মেদ ও বাঙালি শ্রমিক বাবুলকে।

১. টিএম মুসা ওরফে পেস্তা পাকিস্তানি আর্মির জাতিগত নিধন, গণহত্যা ও ধর্ষণযজ্ঞের বিবরণ দিতে গিয়ে বলেন, ছাব্বিশে মার্চ সকালে পাকিস্তানি আর্মি বগুড়া শহরে ঢুকতে গিয়ে আমার ছোট ভাই টিটু, আজাদ ও ভিখুকে হত্যা করে। তাদের হামলায় অনেকেই আহত হন। এ ছাড়া পাকিবাহিনী চারজনকে এখান থেকে ধরে নিয়ে যায় যাঁরা পরে আর ফিরে আসেননি। এখানে এসে পাকিস্তানি বাহিনী আযীযুল

www.pathagar.com

হক কলেজ ও মজিবর রহমান মহিলা কলেজে আশ্রয় নেয়। পরবর্তীতে তারা বগুড়া শহরে হামলা করে চৌদ্দজনকে ধরে নিয়ে বাবুর পুকুর নাম স্থানে গুলি করে হত্যা করে। স্থানীয় জামিল ফ্যাক্টরিতে নিয়ে বাঙালি তারা বহু হত্যা করেছে।

পাকি আর্মি গাবতলী থানার সুখান পুকুরের কাছে একাধিকবার হামলা চালিয়ে গ্রামের সমস্ত ঘর পুড়িয়ে দেয়। কোন কোন বাড়িতে একাধিকবার আগুন লাগিয়ে পুড়িয়ে দেওয়া হয়। বিভিন্ন ঘরে আগুন লাগিয়ে পাকি আর্মি নদীর অপর পারে বসে সিগারেট টেনেছে আর লক্ষ্য করেছে কখন ঘরগুলো পুড়ে ছাই হয়। আর বাড়ির মালিকরা দেখেছেন তাঁদের অনেক যত্নে গড়া ঘরগুলো কিভাবে আগুনে পুড়ে শেষ হয়ে যাচ্ছে। সুখান পুকুরে বিচ্ছিন্নভাবে আঠাশ জন লোককে গুলি করে হত্যা করা হয়। সুবেদার মেজর হানিফের নেতৃত্বে পাকি বাহিনী সুখান পুকুরে নারকীয় তাণ্ডব চালায়।

তিনি আরও জানান, ফুলবাড়ি, জামিলের গোডাউন, মদলা জেলা স্কুল ও সার্কিট হাউজসহ আরও দু'তিনটা জায়গায় পাকি বাহিনী বাঙালিদের ধরে নিয়ে হত্যা করে। কিন্তু লাশগুলো অন্যত্র সরিয়ে ফেলা হয়। এসব স্থানে নিহত হওয়া দু'শ' সাতষট্টি জনের পরিচয় পাওয়া গেছে। তাঁরা সবাই বগুড়া সদরের সাধারণ নিরীহ জনগণ। বগুড়া সদরে আটচল্লিশ জন শহীদের নাম সংগ্রহ করা হয়েছে। স্থানীয় শহীদ হায়দার কসাই ও জসিম উদ্দীন মুক্তিযোদ্ধা ছিলেন না। এঁদেরকে বাড়ি থেকে ডেকে নিয়ে শেরপুর রোডের পাশে বেয়নেট চার্জ করে হত্যা করা হয়। নারী নির্যাতন সম্পর্কে কথা বলতে তিনি কিছুটা দ্বিধান্বিত হয়ে পড়েন। পরে বলেন, এখানে ব্যাপক নারী নির্যাতন হয়। আমি ব্যক্তিগতভাবে চৌদ্দ জন নারীকে জানি, যাঁরা খুবই সম্ভ্রান্ত পরিবারের ছিলেন। এই মেয়েদের বাবারা স্বাধীনতার পরে আমাদের সামনে কেঁদে কেঁদে বলেছেন, 'আমাদের ব্যথা তোমরা বুঝবেনা'। তিনি আমাদের প্রতিনিধিকে আরও জানান, এই চৌদ্দজন নারীর দু'জন পরবর্তীতে পুরোপুরি পাগল হয়ে যান। বাকিদের জীবনে আর কখনই স্বাভাবিকতা ফিরে আসেনি।

২. সালামতুল্লাহ সরকার বলেন, পাকিস্তানি আর্মি আমার ভাই ফজি শেখসহ আমার আত্মীয়দের মধ্যেই ষোলো জনকে হত্যা করে। আমাদের এলাকায় আর্মি ব্যাপক লুটপাট ও ধর্ষণযজ্ঞ চালায়। আমাদের লাটাই পাড়ার প্রাক্তন আর্মি অফিসার নাজিমের গর্ভবতী স্ত্রীকে ধরে পাকি হানাদাররা পাশবিক নির্যাতন করে। কিছুদিন পর ওই মহিলা মারা যান। পরে নাজিম বগুড়া ক্যান্টনমেন্টে গিয়ে নালিশ করলে সেখানকার এক ক্যাপ্টেন অপরাধী পাকি আর্মিকে শাস্তি দিতে চেয়েছিলেন। কিন্তু উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ সেই ক্যাপ্টেনকে অন্যত্র বদলি করে নাজিমকে হত্যা করার নির্দেশ দেয়। নাজিমকে পাকি আর্মি ধরে নিয়ে গেলে হবিবর ডাক্তার ও গোলাম হোসেনের ভাই অনেক দেন দরবার করে ছাড়িয়ে আনে। তিনি জানান, চেলোপাড়া রেলক্রসিং এর কাছে তাল গাছের গোড়ায় পাকি আর্মি একশ' পঞ্চাশ জনের মত সাধারণ বাঙালিকে হত্যা করে।

৩. বগুড়ার আব্দুল বারী ও আব্দুল জলিল সরকার বলেন, একাত্তরে বগুড়ার অবস্থা ভাল ছিল না। সে সময় বগুড়া শহরের অনেক লোক পাকি সেনাদের হাতে নিহত

www.pathagar.com

হন। ফুলবাড়ি গ্রামে এক লাইনে দাঁড় করিয়ে প্রায় ত্রিশ জন নিরীহ বাঙালিকে পাকি আর্মি গুলি করে হত্যা করে। এঁদের সবাইকে নদীর ধারে দাঁড় করিয়ে গুলি করা হয়। এখানে যে ত্রিশ জনকে গুলি করা হয়, তাঁদের মধ্যে একজন আহত অবস্থায় বেঁচে যান। নিহতদের মধ্যে হুদা খাঁ ও লোকমানের নাম জানা যায়। এই ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী আব্দুল বারী। তিনি পাকি সেনা কর্তৃক এই ত্রিশ জনকে এক লাইনে দাঁড় করিয়ে গুলি করার ঘটনাটি প্রত্যক্ষ করেন। পরে তাঁরা ওই লাশগুলোকে কাঁধে করে সেখান থেকে নিয়ে যান। ফুলবাড়ি উত্তর পাড়ার আযীযুল হক কলেজের পেছনে আমতলা নামক স্থানে একটা গণকবর রয়েছে।

পাকি হানাদাররা বগুড়ায় নারীদের ওপর ব্যাপক পাশবিক নির্যাতন চালায়। তাঁরা বলেন, এলাকার একটি বালিকা বিদ্যালয়ে তাদের ক্যাম্প ছিল। সেখানে তারা মেয়েদের ধরে নিয়ে পাশবিক নির্যাতন চালাতো। তাঁরা আরো জানান, যুদ্ধের শেষ পর্যায়ে বগুড়া মুক্ত হওয়ার পূর্ব মুহূর্তে আমরা যখন ওই ক্যাম্পের দিকে অগ্রসর হই, তখন পাকি সেনারা পেছনে হটে যায়। আমরা তখন পাকি সেনাদের ছেড়ে যাওয়া বাঙ্কারগুলোতে প্রবেশ করে বেয়নেট চার্জ করে হত্যা করা অনেক মেয়েকে দেখতে পাই। এসব মেয়েদের পরনে কোন পোশাক ছিল না। ফুলবাড়িয়ার স্থানীয় এক বাঙ্কারে আমরা দশ পনেরো জন মেয়ের লাশ পাই, যাঁদেরকে পাকি সেনারা ধর্ষণ করে বেয়নেট চার্জ করে হত্যা করে। এ ছাড়াও পাকি সেনারা বাড়িতে বাড়িতে আক্রমণ চালিয়ে বৃদ্ধ, যুবক, শিশু, নারী সবার ওপরেই অত্যাচার চালায় এবং এখানে অবস্থানরত পাকি মেজর, কর্নেলদের মনোরঞ্জনের জন্য মেয়েদের জোরপূর্বক ধরে নিয়ে যায়।

৪. আব্দুল লতিফ সরকার বলেন, একাত্তর সালে পাকিবাহিনী বগুড়া শহরে ব্যাপক হত্যাকান্ড চালায় ও বাড়িঘর পুড়িয়ে দেয়। আমি তখন পূর্বদিকে খামারকান্দি এলাকায় থাকতাম। তবে বগুড়া শহরের সাথে আমার সার্বক্ষণিক যোগাযোগ ছিল।

এ সময় পাকি হানাদাররা মেয়েদের ওপর ব্যাপক নির্যাতন চালিয়েছে। বগুড়া শহরের পূর্ব পাশে বেশ কয়েকজন নারী পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর পাশবিক নির্যাতনের শিকার হন। যে সমস্ত নারী নির্যাতিত হন, তাঁদের মধ্যে লাইলী বেগম এবং আমাদের এলাকার এক পীরের মেয়ে উল্লেখযোগ্য। এই পীরের মেয়েকে এক পাকিস্তানি সৈন্য লোক দেখানো বিয়ে করে পাকিস্তানে নিয়ে যায়। পরে তাঁর আর কোন খোঁজ পাওয়া যায়নি। ওই পাকিস্তানি সৈন্যটির নাম ছিল আব্দুর রহিম। সে পাকি আর্মির একজন সাধারণ সেপাই ছিল। আমার জানা মতে, আমার এলাকায় দশ পনেরো জন নারী নির্যাতিত হয়েছেন।

বগুড়ায় পাকি বাহিনীর যে সমস্ত সদস্য ছিল, তাদের মধ্যে কর্নেল বাদশাহ'র নাম উল্লেখযোগ্য। এই কর্নেল বাদশাহ্ আমাকে উত্তরা সিনেমা হল থেকে ধরে নিয়ে যায়। তখন আমি এসএসসি পরীক্ষার্থী ছিলাম। এই অবস্থায় আমার বন্ধু কাসেম বিহারির পিতা ওসমান বিহারি আমাকে তার কবল থেকে উদ্ধার করে। এ সময় কর্নেল হান্নান নামে একজন পাকি সেনা আড়িয়া বাজার ক্যান্টনমেন্টের প্রধান ছিল।

www.pathagar.com

৫. মোঃ মোজাফ্‌ফর রহমান বলেন, আমি যে মেয়েটিকে সাহায্য করেছিলাম ,তাঁর নাম ছিল লতিফা। তিনি বগুড়া সরকারী আযীযুল হক কলেজের স্নাতক দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্রী ছিলেন। তাঁকে কলেজের হোস্টেল থেকে পাকি বাহিনী ধরে নিয়ে যায়। এরপর তাঁকে আড়িয়া ক্যাম্পে আটকে রাখা হয়। সেখানে তিনি পনেরো বিশ দিন যাবত আটক ছিলেন। প্রথমদিকে তাঁকে অফিসারদের মনোরঞ্জনের জন্য রাখা হলেও পরে সেপাইরাও তাঁর ওপর পাশবিক নির্যাতন চালায়। আমি যখন তাঁকে উদ্ধার করি, তখন তিনি অজ্ঞান অবস্থায় পড়েছিলেন। বীরাঙ্গনা লতিফা জানান, পাকি সেনাদের যখনই ইচ্ছা হত, তখনই তাঁর ওপর পাশবিক নির্যাতন চালাত। আমি ও আমার সাথের মুক্তিযোদ্ধারা তাঁর আটক হওয়ার পঁচিশ দিন পর আর্মি ক্যাম্প আক্রমণ করে তাঁকে উদ্ধার করেছিলাম। যখন আমরা তাঁকে উদ্ধার করি, তখন তাঁর হাত বাঁধা অবস্থায় ছিল। তাঁর গণ্ডদেশ ও স্তনে অসংখ্য কামড়ের চিহ্ন ছিল। উদ্ধার করে প্রথমে আমরা তাঁকে পাশের একটি বাড়িতে রেখেছিলাম। পরবর্তীতে তিনি অন্তঃসত্ত্বা হয়ে পড়েন। লতিফা বেগমের বাড়ি ছিল চাঁপাইনবাবগঞ্জে। তাঁর বর্তমান ঠিকানা আমি জানি না।

প্রত্যক্ষদর্শীদের বিবরণ থেকে সন্দেহাতীতভাবে এটা প্রমাণিত হয় যে, উপরিউক্ত আর্মি অফিসার ও তাদের সহকর্মীরা বগুড়া সদর ও তার আশপাশের এলাকায় ব্যাপক গণহত্যা, ধর্ষণ, লুটপাট, অগ্নিসংযোগ ও ধ্বংসযজ্ঞ চালায়। বগুড়া জেলায় সংঘটিত সকল অপকর্মের সাথে তারা সরাসরি জড়িত ও দায়ী।

আসামী ঃ কর্নেল এস এম ইকবাল, মেজর আজমল, মেজর আফজাল হোসেন, মেজর মোস্তফা।

অপরাধের ধরনঃ গণহত্যা, জাতিগত নিধন, ধর্ষণ, লুটপাট, অগ্নিসংযোগ।

সাক্ষী ঃ মোস্তাফিজুর রহমান, আনিসুর রহমান, আমজাদ হোসেন, অ্যাডভোকেট নন্দকিশোর আগরওয়ালা, মুক্তিযোদ্ধা সিরাজুল ইসলাম, দেওয়ান মোজাম্মেল হক, প্রভাসচন্দ্র মহন্ত, ডা. মোঃ আলতাফ হোসেন, আমিনুল হক বাবুল।

ঘটনাকালঃ একাত্তরের ছাব্বিশ মার্চ থেকে চৌদ্দই ডিসেম্বর পর্যন্ত।

ঘটনাস্থল ঃ জয়পুরহাট শহর ও জেলার বিভিন্ন এলাকা।

সূত্রঃ যুদ্ধাপরাধ গণহত্যা ও বিচারের অন্বেষণ এবং WCFFC গবেষণা।

একাত্তর সালে উপরিউক্ত পাকিস্তানি আর্মি ও তাদের সহকর্মীরা তৎকালীন জয়পুরহাট মহকুমায় অত্যাচার নির্যাতন ও জাতিগত নিধনের যে স্টিম রোলার চালায়, তা যে কোন বিবেকবান মানুষকে বিস্মিত ও হতবাক না করে পারে না। জয়পুরহাটের পাগলা দেওয়ানে পাকি সেনা ও তাদের সহযোগীরা হাজার হাজার লোককে হত্যা, সহস্রাধিক নারীর সম্ভ্রমহানি এবং অসংখ্য বাড়িঘর ধ্বংস করে বলে প্রত্যক্ষদর্শীদের

www.pathagar.com

দেয়া তথ্যে জানা যায়। পাগল দেওয়ান ও তার আশেপাশের চর বরকত, নামুজানিধি, পাওনন্দা, খাস পাওনন্দা, ছিট পাওনন্দা, নওপাড়া, বিরলা, রূপনারায়ণপুর, জগদীশপুর, ভুটিয়াপাড়া, মল্লিকপুরসহ অসংখ্য গ্রামে পাকি বাহিনী নৃশংস ধ্বংসযজ্ঞ চালায়। মে মাসের শেষের দিকে পাকিবাহিনী জয়পুরহাট থেকে পাগল দেওয়ানে গিয়ে ঘাঁটি স্থাপন করে। কেদারপুকুর পাড়ের আখের গুড় তৈরির চুল্লিতে একাত্তরের উনিশে এপ্রিল পাকিস্তানি আর্মি বহু বাঙালিকে মাটিচাপা দিয়ে হত্যা করে।

এ ছাড়া জয়পুরহাটের কড়াই কাদিপুর গ্রামে পাকিবাহিনী নৃশংস গণহত্যা চালায়। এখানে একইদিনে তিন শ' একষট্টি জনকে লাইনে দাঁড় করিয়ে ব্রাশ ফায়ারে হত্যা করে। নিহতদেরকে ডোমপুকুরের ভিটায় গর্ত খুঁড়ে মাটিচাপা দেয় তারা। কড়াই কাদিপুর গ্রামের এক শ' পাঁচ ঘর হিন্দু ও চার ঘর মুসলমান পরিবারের সবাইকেই পাকি বাহিনী হত্যা করে। ভারতীয় সীমান্তসংলগ্ন গ্রাম পাগল দেওয়ানে রয়েছে একটি বড় বধ্যভূমি। মুক্তিযুদ্ধের সময় ভারতগামী হাজার হাজার শরণার্থীকে পাকিস্তানি সেনারা এখানে এনে হত্যা করে। গ্রামবাসীদের মতে, প্রায় দশ হাজার লোককে এখানে হত্যা করা হয় বলে জানা যায়। ১৯৭১ সনের আঠারোই জুন শুক্রবার গ্রামের মসজিদে জুমআর নামাজ আদায় করার সময় ধরে নিয়ে আঠাশজন মুসল্লিকে হত্যা করে গণকবর দেওয়া হয়। কয়েকজন প্রত্যক্ষদর্শীর সাক্ষ্য এখানে উল্লেখ করা হল।

১. মোস্তাফিজুর রহমান বলেন, একাত্তর সালে আমি জয়পুরহাট কলেজের স্নাতক শ্রেণীর ছাত্র ছিলাম। জয়পুরহাট শহরে প্রথম যেদিন পাকি বাহিনী প্রবেশ করে, তার পরের দিনই এখানকার মুসলিম লীগ ও জামায়াতের লোকজনদেরকে সাথে নিয়ে দোগাতি ইউনিয়নের পুটিবাড়ি ব্রিজ থেকে শুরু করে পেচুলিয়া মৌজা পর্যন্ত অসংখ্য বাড়িঘরে তারা আগুন লাগায়। কেবল বাড়িঘরে আগুন লাগিয়েই ক্ষান্ত হয়নি, বেশ কিছু সংখ্যক নিরীহ গ্রামবাসীকেও তারা হত্যা করে। এদের মধ্যে নয়া মিয়া, আমার সহপাঠী আব্দুল মোতালেব ও মোগলা নামের একজন বৃদ্ধের কথা আমার মনে পড়ে। এছাড়া শহীদ নুরু মিয়ার ভাই গনি মিয়া ও একজন মহিলা আহত হন। এদের সাথে আমার এক দাদীও পাকি বাহিনীর গুলিতে আহত হন। আহত হওয়ার কয়েক ঘন্টার মধ্যেই আমার সেই দাদীকে নিয়ে আমি ভারতে চলে যাই। ভারতের বালুঘাট হাসপাতালে তাকে ভর্তি করি। দাদীর চিকিৎসা চলাকালীন আমি ভারতেই ছিলাম। সুস্থ হওয়ার পর দাদীকে নিয়ে দেশে ফিরে আসি। এপ্রিলের একুশ-বাইশ তারিখের দিকে তারা আমাদের গ্রামে এই হামলা চালায়। সম্ভবত আর্মি বিশ-একুশ তারিখে জয়পুরহাট শহরে প্রবেশ করে। পাকি বাহিনী গ্রামের কয়েকজন মহিলাকেও সেদিন হত্যা করেছিল।

২. আনিসুর রহমান বলেন, এখানকার অত্যাচার নির্যাতনকারী পাকি আর্মির মধ্যে মেজর আফজাল হোসেনের নাম আমার এখনও মনে আছে। সে এখানে সব ধরনের অপকর্মের সাথে জড়িত ছিল। এখানে মুসলমানদের চেয়ে হিন্দুদের উপরেই বেশি

www.pathagar.com

নির্যাতন চালানো হয়। তাদের ঘরবাড়ির জিনিসপত্র সব লুটপাট করা হয়। আর্মিদের সহযোগীরা হিন্দুদের টাকাপয়সা, গরু-ছাগল, অর্থ সম্পদ, কাপড়চোপড় সব কিছুই লুট করে নেয়। গিরিবাবু, কার্তিক, গোবিন্দ, কাশীদে প্রমুখের বাড়িঘর এভাবে লুটপাট হয়ে যায়।

৩. আমজাদ হোসেন বলেন, এপ্রিলের বিশ-বাইশ তারিখে পাকি বাহিনী জয়পুরহাট শহরে প্রবেশ করে। রাতে শহরে অবস্থানের পর সকালেই তারা জয়পুরহাটের পূর্বদিকে মুভ করে কড়াই কাদিপুর গ্রাম আক্রমণ করে। কড়াই কাদিপুরের সাড়ে তিন থেকে চার শ' লোককে সেদিন তারা হত্যা করে। সবাইকে লাইনে দাঁড় করিয়ে ব্রাশ ফায়ার করা হয়। পাকি বাহিনী কড়াই কাদিপুরে প্রবেশের সময় ন'জন গ্রামবাসী প্রাণের ভয়ে একটা বট গাছে উঠে পাতার আড়ালে লুকান। পাকি বাহিনী গাছের ওপরে তাদেরকে পাখির মত গুলি করে হত্যা করে। জয়পুরহাট শহর থেকে সাড়ে তিন কিলোমিটার দূরে ওই গ্রামের অবস্থান। সম্ভবত বাইশে এপ্রিল সেখানে গণহত্যা চালানো হয়। এখানে আক্রমণকারী পাকি আর্মির মধ্যে মেজর আজমল ও কর্নেল এস এম ইকবাল ছিল উল্লেখযোগ্য।

জয়পুরহাটে প্রবেশের পর পাকি আর্মি খঞ্জরপুর মিশন এলাকা, সুগারমিল ও বর্ডার বেল্টে ক্যাম্প করে। তারা চৌদ্দই ডিসেম্বর পর্যন্ত সেখানে ছিল। এ সময়ের মধ্যে তারা জয়পুরহাটের প্রায় চার/পাঁচ হাজার লোককে হত্যা করে। এখানকার চার পাঁচটা গণকবরেও অনেক লাশ ফেলা হয়। কড়াই কাদিপুর, জয়পুরহাট সরকারি কলেজ ও খঞ্জনপুরেও গণকবর রয়েছে। এছাড়া পাগলা দেওয়ানে আরও দু'টি গণকবর আছে। পাগলা দেওয়ানেই সবচেয়ে বেশি হত্যাকাণ্ড ঘটানো হয়। শুধু গণকবরগুলোতেই যে হত্যাকাণ্ড ঘটানো হয়েছে এমন নয়, এর আশপাশেও বিচ্ছিন্নভাবে তারা অনেক হত্যাকাণ্ড সংঘটিত করে।

৪. অ্যাডভোকেট নন্দকিশোর আগরওয়ালা বলেন, আমি পেশাগতভাবে এ্যাডভোকেট হলেও সাংবাদিকতার সাথে জড়িত। ১৯৯২ সালে আমিনুল হক বাবুল (সংবাদ প্রতিনিধি) আমাকে বললেন, পাগলা দেওয়ানে যে সব হত্যাকাণ্ড ও নারী নির্যাতনের ঘটনা ঘটে, তার তথ্য সংগ্রহের জন্য সাংবাদিক হিসেবে আমাদের সেখানে যাওয়া দরকার। আমরা সে বছরের ডিসেম্বরে সেখানে যাই। তারিখটা এ মুহূর্তে ঠিকমত মনে করতে পারছি না। আমরা সেখানে গিয়ে একাত্তরের গণহত্যা ও নারী নির্যাতনের বিষয়ে স্থানীয় লোকজনদের সাথে কথা বলি। যাদের মধ্যে সোলায়মান আলী, আবেদ আলী, আফসার আলী, মোজাম্মেল হক প্রমুখের নাম উল্লেখযোগ্য। এদের মধ্যে মোজাম্মেল হক মুক্তিযোদ্ধা এবং সোলায়মান আলী ও আবেদ আলী পাকি বাহিনীর বর্বর আক্রমণে মারাত্মকভাবে আহত হয়েও কোন রকমে বেঁচে গিয়েছিলেন। আমরা যখন পাগলা দেওয়ানে যাচ্ছিলাম তখন পথে একজন আদিবাসীর সাথে আমাদের কথা হয়। তিনি আমাদেরকে জানান যে, পাগলা দেওয়ানে একাত্তরে হাজার হাজার মানুষকে হত্যা করা হয়েছে।

www.pathagar.com

আদিবাসী সেই লোকটির কথা আমাদের বিশ্বাস হচ্ছিল না। মনে হচ্ছিল আদিবাসী লোকটি হাজার কি সেটা হয়ত ভাল বোঝে না। তারপর আমরা পাগলা দেওয়ানে গিয়ে একটি মাদ্রাসার কাছে বসলাম। সেখানে অনেক লোকজনের সমাগম ঘটল। তাদের সাথে কথা বলে বুঝতে পারলাম যে, সত্যিই একাত্তরে পাগলা দেওয়ানে হাজার হাজার লোককে হত্যা করা হয়েছে। এ সময় এক বৃদ্ধ আমাদেরকে বললেন তরমুজের সময় যেরকম ক্ষেতে তরমুজ ছাড়া আর কিছু দেখা যায় না তেমনি একাত্তর সালে এখানকার জমিতে শুধু মানুষের মাথা দেখা গেছে।

একাত্তর সালের আষাঢ় মাসে চার তারিখের দুপুরে যখন সেখানকার ছোট মসজিদটায় স্থানীয় লোকজন জুমআর নামাজ আদায় করছিলেন তখন রাস্তায় আর্মির একটা জিপ মাইন বা বোমার আঘাতে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। এতে পাকি আর্মির কিছু সদস্য আহত হয়। পাকি আর্মি এই অবস্থায় গাড়ি তোলার নাম করে মসজিদ থেকে মুসল্লিদের সেখানে ধরে নিয়ে যায়। জিপটা তোলানোর পর তাদেরকে পাগলা দেওয়ানে নিয়ে গর্ত খোড়ানো হয়। এরপর পাকিস্তানি আর্মি তাদেরকে রামদা দিয়ে কুপিয়ে কুপিয়ে হত্যা করে তাদের নিথর দেহগুলো সেই গর্তের মধ্যে ফেলে দেয়। হত্যা করার আগে নির্যাতন করার জন্য তাদেরকে কাঁটার ওপর দিয়ে হাঁটানো হয়। ওই গণহত্যা স্পট থেকে সোলায়মান ও আবেদ আহত অবস্থায় পার্শ্ববর্তী গ্রামে গিয়ে আশ্রয় নেন। সেখান থেকে তাদেরকে ভারতে নিয়ে চিকিৎসা করানো হয়। এই দুজনের মধ্যে আবেদ আলী এখনও বেঁচে আছেন। তিনি বলেছেন, যুদ্ধের পর এখানে নারী নির্যাতনের অনেক আলামত পাওয়া যায়। এসব আলামতের মধ্যে ছিল কাচের চুড়ি, ব্রা, শাড়ি, ব্লাউজ ইত্যাদি। এলাকাবাসী আমাদেরকে দুটো জায়গা দেখিয়ে দেয়। আমরা তখন সেই দুটো জায়গা খুঁড়ে শহীদদের হাড়গোড়, মাথার খুলি তুলে একটা খবরের কাগজের ওপর রেখে ছবি তুলে নেই (এ সময় নন্দকিশোর আগরওয়ালা নীরবে কাঁদছিলেন)। তিনি উল্লেখ করেন, এ সময় একজন বৃদ্ধ সেখানে এসে ডুকরে কেঁদে উঠল। তার ছেলেকে এখানে এনে হত্যা করা হয়েছিল। এই হাড়গোড়গুলো তার ছেলের কি না, সেটা ভেবে তিনি কাঁদছিলেন। তারপর আমরা সেই হাড়গোড়ের ছবিগুলো বিভিন্ন পত্রিকায় পাঠিয়ে দিই। সেগুলো ছাপাও হয়। আমি তখন আজকের কাগজের প্রতিনিধি ছিলাম।

কড়াই কাদিপুর হিন্দু প্রধান এলাকা। জয়পুরহাট এলাকার পাল সম্প্রদায়ের লোকেরা এখানে বসবাস করত। নওগাঁ থেকে পাকি আর্মি রাজাকার ও আলবদরদের সহযোগিতায় সেখানে গিয়ে গণহত্যা চালায়। বিভিন্ন বাড়ি থেকে লোকজন ডেকে এনে একটি পুকুর পাড়ের গুড় তৈরি করার স্থানে তাদেরকে হত্যা করা হয়। এখানে তিন শ' একষট্টি জনকে হত্যা করা হয়।

আক্কেলপুরে জামায়াতে ইসলামীর নেতা নূর বখতের বাড়ি গিয়ে আর্মি কিছু মেয়ে যোগাড় করে দিতে বলে। নূর বখ্ত আর্মিকে নিয়ে গ্রামে মেয়ে খুঁজতে বের হলে তার নিজের মেয়েকেই আর্মি বাড়িতে ফেলে ধর্ষণ করে। নূর বখ্ত ওয়াইর গ্রামে বিভিন্ন

www.pathagar.com

বাড়িতে মেয়ে খুঁজে বাড়ি ফিরে এসে দেখে তার মেয়েকেই পাকি আর্মি ধর্ষণ করেছে। তখন সে ধর্ষক আর্মিকে থাপ্পড় মারে। থাপ্পড় মারার পর মেজর আফজালের কাছে নালিশ করা হলে সে বলে "রেপ করে অন্যায় করেছে কিন্তু তুমি থাপ্পড় মারলে কেন? অতএব তুমি কান ধরে দশবার উঠবস কর"। এভাবে নূর বখ্‌ত নিজেই তার অপকর্মের শাস্তি পেয়েছিল।

৫. মুক্তিযোদ্ধা সিরাজুল ইসলাম বলেন, পাকিস্তানি আর্মি যুদ্ধের ন'মাসে জয়পুরহাটে ব্যাপক নারী নির্যাতন চালায়। নির্যাতিত নারীদের মধ্যে আমি বিশেষভাবে যাদেরকে চিনি, তাদের মধ্যে ডলি (আনজুয়ারা বেগম ডলি) অন্যতম। পাকিস্তানি আর্মি পিস কমিটির চেয়ারম্যান মেম্বারদের পরিবারের মহিলাদের ওপরও যৌন নির্যাতন চালায়। রাজাকার আজিম উদ্দিন, তালেব মেম্বর এদের পরিবারের মহিলারা পাকি বাহিনী কর্তৃক নির্যাতিত হয়েছে। বিষ্ণুপুরেও এরকম একটা দুঃখজনক ঘটনা ঘটে। সেখানকার এক হাজি সাহেব খাওয়ার দাওয়াত দিয়ে আর্মিকে বাড়িতে নিয়ে আসেন। কিন্তু আর্মি খাওয়া দাওয়া শেষে সেই বাড়ির মহিলাদের ওপর পাশবিক নির্যাতন চালায়। জয়পুরহাটে মুক্তিযুদ্ধের ন'মাসে যেসব পাকি আর্মি গণহত্যা, নারী নির্যাতন ও ধ্বংসযজ্ঞ চালায়, তাদের মধ্যে মেজর আফজালের নাম আমার বিশেষভাবে মনে পড়ে।

৬. দেওয়ান মোজাম্মেল হক বলেন, যুদ্ধের নয় মাসের প্রায় প্রতিদিনই এই পাগলা দেওয়ানে হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হয়েছে। আনুমানিক দশ-পনেরো হাজার লোককে এখানে হত্যা করা হয়। কারণ হচ্ছে বগুড়া, শেরপুর, নন্দীগ্রাম, পাবনা, নাটোর, রাজশাহী ও চাঁপাইনবাবগঞ্জ এলাকার লোকজন এই রাস্তাটিকে নিরাপদ ও সংক্ষিপ্ত মনে করে এই পথে যাতায়াত করত। আর এসব জায়গায় লুকিয়ে থাকা পাকি আর্মি এসব শরণার্থীদেরকে হত্যা করত এবং মেয়েদেরকে বাঙ্কারে ধরে নিয়ে নির্যাতন চালাত। নির্যাতিত মেয়েদের অনেকের লাশ আমরা পাশের এক হিন্দু বাড়ির মাটির ঘরে স্বাধীনতার পর খুঁজে পেয়েছিলাম। আমার বাড়ির পূর্ব পাশের নজিমউদ্দিনের মেয়েকে পাকি সেনারা হাত চেপে ধরে। তখন নজিমউদ্দিন তাদের কাছে অনেক অনুনয় করে বলেন, 'বাবা আমার মেয়েকে ছেড়ে দাও, বিনিময়ে তোমরা আমাকে হত্যা কর।' তখন পাকিরা মেয়েকে ছেড়ে নজিমউদ্দিনকে গুলি করে হত্যা করে। তখন কেউ কেউ সীমান্ত পথে নিয়মিত আসা-যাওয়া করত। তাদের কাছ থেকে ওপারে বসেই আমারা সব খবর পেতাম। ছোট ছোট ছেলেরাও খবর আনা নেওয়া করত। তাছাড়া শরণার্থীদের যাওয়ার পথে তারা হত্যা করেছে। সৌভাগ্যক্রমে যারা বেঁচে যেত, তারা সীমান্ত পার হয়ে আমাদের কাছে এসব ঘটনা বর্ণনা করত। কেউ কেউ বলেছেন, আমার গ্রামের সবাই ভারতে যাওয়ার জন্য রওনা দিয়েছিলেন, কিন্তু পাঁচ জন মাত্র বেঁচে আসতে পেরেছি।

www.pathagar.com

ভারত থেকে ফিরে এসে আমি বাড়িতে ঢুকতে পারছিলাম না। আমার বাড়ির চারদিকে কুকুর শিয়ালে খাওয়া অনেক লাশ পড়ে ছিল। তখনও কুকুরগুলো লাশ টেনে টেনে খাচ্ছিল। ঘরের মধ্যে মদের বোতল, মহিলাদের ছেঁড়া কাপড় বিক্ষিপ্ত অবস্থায় পড়ে ছিল। মনে হয়েছিল ভূতের দেশ। এখানে বেশিরভাগ বাইরের এলাকার লোকজনকে হত্যা করা হয়েছে। তবে স্থানীয় বেশ কিছু লোককেও তারা এখানে হত্যা করে। যারা সে সময় ভারতে গিয়েছিল, তাদের কাছ থেকে এসব ঘটনা শুনেছি। পল্লীপাড়া স্টোরের মালিক আব্দুলের সামনে পাকি বাহিনী সাতজনকে গুলি করে হত্যা করার পর সেখান থেকে দশ-পনেরো জন মেয়েকে উঠিয়ে নিয়ে যায়। পাকি আর্মি মেয়েগুলোকে আমার বাড়ির পেছনে ওয়াছের দেওয়ানের বাড়ির একটা ঘরে উলঙ্গ অবস্থায় বন্দী করে রাখে। স্বাধীনতার পর আমরা সেখানে মদের বোতল ও মেয়েদের রক্তাক্ত ছেঁড়া কাপড়চোপড় পড়ে থাকতে দেখেছি। কুকুরগুলো লাশ নিয়ে টানাটানি করছিল এবং রক্তাক্ত কাপড়চোপড় চাটছিল। তখন কুকুরগুলো পাগলা হয়ে গিয়েছিল। জীবিত মানুষ দেখলেও কুকুরগুলো তেড়ে আসত। এই কুকুরগুলোকে পরে মেরে ফেলা হয়।

৭. আমিনুল হক বাবুল বলেন, আমি আমার বন্ধু নন্দকিশোর আগরওয়ালাকে সাথে নিয়ে জয়পুর হাটের সীমান্তবর্তী গ্রাম পাগলা দেওয়ানে যাই। সেখানে পাকিস্তানিদের খুব শক্তিশালী ঘাঁটি ছিল। ভারতগামী হাজার হাজার শরণার্থীকে সেখানে হত্যা করা হয়েছে। তার সাক্ষী প্রমাণও আমরা পরে পেয়েছি। সেখানকার লোকজনদের সাথে আলাপ-আলোচনা করে আমরা জানতে পারি যে, কয়েক হাজার লোককে সেখানে হত্যা করা হয়। পাবনা, নাটোর, নওগাঁ, সিরাজগঞ্জ প্রভৃতি অঞ্চলের লোকজন ভারতে যাওয়ার জন্য পাগলা দেওয়ানের পথটাকেই সে সময় বেছে নিত। কারণ জয়পুরহাট থেকে ধামুইর হাটের দিকে যাওয়ার রাস্তাটি দিয়ে ভারতে যাওয়া অনেক সোজা। এই পথে পাকিস্তানি আর্মির ঘাঁটি করার আগে বহু লোক নিরাপদে ভারতে গিয়েছিল। তাদের অনুসরণ করে পরে যারা ভারতে যাওয়ার জন্য এই পথে এসেছিল, তাদের কেউ আর বাঁচতে পারেনি। ওখানকার ঝোপ ঝাড়ে পাকিস্তানি আর্মি লুকিয়ে থাকত। কিন্তু সাধারণ বাঙালিরা সেটা না বুঝতে পেরে তাদের শিকারে পরিণত হত। ওখান থেকে ভারতের দূরত্ব মাত্র এক কিলোমিটার।

তাছাড়া পাগলা দেওয়ানে এসে লোকজন দীর্ঘ পথ অতিক্রম করে ক্লান্ত হয়ে পড়ত। চল্লিশ-পঞ্চাশ কিলোমিটার হেঁটে এসে তারা সেখানে একটু বিশ্রাম নিত। সাথে কোন খাবার থাকলে খেত, না হলে এমনিই বসে বিশ্রাম নিত। তবে অধিকাংশেরই কোন খাবার ছিল না। অনেকের পা ফুলে কলাগাছের মত হয়ে যেত। শিশুদের নিয়ে হেঁটে আসা ছিল আরও কষ্টের। এরকম ক্লান্ত পরিশ্রান্ত শরণার্থীদেরকে পাকিস্তানি আর্মির নির্বিচারে হত্যা করেছে। পুরুষদের হত্যা করে মহিলাদেরকে ক্যাম্পে ধরে নিয়ে পাশবিক উল্লাসে মেতে উঠেছে। ওই পথ দিয়ে আসা কোন শরণার্থীই বাঁচতে

www.pathagar.com

পারেনি। ফলে অন্য শরণার্থীরা ওই পথটির ভয়াবহতা সম্পর্কে কিছুই আর জানতে পারেনি। তাই ওই পথ দিয়ে শরণার্থী যাওয়াও যেমন বন্ধ হয়নি, তেমনি হত্যাকাণ্ডও থেমে থাকেনি।

পাগলা দেওয়ানের পাকি আর্মি কর্তৃক আরও একটি লোমহর্ষক ঘটনা ঘটে একাত্তরের আঠারোই জুন বাংলা চৌঠা আষাঢ়। সেদিন ছিল শুক্রবার। পাগলা দেওয়ানের ছোট মসজিদটিতে সেদিন জুমআর নামাজ আদায় করছিল স্থানীয় অধিবাসীরা। ওই সময় পাকিস্তানি আর্মি মসজিদ থেকে মুসল্লিদেরকে ধরে নিয়ে তাদের খাদে পড়া জিপটিকে টেনে তোলায়। তারপর তাদেরকে দিয়ে গর্ত খুঁড়িয়ে জবাই করে সবাইকে সে গর্তে ফেলে মাটিচাপা দেয়। সোলায়মান আলী আর আবেদ আলী সেই লোমহর্ষক হত্যাকাণ্ড থেকে বেঁচে আসতে পেরেছিলেন। মুসল্লিদেরকে হত্যা করার আগে কাঁটা ওয়ালা গাছের শুকনো ডালের ওপর দিয়ে হাঁটিয়ে পাকি আর্মি তাঁদের পাগুলোকে রক্তাক্ত করে দেয়। যারা হাঁটতে পারছিলেন না, তাঁদেরকে রাইফেলের বাঁট দিয়ে পিটিয়ে হত্যা করা হয়। আমি, নন্দকুমার আগরওয়ালা, তপন কুমার, সুমন হাজারী, আবুল হোসেনসহ আরও কয়েকজন সাংবাদিক মিলে প্রশাসনের সহযোগিতা নিয়ে ওই গণকবরটি সংরক্ষণের ব্যবস্থা করি।

জয়পুরহাটের কড়াই কাদিপুর গ্রাম দু'টি একাত্তরে হিন্দু অধ্যুষিত ছিল। পাল সম্প্রদায়ের লোকজনের বসবাস ছিল সেখানে। ওই গ্রামের তিন শ' একষট্টি জন লোককে সারিবদ্ধভাবে দাঁড় করিয়ে পাকিস্তানি আর্মি গুলি করে হত্যা করে। সেখান থেকে অল্প দু'একজন আহত অবস্থায় বেঁচে গিয়েছিলেন। এছাড়া জয়পুরহাট কলেজের পাশে বারকাটির একটি পুকুরের দক্ষিণ পাড়ে বহু নিরীহ বাঙালিকে পাকিস্তানি আর্মি হত্যা করে। সেখানে বেশ কিছু গর্ত ছিল। এখন সেগুলো পুকুরের সাথে অনেকটা মিশে গেছে। খঞ্জনপুরেও বহু নিরীহ বাঙালিকে পাকিস্তানি আর্মি হত্যা করে। ন্যাপ নেতা সেকান্দার আলীকেও সেখানে হত্যা করা হয়।

পাগলা দেওয়ানের মুক্তিযোদ্ধা মোজাম্মেলের বাড়িটাকে পাকি আর্মি নারী নির্যাতনের কেন্দ্র হিসাবে গড়ে তোলে। মুক্তিযুদ্ধে পর সেখানে মেয়েদের ব্যবহৃত কাচের চুড়ি, পেটিকোট, ব্লাউজ, চুলের কাঁটা অংশ প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়। পাগলা দেওয়ানে যে সমস্ত মহিলাকে হত্যা করা হয়, তাঁদেরকে হত্যার আগে ধর্ষণ করা হত। পাকিস্তানি আর্মির পাশবিক নির্যাতন থেকে কোন কিশোরী কিংবা যুবতী নারী সে সময় রেহাই পায়নি। হাতে গোনা দু'একজন নারী কৌশলে তাদের হাত থেকে বেঁচে আসতে পেরেছিলেন। তাঁদের এখন ঘর সংসার আছে, তাই নাম বলা যাচ্ছে না।

এখানকার সকল গণহত্যা, ধর্ষণ, লুটপাট, অগ্নিসংযোগ, ও জাতিগত নিধনের জন্য কর্নেল এস এম ইকবাল, মেজর আজমল, মেজর আফজাল হোসেন, মেজর মোস্তফা প্রমুখ সামরিক কর্মকর্তা ও তাদের সহকর্মীরা দায়ী।

www.pathagar.com

আসামী ঃ মেজর কামরুজ্জামান, ক্যাপ্টেন নাসের, ক্যাপ্টেন ইকবাল, ক্যাপ্টেন উলফাৎ।

অপরাধের ধরনঃ গণহত্যা, জাতিগত নিধন, ধর্ষণ, লুটপাট, অগ্নিসংযোগ

সাক্ষী ঃ আব্দুস শহীদ, আবুল কালাম আজাদ সৈয়দ মোকাদ্দেস হোসেন বাবলু, আতিয়ার রহমান, রাফিউল ইসলাম রিটন, অ্যাডভোকেট গোলাম মোস্তফা সরদার, কুমোর আলী, মোঃ লিকায়ত আলী, মোঃ মোকসেদ আলী মামুন, আমেনা খাতুন, হাসনা হেনা, আজাদী হাই ।

ঘটনাকালঃ ছাব্বিশ মার্চ থেকে মুক্তিযুদ্ধের শেষ সময় পর্যন্ত।

ঘটনাস্থল ঃ দিনাজপুর জেলা

সূত্রঃ যুদ্ধাপরাধ গণহত্যা ও বিচারের অন্বেষণ এবং WCFFC গবেষণা।

একাত্তরের মার্চ থেকে ডিসেম্বর পর্যন্ত পাকিস্তানি আর্মি অফিসার মেজর কামরুজ্জামান, ক্যাপ্টেন নাসের, ক্যাপ্টেন ইকবাল, ক্যাপ্টেন উলফাৎ প্রমুখের নেতৃত্বে দিনাজপুর জেলায় কমপক্ষে পঞ্চাশ হাজার নিরীহ নারী-পুরুষ-শিশুকে হত্যা করা হয়। দিনাজপুর শহরের উপকণ্ঠে বালিয়াডাঙ্গির নিকটবর্তী কুঠিবাড়ির গা ঘেঁষে কাঞ্চন নদীর কয়েকটি খাল সে সময় নিরীহ বাঙালিদের লাশে ভর্তি ছিল। এক মাইল জুড়ে কাঞ্চন নদীর দু'কূলে ছড়িয়ে ছিল অসংখ্য লাশ। পার্বতীপুর শহরের স্টেশন এলাকা, সেতাবগঞ্জ উন্নয়ন কেন্দ্র প্রাঙ্গণ, রানীশংকৈল, হরিপুর, ঠাকুরগাঁ, পীরগঞ্জ, বিরল, কাহারোল, খানসামা, চিরিরবন্দর, ফুলবাড়ি, হিলি, নবাবগঞ্জ, ঘোড়াঘাট, বীরগঞ্জ, বালিয়াডাঙ্গি, বোদা প্রভৃতি স্থানেও পাকিস্তানি আর্মির ভয়ঙ্কর গণহত্যা, জাতিগত নিধন ও ধর্ষণযজ্ঞের নিদর্শন রয়েছে। কয়েকজন প্রত্যক্ষদর্শীর সাক্ষ্য এখানে আমরা উল্লেখ করছি।

১. বালুরবাড়ি সৈয়দ মোকাদ্দেস হোসেন বাবলু বলেন, সে সময় রংপুর ও সৈয়দপুর ক্যান্টনমেন্ট ছিল পাকি বাহিনীর ঘাঁটি। তারা রংপুর ক্যান্টনমেন্ট থেকে তিন দিক দিয়ে আক্রমণ চালিয়ে অগ্নিসংযোগ ও লুটপাট করতে করতে সামনে এগোয়। আমাদের দক্ষিণ ও পশ্চিমদিকে ভারত সীমান্ত। গ্রামের লোকজন অবস্থা খারাপ দেখে সীমান্ত পেরিয়ে ভারতে চলে যায়। এভাবে প্রতিটি গ্রামেই পাকিস্তানি আর্মি অত্যাচার, নির্যাতন চালায় এবং মহিলাদেরকে ধর্ষণ করে।

তিনি আরও বলেন, দিনাজপুরে পাকি আর্মি অফিসারদের মধ্যে কয়েক জনের নাম জানতাম। এদের মধ্যে ক্যাপ্টেন উলফাৎ, ক্যাপ্টেন ইকবাল, ক্যাপ্টেন নাসের ও মেজর কামরুজ্জামান উল্লেখযোগ্য। ক্যাপ্টেন নাসের প্রথমে এখানকার দায়িত্বে ছিল। দেশ স্বাধীন হওয়ার দু' আড়াই মাস আগে মেজর কামরুজ্জামান এখানকার দায়িত্ব পায়। তারা সে সময় যেখানেই গিয়েছে, সেখানেই নারী নির্যাতন করেছে। আমাদের

www.pathagar.com

লিস্টে কয়েকজন বীরাঙ্গনার নাম আছে। এদের মধ্যে সাত নং উথরাইল ইউনিয়নের একজন মহিলাসহ অনেকেই ছিলেন। এছাড়াও রানীপুরে আমার এক পরিচিত মহিলা ধর্ষিতা হন। তার নাম মোসলেমা। পরে অবশ্য তাঁর বিয়ে হয়ে যায়। সামাজিক অবস্থানের কথা ভেবে এসব বিষয় নিয়ে এখন তাকে বিরক্ত না করাই শ্রেয়। আমাদের এখানে নারী পুনর্বাসন কেন্দ্র খোলা হয়েছিল। সেখানে প্রায় এক শ'। এক শ' পঞ্চাশ জন নির্যাতিত মহিলাকে আশ্রয় দেওয়া হয়।

২. প্রাণকৃষ্ণপুরের দক্ষিণ জয়দেবপুর মৌজার কাছে ১৯৭১ সনে পাকি আর্মি যে বর্বর হত্যাকাণ্ড চালায়, তার প্রত্যক্ষদর্শী আতিয়ার রহমান। তিনি সে সময় পঞ্চম শ্রেণীর ছাত্র ছিলেন। তাঁর বাবা চাচাসহ পরিবারের অনেকেই এই হত্যাকাণ্ডের শিকার হন। একাত্তরের স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে তিনি বলেন, বয়স কম থাকার কারণে কি কারণে যুদ্ধ হয়েছিল সেটা ঠিক বুঝতে পারিনি। চড়ারহাট বাজারে পাকিস্তানি আর্মির ক্যাম্প ছিল। এই ক্যাম্প থেকে গ্রামবাসীদেরকে বলা হল আপনারা নিশ্চিন্তে গ্রামে থাকেন। আপনাদের কোন অসুবিধা হবে না। মনসুর মণ্ডল নামে গ্রামের এক প্রভাবশালী লোক বলেছিলেন যে, আমরা বাংলাদেশের লোক, বাংলাদেশেই থাকব। কোথাও যাব না, মরতে হলে সবাই একসাথেই মরব। তার কথা শুনে লোকজন আর গ্রাম ছেড়ে যায়নি।

এরপর সবাই গ্রামেই থাকতে লাগল। এর মধ্যে একদিন আর্মি এসে আমার বাবাকে ধরে নিয়ে বলল, গ্রামের লোকদের ডাকো। এখানে একটি ব্রিজ ভেঙে গেছে, মাটি ভরাট করতে হবে। মাটি কাটার মিথ্যে অজুহাত দেখিয়ে তারা পুরো গ্রামের লোক ডেকে সেখানে জড়ো করল। অনেকে মাটি কাটার জন্য কুড়াল, টুকরি নিয়ে আসতে চাইলে তারা বলল, এগুলোর দরকার নেই, ওখানে সব আছে।

যেখানে গ্রামের লোকদেরকে জড়ো করা হয় সেখান থেকে আমাদের বাড়ি মাত্র দশ গজ দূরে। আমিও তখন বন্ধুদের সাথে সেখানে গিয়ে দাঁড়ালাম। কিন্তু পাকিস্তান আর্মি বাচ্চা ও বৃদ্ধদেরকে সেখানে থেকে তাড়িয়ে দিল। আমরা একটু সরে যেতেই গুলির শব্দ শুনতে পেলাম। পেছন ফিরে দেখি আর্মি তাদের ওপর অবিরাম গুলিবর্ষণ করছে। সেই দৃশ্য আজও আমার মনে আছে। সেখানে একটি মেশিন গান সেট করা ছিল এবং চতুদিক দিয়ে পাকিস্তানি আর্মি তাদেরকে ঘিরে রেখেছিল। সেখানে উপস্থিত হওয়ার কিছুক্ষণ পর আর্মির একজন বলল যে, আপনারা সবাই কলেমা পড়েন। কলেমা পড়া শেষ হতে না হতেই তারা গুলি করা শুরু করে। গুলির আঘাতে তারা একজনের ওপর আরেকজন গিয়ে পড়ে। যন্ত্রণায় তারা তখন ছটফট করছিল। আমার বাবা আকতার আলী মণ্ডলও ছিলেন এই হতভাগ্যদের মধ্যে। তাদেরকে হত্যা করার পর আধ ঘন্টা আর্মি সেখানে ছিল। তারা চলে যাওয়ার পর নিহতদের আত্মীয়-স্বজনরা এসে লাশগুলো নিয়ে যাওয়ার সময় আর্মি পুনরায় এসে গুলি বর্ষণ করে। দ্বিতীয়বারের গুলিতে আরও অনেকেই আহত হন। আহতদের মধ্যে ছিলেন, আমার

www.pathagar.com

জাঠাতো ভাই রহমত আলী, মোজাম্মেল মাস্টার, হামিদ, একরাম প্রমুখ। সেদিন ওই জায়গায় পাকিস্তানি আর্মি এক শ' পঁয়ষট্টি জনকে হত্যা করেছিল। এর মধ্যে আশি জনের পরিচয় পাওয়া যায়। আমার বাবা ছাড়াও সেদিন আমাদের পরিবারের যে সব সদস্য নিহত হন, তারা হলেন। আকবর আলী, তার বড় ছেলে আজিজ মন্ডল, আফসার আলী, মুন্সী মণ্ডল, মুন্সী মণ্ডলের ছেলে মকবুল হোসেন ও আনোয়ার চৌধুরী।

নারী নির্যাতন প্রসঙ্গে তিনি বলেন, এখানে ব্যাপক নারী নির্যাতন চালানো হয়। ইউনুস আলীর দুই স্ত্রীও এই নির্যাতনের শিকার হয়েছিলেন। তাদেরকে বাড়ি থেকে ধরে অন্য এক বাড়িতে নিয়ে রাখে। পরে বন্দী অন্য মহিলাদের সঙ্গে তাদেরকেও সেখানে নির্যাতন করা হয়। একই গ্রামের বৃদ্ধ আহসান আলী বলেন, একাত্তরে পাকি বাহিনী প্রাণকৃষ্ণপুরে যে গণহত্যা চালায়, তাতে এই গ্রামের তিনটি বাড়ি বাদে প্রত্যেক বাড়িরই কেউ না কেউ নিহত হন। আমাকেও পাকি বাহিনী ধরে নিয়ে গিয়েছিল। অনেক কষ্টে আমি ওই স্থান থেকে পালিয়ে আসতে পেরেছিলাম। সেদিন পাকি বাহিনী এক শ' পঁয়ষট্টি জনকে সেখানে হত্যা করেছিল। সেদিনের হত্যাকাণ্ডে পাকি আর্মির সহযোগিতা করেছিল তিনজন মৌলভী (মুসলিম লীগার)। এদের একজনের নাম ছিল রমজান আলী। বাকী দু'জনের নাম এখন আর মনে নেই।

৩. রাফিউল ইসলাম রিটন বলেন, মহাড়াপাড়া হিলি উপজেলা সদরের একটি গ্রাম। হাসপাতাল পেরিয়ে কিছু দূরে অবস্থিত বিডিআর ক্যাম্প। এই বিডিআর ক্যাম্পের পেছনেই মহাড়াপাড়া গ্রামটি। এখানেই রয়েছে পাকি বাহিনী সৃষ্ট এলাকার সর্ববৃহৎ বধ্যভূমিটি। এখানে বিমান হামলাও চালানো হয়েছিল। বাজার থেকে চেক পোস্ট রোডে যাওয়ার সময় মাসুদ চৌধুরীর রাইস মিলটি দেখা যায়। এই মিলের পুকুর পাড়ে একটি কূপ আছে। পাকি আর্মি বহু নিরীহ লোককে হত্যা করে তাদের লাশগুলো এই কূপে ফেলে দেয়। এখানকার অনেকেই এই কূপে লাশ ফেলতে দেখেছেন। এদের একজন বর্তমানে ডাক্তারি পেশায় নিয়োজিত আছেন। তিনি বলেছেন, এই কূপের মধ্যে অনেককেই হত্যা করে ফেলে দেওয়া হয়। সাক্ষীদের মধ্যে একজন মহিলার লাশও ছিল। আমাদের এখানে ভাংগাপাড়া নামে দুটো জায়গা আছে। একটি বড় ভাংগাপাড়া, অন্যটা স্টেশন ভাংগাপাড়া। বড় ভাংগাপাড়ায় বর্তমান পৌরসভা চেয়ারম্যান সাখাওয়াত হোসেন শিল্পীর বাড়ি। তার বাড়ির কাছাকাছি এলাকায় পাকি বাহিনী অনেক নিরীহ বাঙালিকে হত্যা করে। এখানকার প্রাণকৃষ্ণপুরে একটি বড় গণকবর রয়েছে। এখানে পাকি আর্মি এক শ' সাতান্ন জন নিরীহ গ্রামবাসীকে হত্যা করে মাটিচাপা দেয়। এঁদের মধ্যে তিরানব্বই জনের নাম আমি সংগ্রহ করতে পেরেছি। প্রত্যক্ষদর্শী এবং যারা আহত হয়ে বেঁচে গিয়েছিলেন, তাদের কাছ থেকে আমি এই সব তথ্য সংগ্রহ করেছি।

www.pathagar.com

এই এলাকার নারী নির্যাতন প্রসঙ্গে রাফিউল ইসলাম রিটন আমাদের প্রতিনিধিকে বলেন, একজন নির্যাতিতা নারীর কথা আমি জানি। যিনি বর্তমানে হিলিতে থাকেন না। আমি খোঁজ নিয়ে তার সাথে কথা বলার চেষ্টা করেছিলাম। কিন্তু তিনি তাঁর নির্যাতনের বিষয়ে খোলাখুলিভাবে কিছু বলতে চাননি। মান সম্মানের ভয়ে তিনি বিষয়টি চেপে যেতে চেয়েছেন। শুধু তাই নয়, আমি যেটুকু জানি সেটুকুও যেন প্রকাশ না হয়, সেজন্য তিনি আমাকে বারবার অনুরোধ করেছেন।

৪. আব্দুস শহীদ বলেন, এপ্রিলের প্রথম সপ্তাহে গ্রামের কিছু মানুষ জীবনের মায়ায় ঘরবাড়ি ছেড়ে দল বেঁধে ভারতে যাওয়ার জন্য রওয়ানা হয়। পথে সন্ধ্যা ঘনিয়ে এলে তারা পার্শ্ববর্তী গ্রাম মল্লিকপুরের এক পুকুর পাড়ে যাত্রা বিরতি করে। পাশে খাসপাহনন্দা গ্রামে পাকি বাহিনীর ক্যাম্প ছিল। তারা খবর পেয়ে সেখানে গিয়ে শরণার্থীদের মধ্য থেকে প্রায় দেড়, দু'শ' জনকে ধরে নিয়ে যায়। এদের মধ্যে হিন্দু-মুসলিম, নারী-পুরুষ, শিশু-বৃদ্ধ সব শ্রেণীর মানুষই ছিল। কিছু শরণার্থী সে সময় পালিয়ে যেতে সক্ষম হয়। কাছেই যে পাকি সেনাদের ক্যাম্প আছে, নিরীহ গ্রামবাসীরা সেটা জানত না। পাকি সেনারা তাদেরকে সেখান থেকে ধরে নিয়ে খাসপাহনন্দা মিশন ক্যাম্পে বন্দী করে রাখে। এই ক্যাম্পের আধা কিলোমিটারের মধ্যেই আমার বাড়ি। তারা সারা রাত মহিলা ও পুরুষদের পৃথক পৃথক ঘরে বন্দী করে রাখে। নির্যাতনের পরদিন সকালে কিছু মহিলাকে তারা ছেড়ে দেয়। বাকি মহিলাদেরকে সেদিন ভোর বেলাতেই হত্যা করে। হিন্দু এবং মুসলমানদের দুটো পৃথক লাইন করে ব্রাশ ফায়ার চালানো হয়। মিশনের দুটো গর্তে সত্তর আশি করে লাশ মাটিচাপা দেওয়া হয়। প্রত্যক্ষদর্শীদের কাছ থেকে আমি এই তথ্য জেনেছি। প্রত্যক্ষদর্শীদের মধ্যে ছিলেন আমাদের গ্রামের ফরিদ উদ্দিন মোল্লা, তমিজ উদ্দিন ও আব্দুল গনি।

তিনি বলেন, গ্রামের লোকজনের ঘরবাড়ি ছেড়ে চলে যাওয়ার সময় সময় যে লুটপাট হয়, সেটা আমার নিজ চোখে দেখা। প্রথম দিক থেকেই সংখ্যালঘুরা দেশ ছেড়ে চলে যেতে থাকেন। পয়লা এপ্রিল আমার শিক্ষক নরেন্দ্র বাবু পরিবারের সবাইকে নিয়ে দেশ ছাড়ার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হন। তার বাড়ি ছিল খঞ্জনপুরে। ক্যাম্পের পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় রাজাকার খোকা তাঁদের জিনিসপত্র লুট করে। আমরা লুটপাটে বাধা দিলে তারা চলে যায়। রাজাকার খোকা তখন গ্রামের কয়েকজনকে সাথে নিয়ে এসব লুটপাট চালাত। বর্তমানে সে অন্য জায়গায় বসবাস করছে।

৫. অ্যাডভোকেট গোলাম মোস্তফা সরদার বলেন, একুশে এপ্রিল সকাল আটটার দিকে আমরা হিলির পালপাড়ায় আশ্রয় নিই। পালপাড়াতে আমার সাথে ছিল লুৎফর রহমান ও ঢাকার কয়েকজন ছাত্র। সারারাত কিছু খেতে না পারায় আমরা খুব ক্ষুধার্ত ছিলাম। এজন্য আমরা কয়েকজন চা, মুড়ি তৈরি করছিলাম। ওই মুহূর্তে বৃষ্টি শুরু হয়ে যায়। কিছু পরে চা খেতে খেতে কলকাতার নিউজ শুনছি। এমন সময় আশেপাশে লুকিয়ে থাকা কিছু পাকি আর্মি বাড়িটি ঘিরে ফেলে। তারা বাড়ির দরজা

www.pathagar.com

ভাঙার চেষ্টা করতে থাকে। দরজা খোলা থাকলে সেদিন আমরা সবাই মারা যেতাম। আমাদের সাথের দশ বারো জন মুক্তিযোদ্ধা দেয়াল টপকাতে গিয়ে তাদের গুলিতে নিহত হন। আর আমরা যারা দেয়াল না টপকিয়ে ওই বাড়ির আনাচে কানাচে লুকিয়ে ছিলাম, তারা বেঁচে যাই। প্রায় বারোটা পর্যন্ত গোলাগুলি চলে। সেখানে পাকি আর্মির একজন ক্যাপ্টেন ছিল, সম্ভবত তার নাম ক্যাপ্টেন আফজাল। বারোটা একটার দিকে গোলাগুলি কমে গেলে তারা পুরো বাড়ি তল্লাশি করে আমাদেরকে গ্রেফতার করে। আমরা সংখ্যায় ছিলাম ষোলো জন। আমি, লুৎফর, পূর্ণ, নূর মোহাম্মদ মণ্ডল, গোলাম রহমান মণ্ডল ও বাবু মন্ডলসহ আরও কয়েকজন ছিলাম। তারা আমাদেরকে মারধোর করে ঘরে বন্দী করে রেখে চলে যায়। এই ষোলো জনের মধ্যে সাত জন ছিল বৃদ্ধ। পরে আর্মির আরেকটি গ্রুপ এসে আমাদেরকে জিজ্ঞাসাবাদ করলে বুঝতে পারি যে, আগের গ্রুপটি আমাদেরকে গুণে রেখে যায়নি। তৃতীয় পর্যায়ে অন্য একজন মেজর আসে। তার নাম জানতে পারিনি। তবে সে উর্দুতে কথা বলছিল। তখন আমরা সাত জন যুক্তি করে বাড়ির চিলেকোঠায় উঠি। শুক্রবার সকালে হিলি তাদের দখলে চলে যায়। সেদিন ছিল বাইশে এপ্রিল। আমরা পূর্ণকে রাতের বেলা গোপনে সেখান থেকে পাচার করে দিয়েছিলাম। এর পরের দিন কমনওয়েলথ থেকে বিদেশী পর্যবেক্ষক দল যুদ্ধের অবস্থা দেখার জন্য এলে তারা গোলাগুলি বন্ধ রাখে। আমাদের সাথে বন্দী হওয়া সাত জন বৃদ্ধ যখন নামাজ পড়ার প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন। তখন তিন চার জন আর্মি এসে তাদেরকে বলল, তোমরা লাইন করে দাঁড়াও। তিন দিন, তিন রাত আমরা ওই ঘরে অভুক্ত অবস্থায় বন্দী ছিলাম। তারা একটু পানিও আমাদেরকে খেতে দেয়নি। অকারণে সেই সাত জন বৃদ্ধকে তারা আধ ঘন্টা ধরে দু'হাত লম্বা লাঠি, বুট, জুতো ও বেয়নেট দিয়ে আঘাত করে।

তাদেরকে এমনভাবে আহত করে যে, যন্ত্রণায় ছটফট করতে করতে আধ ঘন্টার মধ্যেই তারা মারা যান। আর্মি সোয়া বারোটা থেকে পৌনে একটা পর্যন্ত সেখানে থাকার পর সেখান থেকে এক কি.মি. পূর্বে অবস্থিত পালপাড়া গ্রামে যায়। সেখানে গিয়েও তারা হত্যা ও নির্যাতন চালায়। দূর থেকে আমরা মানুষের আর্ত চিৎকার ও গুলির শব্দ শুনতে পাচ্ছিলাম। কিছুক্ষণ পর পাঁচজন পাকি আর্মি জালাল নামে সে গ্রামেরই এক ব্যক্তির আত্মীয়াকে ওই বাড়িতে নিয়ে আসে। কিছুক্ষণ পর আমরা বুঝতে পারছিলাম যে, মেয়েটার ওপর ভয়ানক পাশবিক নির্যাতন চালনো হচ্ছে।

তিনি আরও জানান, হিলির পালপাড়ায় একটি গণকবর আছে। সেখানে বারো জনকে মাটিচাপা দেয়া হয়েছিল। এর আগে পাকি আর্মি যাদেরকে হত্যা করেছিল, তাদেরকে পালপাড়ার বাঁশবাগানে মাটিচাপা দেওয়া হয়। হিন্দু, মুসলিম সবাইকে এক জায়গায় মাটিচাপা দেওয়া হয়। তেইশে এপ্রিল শুক্রবার যাদেরকে হত্যা করা হয়েছিল, তাদের কবর দেওয়া হয়নি। তাদের হাড়গোড় সে ভাবেই উঠানেই পড়ে ছিল। চড়ারহাটে যেদিন হত্যাকাণ্ড ঘটানো হয় ঠিক সেদিনই নবাবগঞ্জ থানায় সকাল এগারোটার সময় পাকি আর্মি অতর্কিতে হামলা চালিয়ে গ্রামের পঁয়ত্রিশ জনকে হত্যা করে। পরে

www.pathagar.com

তাদের বাড়িঘর আগুন দিয়ে পুড়িয়ে দেওয়া হয়। কিছু লাশ তারপরও অক্ষত অবস্থায় পাওয়া যায়, কিছু একেবারেই পুড়ে যায়। ওই গ্রামটির নাম ছিল আন্দোল। গ্রামের একজন বৃদ্ধ এই পঁয়ত্রিশ জনের মধ্যে বত্রিশ জনের নাম বলতে পারেন। এরা হলেন ১. কছির উদ্দিন মণ্ডল ২. মজিবর খন্দকার ৩. নজর উদ্দীন সরদার ৪. গফুর সরদার ৫. আসাদ আলী মাস্টার ৬. মস্তনা রেজা ৭. আফসার উদ্দিন ৮. সোহরাওয়ার্দী ৯. আব্দুল আজিজ সরদার ১০. কছিম উদ্দিন সরদার ১১. মালেক উদ্দিন সরদার ১২. কলিম সরদার ১৩. রিয়াজ উদ্দিন ১৪. নিজাম উদ্দিন ১৫. কেরামত সরদার ১৬. আব্দুর রহমান সরদার ১৭. ইব্রাহিম সোহেল সরদার ১৮. আব্দুল ওয়াহেদ ১৯. সমীর উদ্দিন ২০. মঙ্গের আলী ২১. খোকা মিয়া ২২. জফি উদ্দিন ২৩. ইনসার আলী ২৪. মোজাহার আলী ২৫. মহির উদ্দিন ২৬. খাকসার আলী ২৭. জহির সরদার ২৮. আলেফ উদ্দিন ২৯. আলেফ উদ্দিন-২ ৩০. আব্দুস সাত্তার ৩১. সামাদ আলী ৩২. জহির উদ্দিন মাস্টার।

৬. প্রাণকৃষ্ণপুর গ্রামের কুমোর আলী বলেন, একাত্তরের তেইশে আশ্বিন রোববার ভোরে ঘুম থেকে উঠে দেখি, পাকিস্তানি আর্মি পুরো গ্রাম ঘিরে ফেলেছে। কোন দিক দিয়ে পালিয়ে যাওয়ার পথ নেই। পরিস্থিতি দেখার জন্য আমি অন্যদের সাথে বাড়ি থেকে বের হয়ে একটু সামনে গেলাম। কিছু দূর যেতেই চারিদিকে গোলাগুলির শব্দ শুনতে পেলাম। পাকি আর্মি আমাদেকে লক্ষ্য করেও গুলি বর্ষণ শুরু করে। আমার একটু সামনে ছিল আব্দুল লতিফ। প্রথম গুলিটি তার পায়ে লাগে। দ্বিতীয়বার গুলি করলে আমি পেছন দিক দিয়ে দৌড়ে গ্রামে চলে আসি। কিন্তু সেখানে গিয়েও তাদের হাত থেকে রেহাই পাইনি। তারা গ্রামের অন্যদের সঙ্গে আমাকেও ইউনিয়ন কাউন্সিলের রাস্তার ধারে ধরে নিয়ে যায়। সেখানকার একটি ঘরে গ্রামের আরও অনেককে তারা বন্দী করে রেখেছিল। মুরুব্বিরা আমাদেরকে দেখে বলেন, 'এই ছেলেগুলোকেও আর্মি কেন এখানে ধরে নিয়ে এসেছে?' কিছুক্ষণ পর কয়েকজন সৈন্যসহ একজন পাকি ক্যাপ্টেন আমাদের দিকে এগিয়ে এসে সেই বয়স্ক লোকগুলোকে বলল, 'ওঠ'। ওঠ বলার সাথে সাথে তাদের সাথে আমরাও দাঁড়িয়ে গেলাম। দাঁড়ানোর পর দেখলাম তারা আমাদের দিকে স্টেনগান তাক করে রেখেছে। কিছুক্ষণ পর স্টেনগান থেকে ব্রাশফায়ার করা শুরু করলে আমরা সবাই জোরে জোরে কলেমা পড়ে মাটিতে শুয়ে পড়লাম। আমি বুঝতে পারছিলাম, যে আমার গায়ে গুলি লাগেনি। অন্যদের রক্তে আমার শরীর তখন ভিজে যাচ্ছিল। তারপরও মারা যাওয়ার ভান করে শুয়ে থাকলাম। কিছুক্ষণ পর দেখি, গুলি লেগে বেঁচে যাওয়া কয়েকজন লাশের স্তূপ থেকে উঠে পালাতে চেষ্টা করছে। এই অবস্থায়ও আর্মি তাদেরকে লক্ষ্য করে গুলি করা শুরু করল। কয়েক মিনিট পর এক পাকি আর্মি বাঁশিতে ফুঁ দিলে তারা আবার গুলি করা শুরু করে। গুলির শব্দ তখনও আমার কানে আসছিল। গুলি বন্ধ হলে এক পাকি ক্যাপ্টেন লাশগুলো গুনতে নির্দেশ

www.pathagar.com

দেয়। তারা লাশ গুণে ক্যাপ্টেনকে বলল, সাতান্ন জন হুয়া। এরপর সেখান থেকে তারা উত্তর দিকে চলে যায়। আর্মি চলে যাওয়ার পর সন্ধ্যার সময় আমি লাশের স্তূপ থেকে উঠে বাড়ি ফিরে আসি।

সেদিন ৮০ জনেরও বেশি লোককে তারা সেখানে জড়ো করেছিল। এঁদের মধ্যে পঁয়ষট্টি জনকে তারা হত্যা করে। আহত হন বারো জন আর অক্ষত ছিলাম আমরা তিন জন। শহীদদের মধ্যে কয়েকজনের নাম আমার মনে আছে। এঁরা হলেন, আমার চাচা মনসুর আলী মণ্ডল, আজাহার মাস্টার, খোরশেদ আলী মণ্ডল, জহির আকন্দ, চাচাত ভাই মকবুল ও মোজাম্মেল। এই আশি জনের মধ্যে কোন মহিলা ছিলেন না।

দু'জন মহিলাকে তারা এখানে হত্যা করেছিল। এছাড়া বহু মহিলার ওপর পাকি আর্মি পাশবিক নির্যাতন চালায়। ধর্ষিতাদের মধ্যে আনসারের স্ত্রী লাইলীও ছিলেন। অন্যরা হলেন গ্রামের শয়না ও শালু। শালুর বয়স ছিল পঁয়ত্রিশ আর শয়নার পঞ্চান্ন। এদিন এখানকার বাঁশতলায় অনেক মহিলার ওপর পাশবিক নির্যাতন চালানো হয়।

৭. মোঃ লিয়াকত আলী বলেন, আমাদের পার্শ্ববর্তী থানা নবাবগঞ্জে পাকি বাহিনী লাইনে দাঁড় করিয়ে অনেক নিরীহ লোককে হত্যা করে। হিলিতে একটি গণকবর আছে মহাড়াপাড়ায়। এখানে সৈয়দ গোলাম মোস্তফাসহ আমাদের পরিচিত আরও দু'জন ব্যক্তি মারা যান। তখন দু'এক মাইলের মধ্যে কোন লোক ছিল না। এখানকার গ্রামাঞ্চলে বেশ কিছু নারী নির্যাতনের ঘটনা ঘটেছে। আমাদের এখানে পাকিস্তানিদের হাতে নিহত সাত জনের নাম জানা যায়। এরা হলেন (১) শহীদ গোলাম মোস্তফা (২) ইয়দ আলী মুন্সী (৩) অছিমুদ্দীন (৪) একরামুল হক (৫) মন্তাজ আলী মোল্লা (৬) মনির উদ্দীন ও (৭) নবির উদ্দীন।

৮. মুক্তিযোদ্ধা মোঃ মোকসেদ আলী মামুন বলেন, দিনাজপুর সদরের ৮ নম্বর ইউনিয়নের মোহনপুর ব্রিজের কাছে পাকি আর্মি বাঙ্কার তৈরি করে। ওখানে পাকি আর্মির সাথে আমাদের প্রচণ্ড সংঘর্ষ হয়। তারিখটা ছিল সম্ভবত পঁচিশ অক্টোবর। উভয় পক্ষের মধ্যে প্রচণ্ড গোলাগুলির পর বাঙ্কারটি আমাদের নিয়ন্ত্রণে আসে। তখন বাঙ্কারের ভিতরে রক্ত মাখা কিছু ছেঁড়া পোশাক দেখতে পেলাম আমরা। প্রথমে ভাবলাম, ভেতরে পাকি আর্মির লাশ আছে। তারপর দেখলাম যে কোন আর্মি নয়, দুটো মেয়ে বাঙ্কারের ভেতর চৌকির উপরে উলঙ্গ অবস্থায় বসে আছে। তারা উঠতে পারছিল না। এই অবস্থা দেখে আমরা ভেতরে না ঢুকে পার্শ্ববর্তী গ্রাম থেকে কিছু কাপড়চোপড়সহ কয়েকজন মহিলাকে নিয়ে এলাম। তারপর মেয়ে দুটোকে বাঁশের মইয়ের সাহায্যে বাঙ্কারের মধ্যে নামিয়ে দিলাম। গ্রামের সেই মহিলারা নির্যাতিত সেই দুটি মেয়েকে কাপড় পরিয়ে ধরাধরি করে ওপরে নিয়ে আসে। নির্যাতিত সেই দুই মহিলার বাড়ি ছিল দিনাজপুর জেলার চিরিরবন্দর থানায়। এদের নাম ছিল আসমা খাতুন ও মরিয়ম নেসা। একজন ছিল আই এ পাস, অন্য একজন

www.pathagar.com

এস.এস.সি পরীক্ষার্থী। এরা বাবা মায়ের সঙ্গে ভারতে পালিয়ে যাওয়ার সময় পাকি আর্মির কবলে পড়ে। এরপর থেকেই তাদেরকে বিভিন্ন ক্যাম্পে নিয়ে নির্যাতন করা হত। শেষ পর্যায়ে তাদেরকে এই বাঙ্কারে নিয়ে আসা হয়।

মামুন আরো বলেন, দিনাজপুরের লালবাগে একটি হৃদয়বিদারক দৃশ্য দেখেছিলাম সে সময়। সেখানে মায়ের কোল থেকে এক শিশু বাচ্চাকে পাকিস্তানি আর্মি ছিনিয়ে নিয়েছিল। শিশুটিকে আমার চোখের সামনেই পা দিয়ে চেপে টান দিয়ে ফেড়ে ফেলে। শিশুটির বয়স ছিল সাত আট মাস। শিশুটির মা এই দৃশ্য দেখে ওখানেই অজ্ঞান হয়ে যায়। আমি পথের মধ্যে ছিলাম বলে নাম ঠিকানা জানার সুযোগ হয়নি।

৯. মুদিপাড়ার আবুল কালাম আজাদ বলেন, পাকি আর্মি সৈয়দপুর ক্যান্টনমেন্ট থেকে বের হয়ে আশপাশের এলাকা দখল করতে করতে দিনাজপুর এসে ঘাঁটি গড়ে। আসার পথে এই দশ মাইল রাস্তার মধ্যে তারা ব্যাপক হত্যা, ধ্বংসযজ্ঞ ও নির্যাতন চালায়। মুন্সিপাড়ার আবু মিয়া ও পুলিশ লাইনের হুদা নজরের বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ুয়া ছেলে সে সময় আর্মির ব্রাশ ফায়ারে নিহত হন। পাকি আর্মি ব্যাপক অস্ত্রশস্ত্র ও ট্যাংক নিয়ে দিনাজপুর দখল করে। পরিস্থিতি ভয়াবহ রূপ নিলে এখানকার বাঙালিরা ঘর বাড়ি ছেড়ে ভারতে চলে যায়।

নারী নির্যাতন প্রসঙ্গে তিনি বলেন, লিয়াকত সাহেবের নাতনি আর আমার এক বন্ধুর মেয়েকে পাকি আর্মি ধর্ষণ করেছিল। এ ধরনের বহু নির্যাতনের কথা শুনেছি। এসব কথা তো কেউ বলতে চায় না। বাড়িতে যা রেখে গিয়েছিলাম, তার মধ্যে আমার সার্টিফিকেটগুলো ছাড়া সব কিছুই লুট হয়ে যায়। এখানে যেসব পাকি আর্মি ছিল, তাদের মধ্যে কামরুজ্জামান ও নাসেরের নাম আমার মনে পড়ে।

১০. প্রাণকৃষ্ণপুরের আমেনা খাতুন বলেন, আমার স্বামীকে যখন ধরে নিয়ে যায়, তখন আমি তার সাথেই ছিলাম। পাকি আর্মি আমার স্বামীসহ অন্যদেরকে লাইনে দাঁড় করিয়ে গুলি করে। কিন্তু গুলি তাঁর গায়ে লাগেনি। তার কাছে একটি গামছা ছিল। তিনি গামছা দিয়ে মুখ ঢেকে অন্যদের সাথে মরার মত পড়েছিলেন। রক্তে তার শরীর ভেসে যাচ্ছিল। রক্ত মাখা সেই কাপড়গুলো পরে ফেলে দিতে হয়েছিল। সে দিন আমার শ্বশুর, দেবর, মকবুল, জয়নাল, যতীন, সাহেদ ও সাত্তারসহ অনেকেই নিহত হন। নিহতদের লাশ যার যার আত্মীয়স্বজন নিয়ে গিয়েছিল। খুরশেদ নামে একজনের গায়ে এগারোটি গুলি লাগে। তিনি মৃত্যু যন্ত্রণায় ছটফট করতে করতে আমাদের সামনেই মারা যান। আমার ভাগ্নে আহাদ আলীকে তারা হাটের মধ্যে গুলি করে হত্যা করে। তার ওপর পাঁচটি গুলি চালানো হয়।

নারী নির্যাতন প্রসঙ্গে তিনি বলেন, এই গ্রামের অনেক মহিলা পাকি আর্মি কর্তৃক নির্যাতিত হন। এদের মধ্যে আম্বিয়া, লাইলী, মমতাজ ও নূরজাহান আমার পরিচিত। আম্বিয়া এক ছেলের মা ছিল। পাকি আর্মি তাঁকে ধরে নিয়ে যাওয়ার সময় আমি বাধা দিলে তারা আমাকে নিয়ে যাওয়ার জন্যও টানাহ্যাঁচড়া শুরু করে। আমার কোলে

www.pathagar.com

ছোট বাচ্চা থাকায় তারা শেষ পর্যন্ত তারা আমাকে ছেড়ে দেয়। নূরজাহানের দুই ছেলেমেয়ে ছিল। লাইলীর কোন সন্তান ছিল না। আমার পর জাহেরাকে টানা হ্যাঁচড়া শুরু করলে তার শাড়ি ছিঁড়ে যায়। লজ্জায় বিবস্ত্র অবস্থায় সে দৌড়ে বাড়ির ভেতরে চলে যায়।

১১. মোসলেম উদ্দিনের স্ত্রী হাসনাহেনা বলেন, যুদ্ধের এক দেড় বছর আগে আমার বিয়ে হয়েছিল। তখন তিন চার মাসের একটি মেয়ে আমার কোলে। স্বামী, শ্বশুর, শাশুড়ি, তিন ননদ ও আমার ছোট বোনকে নিয়ে আমি স্বামীর বাড়িতেই থাকতাম। আষাঢ় কি শ্রাবণ মাস ছিল তখন। তারিখটাও সঠিক মনে নেই। ভোর পাঁচটার দিকে পাকি বাহিনী গ্রাম ঘিরে ফেলে গুলি করতে শুরু করে। কিছুক্ষণ পর আমাদের গ্রামের এক বুড়ো লোক (সম্পর্কে আমার নানা শ্বশুর হতেন) নাম কোদান, তিনি প্রত্যেক বাড়িতে গিয়ে খবর দেন যে, তোমরা সবাই ওঠ, খানেরা এসেছে মিটিং করবে। তিনি রাজাকার ছিলেন না। পাকি আর্মির উদ্দেশ্য তিনি বুঝতে পারেননি। আমরা ভেবেছিলাম, খানেরা তো প্রায় আসে। উনি বোধহয় মিথ্যা কথা বলছেন। এই কথা ভেবে আমরা তখনও শুয়ে আছি। তারপর দেখি যে, ওরা খুব কাছাকাছি চলে এসেছে। আমার ছোট শাশুড়ি ঘুম থেকে উঠে পান খেয়ে আমার শ্বশুরকে ডাকাডাকি করছিলেন। কিন্তু তার কোন সাড়া পাওয়া যাচ্ছিল না। কারণ খানেরা মিটিং এর কথা বলে তাঁকে আগেই নিয়ে গিয়েছিল। আমার স্বামী আমরা জানতাম না যে, তারা বাবাকে ধরে নিয়ে গেছে। কারণ তখন আমরা পাশের ঘরে ছিলাম। আমার শ্বশুরের নাম ছিল মইর আকন্দ। এই ঘটনার পর আমরা তাড়াতাড়ি ঘর থেকে বের হয়ে পাশের বাড়িতে আশ্রয় নিতে গেলাম। বাড়িটা ছিল শামসু ডাক্তারের। ওই বাড়ির মেয়ে আমাদের দেখে দরজা লাগিয়ে দিলে আমরা সে বাড়ি থেকে একটু সামনে গিয়ে আমার এক ফুফু শাশুড়ির বাড়িতে গিয়ে আশ্রয় নিই।

আমার স্বামী ও পাশের বাড়ির মকবুল আশ্রয়ের জন্য অন্য এক বাড়িতে ঢোকার সময় খানেরা তাদেরকে ধরে নিয়ে যায়। তারা মেয়েদের ধরে নিয়ে যায়নি। তবে মারধোর ও টানাহ্যাঁচড়া করে। তখন আমার শরীর খুবই অসুস্থ ছিল। তার ওপর রাস্তাঘাট চিনি না। তাড়াহুড়ো করে পালাতে গিয়ে পানিতে পড়ে যাই। আমার বোন শেলীর কোলে ছিল আমার মেয়েটা। তাকিয়ে দেখি, পাকি আর্মি সেদিকে আসছে। তাদের পোশাক ছিল জংলি আর মাথায় ছিল জংলি পিরান। শেলী তখন আমার মেয়েকে নিয়ে অন্যদের সাথে গোয়ালদা গ্রামের দিকে চলে যায়। সবাই চলে যাওয়ার পর আমরা যে বাড়িতে আশ্রয় নিই, সেখানে আমি, আমার নানী ও দাদীশাশুড়িসহ অন্যদের সাথে ঘরের এক পাশে জড়োসড়ো হয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম। আমার নানীশাশুড়ির কাছে নতুন একটা লুঙ্গি ছিল, সেটা বিছিয়ে পরে সেখানে আমরা বসে পড়লাম। বসার পর দেখি আমাদের সামনেই এক বিহারি। আমার নানীশাশুড়ি তখনও বসে। বিহারিকে দেখে আমি দাঁড়িয়ে গেলাম। কিছুক্ষণ পর আমার নানীশাশুড়ি উঠে দাঁড়াতেই তার গায়ে গুলি লাগল। একটা গুলিই আমার নানীশাশুড়ির পেট, আমার হাত ও আমার দাদীশাশুড়ির গায়ে লাগে। গুলি লেগে আমার নানীশাশুড়ি সাথে সাথেই মারা যান।

www.pathagar.com

আমি আহত হয়ে তার লাশের ওপর পড়ে যাই। এরপর কি হয়েছিল, আমি সেটা বলতে পারি না। তারা আমাদেরকে গুলি করেছিল সকাল আট নয়টার দিকে। আর আমার দাদীশাশুড়ি মারা যান সন্ধ্যার পর।

আমি গুলি খেয়ে পড়ে আছি, আর এদিকে আর্মি আমাদের ঘরে আগুন লাগিয়ে দিয়েছে। আমি জ্ঞান ফিরে পেয়েও উঠতে পারছিলাম না। পানি খাওয়ার জন্য ছটফট করছিলাম। সেখানে আমার ফুপাত ভাই ছিল, সে আমার জন্য পানি নিয়ে আসে। কিন্তু আর্মি পুনরায় এসে তাকে দেখে ফেললে সে পানি ফেলে পালিয়ে যায়। আমি এ সময় তাকে আমার স্বামী ও অন্যদের কথা জিজ্ঞেস করলে সে বলে, 'ওদের তো পাকি আর্মি বকের মতো গুলি করে হত্যা করেছে। আমি তখন সেখান থেকে উঠে আসতে চেষ্টা করলাম। কিন্তু আর্মির দেখে গোয়াল ঘরের কাছে গোবরের মধ্যে আবার শুয়ে পড়লাম। আর্মি আমাকে প্রশ্ন করল, মেয়েরা কোথায়? আমি কি উত্তর দিয়েছিলাম তা এখন মনে নেই। আমরা কথা শুনে তারা চলে যায়। তাদের চলে যাওয়ার পর আমার স্বামী ফিরে আসেন। তার কাছ থেকে পরে সব ঘটনা জানতে পারি। নওশার বাড়িতে মিটিং-এর কথা বলে তাদের সবাইকে ধরে নিয়ে যাওয়া হয়। প্রায় দুই তিন 'শ লোককে সেদিন তারা ধরে নিয়ে গিয়েছিল। তার মধ্যে আমার স্বামীসহ চার পাঁচ জন বেঁচে আসতে পেরেছিলেন। যখন আর্মি সবাইকে লাইন করে গুলি করছিল, তখন আমার স্বামী মরার ভান করে লাশের ওপরে পড়ে ছিলেন। প্রথম গুলি করার পর যারা বেঁচেছিলেন, তাদেরকে আবার গুলি করতে উদ্যত হয় আর্মি। কিন্তু রাইফেলে গুলি না থাকায় সেটা আর সম্ভব হয়নি। সেখানে একটা বিল ছিল, আর্মি সেই বিলের ধারে গিয়ে দূর থেকে দেখছিল কেউ বেঁচে আছে কি না। যারা বেঁচে ছিলেন, তারা আর্মিদের চোখের আড়াল দিয়ে লাশ আনার চেষ্টা করলে আর্মি সেটা দেখে ফেলে। তখন আমার স্বামীসহ অন্যরা সেখান থেকে দৌড়ে পালিয়ে বেঁচে যায়। আমার বাবার বাড়ি সরাইপাড়ায় একেকটি কবরে দু'তিনজনকে মাটিচাপা দেওয়া হয়। আমার শ্বশুরকে আর্মি তার দিয়ে বেঁধে রেখেছিল। সরাইপাড়া ছিল রাস্তার ওপারে। এই দুই গ্রামেই বেশি গণহত্যা সংঘটিত হয়েছে। সরাইপাড়ায় মুক্তিরা আর্মির একটা গাড়ি নষ্ট করে দিলে আর্মি সেখানকার নিরীহ লোকজনদেরকে হত্যা করে।

এখানে যেসব পাকিস্তানি আর্মি ছিল, তাদের কারও নাম আমরা জানতে পারিনি। তাদের হাতে বহু নারী সে সময় পাশবিক নির্যাতনের শিকার হয়েছিলেন। আমার জানামতে, এদের মধ্যে ছিলেন ইউনুসের দুই স্ত্রী, আমার এক চাচাতো ননদ, নিজাম মাস্টারের বোন জিন্না ও মোজাম্মেল মাস্টারের বোন শরিফা। তারা বেঁচে আছেন, তাদের আবার বিয়ে হয়েছে।

১২. মুদিপাড়া গ্রামের সমাজ সেবিকা আজাদী হাই বলেন, একদিন দুপুরে কান্নাকাটি, হৈ চৈ শুনে ঘর থেকে বের হয়ে দেখি লোকজন নদী পার হয়ে এদিকে আসছে। কেউ নৌকায় করে কেউবা সাঁতার কেটে। যারা নৌকা পায়নি, তারা চিৎকার করছিল। নৌকায় বেশি লোক ওঠানোর কারণে দুই একজন নদীতে পড়েও যাচ্ছিল। অনেক মহিলা তখন বাচ্চা কাচ্চাসহ এপারে এলে তাদের কাছ থেকে

www.pathagar.com

জানতে পারি যে, ওই এলাকায় পাকি আর্মি আক্রমণ করেছে। পুরুষরা আগেই সরে যেতে পেরেছিল। কিন্তু মহিলারা কোথাও যেতে পারেনি। তারা মই বেয়ে ঘরের চালায় আশ্রয় নিয়েছিল। তারপর মইগুলো সেখানে সরিয়ে ফেলে, যাতে পাকি আর্মি বুঝতে না পারে যে, সেখানে কেউ লুকিয়ে আছে। মহিলাদের সাথে অনেক বাচ্চাও লুকিয়ে ছিল সেখানে। পাকি আর্মি ওইসব বাড়িতে ঢুকে আগুন লাগিয়ে চলে যায়। এরপর আর্মি চলে যাওয়ার পর প্রতিবেশীরা তাদেরকে আবার মই দিয়ে নামিয়ে আনে। তারা সম্মান রক্ষার জন্য মৃত্যুকে পরোয়া না করে আশ্রয়ের খোঁজ নদী পার হয়ে এই গ্রামে আসছিল। সে সময় অনেক লোককে পাকি আর্মি ধরে নিয়ে যায়। তিনি বলেন, আমাদের আশেপাশে কত নারী নির্যাতিত হয়েছেন, তার সঠিক সংখ্যা বলা মুশকিল। তবে দু'চার শ' হবেই এতে কোন সন্দেহ নেই। আর দিনাজপুর শহরের কথা আমি ঠিক বলতে পারব না।

যুদ্ধের পর দিনাজপুরের ঘাসিপাড়ায় নির্যাতিত নারীদের জন্য এই পুনর্বাসন কেন্দ্রটি খোলা হয়েছিল। বর্তমানে এটা মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর হিসেবে পরিচিত। ঠাকুরগাঁও, বীরগঞ্জ ও পঞ্চগড় তখন বৃহত্তর দিনাজপুরের অংশ হিসেবে পরিচিত ছিল। এই সব এলাকা থেকে প্রায় ষাট থেকে সত্তর জন নির্যাতিত মহিলা এই পুনর্বাসন কেন্দ্রে আশ্রয় নেন। যারা অন্তঃসত্ত্বা হয়ে পড়েছিলেন, শুধুমাত্র তাদেরকেই স্থায়ীভাবে এই কেন্দ্রে রাখা হয়েছিল। আর যারা অসুস্থ ছিল, তাদেরকে কেন্দ্রে আনা নেওয়া করে চিকিৎসা দেওয়া হত।

এসব প্রত্যক্ষদর্শী ও ক্ষতিগ্রস্তদের সাক্ষ্য থেকে প্রতীয়মান হয় যে, দিনাজপুর জেলার সকল হত্যাকাণ্ড, ধর্ষণ ও নির্যাতনের জন্য মেজর কামরুজ্জামান, ক্যাপ্টেন নাসের, ক্যাপ্টেন ইকবাল, ক্যাপ্টেন উলফাৎ প্রমুখ পাকি আর্মি অফিসার ও তাদের সহকর্মীরা দায়ী। এদেশের জনগণ পাকি আর্মির এই নির্বিচার গণহত্যা, জাতিগত নিধন, ধ্বংসযজ্ঞ ও ভয়ঙ্কর ধ্বংসাত্মক কর্মকাণ্ডের জন্য বিচারের কাঠগড়ায় দাঁড় করাতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ।

আসামী ঃ ক্যাপ্টেন নিয়াজি

অপরাধের ধরনঃ গণহত্যা, জাতিগত নিধন, ধর্ষণ, লুটপাট, অগ্নিসংযোগ।

সাক্ষী ঃ এস এম লিয়াকত আলী, মির্জা আবুল কালাম দুলাল।

ঘটনাকালঃ একাত্তরের ছাব্বিশ মার্চ থেকে ২৯ নভেম্বর পর্যন্ত।

ঘটনাস্থল ঃ পঞ্চগড় জেলা।

সূত্রঃ যুদ্ধাপরাধ গণহত্যা ও বিচারের অন্বেষণ এবং WCFFC গবেষণা।

ক্যাপ্টেন নিয়াজি ও তার সহযোগীদের নেতৃত্বে পাকিস্তানি আর্মি পঞ্চগড় জেলায় ব্যাপক গণহত্যা, জাতিগত নিধন, ধর্ষণযজ্ঞ ও অগ্নিসংযোগ করে। পঞ্চগড় শহরে পঞ্চাশ ষাট জন নিরীহ বাঙালিকে তারা হত্যা করে। ধর্ষণ করে শহরে অবস্থানরত

www.pathagar.com

কিশোরী ও যুবতী নারীদের প্রায় সকলকে। এই জেলার আটোয়ারী উপজেলার মির্জাপুর গ্রামে পুরানদীঘি নামে একটি বধ্যভূমি রয়েছে। একাত্তরে পাঁচ নভেম্বর মুক্তি বাহিনী পাকি সেনাদের ওপর আক্রমণ চালায়। সে আক্রমণে আহত পাকি সেনাদের বহন করে নেওয়ার জন্য পাকি সেনারা স্থানীয় এগারো জন গ্রামবাসীকে জোর করে পুরানদীঘি সংলগ্ন ক্যাম্পে ধরে নিয়ে যায়। সারাদিন তাদেরকে দিয়ে বিভিন্ন কাজ করানোর পর সন্ধ্যায় বাড়ি ফিরে যাওয়ার কথা বলে পেছন দিক থেকে ব্রাশফায়ার করে তাদেরকে হত্যা করা হয়। সেদিন পাকিস্তানি আর্মির হাতে যে সমস্ত নিরীহ গ্রামবাসী নিহত হন, তারা হলেন: রফিকুল ইসলাম, শাহীদুল ইসলাম, সানু আলী, চৌধুরী, কাশেম আলী, জহির উদ্দিন, রফিজ উদ্দিন, খাবারু, শ্রীদর্শন চন্দ্র বর্মন ও তছলিম উদ্দিন। প্রত্যক্ষদর্শী কয়েকজনের সাক্ষ্য নিচে উল্লেখ করা হল।

১. এস এম লিয়াকত আলী বলেন, অবস্থার ভয়াবহতা চিন্তা করে আমরা ছাত্র লীগ ও ছাত্র ইউনিয়নের কর্মীরা আমাদের পরিবারের আঠারো থেকে ত্রিশ বছর বয়সী মেয়েদের গ্রামে পাঠিয়ে দিয়েছিলাম। কারণ শহরে থাকা তাদের জন্য নিরাপদ ছিল না। বেশিরভাগ লোক সে সময় নিরাপদ স্থানে চলে গেলেও এখানকার মুসলিম লীগ ও জামায়াতের লোকেরা যায়নি। তারা বলল, আমরা এখানেই থাকব। আমরা সাবধানতা অবলম্বন করে মহিলা, শিশু ও অন্যদেরকে নিরাপদ আশ্রয়ে পাঠিয়ে দেওয়ার কারণে পাকি আর্মি এখানে খুব বেশি হত্যাকাণ্ড ঘটাতে পারেনি। পঞ্চগড় শহরে সে সময় পাকি আর্মি পঞ্চাশ ষাট জনের মত নিরীহ বাঙালিকে হত্যা করেছিল।

এখানকার গণহত্যার সাথে যেসব পাকি আর্মি জড়িত ছিল তাদের মধ্যে অন্যতম হচ্ছে ক্যাপ্টেন নিয়াজী। সে খুব অত্যাচারী ছিল। এখানে পাকি বাহিনীর সহযোগী ছিল খমির উদ্দীন চেয়ারম্যান ও মুসলিম লীগের সদস্যরা। এলাকাটি সীমান্তের কাছাকাছি হওয়ায় এখানকার অধিবাসীদের অধিকাংশই ভারতে চলে গিয়েছিল। জামায়াতে ইসলামী ও মুসলিম লীগের সদস্যরা পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর সহযোগী হিসেবে এখানে অবস্থান করায় তাদের স্ত্রী, কন্যা ও বোনদের ওপরেই পাকি সৈন্যরা নির্যাতন চালায়। তারা পিস কমিটির চেয়ারম্যান ও মেম্বারদের বাড়ির মেয়েদের ধরে এনে ক্যাম্পে রেখে নির্যাতন করে। প্রায় শ' খানেক মহিলা এখানে পাকি বাহিনীর হাতে নির্যাতিত হয়েছেন। তাদের সম্মানের কথা ভেবে আমি তাদের নাম বলতে চাচ্ছি না। তাঁরা বর্তমানে বেশ ভাল অবস্থায় আছে। তাদেরকে পুনর্বাসন করা হয়েছে। তারা এখন সুপ্রতিষ্ঠিত। বিভিন্ন অফিস আদালতে চাকরি করছেন। আমরাই তাঁদের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করেছি, ভাল বিয়ে দিয়েছি।

মির্জা আবুল কালাম দুলাল নারী নির্যাতন প্রসঙ্গে বলেন, গ্রামেগঞ্জে বিচ্ছিন্নভাবে কিছু নারী নির্যাতনের ঘটনা ঘটেছে। গ্রামে হামলা চালিয়ে পাকি আর্মি মহিলাদের ওপর নির্যাতন চালাত। অনেক সময় মহিলাদেরকে ধরে তারা ক্যাম্পেও নিয়ে গেছে। বিহারি ও রাজাকার অর্থাৎ তাদের দোসররা তাদেরকে প্রায়শই গ্রামে নিয়ে যেত। গ্রামে হামলা চালিয়ে মহিলাদেরকে ওপর পাশবিক নির্যাতনের পাশাপাশি তারা

www.pathagar.com

ঘরবাড়িও জ্বালিয়ে দিত। নির্যাতিত অনেক মহিলার নাম আমি জানি। কিন্তু বলতে চাচ্ছি না। কারণ তাতে ওই সব মহিলাদের অযথা হয়রানি করা হবে। তবে কতজন নারীকে নির্যাতন করা হয়েছিল, তার সঠিক সংখ্যা বের করার জন্য কোন কার্যক্রম এখানে চালানো হয়নি। যে সব পাকি আর্মি অফিসার এখানে এসব হত্যা, নির্যাতন চালিয়েছিল, তাদের একজনের নাম ছিল ক্যাপ্টেন নিয়াজি। বাকিদের নাম এখন মনে পড়ছে না।

পঞ্চগড়ের সকল গণহত্যা, ধর্ষণযজ্ঞ, জাতিগত নিধন, অগ্নিসংযোগ ও লুটপাটের জন্য ক্যাপ্টেন নিয়াজি, তার ঊর্ধ্বতন ও অধস্তন সহকর্মীরা সরাসরি সংশ্লিষ্ট ছিল। এখানে সংঘটিত সকল অপরাধের জন্য উপরিউক্ত পাকিস্তানি সামরিক কর্মকর্তারাই দায়ী।

www.pathagar.com

শেষ কথা

আলোচ্য গ্রন্থে উল্লেখিত ১৯১ জন যুদ্ধাপরাধী এবং তাদের দোসর দ্বারা সংঘটিত অপরাধের অনুপুঙ্খ বিবরণ এদের বিচারের দাবিকে প্রতিষ্ঠিত করে। এ সকল যুদ্ধাপরাধীদের বিচার এখনও সম্ভব। এর জন্য যা প্রয়োজন, তা হল সঠিক রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত এবং জনগণের দৃঢ় অঙ্গীকার। তাদের বিচার হওয়া উচিত সমগ্র মানব জাতির মর্যাদা ও ন্যায়ের অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য। সামগ্রিকভাবে ১৯১ জন যুদ্ধাপরাধী যে সব আইনের ধারায় বিচারযোগ্য তা হলঃ

- হত্যাযজ্ঞের মাধ্যমে গণহত্যা সাধন।
- গুরুতর শারীরিক ও মানসিক ক্ষতিসাধনের মাধ্যমে গণহত্যা।
- সুপরিকল্পিতভাবে শারীরিক ধ্বংস ও জীবননাশের মাধ্যমে গণহত্যা পরিকল্পনা এবং সংঘটন যা পরিণামে মানবজীবনকে নিশ্চিহ্ন করে।
- এমন কর্ম করে গণহত্যা সাধন, যাতে অন্যের জন্মচক্র থেমে যায়।
- হত্যার মাধ্যমে সংঘটিত মানবতাবিরোধী অপরাধ।
- ব্যাপক নিধনযজ্ঞের মাধ্যমে সংঘটিত মানবতার বিরুদ্ধে অপরাধ।
- ধর্ষণের মাধ্যমে সংঘটিত মানবতার বিরুদ্ধে অপরাধ।
- যৌনদাসীতে পরিণতকরণের মাধ্যমে সংঘটিত মানবতার বিরুদ্ধে অপরাধ।
- যৌন নির্যাতনের মাধ্যমে সংঘটিত মানবতার বিরুদ্ধে অপরাধ।
- জাতিগত বিদ্বেষ ও ঘৃণা সৃষ্টির মাধ্যমে সংঘটিত মানবতার বিরুদ্ধে অপরাধ।
- দাসত্বে আবদ্ধকরণের মাধ্যমে সংঘটিত মানবতার বিরুদ্ধে অপরাধ।
- জোরপূর্বক নির্বাসন, দেশান্তর এবং জনগণকে ভিটা থেকে উৎখাতের মাধ্যমে সংঘটিত মানবতার বিরুদ্ধে অপরাধ।
- আইন বহির্ভূতভাবে কারাগারে নিক্ষেপ, বন্দীকরণ এবং স্বাধীনতার অধিকার ক্ষুণ্ন করার মাধ্যমে সংঘটিত মানবতার বিরুদ্ধে অপরাধ।

www.pathagar.com

- অত্যাচার ও নির্যাতনের মাধ্যমে সংঘটিত মানবতার বিরুদ্ধে অপরাধ।
- মানসিক নির্যাতনের মাধ্যমে সংঘটিত মানবতার বিরুদ্ধে অপরাধ।
- উদ্দেশ্য প্রণোদিত হত্যার মাধ্যমে সংঘটিত যুদ্ধাপরাধ।
- নিপীড়ন ও নির্যাতনের মাধ্যমে সংঘটিত যুদ্ধাপরাধ।
- বেসামরিক ব্যক্তিবর্গের উপর আক্রমণের মাধ্যমে সংঘটিত যুদ্ধাপরাধ।
- শত্রু দেহ খণ্ড বিখণ্ড ও বিকৃত করার মাধ্যমে সংঘটিত যুদ্ধাপরাধ।
- ধর্ষণের মাধ্যমে সংঘটিত যুদ্ধাপরাধ।
- যৌনদাসীতে পরিণতকরণের মাধ্যমে সংঘটিত যুদ্ধাপরাধ।
- যৌন নির্যাতনের মাধ্যমে সংঘটিত যুদ্ধাপরাধ।
- খুনের মাধ্যমে সংঘটিত যুদ্ধাপরাধ।
- সাধারণ জনগণের উপর আক্রমণের মাধ্যমে সংঘটিত যুদ্ধাপরাধ।
- অমানবিক আচরণের মাধ্যমে সংঘটিত মানবতার বিরুদ্ধে অপরাধ।
- লুটপাট, ক্ষতিসাধন ও বিনাশের মাধ্যমে সংঘটিত যুদ্ধাপরাধ।
- বৈরী পরিবেশে শত্রুপক্ষের লোকজন দিয়ে জোরপূর্বক শ্রম আদায়ের মাধ্যমে সংঘটিত যুদ্ধাপরাধ।
- অন্তহীন কষ্ট ও দুর্ভোগ সৃষ্টির মাধ্যমে সংঘটিত যুদ্ধাপরাধ।
- জোরপূর্বক নির্বাসন, দেশান্তর এবং জনগণকে ভিটা থেকে উৎখাতের কারণে সংঘটিত মানবতাবিরোধী অপরাধ।
- বেসামরিক ব্যক্তি ও স্থাপনার উপর আঘাতের মাধ্যমে সংঘটিত যুদ্ধপরাধ।
- লক্ষ্যবস্তুর বাইরে ব্যক্তি ও বস্তুর উপর সীমাহীন আঘাতের মাধ্যমে ধ্বংস, মৃত্যু ও শারীরিক ক্ষতি সাধনের মাধ্যমে সংঘটিত যুদ্ধাপরাধ।
- প্রতিরক্ষাবিহীন স্থান ও স্থাপনার উপর আঘাতের মাধ্যমে সংঘটিত যুদ্ধাপরাধ।
- শত্রুসম্পত্তি অধিগ্রহণ ও ক্ষতিসাধনের মাধ্যমে সংঘটিত যুদ্ধাপরাধ।
- ব্যক্তি মর্যাদার উপর গুরুতর আঘাতজনিত যুদ্ধাপরাধ।

---

www.pathagar.com

www.pathagar.com